মনোজ বসু

সোভিয়েতের দেশে দেশে

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা বারো

প্রথম প্রকাশ—কার্তিক, ১৩৬৪

প্রকাশক—শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট
কলিকাতা—১২

মুদ্রাকর—বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য
ইনল্যাণ্ড প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৬০-৩, ধর্মতলা স্ট্রীট
কলিকাতা—১৩

প্রচ্ছদপট
আশু বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রচ্ছদপট-মুদ্রণ
ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও

বাঁধাই—বেঙ্গল বাইণ্ডার্স
কলিকাতা—১২

ছয় টাকা

উৎসর্গ

আমার মায়ের স্মৃতিতে
দূর-বিদেশে অনেক অসহায় মুহূর্তে
আবার আমি যাঁর শিশু হয়ে যেতাম

ধন্যবাদ জ্ঞাপন :

মাসিক বসুমতীর সম্পাদক শ্রীমান প্রাণতোষ ঘটকের আগ্রহে ও সৌজন্যে এই ভ্রমণ কথা ধারাবাহিক ভাবে দীর্ঘকাল তাঁর পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। বইয়ের সমস্ত ছবি সোবিয়েতের সংস্কৃতি-বিভাগ ভোকসের তোলা।

সোবিয়েতের দেশে দেশে

এই লেখকের

উপন্যাস এক বিহঙ্গী (৩য় মু) ॥ সৈনিক (৭ম মু) ॥ ওগো বধূ সুন্দরী (৪র্থ মু) ॥ বকুল (৩য় মু) ॥ নবীন যাত্রা (৩য় মু) ॥ জলজঙ্গল (৩য় মু) ॥ শত্রুপক্ষের মেয়ে (৪র্থ মু) ॥ যুগান্তর (২য় মু) ॥ ভুলি নাই (২৭শ মু) ॥ বাঁশের কেল্লা (৪র্থ মু) ॥ আগস্ট, ১৯৪২ (২য় মু) ॥ সবুজ চিঠি (২য় মু) ॥ বৃষ্টি, বৃষ্টি! (২য় মু) ॥

গল্পগ্রন্থ শ্রেষ্ঠ গল্প (৩য় মু) ॥ বনমর্ম্মর (৪র্থ মু) ॥ উলু (৩য় মু) ॥ কাচের আকাশ (২য় মু) ॥ দেবী কিশোরী (৩য় মু) ॥ খদ্যোত (২য় মু) ॥ কুঙ্কুম (২য় মু) ॥ কিংশুক (২য় মু) ॥ পৃথিবী কাদের (৪র্থ মু) ॥ নরবাঁধ (৪র্থ মু) ॥ দিল্লি অনেক দূর (২য় মু) ॥ দুঃখনিশার শেষে (৩য় মু) ॥ একদা নিশীথকালে (৪র্থ মু) ॥

নাটক প্লাবন (৪র্থ মু) ॥ নূতন প্রভাত (৫ম মু) ॥ বিপর্যয় ॥ রাখিবন্ধন (২য় মু) ॥ বিলাসকুঞ্জ বোর্ডিং ॥ শেষ লগ্ন ॥

ভ্রমণ চীন দেখে এলাম ১ম পর্ব (৮ম মু) ২য় পর্ব (৪র্থ মু) ॥ পথ চলি (২য় মু) ॥ সোবিয়েতের দেশে দেশে ॥

কাবুল। শ্রীমতী মুখুজ্জে, শ্রীমতী গুপ্ত ও বাচ্চাদের সঙ্গে

গায়ে হাত দিলাম, দৃকপাত নেই (পৃ. ১৯)

চীন দেখে এসেছি, রাশিয়ায় চললাম। এই দেখুন, বিসমোল্লায় গলদ। রাশিয়া বলি কেন, রাশিয়া আর কতটুকু জায়গা, যাচ্ছি সোবিয়েত দেশে। ষোল শরিকের এজমালি দেশ; সবাই সমান তেজীয়ান—এ বলে আমায় দেখ, ও বলে আমায় দেখ। একান্নবর্তী আছেন নিজ নিজ সুবিধা বিবেচনায়; বনিবনাও না হলে পৃথক হতে বাধা নেই। রাশিয়া হলেন সেই ষোলর একটি। এই সব বড় শরিক ছাড়াও মেজো-ছোট রকম-বেরকমের বৃত্তিভোগীরা রয়েছেন। বিজ্ঞজনদের ধরুন, জলের মতন বস্তুটা জিলিপির মতন প্যাঁচ খেলিয়ে খেলিয়ে বুঝিয়ে দেবেন।

বিস্তর খবর শুনেছেন রাশিয়া সম্বন্ধে। আপনি বলে কেন, পাঁচ বছরের শিশুটা অবধি বুকনি ছাড়ে। উভয় তরফই পণ ধরে আছেন—আপনি কানে ছিপি আঁটলেও তাঁরা না শুনিয়ে ছাড়বেন না। গাঁটের পয়সায় বই কাগজ ছেপে বিশ্বজন-হিতায় বাড়ি বাড়ি পাঠাচ্ছেন—তার পাঁচটা উনুন-ধরানো কর্মে আত্মদান করেও একটা অন্তত যদি নজর সুমুখে হাজির হয়। লোহার পর্দায় নাকি দেশটি ঘেরা, ভিতরে রোমহর্ষক কাণ্ডকারখানা। চীন দেখে এসে আমার কিন্তু ভয় ভেঙে গেছে। আহা, দেখেই আসি না কেন—কোন্ সব জীবজন্তু নরমূর্তিতে তথায় বিচরণ করছে। মোলাকাত করে আসি।

আর সেই যেমন হয়ে আসছে—যেটা ভাবব, ঘুরে ফিরে তাই কিনা ঘটে যাবে! আমার এক দৈত্য তাঁবেদার আছে, বুঝলেন। আলাদিনের যেমনটা ছিল। অহরহ সে হুকুম তামিল করে বেড়ায়। হুকুমটা আবার মুখ ফুটেও বলতে হয় না, মনে মনে মতলব করলেই হল। রাগও হয় এই নিয়ে। আরে দূর, হা-হুতাশ, দীর্ঘশ্বাস, এবং দু-চার ঘটি চোখের পানি বিহনে জীবন নিতান্তই আলুনি। ওগুলোও চাই।

যাকগে, যাকগে। ধান ভানতে শিবের গীত শুরু হয়ে গেল। 'চীন দেখে এলাম' বইদুটো পড়লেন নাকি? গল্প-উপন্যাস নয়—পড়তেই হবে,

এমন-কিছু নয়। ধরে নিচ্ছি, আপনার ভবনে এই সব আজেবাজে বইয়ের ঢোকবার এক্তিয়ার নেই। অতএব কিঞ্চিৎ ফলাও করে বলতে হবে। পড়তে মন না হয় তো বাদ দিয়ে যান। উপন্যাসের ভিতরে প্রাকৃতিক বর্ণনা অথবা মনোবিশ্লেষণ এসে পড়লে যেমন করে থাকেন।

পিকিনের সম্মেলনে সোবিয়েত থেকে ওজনদার এক দল গিয়েছিল। দল-নেতা অ্যানিসিমভ জাঁদরেল পণ্ডিত--এবং কি আশ্চর্য, লেখকও। লেখাপড়া জানলে তো লিখতে পারে না। কিন্তু একাধারে দুধ খায় তামাকও খায়--সেই মানুষটা দেখলাম। দোস্তি জমে গেল অচিরে। সেটা যে ঠোঁটে-বুলানো হাসির দোস্তি নয়--মালুম হল মস্কোয় ওঁদের খাস এলাকার মধ্যে ঢুকে পড়ে। ক'দিনই বা দেখা, কিন্তু পুরোপুরি মনে রেখেছেন। কথাবার্তাগুলোও। সেইসব বলতে লাগলেন। একটা জিনিসই চেপে গেলেন শুধু। অথবা ভুলে মেরেছেন। কিন্তু যেহেতু নিমন্ত্রণের ব্যাপার--উনি ভুললেও তো আমরা ভুলতে পারিনে।

তলস্তয়ের কথা উঠেছিল সেবারে পিকিন হোটেলে আলোচনার মধ্যে। দাবি তুললাম, তলস্তয় ব্যক্তিটি শুধুমাত্র আপনাদের ষোলআনা নন; আমাদেরও হিস্যা আছে। আমাদের ভালবাসার মানুষ। ১৮৫৭-র অভ্যুত্থানের (ইংরেজের বুলি কপচে যাকে বলে থাকেন--সিপাহি-বিদ্রোহ) শোধ নিচ্ছে অসবার্ন সাহেব চুরানব্বুই জন সিপাহিকে গুলি করে মেরে--তলস্তয় লিখলেন, ধন্য ঈশ্বর। কি এলেমদার বানিয়েছ ওদের, কেমন শান্তচিত্তে বিচার-বিবেচনা অন্তে চুরানব্বুইটা মানুষ খুন করছে। লিখলেন, দেখ দেখ কি তাজ্জব--ত্রিশ হাজার দুষ্ট বেনে বিশ কোটি সাহসী স্বাধীনতাকামীদের পায়ে পিষছে। ... দুর্দিনের এমন বন্ধুকে পর ভাবতে পারি?

_ বেশ তো, বেশ তো--অ্যানিসিমভ ঢালাও নিমন্ত্রণ করলেন সঙ্গে সঙ্গে। একশ' পঁচিশ বছর পুরে যাচ্ছে তলস্তয়ের। জাঁকিয়ে উৎসব হবে। কাজটা হল সাহিত্যিকদের--দুনিয়ার এখানে-সেখানে যত আমরা কলমবাজ আছি, তলস্তয়ের নামে, আসুন, এক জায়গায় মিলে ফূর্তি-ফার্তি করি। ভারত থেকে অনেক জনকে চাই।

প্রস্তাব মাত্রেই কামরায় সমবেত সমুদয় মস্তক একসঙ্গে কাত হয়ে সমস্বরে সাধু সাধু রব দিয়ে উঠল। দেশেঘরে ফিরেছি, তখনও ঐ নিমন্ত্রণ মাথায় ঘুরছে। কাগজ দেখে একদা লাফিয়ে উঠলাম--সিকি ইঞ্চির সরু সংবাদ বেরিয়েছে, তলস্তয়-উৎসবের জন্য কমিটী বানানো হল। আর কি, পাশপোর্টের জোগাড় দেখতে হয় এবার। আমার আন্তর্জাতিক পাশপোর্টে ইউ. এস. এস. আর.--চারটি মাত্র অক্ষর ঢুকিয়ে দেওয়া। কর্তাদের বেশি খাটনি হবে না।

কিন্তু নিরীহ ঐ চারটি অক্ষর লাইনবন্দি দাঁড়িয়ে গেলেই নাকি শেল-শূল-গদা-চক্র। ওঁরা বরঞ্চ যমালয়ের ছাড়পত্র দেবেন, রাশিয়ার নয়। যতেক ভালমানুষ লঙ্কায় গিয়ে রাবণ হয়ে ফিরে আসে।

যমালয়ের জন্য তত আমার তাড়া নেই, রাশিয়াটা আগে। জনৈক ঘড়েল ব্যক্তিকে ধরলাম। তিনি বুদ্ধি দিলেন, শুখো-দরখাস্তে হবে না হে! উপরতলায় ঘুরতে হবে; অমুককে গিয়ে ধরো।

বলে তো দিলেন। কিন্তু আমি এক গোত্রছাড়া মানুষ—রাইটার্স বিল্ডিং-এর ঘর-বারাণ্ডা গোলকধাঁধা আমার কাছে; কা'কে ধরলে কি হয়, এই তত্ত্বে নিতান্ত আনাড়ি। কোন পরিচয়ে গিয়ে দাঁড়াই উপরতলার উক্ত মহামান্যটির সামনে? সাহিত্যিক বলতে ওঁরা কয়েকটিকে চেনেন, দরবারে যাঁদের নিয়মিত হাজিরা। তাঁরা দায়েবেদায়ে কবিতা লেখেন, বক্তৃতা ছাড়েন। নিতান্তই গোনাগুনতি, লিস্টিভুক্ত—পশ্চিম-বঙ্গের সরকারি বার্ষিক রিপোর্টে *সেই ক'টি নাম পাবেন। সেই লিস্টির শেষে একটা 'ইত্যাদি'ও নেই যে তার মধ্যে আন্দাজে মাথা ঢুকিয়ে সরকার-জানিত বলে মনে মনে আত্মপ্রসাদ নেবো।

এমনিতরো তা-না না-না করে, দু-পা এগিয়ে দেড় পা পেছিয়ে—যা থাকে কপালে, ঢুকে পড়লাম অবশেষে একদিন। কি বলব, মানুষ সব এমন ভাল! জাঁদরেল অফিসার—লোকে কত রকম ভয়-দেখানো কথা বলে—মিষ্টি হেসে অভ্যর্থনা করলেন।

রাশিয়ায় যাবেন, নেমন্তন্ন এলো নাকি?

আসব-আসব করছে। ঝামেলাগুলো চুকিয়ে দিন। এলেই যাতে চাদরটা কাঁধে ফেলে—থুড়ি, পাশপোর্টটা পকেটে পুরে, বেরিয়ে পড়তে পারি।

দরখাস্ত করে দিনগে, হয়ে যাবে। আপনারা যাবেন—এতে আর কথা কি!

অভয় পেয়ে দরখাস্ত ছাড়লাম। এক মাস যায়, দু-মাস যায়। সেই ঘড়েল মশায় বললেন, হয়ে যাবে বলেছে—কবে হবে, দিনক্ষণ ধরে তো বলে দেয় নি! লাল-ফিতের গাঁট ছাড়াতে অমন এক-জন্ম দু-জন্ম কাবার হয়ে যায়।

পুনশ্চ অতএব রাইটার্স বিল্ডিং-এ হানা দেওয়া গেল। এবারে অত উঁচু হিমালয়-চূড়ায় নয়—মাঝ বরাবর, ধরুন বিন্ধ্যশৃঙ্গে।

হাঁ-না একটা কিছু বলে দিন মশায়। জগদ্দল পাথর চাপা দিয়ে কত কাল রাখবেন?

বিন্ধ্যমশায় বললেন, পাশপোর্ট কবে হয়ে আছে। রা কাড়ছেন না দেখে আমরাই খবর দেবো ভাবছিলাম। বসুন, নিয়ে যান।

* West Bengal (Independence Anniversary)—1953 (p. 10)

ভারি তাজ্জব! ইংরেজ বিদায় হবার পর সরকারি-লোক রাতারাতি খোলস ফেলে ভদ্রলোক হয়েছেন। রামা-শ্যামাদের চেয়ারে বসিয়ে ছুটোছুটি করে কাজ চুকিয়ে দেন। এবং একেবারে মুফতে।

পাশপোর্ট বাক্সবন্দি করে উদ্বেগ বেড়ে গেল। চিঠি আসে-আসে, তবু আসে না। দেশেঘরে যেন জল-বিছুটি মারছে, ডাক-পিওনের পাগড়ি দেখলেই মন আকাশের প্লেন ধরতে ওড়ে। এলো অবশেষে নিমন্ত্রণের চিঠি নয়, অন্য এক খবর—স্ট্যালিনের মৃত্যু।

স্ট্যালিনের সঙ্গে সঙ্গে অনেক মতলব বানচাল হল। অনেক ব্যবস্থা উল্টো-পাল্টা হয়ে গেল। তলস্তয়ের উৎসবটাও একরকম নমো-নমো করে সারল নিজ দেশের মধ্যে। কিন্তু আমার যে হাত কামড়ানোর অবস্থা। ঘরে বসে দিনের পর দিন যাচ্ছে। পাশপোর্টের মেয়াদ কমছে। মেয়াদ কমছে জীবনেরও। ঘুমিয়ে পড়লে নাকি হুকুমের দৈত্যবর? যা ভাবি, তা আর ঘটে কই?

হেন কালে কানে এলো দাওয়াত এসেছে সোবিয়েত থেকে। এটা একেবারে আলাদা ব্যাপার। সোবিয়েতের সংস্কৃতি-বিভাগ—যার নাম হল ভোক্‌স্—ভারতের গুণীজ্ঞানীদের দেশ দেখতে ডেকেছেন। মানুষ বাছাই করছেন ভারত-সোবিয়েত সংস্কৃতি-সমিতি। পশ্চিম-বাংলায় তার শাখা আছে—এখানকার ভাগে ফেলেছে চার জন। শাখাধীশরা তেড়েফুঁড়ে চারের জায়গায় একেবারে পুরো ডজন নাম পাঠিয়ে বসলেন। এবং অধমের নাম এগারো নম্বরে। গুণ নেই জ্ঞান নেই—এবং এ দুটো না হলেও অনুকল্পে যা দিয়ে কাজ চলে, ধনও নেই। এর অধিক অতএব কি করে সম্ভবে? গতিক দাঁড়াচ্ছে এখন, আমার উপরের অন্তত ছয় ব্যক্তির যাওয়া পণ্ড হবে কোন না কোন গতিকে। এই ধরুন, অসুখ করল কারো, কিম্বা ছেলে (বা ছেলের মা) কাঁদছে ভীষণ ভাবে, অথবা পাশপোর্ট মিলল না—ইত্যাদি, ইত্যাদি। তবেই আমার ডাক পড়বে। এতজনের ব্যাপারে যুগপৎ এত উৎপাত—পাপ কলিযুগে ইচ্ছাশক্তির উপর এতদূর ভরসা রাখা যায় না। পাশপোর্ট অতএব বাক্সবন্দি থাকুক যথারীতি—নাড়াচাড়া করবার গরজ দেখিনে।

কী তাজ্জব! বিড়ালের ভাগ্যে শিকা ছিঁড়লই শেষ অবধি। একচক্ষু হরিণ কিনা, ও পথটা নজরে আসেনি। শাখারা যা করবার করলেন, বম্বের কেন্দ্রীয় দপ্তর তদুপরি সারা ভারত থেকে ন'টি প্রাণী বাছাই করে নিলেন। অধম তার ভিতরে। অত দূরে কি করে নাম পৌঁছে গেছে—কেউ বলে থাকবে, লোকটা অত্যন্ত যাচ্ছেতাই লিখলেও চীনের বই দুটো হাই তুলতে তুলতে

কোন গতিকে শেষ করা যায়। দাও পাঠিয়ে তবে, দেখা যাক—সোবিয়েত নিয়েই বা কি লেখে!

প্রাতঃকালে দুই বন্ধু এসে খবর দিলেন, গাঁটরি বাঁধুন—মাঝে আর কয়েকটা দিন মাত্র। হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। গরম জামা বানাও শীত ঠেকাবার জন্য, মোটাসোটা খাতা বাঁধিয়ে নাও লেখায় ভরাট করে এনে ভালমানুষ পাঠকদের জ্বালাতন করবার জন্য। সকলের চেয়ে দরকারি বস্তু—মাথায় মাখবার তিলের তেল। নারিকেল তেল নিয়ে গিয়ে পিকিনে কী জব্দ! গরম করে গালিয়ে মাথায় ঢালতে না ঢালতে জমে আবার কাঠ হয়ে যায়। আর মস্কো-লেনিনগ্রাদের শীত, যা শুনেছি, পিকিনের পিতামহ।

ট্রেনে দিল্লি। চার বঙ্গনন্দন চলেছি একসঙ্গে। আমি ছাড়া বাকি তিনজন ডাক্তার। হোমিওপ্যাথি ডাক্তার—জ্ঞান মজুমদার; দাঁতের ডাক্তার—অরুণ গাঙ্গুলি। আর একজন নিতান্তই কাগুজে ডাক্তার, একটা ফোড়া কাটারও বিদ্যে নেই। সেই মহাশয় হলেন—ধীরেন সেন।

[ডায়েরি]

রেলগাড়ি—রাত্রি ১১টা।

ছুটছি। বর্ধমান পার হয়ে এসেছি। আর তিনজন গভীর নিদ্রাচ্ছন্ন। আকাশে ছেঁড়া-ছেঁড়া মেঘ—কোদালে-কুড়লে মেঘ বলে আমাদের পাড়াগাঁয়ে। দু-পাঁচটা তারা মেঘের ফাঁকে ফাঁকে। গাড়ির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তারারা ছুটছে। ছাড়বে না আমায়, কিছুতে ছেড়ে দেবে না। দেশ-দেশান্তর চলেছি, ওরাও ছুটল সঙ্গে সঙ্গে যতক্ষণ এই রাত্রিটুকু আছে। নিষ্ঠুর নিষুপ্ত পৃথিবীতে আজকে আমার কেউ নেই ঐ তারা কয়েকটি ছাড়া।

ছোট্ট বয়সে তারা দেখতাম। এক তারা ন্যারাব্যারা, দুই তারা পথহারা, তিন তারা আপশোস, চার তারায় নেই দোষ ··· তারপর, তারা দেখিনে আর। শহরের ইঁটের স্তূপের আড়ালে কখন তারা ওঠে, কাজের মানুষ আমরা—ফুরসত কখন তারা দেখে সময় নষ্ট করবার? আজকে এই অনেক দূর চলেছি—প্রতিটি মিনিটে ব্যবধান বেড়ে যাচ্ছে নিজভূমি ও চেনা মানুষদের সঙ্গে। ছোট্ট বয়সটা সঙ্কুচিত হয়ে রেলের কামরার আধ-অন্ধকারে যেন প্রবীণ গণ্যমান্য মানুষটিকে চুপি-চুপি একটুখানি দেখতে এসেছে।

রেললাইনের ধারে ধারে জল জমে আছে, ম্লান জ্যোৎস্নায় নজরে আসছে। গাছের ছায়া পড়েছে জলে। আর দূরবিস্তৃত ধানবন। ঝোপেঝাপে-ঢাকা ঘরবাড়ি পলক না ফেলতে পার হয়ে যাচ্ছি। অঘোরে ঘুমুচ্ছে তারা আশা-

উল্লাস দুঃখ-ব্যথা ভুলে গিয়ে রাত্রির এই মধ্যযামে। আমার চিরকালের-চেনা মানুষগুলির ঘরের পাশ দিয়ে নতুন দেশে চললাম। যাচ্ছি ভাই, সেই তাদের সঙ্গেও একটু চেনা-পরিচয় করে আসি।

স্টেশন মাঝে মাঝে। সাঁক-সাঁক করে পার হয়ে যাচ্ছি। জোরালো আলো সেই সময়টুকু। আবার ঘোলা-ঘোলা জ্যোৎস্না। আজ আমি বাংলাদেশ ছাড়ার আগে প্রাণ পরিপূর্ণ করে মাঠ-ঘাট, ধানবন, ঘর-বাড়ি, জল-আকাশ, আকাশের তারা দেখে নিচ্ছি।

কয়লার দেশে এসে গেলাম। বড় বড় চোঙা, কপিকল, পাহাড়ের মতন কয়লার স্তূপ…

পরদিন, বেলা ১১টা।

ভারতবর্ষকে চোখের উপর দেখতে দেখতে যাচ্ছি। চাষী চাষ করছে। খোলার ঘরের গ্রাম—ঘরের পাশে গরু শুয়ে আলস্যে জাবর কাটছে। গাছের ছায়ায় কাটা-ধান স্তূপাকার করে রেখেছে। শাখাবিস্তারী ছত্রছায় আমবাগান। অড়হর-ক্ষেত, ক্ষেতে হলদে ফুলের সাগর। মহিষ দৌড়চ্ছে—ন্যাংটো ছেলে দৌড়চ্ছে তার পিছু-পিছু। তীরগতিতে ছুটেছে রেলগাড়ি, ডায়েরির লেখা বড্ড ট্যারাবাঁকা হচ্ছে। স্টেশনের নামটাও পড়ে নিতে পারলাম না, হুশ করে এমনি ভাবে বেরিয়ে গেল। বড় দীঘি স্টেশনের পাশে; ছেলেমেয়েরা স্নান করছে, জলে ঝাঁপাচ্ছে। ভেড়ার পাল। গঙ্গা ডানদিকে—হঠাৎ একবার বর্ষার গঙ্গার রূপালি জলধারা ঝিকমিকিয়ে উঠল। ভোল পাল্টে গেছে চারিদিককার। জোয়ার আর অড়হরের ক্ষেত। চাষীদের মাথায় পাগড়ি। এক-মানুষ দেড়-মানুষ সমান কাশের বন।

আমার কামরার অপর তিন সহযাত্রী বিবিধ বিতর্কে মেতেছেন। বিদগ্ধ ব্যক্তি তাঁরা—মানুষের অধিগত যাবতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের শাখায়-শাখায় তাঁদের বিচরণ। তাঁরা বাঁ-দিকে—আর ডাইনে গাড়ির জানলার ওপারে ভারতের লক্ষকোটির সাধারণ দিনগত জীবনযাত্রা। একদিন আমিও অমনি কত সহজ ছিলাম, তাই ভাবি। গাছের ছায়ায় পথ-চলতি মানুষেরা বসে বসে জিরোচ্ছে, ধুলোর মধ্যে আমিও কতদিন পা অমনি করে ছড়িয়ে বসেছি। আজকে আলাদা, ওরা সব তটস্থ হয়ে উঠবে আমি কাছাকাছি গেলে। জবুথবু ভদ্রলোক হয়ে যাবে। অনেক দূর চলেছি—পৃথিবীর এক দূর-প্রান্তে। আরও যাব কোথায় না জানি একদিন—মহাব্যোমে বায়ুভূত হয়ে ঘুরব না কি করব। তারই পয়লা কিস্তি হল শহরবাসী ও গণ্যমান্য হয়ে

গিয়ে মানুষজনের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি। একেবারে সমস্ত ছেড়ে যাবার প্রাথমিক ভূমিকা।

এলাহাবাদ স্টেশনে ভারী দরের অনেকের সঙ্গে দেখা, এক ট্রেনে যাচ্ছি। বিধু সেনগুপ্ত, আনন্দবাজারের অশোক সরকার,···প্ল্যাটফরমের উপরেই বিজয়ার কোলাকুলি। অরুণ গুহ মশায়ও যাচ্ছেন—এই সেদিন অবধি আমাদের বিস্তর ভালবাসার অরুণদা। এখন মন্ত্রী হয়েছেন, অতএব কোলাকুলি না করে নমস্কারে তিনি বিজয়া সারলেন।

ঠিক দুপুরবেলা। গ্রামের পর গ্রাম ছুটছে পিছন মুখো। এবারে পোড়ো-জমি, পলাশবন। ন্যাড়া-বটগাছ মাঝখানে। ছাগলের পাল চরছে। কাঠের আঁটি কাঁখে মেয়েটা দাঁড়িয়ে আছে রেলগাড়ির দিকে চেয়ে--গলায় বাহারের রূপার হাঁসুলি।

ভিতরে নানান আলোচনা তুমুল হয়ে উঠেছে--বেদ-উপনিষদ, দেশি-বিদেশি দর্শন, আয়ুর্বেদ ও হোমিওপ্যাথি······আর ওদিকে আমতলায় ছোট্ট একটুকু কবর, খানাখন্দ, অজস্র নিমগাছের জঙ্গল। কয়েকটি গ্রামবৃদ্ধ ছাতা নিয়ে চলছে কোন দিকে; ঝাঁকা মাথায় জনকয়েক গল্পগুজব করছে। বক উড়ছে ধানবনের উপর দিয়ে। লাইনের ধারে ঝিলের জলে কুমুদবন—মুদিত কুমুদরা মাথা জাগিয়ে আছে, জল দেখবার জো নেই। এদিকে-ওদিকে বাবলা-বন, বট, কত রকমের ঝোপঝাড়। সমস্ত হঠাৎ ঝাপসা হয়ে গিয়ে অনেক--অনেক দূরের ডোঙাঘাটা দৃষ্টির সামনে ভেসে আসে। পাকিস্তানের ভিতরে ছোট্ট গ্রামটি--আমার বাল্য-কৈশোর আজও সেখানে এলোমেলো ছড়ানো আছে।

দিল্লি অনেক দূর। দূর বলেই ভাঁওতা দিয়ে কিঞ্চিৎ পশার জমিয়েছি ঐ জায়গায়। এবেলা-ওবেলা নেমন্তন্ন, সন্ধ্যে হলেই মীটিং। রাজধানীর মানুষ কী ভালোমানুষ গো! সাহিত্যের নামেই গলে যান, ভ্রূ কুঁচকে কষ্টি-পাথরে দর ঠুকতে বসেন না।

ওখানে সন্তোষ ঘোষ থাকেন, যার লেখায় আপনারা মসগুল। সন্তোষ ছোট ভাইয়ের মতন, দিল্লি গেলে অনেক সময় ওখানেই আস্তানা। আস্তানা এমন অনেক জনেরই। যত মানুষের ঝামেলা বাড়ে, বউমা'টির স্ফূর্তি বেড়ে যায় ততই। খেটে খেটে খেটে সুখ করে নেন। এবার আমায় ঘোরতর দাবড়ি দিয়েছেন। একটা দিন মাত্র আছেন—খবরদার কোনখানে নেমন্তন্ন নেবেন না। নিলেও যাওয়া হবে না, স্পষ্ট কথা।

তবু রেহাই হল না। সোবিয়েত অ্যাম্ব্যাসি সন্ধ্যের পর ডেকেছেন, যাত্রামুখে একসঙ্গে ফূর্তিফার্তি হবে। দিল্লির ভারত-সোবিয়েত সংস্কৃতি-সমিতি এদিকে রাস্তার আধখানা জুড়ে মেরাপ বেঁধেছেন, অধমদের চায়ে বসিয়ে দিয়ে সেই ঝোঁকে গোটা পাঁচ-সাত বক্তৃতা শোনাবেন। কোন দায়টা এড়ানো চলে বলুন। ভোর থেকে বিষম হুটোপাটি। যাও মার্কারি-ট্রাভেলসে—কাবুলে দলসুদ্ধ চালান করবার যাঁরা ভার নিয়েছেন। ক'টার সময় কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে, সঠিক অন্ধিসন্ধি জেনে এসো। ঠিক দুপুরে একবার মীটিঙে যেতে হবে নেতা ও উপনেতা বাছাইয়ের জন্য। মানুষ ঠিকই আছে—কার প্রস্তাব কোন ব্যক্তির সমর্থন কত জন সমস্বরে অমনি হাঁ-হাঁ করে উঠবে, আগাগোড়া পদ্ধতি ছকে ফেলা আছে। তবু নিয়মমাফিক হাজির হয়ে একটিবার ঘাড় নেড়ে আসা। ঘাড় না নাড়তে চান, চুপ করে বসে থাকবেন—তবে হাজিরাটা চাই।

ইতিমধ্যে নিখুঁত এক ফর্দ হয়ে গেছে, দূর-বিদেশে আর কোন কোন বস্তু দরকার পড়বে আমার। পেন্সিল তো অতি-অবশ্য চাই—আকাশের অনেক উপরে উঠলে কলমের মুখে ভলকে ভলকে কালি বেরোয়, পেন্সিল তখন জ্ঞাতির

গতি। সন্তোষ বলল, সেটা হবে তার খরচে। অতএব পাঠকসজ্জনদের এই যে খোঁচাখুঁচি করছি, পাপের ভাগ তারও আছে—পেন্সিল-অস্ত্রটার সে-ই যোগান দিয়েছে।

দেবদাস পাঠক মহোৎসাহে ফর্দ নিয়ে বেরুল। দিল্লির যাবতীয় পথঘাট তার নখদর্পণে। আমার একারই শুধু নয়—ওরা কাশ্মীরে যাচ্ছে তার টুকিটাকি জিনিস আছে, গৃহস্থের ফরমায়েসও আছে দুটো-একটা। কেনাকাটা সুবিধা দরেই হল বটে—পেন্সিলে দু-পয়সা কম, মোজায় এক আনা। টাঙায় রিক্সায় ট্রামে টাকা তিনেকের মতো ব্যয় করে নয়াদিল্লি-পুরানো-দিল্লির সকল মহল্লা ঘুরে গলদ্‌ঘর্ম হয়ে এক প্রহর রাত্রে সওদা এনে ফেলল—তা কম নয়, আনা পাঁচ-ছয় মুনাফা করে এসেছে মোটমাট। করিৎকর্মা ছেলে—এত কষ্ট করে এসেও তিলেক বিশ্রাম নয়। জিনিসপত্র গোছাতে লেগে গেল। গুছিয়েও ফেলল চক্ষের নিমিষে। কাবুলে রাত্রিবেলার হিমে ঠোঁটে একটু ক্রিম ঘষব, পেঁটরা খুলে দেখি,—না, জিনিষ গোনাগুনতি ঠিকই দিয়েছে, ক্রিমের বদলে ঢুকিয়ে দিয়েছে বউমার সিঁদুরকৌটা।

শেষ রাতে রওনা। তখন মোটর মেলে না মেলে—অশ্বিনী গুপ্ত মশায় হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ডের একটা গাড়িতে এরোড্রোম যাবার বন্দোবস্ত করে দিলেন। ঐ কাগজের পয়লা এডিটার হলেন ধীরেন সেন—তাঁকে তুলে নেবো আত্মীয়ের বাসা থেকে। ঘুম যদি না ভাঙে, তজ্জন্য হরেক ব্যবস্থা। ঘড়িতে অ্যালার্ম দেওয়া হয়েছে, কিন্তু কলকব্জার কথা বলা যায় না—সে ঘড়ি ধরুন আজকের রাতে বাজল না। ঘড়ি ছাড়া মানুষও তখন জন পাঁচ-সাত সমকণ্ঠে ভরসা দিলেন, কোন চিন্তা নেই—ঠিক সময়ে তাঁরা তুলে দেবেন। গাড়ির ড্রাইভার বললেন, শেষ রাতে কাগজ নিয়ে স্টেশনে স্টেশনে পৌঁছে দেওয়া আমার কাজ, ঘাবড়াবেন না। চারটেয় কি বলছেন—বলেন তো একেবারে বারোটায় ঘুম থেকে তুলে দিয়ে যাই। সন্তোষ নাইট-ডিউটি নিয়ে নিয়েছে। বলে, বেয়ারা পাঠিয়ে দেবো—শিকল ঝনঝনিয়ে জাগিয়ে তুলবে; তার পরে আমি তো এসে যাচ্ছি ঠিক সময়ে।

বারাণ্ডায় শুয়েছি। রাস্তা খানিকটা দূরে। লনের মাথার উপরে আকাশ-ভরা তারা ঝিকমিক করছে।...

ধড়মড় করে উঠে বসলাম এক সময়। সর্বনাশ! সকাল হয়ে গেছে যে! উঁকি দিয়ে দেখি, যাঁরা অভয় দিয়েছিলেন, সমতালে নাসাগর্জন চলছে তাঁদের। কোথায় সন্তোষের বেয়ারা, কোথায় বা স্টেশনে কাগজ পৌঁছানোর ড্রাইভার।

কাচের জানলা ভেদ করে হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড অফিসের অগণ্য আলো আর রোটারি মেশিনের ক্ষীণ আওয়াজ আসছে শুধু। ঘড়িটাও, যা ভাবা গিয়েছিল, মওকা বুঝে ধর্মঘট করেছে; বেশ একখানা ঝাঁকুনি দেওয়া দরকার। আরে আরে, কি কাণ্ড! মোটে যে এখন আড়াইটে।

তা উঠে পড়েছি যখন, গোছগাছ করে নিই। নিশিরাত্রি এবং কনকনে শীত হলেও দিনমানের স্নানটা চুকিয়ে নিই। পা টিপে টিপে চোরের মতো স্নানঘরে গেলাম—বউমা'টি জেগে না ওঠেন। বেরিয়ে এসে দেখি, যে ভয় করেছিলাম—জলের ঝিরঝিরানিতে বউমা চোখ মুছতে মুছতে রাত্রির তৃতীয় প্রহরে গরম গরম লুচির বন্দোবস্তে বসে গেছেন।

খেয়ে-দেয়ে মাথার চামড়ায় চিরুনি বুলিয়ে জামাজুতো পরে পা দোলাচ্ছি, তখন একে একে সব উদয় হচ্ছেন। শিকল বাজিয়ে উঠল সন্তোষের বেয়ারা। ড্রাইভার ও গাড়ির যুগপৎ গর্জন উঠল নিচে থেকে। ওবাড়ির শচীন ঘোষ এলেন। সাইকেলে মাছওয়ালারা এসে উষালোকে রকমারি মাছের নাম শোনাতে লাগল। ডিউটি সেরে স্বয়ং সন্তোষও তারপর এসে পড়ল।

আমি যাব এরোড্রোম অবধি।

কি দরকার! রাত জেগে কষ্ট করে এলে—

তাই ভোরের হাওয়ারই দরকার।

ঘরের ভিতরের নাসাগুলো সহসা নিস্তব্ধ। কর্তব্যে সজাগ হয়ে তাঁদের একজন বলে উঠলেন, উঠুন, উঠে পড়ুন—যাওয়ার সময় হয়ে গেছে।

তাড়াতাড়ি বলি, ঘুমোন, ঘুমিয়ে পড়ুন—ঠিক যেমনটা ছিলেন। শব্দ-সাড়ায় বাচচারা জেগে উঠলে যাওয়ার দেরি পড়ে যাবে।

শহর ছাড়িয়ে এসেছি। নির্জন পথ, হুশ করে এক-আধটা মোটর বেরিয়ে যাচ্ছে কদাচিৎ। আলো একটা এখানে, একটা ওখানে—তারাই পাহারাদার। জনমানব নেই কোন দিকে। কোজাগরী পূর্ণিমা—জ্যোৎস্নায় চতুর্দিক হাসছে। তার মধ্যে মৃদু গর্জনে ছুটেছে আমাদের গাড়ি। এ রূপ দেখা হয় না কোন দিন—রাজধানীর এমন রূপ ক'জন দেখেছে!

এরোড্রোমে পৌঁছলাম, তখনও সকাল হয়নি। একে দুয়ে দলের সব এসে জুটছেন। ভাড়া-করা প্লেন, দশ-বিশ মিনিটে নেহাত ফেলে পালাবে না—জেনেবুঝে চা-টা খেয়ে দুলকি চালে আসছেন তাঁরা। রওনায় তাই কিঞ্চিৎ দেরি হল। কাস্টমসে রীতরক্ষার মতো একটু চোখ বুলিয়ে নিল। ছবি তুলছে; গলায় মালার উপর মালা চড়াচ্ছে। পয়লা সারিতে গিয়ে বসেছি

আমি। হাতে কলম। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে সকলে। তা দেখুনগে —ওতে লজ্জা নেই, আমার এই জাতব্যবসা।

উল্লাস-ধ্বনির মধ্য দিয়ে প্লেনের দরজা এঁটে দিল। খাঁচার ইঁদুর এখন। কাচের আড়াল থেকে লোকজনের বিদায়-অভিনন্দন দেখছি। প্রপেলারের তিন সুদর্শন-চক্র ঘোরাতে ঘোরাতে প্লেন খানিকটা দূরে গিয়ে দাঁড়াল। অতি ভয়ানক রকম গর্জাচ্ছে—কাঁপছে থর-থর করে। ছুটল খানিকটা পাগলের মতো। তার পরে হুশ করে আকাশে উঠে পড়ল।

সফাদরজং প্রাচীন মহিমা নিয়ে অদূরে দাঁড়িয়ে। দেখতে দেখতে সেটা বিলীন হয়ে গেল। বিশাল দিল্লি শহর এখন মাত্র সাদা সাদা কতকগুলো স্তূপ। জমির উপর খানিকটা করে চুন ঢেলে দিয়েছে যেন। তার পরে জঙ্গল—পাহাড় মাথা বাড়িয়েছে জঙ্গল থেকে। দিল্লি যে পাহাড়ের উপর, আকাশে উঠলেই সেটা ভাল করে মালুম হয়।

পাহাড় গেল তো মাঠ—মাঠের আর শেষ নেই। এক একটা জায়গায় অনেকগুলো বাড়িঘর—যেন এটার ঘাড়ে ওটা, এমনি ভাবে গাদা করে রেখেছে। খালগুলো মাঠের এপার-ওপার চিরে চিরে গেছে। এমনি অজস্র ধমনী-পথে ক্ষেতে ক্ষেতে জল সরবরাহ হয়। আঁকাবাঁকা বৃহৎ জলধারাও দেখতে পাচ্ছি মাঝে মাঝে। নদী ওগুলো।

যাচ্ছি এখন সাড়ে ছ-হাজার ফুট উঁচু দিয়ে। পাইলটের ঘর থেকে খবর এলো—লাহোর নামব পৌনে-ন'টায়। তার আগে বড়নালার উপর দিয়ে যাব, ৭-৫৪ মিনিটে। আকাশে উঠে ভাবনা-চিন্তাও উঁচু দরের হয়ে ওঠে। পদতলে অনেক নিচের মাটি-অঞ্চলে মানুষ নামে একপ্রকার কীট কিলবিল করে বেড়ায়। ঐ দেখতে পাচ্ছেন তাদের গ্রাম—শতখানেক খেলাঘর ছটাক খানেক জায়গায় জড়ো করা। ঘর যাই হোক একটু চোখে দেখছেন, কিন্তু মানুষ নজরে আসবে না। ল্যাবরেটারির অণুবীক্ষণে বীজাণু দেখবার মতন করে দেখতে হবে। গুটি-গুটি রেলগাড়ি চলেছে শুয়োপোকার মতো। খেলনার লাইনের উপর যেন দম-দেওয়া গাড়ি।

বড়নালা এসে পড়ল। কি হিসাব করলে চাঁদ, দু-মিনিট দেরি হয়ে গেল যে-সময় তোমরা লিখে জানিয়েছিলে। শহর ডান দিকে—ঝুঁকে পড়েছি, কিন্তু পলক না ফেলতে পার হয়ে চলে গেলাম। দেখবারই বা কি আছে? অনেকখানি জায়গা নিয়ে ঘরবাড়ি—দালানকোঠা বেশির ভাগ—সকালের রোদ ঝিকমিক করছে, জ্যোতি বেরুচ্ছে। অভ্র যেন গাদা দিয়ে দিয়ে রেখেছে, তেমনি আমার চোখে লাগল।

লাহোর আর একটুখানি পথ, ঢিল ছুঁড়লে গিয়ে পড়ে—এই গতিক। ১০৫ মাইল মাত্র। একটু এগিয়ে জলাভূমি—এখানে-সেখানে বিস্তর জল জমে আছে। লম্বা লম্বা খাল জলাভূমি ফুঁড়ে জনালয়ের দিকে চলে গেছে। ঊষর নিঃসীম মাঠের মধ্যে খাল যাচ্ছে দু-তীরে শ্যামল গালিচা বিছিয়ে দিয়ে।

উড়তে উড়তে আজ দেশের সমগ্র ছবি চোখের উপর এসে গেল। কাঠা চারেকের ছোট্ট বাড়িটুকু মাত্র নয়—এত বড় দেশ আমার, আমারই। ভাবতে আনন্দ লাগে, আকাশ-বিহার অন্তে যে ছোট্ট কুঁড়ের ভিতর আবার ঢুকে পড়ব, সেটা আমার সুবিশাল দেশের; শুধু মাত্র চার কাঠার মধ্যেই তার সীমা নির্দিষ্ট নয়। আজকের মানুষ আমরা পরম ভাগ্যে অনন্ত আকাশে পাখা মেলে উড়তে শিখেছি; উড়তে উড়তে আমি কত বড় দুনিয়ার মানুষ, মালুম পেয়ে যাই।

আঃ, দু-চোখ জুড়িয়ে গেল। এ কী শ্যামায়িত রূপ আমার দৃষ্টির সুদূর সীমানা জুড়ে। এক ফোঁটা নগ্ন মাটি দেখিনে কোথাও—ফসল আর ফসল। আর দেখছি জল। এখানে জল, ওখানে জল—হরিৎ ফ্রেমে বাঁধাই চৌকো চৌকো কালো জল। নদীর উপর এসে পড়লাম—আঁকাবাঁকা বলেই বোঝা গেল, কাটা-খাল নয়—স্বাভাবিক নদী। বর্ষার জলৈশ্বর্যে ভরপুর হয়ে আছে। নদীর কূলে ঘরবাড়ি ছিটানো রয়েছে, দেখতে পাচ্ছি। প্লেন হঠাৎ খুব নিচুতে চলে এলো। পাকিস্তানে ঢুকছি বোধ হয়। লাহোর দূরবর্তী নয়। শ্লিপ এলো—আর মাত্র পঁচিশ মাইল। সে তো নিতান্তই নস্যি।

আরও নিচু হয়েছে প্লেন—নদীর ধারে ধারে ঘরবাড়ি স্পষ্ট হয়ে উঠছে। রাভি নদী পার হলাম তবে—যার সাধু-নাম ইরাবতী। জলের মধ্যেই যেন বাড়ি-ঘর বসিয়ে দিয়েছে কতকগুলো। আরও—আরও নিচু। এরোড্রোম দেখা যায়। দু-পাশে উঁচু বাঁধ-দেওয়া লম্বা লম্বা খাল সোনালি-পাড় নীল শাড়ির মতন দেখাচ্ছে। বাংলা দেশের মতো খোড়ো-ঘর একটাও নেই, শুধু মাট-কোঠা। উপর থেকে দেখাচ্ছে বিশাল ধ্বংস-স্তূপের মতো। বেল্ট বাঁধবার আলো ফুটল, নামব এবারে।

যাই বলুন, লাহোর এরোড্রোম দেখে ভক্তি হল না। নিতান্ত সাদামাঠা—অনেক গেঁয়ো এরোড্রোমেও এর চেয়ে ভাল বাড়ি, বাহারের আসবাবপত্র। ব্রেক-ফাস্ট এখানে—মেটুলি-চচ্চড়ি আণ্ডার পোচ ইত্যাদি শেষ করে নিরামিষ চপে হাত বাড়িয়েছি, দিল্লির ডাক্তার প্রেমচাঁদ ড্যাব-ড্যাব করে তাকাচ্ছেন:

কি মশায় — উভয় রকমই? শ্রীমতী মদন হাসি-হাসি মুখে কণ্ঠস্বর করুণ করে বললেন, আমার নিরামিষ সমস্ত উনি খেয়ে নিচ্ছেন।

আমিষাশী বলেই নিরামিষ খাইনে — এটা ধরে নেবেন কেন? শুধু আমিষে কে বাঁচতে পারে? দুই রকমই চলে আমাদের।

চল্লিশ মিনিট জিরিয়ে নিয়ে আবার আকাশে চড়ছি। এঁদের ঘড়ি আধ ঘন্টা আগে। অর্থাৎ বারোটা আধ ঘন্টা আগে বাজবে আমাদের চেয়ে।

লাহোর শহর পেরিয়ে আবার মাঠ আর ছোট ছোট গ্রাম। মাঠ, মাঠ, মাঠ। পয়লা দলে ষোল জন চলেছি আমরা। প্লেনে এর বেশি জায়গা হল না। পরের দল দিল্লি পড়ে রইলেন, এই প্লেন ফিরে গিয়ে তাঁদের আনবে। গোড়ার সারিতে আমি — পিছনে তাকিয়ে দেখে নিই একবার। ভাব বদলেছে। উত্তম ভোজনের পর জন দুই-তিন ছাড়া সকলেই চোখ বুঁজেছেন। স্ফুরৎ-স্ফুরৎ — নাসা-শব্দও শ্রুত হচ্ছে। আমি বাদে বাকি পনের জনের তিরিশটা গহ্বরের ঠিক কোন কোণটা থেকে — সঠিক মালুম পাচ্ছিনে। খবরের কাগজে মুখ গুঁজে আছেন কেউ কেউ, একজন ডিটেকটিভ-নবেলে। পড়ছেন না ঘুমুচ্ছেন — কে বলবে!

লম্বা পাড়ি, একেবারে কাবুল গিয়ে ভুঁই নেবো। দুর্গম পাহাড়ে ঠুকে আগে ভাগে পড়ে যাই তো আলাদা কথা। প্লেন উঁচু — আরও উঁচুতে উঠে যাচ্ছে। পাশের লোকটি বললেন, তাকিয়ে দেখুন — খাইবার-পাস গিয়ে পড়ব এখুনি। আর যা ভেবেছিলাম — কলমের কালি বেরিয়ে হাত কালিমাময় হয়ে উঠছে। লেখা চলবে না আর কলমে। আমিও তৈরি — সন্তোষের পেন্সিল বের করে নিয়েছি।

বড় মুশকিল হল তো! রোদ ঝিকমিক করছে প্লেনের পাখার উপরে, নিচে কিন্তু ঘন কুয়াশা। চোখের দূরবীন চালিয়ে অশেষ কষ্টে দেখা যাচ্ছে কিছু কিছু কঙ্করময় ভূমি। হরিদ্রাভ। গাছপালারও অমনি হলদে ভাব। কুয়াশার জন্য বোধ হয়।

চেয়ারটা নামিয়ে দিয়ে একটু তবে আরাম করা যাক। দিব্যি সবাই ঘুমুচ্ছিলেন — তারই মধ্যে কেমন করে যেন কায়দাটা দেখে নিয়ে তড়াক করে উঠে একে একে চেয়ার নামাচ্ছেন। মহানন্দে পুনশ্চ চোখ বুঁজলেন, একা আমিই কেবল চোখের দেখাগুলো টুকে টুকে যাচ্ছি। কি বিপদ, শেষ অবধি আমারও যে ঐ গতিক। চোখ ভেঙে আসছে — এক লাইন লিখছি তো ঘুমিয়ে নিচ্ছি দশ সেকেণ্ড। নিখিল ব্রহ্মাণ্ড কুয়াশায় নিশ্চিহ্ন — আলো নেই, মেঘ নেই,

জীবচিহ্ন নেই নিচের দিকে— একটানা প্রপেলারের আওয়াজ। লিখবারও নেই আর কিছু…

ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। মাপ করুন আপনাদের গোলামের দশ মিনিটের এই গাফিলতি। দশ মিনিট মানে কিন্তু বিস্তর দূর। তার মধ্যে স্বপ্ন দেখছি আরও দূর-দূরান্তরের। স্বপ্ন কিম্বা ছেঁড়া-ছেঁড়া ভাবনা। ধীরেন সেন গায়ে হাত দিয়ে জাগিয়ে দিলেনঃ খালি গায়ে আছেন— ঠাণ্ডা লেগে যাবে। খালি গায়ে মানে কোট খুলে রেখে দিয়েছি, শুধু মাত্র গেঞ্জি ও শার্ট। সত্যিই শীত লাগছে। কোট গায়ে ঢুকিয়ে দেখলাম, কনকন করছে, ঠাণ্ডা ঢুকে গেছে ওর ভিতরে। সাড়ে-বারো হাজার ফুট উপর দিয়ে যাচ্ছি ১৭২ মাইল বেগে। তখত-ই-সুলেমান ঐ দেখুন পায়ের নিচে। খানিকটা পরিষ্কার হয়েছে এখন। অনেকেই উঠে এসে জানলায় ঝুঁকে দাঁড়াচ্ছেন। আকাশে ঘুরে ঘুরে সুলুকসন্ধি সমস্ত আমার জানা— কোন সিট থেকে উত্তম দেখা যায়। নিজের জায়গায় হেলান দিয়ে বসে দিব্যি আমি দেখতে পাচ্ছি।

কুয়াশা কেটে গেছে; উজ্জ্বল রোদ হিমালয়ের চূড়ায় চূড়ায়। অধিত্যকায় এখানে আলো ওখানে ছায়া। আলো-আঁধারে রহস্যময় রূপ নিয়েছে আমার চারি দিকের দিগ্‌ব্যাপ্ত পর্বতমালা।

শীত বাড়ছে। গরম কোট-ট্রাউসারে মানাচ্ছে না এখন। উপরে— কত উপরে উঠছি। উঠেই চলেছি। প্লেন বড় দুলছে। বে-অব-বেঙ্গলে একবার ঝড়ের মুখে পড়েছিলাম। জাহাজের কী দুলুনি! তার সঙ্গে অবশ্য তুলনাই হয় না। তবু দেখি, অনেক জনের মুখ শুকিয়েছে।

দুই পাহাড়ের খাঁজে-খাঁজে আঁকাবাঁকা দীর্ঘ পথরেখা। উঁহু, পথ কোথা — শুকনো জলপথ। নির্জলা পথ সাদা দেখাচ্ছে— হঠাৎ একদিন ঢল নামবে, বিলকুল সব কালো হয়ে যাবে। এখন দেখাচ্ছে, মাঠ জঙ্গলের ভিতর দিয়ে পায়ে-চলার পথ পড়ে গেছে। খানিক খানিক কালো দেখাচ্ছে সাদার উপরে, সেটা হল সুদূর পর্বতের কোন ছায়া।

বড্ড দুলছে এখন, ডাইনে বাঁয়ে, উপরে নিচে। লেখা চালানো মুশকিল। ভারি মজা লাগছে, পেন্সিল এবং পেন্সিলের সঙ্গে তাবৎ দায়িত্ব পকেটে পুরে এই বয়সে নাগরদোলা চড়ার সুখ উপভোগ করছি।

একবার ঢুকে পড়লাম পাইলটের ঘরে। দরজায় লেখা— 'ক্রু মেম্বারস ওনলি'। কিন্তু উঁকিঝুঁকির রকম দেখে ওঁরা ডাকছেন, আসুন না, একে একে এসে দেখে যান।

তিন জন আছেন—দু-জন সামনের দিকে; কাচের আড়াল থেকে পথ নিরিখ করছেন। যে-সে কাচ নয়—আমরাও নজর চালিয়ে দেখলাম, চারিদিক একেবারে কুয়াশায় ঢেকে গেছে, অথবা অনেক উঁচুতে উঠার দরুন সাদা চোখে নিচের মাটি দেখতে পাচ্ছিনে—তবু কিন্তু সুস্পষ্ট দেখা চলে ঐ কাচের ভিতর দিয়ে। একজন স্টিয়ারিং-চাকায় হাত দিয়ে আছেন, ঘুরোচ্ছেন একটু-আধটু, দ্বিতীয় জন ম্যাপের সঙ্গে হিসাব করে করে পথ মেলাচ্ছেন। তৃতীয় ব্যক্তি রেডিও-অপারেটার; বাইরের সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক নেই, তাঁর বসবার জায়গায় কাচ দেওয়া নেই বাইরে তাকাবার। যন্ত্র কানে লাগিয়ে যেন ধ্যানে বসে আছেন তিনি।

কাপ্তেনকে জিজ্ঞাসা করি, কোন জায়গায় এখন?

পাকিস্তানের চৌহদ্দির ভিতরে। সুলেমান রেঞ্জের উপর দিয়ে যাচ্ছি।

খাইবার পাস?

যাবই না সেদিকে। হেসে বললেন, সুলেমানের সিংহাসন ডিঙিয়ে যাবার তাগত হয়েছে—পর্বত কোথায় দয়া করে একটু-আধটু গলিঘুঁজি ছেড়ে দিয়েছেন, সে খোঁজে গরজ কি এখন আমাদের?

হিন্দুকুশে যাব কখন?

সেদিকে কেন যাব ঘুরতে?

তাই দেখলাম, সবজান্তারা কেবল ঘরে বসে নেই; দলের সঙ্গেও দু-পাঁচটি বেরিয়ে এসেছেন। তামাম বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নখাগ্রে তাঁদের। দিল্লি থেকেই আপ্তবাক্য ছাড়তে শুরু করেছেন, মুখের সামনে দাঁড়াবে হেন শক্তি কোন্ দুঃসাহসীর?

পর্বতের মাঝে প্রশস্ত সমভূমির মতো দেখাচ্ছে। যৎকিঞ্চিৎ ফসলও ফলেছে। এখানে-ওখানে গোটাকয়েক ঘর—সীমাহীন প্রান্তরের মধ্যে গ্রাম ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিয়েছে যেন আকাশ থেকে। উপজাতিদের বসতি। নিচে নেমে গিয়ে দেখুন না। দরাজ বুকের উপর লুফে নেবে আপনাকে; অথবা বলা নেই কওয়া নেই বুলেটে ছেঁদা করে দেবে আপনার বুক।

বিস্তর উঁচু পর্বতমালা দেখতে পাচ্ছি কিছুক্ষণ থেকে। বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, পার হতে দেবে না। তাই কি শুনি আমরা? আপনারা পাঠাচ্ছেন, আপনাদের শুভেচ্ছা রয়েছে পেছনে—গায়ে বল কত। এক লম্ফে উঠে পড়লাম চূড়ার উপর। কত উঁচুতে উঠেছি, আরও উঠছি। তবু মনে হচ্ছে পাহাড়ের গা ঘেঁসে যাচ্ছি, গড়িয়ে চলেছি পাহাড়ের উপরে। ভয় হয়—এই

রে:, লাগল বুঝি ঘা, সব সুদ্ধ তালগোল পাকিয়ে আগুনে জ্বলে পুড়ে পড়ে রইলাম এই অপরিজ্ঞাত দুরারোহ অঞ্চলে।

কিচ্ছু যে হয়নি, সে তো টের পাচ্ছেন। হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন, এই যে লিখে লিখে জ্বালাতন করছি। পর্বত পার হয়ে এবারে সমভূমি— বিশাল এক জলপথ। প্লেনের বেগ কমেছে—এসে গেল বুঝি! জুতো-জোড়া খুলে আরাম করে বসেছিলাম, তাড়াতাড়ি পায়ে পরলাম। মতামতের জন্য একটা ছাপা কাগজ দিল হাতে: কেমন লাগল ভ্রমণ? প্রাণপণ চেষ্টা করছি, তা সত্ত্বেও ত্রুটি হতে পারে। ইঁটের ঢিল বা ফুলের তোড়া (brickbats or boquets)—যা দেবেন খুশি মনে মাথা পেতে নেব।

পর্বতে আবার পথ আটকে গেল। দুই পর্বতের ফাঁকে নদী; শহর নদীর উপরে। পেটি বাঁধবার লেখা ফুটল। অতএব যা ভেবেছি—কাবুল, ঐ যে শহর কাবুল! পাহাড়ের নানান গলিঘুঁজি পার হয়ে আবার ফাঁকায় এসে পড়লাম। জল জমে আছে চতুর্দিকে, কৃষিক্ষেত্র। অজস্র জনবসতি। পাহাড়ে-ঘেরা একটুকু সমতল জায়গায় প্লেন নেমে পড়ল। কাবুল।

মাথায় কাবুলি টুপি, দীর্ঘদেহ এক ব্যক্তি এয়ারফিল্ডে। কাবুলিওয়ালা শ্যাম বর্ণেরও হয় নাকি ? কাছে এসে বাংলা কথা, আপনি ডাক্তার মজুমদার ?

উঁহু, সাদামাঠা বোস আমি। সামান্য ব্যক্তি।

নাম বলতে সমাদরে তিনি হাত জড়িয়ে ধরলেন। আপনাকেও খুঁজছি। আমি গুপ্ত — অপূর্বভূষণ গুপ্ত। কে. এল. এম. বিমান-কোম্পানির ম্যানেজার।

এই যে লিখে লিখে এত জ্বালাতন করি আপনাদের, দেখা গেল, এত দূরে কাবুল-এরোড্রোমেও সে পাপ গোপন নেই। বাংলা মাসিক এখানেও আসে — এমন হিমালয় পর্বতও পথ রুখতে পারে না। বাঙালি তো আড়াই ঘর — চীনের লেখাগুলো কিন্তু বরাবর এঁরা পড়ে এসেছেন। এবং এমন ক্ষমাশীল, গালমন্দ না করে তাজ্জব বচন ছাড়তে লাগলেন।

কাস্টমসে মাল ছাড়ানো হচ্ছে — খুঁজে দেখি, বইয়ের প্যাকেট লোপাট। অধমের লেখা কিছু বই যাচ্ছে মস্কোয়। পাখনা নাই থাক, বই কিন্তু দস্তুরমতো ওড়ে। বিশ্বাস না হয়, আপনার আলমারির খাঁচা থেকে বের করে কয়েকটা দিন ফেলে রাখুন বাইরে। আর নেই। হীরেমুক্তো বরঞ্চ এক জায়গায় পড়ে থাকে, বই কদাপি নয়। আকাশলোকে প্লেনের গহ্বরেও, দেখছেন তো, ঠিক' সেই ব্যাপার। খোঁজ, খোঁজ, খোঁজ। কোথাও পাত্তা নেই। বইয়ের গাদা দেখিয়ে বিদেশ-বিভুঁইয়ে কিঞ্চিৎ পশার জমাব ভেবেছিলাম (ভিতরের বস্তু পড়তে পারছে না, তখন ভাবনা কি ?)। মনটা খারাপ হয়ে গেল। গুপ্তর বিষম খাতির — বিশেষ করে এই এয়ারফিল্ডের চৌহদ্দির মধ্যে। খুঁজে-পেতে দেখ্ রে বাপু, প্লেনের মধ্যে আছে কি না। হ্যাঁ, হ্যাঁ — আছেই তো একটা প্যাকেট। সব মাল বেরিয়ে গেছে, ওটা ঘাপটি মেরে পড়ে রইল — কোনও সাহিত্যপ্রেমিক তস্করের কারচুপি কি না, কে জানে।

কাবুলের মাটিতে পা ছোঁয়ানো মাত্র আমাদের দায়-দায়িত্ব চুকে গেছে। সোবিয়েত অ্যাম্ব্যাসির হেফাজতে এখন। মনিব্যাগের মুখ বেঁধে ফেলেছি,

খাওয়া-শোওয়া ও ঘোরাঘুরির যাবতীয় ব্যবস্থা তাঁদের। তাঁরা হাজির আছেন। বিষম মুশকিলে পড়ে গেছেন ভদ্রলোকেরা। উত্তম হোটেল এখানে সর্বসাকুল্যে দুটো। মালিক হলেন খোদ আফগান-গবর্নমেন্ট — আপনি-আমি ইচ্ছে করলে হোটেল খুলতে পারব না এখানে। কাবুল-হোটেলের নতুন এক ব্লক বানানো হয়েছে সেটা চালু হয়নি এখন অবধি। স্থান অতিশয় সঙ্কীর্ণ। তার উপরে আজ মঙ্গলবার — ভারত থেকে প্লেন আসার দিন। দুটো প্লেন এসে পৌঁছল, একটা নিয়মমাফিক, বাড়তি আর একটা আমরা ভাড়া করে নিয়ে এলাম। এয়ারফিল্ড থেকে শহরে যাব, তার গাড়ি পাওয়া যাচ্ছে না। ঝনাৎ করে টাকা ফেলে ট্যাক্সি ভাড়া করবেন, সে জায়গা কাবুল নয়। কড়া রোদে পথের ধারে সকলে দাঁড়িয়ে আছি — আসছে, ঐ যে ধুলোর ঝড় উঠেছে, ঐ বুঝি আসছে গাড়ি। কিন্তু ঝড় তুলবার জন্য কাবুলের রাস্তায় মোটরকারের প্রয়োজন হয় না, জন দুই-চার লোকেই বীর পদক্ষেপণে চতুর্দিক অন্ধকার করে তুলতে পারে। অ্যাম্ব্যাসির লোকেরা লজ্জা পেয়েছেন — অপ্রতিভ হাসি হেসে বারম্বার ভরসা দিচ্ছেন, দেরি নেই — এসে পড়ল বলে মেশিন; বেশি আর দেরি হবে না। মেশিন মানে মোটরগাড়ি।

অবশেষে এসে পড়ল একখানা কার ও একটি স্টেশন-ওয়াগন। মানুষের যা হয় হোকগে, মাল মিলিয়ে তুলে ফেলা যাক তো আগে। মাল বোঝাই হয়ে স্টেশন-ওয়াগন শহরমুখো চলল। ড্রাইভারের পাশে কায়ক্লেশে দুটো জায়গা হয়, আমি আর প্রেমচাঁদ চড়ে বসলাম। বয়স কম হলে কি হয়, প্রেমচাঁদ অসামান্য ব্যক্তি। হেন বিদ্যা নেই যা তাঁর অজানা। মায় উর্দুতে পদ্য বানানো অবধি। বিশ-পঁচিশ গণ্ডা রাশিয়ান কথা জানা আছে, সে জন্য খাতিরের অবধি নেই। দলের সেক্রেটারি এবারের চালানে আসতে পারেন নি, পিছনের দলে আসছেন। রুশীয় বিদ্যার জোরে প্রেমচাঁদকে কাঁচা-সেক্রেটারি করে নিয়েছেন দলপতি। সকলের দেখাশুনা ও বিলিবন্দোবস্ত উনিই করবেন আপাতত। স্টেশন-ওয়াগনের ড্রাইভারটি জাতে রুশ, দু-চারটি রুশ-কথার ফোড়ন দিয়ে প্রেমচাঁদ তার তাক লাগিয়ে দিয়েছেন। এটা কি ওটা কি জিজ্ঞাসা করছেন; ড্রাইভার যথাজ্ঞান জবাব দিচ্ছে। নিজেও উপযাচক হয়ে এটা-ওটা দেখাচ্ছে।

আগে ভিন্ন এক হোটেলে গিয়ে দাঁড়াল। না, সেখানে জায়গা নয়। দুটো ছাড়া হোটেল নেই — অতএব নিশ্চিত কাবুল-হোটেলে। সামনে কাঁচা নর্দমা, তার ও-পারে ফুটপাথ। সেইখানে মালপত্রের পাহাড় ঢেলে দিয়ে গাড়ি আবার এয়ারফিল্ডে চলল মানুষ আনবার জন্য।

প্রেমচাঁদ হাঁক দিলেন, দাঁড়াও দাঁড়াও—আমি যাব। সেক্রেটারি মানুষ—মালপত্রের মতন মানুষগুলোও গুনেগেঁথে হিসাবপত্র হিসাব-কিতাব করে নিয়ে আসবেন বুঝি। ভাল, দায়িত্বজ্ঞান একেই বলে।

ও হরি, যাচ্ছেন নিজের গরজে। মাথার টুপি কোথায় ফেলে এসেছেন, খুঁজে পেতে আনতে চললেন। ফুটপাথ থেকে জিনিস বয়ে বয়ে হোটেলে নিয়ে তুলল। সাবেক ঢঙের বাড়ি, ছোট ছোট ঘর। জাঁদরেল সরকারি হোটেল—তা ড্রইংরুমে লম্বার দিকে একটা মানুষ পুরো পা ছড়িয়ে শুতে পারে, চওড়ার দিকে হয়তো বা পা একটু গুটাতে হয়। পাঁচ-সাতটি প্রাণী বসতে পারে টায়েটোয়ে। দোতলার সিঁড়ি উঠে গেছে সেই ঘরের ভিতর দিয়ে—তার এক ধাপে চড়লেন তো পরের ধাপ দেখতে পাবেন কোমরের কাছাকাছি। নেহাত পক্ষে হাত তিনেক মাপের এক-একখানা পা হলে ঐ সিঁড়ি ভেঙে অবাধে উঠা যায়। মালপত্রে তামাম ড্রইংরুম ভরাট হয়ে গিয়ে এবারে ঐ সিঁড়ির উপর থাক দিচ্ছে। ধাপ অতএব আরও উঁচু হয়ে উঠল।

সহযাত্রীরা সামাল করে দিয়েছেন—জায়গা খারাপ, তিলেকের অসাবধানে বাক্সটা-ব্যাগটা নাকি এদিক-ওদিক সরে যাবে। সতর্ক চোখ মেলে খাড়া দাঁড়িয়ে আছি তাই। আর জনান্তিকে শুনছি, এত লোকের জায়গা হবে না হোটেলে—এখানে-ওখানে ছড়িয়ে দেবে। পাকাপাকি ঘর নিয়ে আছেন অনেকে। পাইলটের জায়গা রিজার্ভ করা থাকে, দু-দুখানা প্লেনের যাবতীয় পাইলট হাজির আজকে এক সঙ্গে। শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে তার উপরে আমরাও ষোল জন এই মাত্র নির্বিঘ্নে পৌঁছলাম।

আছি দাঁড়িয়ে। কতক্ষণ পরে মোটরকারে মেয়েরা এসে পড়লেন। এবং তন্মধ্যে তেজা সিং। দাড়িওয়ালা হাতে বালা-পরা শিখ। বেঁটে মানুষ—পাগড়ি বেঁধে বিনুনি-করা চুলের ঝুঁটি তদ্‌গর্ভে ঢেকে দিয়েছেন, এবং আকারেও কিঞ্চিৎ লম্বা হয়েছেন। কেওকেটা ব্যক্তি—পেপসুর চীফ-জাস্টিস ছিলেন, পাঞ্জাব য়্যুনিভার্সিটির ভাইস-চ্যান্সেলার। অতএব দলপতি হয়েছেন। দল-পতিত্ব এবং পাকা দাড়ির গৌরবে মেয়েরা নিজেদের মধ্যে ঠাঁই দিয়ে পয়লা গাড়িতে ওঁকে নিয়ে এলেন। অন্য সবাই পথে বসে আছেন স্টেশন-ওয়াগন উদ্ধার করে আনবে এই প্রতীক্ষায়।

হোটেল-ম্যানেজারের সঙ্গে গোটা কয়েক কথা বলে তেজা সিং অবস্থা বুঝে নিলেন। গোমড়া মুখে বসে আছেন। ভেবে ভেবে তড়াক করে হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন। আমায় ডাকছেন, আসুন—ঘরদোর বেছে নেওয়া যাক।

আমি ঘাড় নেড়ে বলি, সকলে এসে পড়ুন—

এসে পড়লে তখন কি আর মনের মতন বাছাবাছি চলবে?

বোকারাম আমি, হিতকথা কানে গেল না। একটা বাক্সে চেপে বসে পা ছড়িয়ে বাইরে চেয়ে আছি। দুর্লঙ্ঘ্য সিঁড়ি বেয়ে বুড়োমানুষ তেজা সিং শম্বুকগতিতে উঠতে লাগলেন। উত্তম ঘর পাবার লোভে মেয়েরাও মহোৎসাহে উঠে দাঁড়ালেন। ওরে বাবা, রেলিঙে ঝুল খেয়ে এ-বোঝা ও-বোঝার উপর দিয়ে পাহাড়ে চড়ার মতো আলটপকা উঠে গেলেন দলপতিকে বিস্তর পিছনে ফেলে। হিমালয়ে তুলে দিলে, যা কাণ্ড, তেনজিঙের আগেই তো এঁরা এভারেস্টে চড়ে বসতেন।

ঘর দখলের কাজ সমাধা করে তেজা সিং নেমে এসে খাবার তাগিদ দিলেন। মহিলারাও নামতে লাগলেন। মিনিট দশ-পনেরোর বেশি নয়—আহা-হা, কি হয়ে সব আসছেন ইতিমধ্যে! ঘরের চেয়ে ওঁরা সাজ-বদলের জন্যেই অধিক আকুল হয়েছিলেন। স্নান নামক বিলাসিতার বেশি রেওয়াজ নেই এখানে, অত জনের স্নানের জল কে জোগাড় করে রেখেছে? যেটুকু ছিল, তা এঁদের মুখ-হাত ঘষাঘষিতেই ব্যয় হয়েছে। ব্যয় সার্থক বটে! ঈশ্বর মোটামুটি এক চেহারা দিয়ে নিশ্চিন্ত ছিলেন। কিন্তু মানুষের অধ্যবসায়ে কি অসাধ্য-সাধন হয়—স্বয়ং সেই স্রষ্টিকর্তা এখন এঁদের দেখলে চিনতে পারবেন না।

তেজা সিং হোটেল-ম্যানেজারের উপর হাঁকড়াচ্ছেন, কই গো, আর কত দেরি?

আমায় বললেন, খাইগে চলুন যাই—

হুকুম দলপতির হলেও ঘাড় নেড়ে বসলাম: বন্ধুরা পথে পড়ে, আমি এখন খাচ্ছি না।

অনেক দেরি হবে তাদের আসতে।

দেরি যতই হোক, আমি বসে আছি এখানে। তাদের ফেলে খাব না।

দলপতি বললেন, আমি চললাম তবে বাপু। কিছু মনে কোরো না।

যথা আজ্ঞা। আগের হুকুম না মেনে অপরাধী হয়েছি, পুনশ্চ সেটা আর করতে চাই নে। উনি খানাঘরে গিয়ে ঢুকলেন, আমি কিছু মনে করলাম না।

ক্রমশ সকলে এসে পড়লেন। কাস্টমস বাবদে এবং যানবাহনের অভাবে দু-তিন ঘন্টা পথের উপর ঘোরাঘুরি করে মেজাজ সমধিক উষ্ণ।

মালপত্র?

নির্ভয় হন। সেগুলো ঠিক আছে। কোনখানে নিয়ে তুলবেন, সেই সেইটে ভাবুন।

লীডার কোথায়?

দেখা হবে না, বিশেষ কর্মে ব্যস্ত রয়েছেন।

তা হলে সেক্রেটারি মশায়—

প্রেমচাঁদ সহসা জিভ কেটে বলে উঠলেন, এই যাঃ—আবার এয়ারফিল্ডে দৌড়তে হল। জিনিস ফেলে এসেছি।

টুপি তো ঐ মাথায়—

উঁহু, ফোলিওব্যাগ ভুলে এসেছি কাস্টমস-ঘরে।

একটা গাড়িতে স্টার্ট দিয়েছে, দৌড়ে তার ভিতর ঢুকে পড়লেন। অস্থায়ী যদিচ, তাহলেও সেক্রেটারি। মানুষ ও মালপত্রের যাবতীয় দায়ঝক্কি ওঁর উপর। দলপতি সেক্রেটারি বাছাই করেছেন। মানুষ অতি উপযুক্ত, কাবুলে পা দিয়েই বারম্বার মালুম পাওয়া যাচ্ছে।

এয়ারফিল্ড থেকে এক ভদ্রলোক পিছু নিয়েছেন। চেহারা ও হিন্দি জবানে প্রকট হল ভারতীয়। জীপগাড়ি সঙ্গে—যাকে সামনে পান, কাতরাচ্ছেন গিয়ে, উঠে পড়ুন—উঠে পড়ুন। কেউ কানে নেয় না। আপনি কে হলেন মশায়? রুশ-রাজদূতের অতিথি—যত্র তত্র গেলে আমাদের ইজ্জত থাকে?

ভদ্রলোক অতএব ক্ষুণ্ণ মনে ফিরলেন। তা বলে নিরস্ত হবার পাত্র নন। ফিরে এসে বসে আছেন হোটেলে। জাতভাইরা এসে পড়েছে, উপকার না করে কিছুতে ছাড়বেন না। আর আছেন অপূর্ব গুপ্ত। ছায়ার মতন সেই থেকে সঙ্গে ঘুরছেন। দুপুর গড়িয়ে যায়—তা হোক, তা হোক, খাওয়া-নাওয়া তো রোজই আছে। আপনাদের সকলের বন্দোবস্ত হয়ে গেছে—সেইটি দেখে তবে যাব।

জনা তিনেক ফালতু হয়ে যাচ্ছি। যা গতিক, মেজেয় সতরঞ্চি বিছানো ছাড়া উপায় দেখি নে। জীপের মানুষটি পরম পুলকে এগিয়ে এলেন: তবে আর কি, উঠে পড়ুন এবারে জীপে। ইণ্ডিয়ান ক্লাবে খাট-বিছানা পেতে রেখে এসেছি। তোফা থাকবেন। কেন মিছে ঝামেলা বাড়ান এখানে?

নিরুপায় হয়ে তখন ভদ্রলোকের পরিচয় নিতে হয়। গোবর্ধন দাস মালহোত্র—টালিগঞ্জ জয়া-ইঞ্জিনিয়ারিঙের লোক। বছর কয়েক ধরে কাবুলের মা-লক্ষ্মীদের সেলাই-কল যোগান দিয়ে আসছেন। আমি বালিগঞ্জে থাকি, তবে তো এক পাড়ার লোক—যান মশায়, আগে বলতে হয়!

ঐ জীপের খবরও বেরিয়ে পড়ল। ভারত-সরকারের গাড়ি—অ্যাম্ব্যাসি থেকে মালহোত্রের জিম্মায় দিয়েছে আমাদের কাজে কর্মে লাগে যদি। কিচ্ছু তো বলেন নি এতক্ষণ—মিনমিন করছিলেন, জীপের মালিকানা তবে তো

আমাদেরই অর্শায়। নিজের গাড়িতে ড্যাং-ড্যাং করে ঘুরব, তা নিয়ে আর কথা কি!

উঠুন—

তিন নয় কিন্তু, চার বাঙালি আছি। কে পড়ে থাকবে, তার জন্যে কি টস করতে বসব এখন?

মালহোত্র বললেন, চারই আসুন চলে। আন্দাজি চার বিছানা পেতে রেখে এসেছি, গিয়ে দেখতে পাবেন। আমার কেমন মনে হল, বাড়তি একটি ব্যবস্থা থাকা উচিত।

সে তো হল, কিন্তু দলপতির অনুমতি চাই যে! তিনি রাজি না হলে স্বয়ং যমরাজও যদি এসে পড়েন, তাঁকে খালি হাতে ফিরতে হবে। খোঁজ, খোঁজ, কোথায় আছেন দলপতি।

খানাঘরে সেই যে ডেকে গেলেন আমায়, তখন থেকেই চালাচ্ছেন। সর্বনাশ! হোটেলের মালিক খুদ আফগান গবর্নমেন্ট—খেয়েই তাঁদের ফতুর করবেন। ভারতের সঙ্গে বিশেষ দহরম-মহরম—এই নিয়ে শেষটা দুই গবর্নমেন্টে ঝগড়া না বেধে যায়!

পরে অবশ্য টের পেয়েছিলাম আশঙ্কা অমূলক। হাড়ে-হাড়ে বুঝলাম—মুরগির হাড়ে। যে-সব লোকের উপর হোটেলের কর্তৃত্ব, তারা অতিশয় হিসাবি। সোবিয়েত দেশ থেকে ফেরার মুখে এক রাত্রি খেয়েছিলাম হোটেলে। তাই যথেষ্ট। মুরগির কোর্মার মাংসগুলো নিপুণ হাতে চেঁচে নিয়ে লম্বা লম্বা হাড়গুলো ঝোলে ডুবিয়ে রেখেছে। দাঁতের কত শক্তি ধরেন, পরীক্ষা দিন খানা-টেবিলে বসে। নাজেহাল হয়ে দাঁতের বিশ্রাম দিয়ে শেষ অবধি হয়তো বিবেচনা করলেন, ঝোল শুষেই কিঞ্চিৎ উশুল করে নেবেন। তা ঝাললঙ্কা এমন ঠেলে দিয়েছে—মুখবিবর থেকে উদর অবধি ছ্যাঁকা দিতে দিতে এগুবে। জলে ঠাণ্ডা হবে না। মুখব্যাদান করে ঘন্টাখানেক অন্তত লালা ঝরাবেন। খাদ্যের এই মাহাত্ম্য সেদিন জানা ছিল না। তাই ভাবলাম, তেজা সিং অফুরন্ত সাপটাচ্ছেন এই বেলা ধরে।

একজনে খানাঘরে ছুটলেন অনুমতির জন্যে। আর ফেরেন না। বলা যায় না, মহদ্দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে বসেই গেলেন বা! ক্ষিধেয় নাড়ি পট-পট করছে—তার চেয়েও বড় ব্যাপার, ধুলোয় আপাদমস্তক বিভূষিত। ঘন্টা তিনেক ব্যেপে এই কাণ্ড—সহ্যের সীমা শেষ হয়ে এলো।

পুনশ্চ একজন, তাঁরও পাত্তা নেই। তাগিদ দিতে তখন আরও একজন গেলেন। সর্বশেষ আমি। যাই হোক, মিলে গেল অনুমতি। মুরগির হাড়

স্তূপীকৃত পাতের পাশে। এতক্ষণ ঐ তালে ব্যস্ত ছিলেন — ভরতি মুখ থেকে কায়ক্লেশে বলেছিলেন, দাঁড়ান — ভেবে দেখি। একে একে এসে চুপচাপ এঁরা সারবন্দি দাঁড়িয়ে। উনি খাচ্ছেন আর ভাবছেন। সমস্তগুলো প্লেট নিঃশেষিত হবার পর ভাবনা শেষ হল। অনুমতি দিয়ে দিলেন।

অতএব যাবতীয় মালপত্র এবং মালহোত্র ও শ্রীগুপ্ত সমভিব্যাহারে চললাম ইণ্ডিয়ান ক্লাবে। সগর্জনে এবং সগৌরবে ধুলোর ঝড় উড়িয়ে ছুটতে ছুটতে — হঠাৎ একি হয়ে গেল, চারিদিক দিব্যি নজরে তো এসে যাচ্ছে, ধুলো নেই, আওয়াজও রীতিমত কোমল হয়ে এসেছে। তাকিয়ে দেখি; রাস্তায় পিচ দেওয়া। সারা শহরে একমাত্র পিচের রাস্তা — শাহী-সড়ক এর নাম -- মাইল দেড়েক হবে লম্বায়, কাবুলবাসী এই শড়কের গুমরে বাঁচেন না।

শাহী-সড়ক ছাড়িয়ে আরও অনেক বাঁক ঘুরে ইণ্ডিয়ান ক্লাবে পৌঁছানো গেল। খাসা বাড়ি — চওড়া উঠান, ফুলবাগিচা। টেনিস-লন আছে, সারি সারি আপেলের চারা লনের এক দিকে। অদূরে পাহাড় -- ঘরে শুয়ে পাহাড় দেখা যায়, ভারি সুন্দর জায়গা। হাত-মুখ ধুয়ে অগৌণে আহারে বসা গেল। অতি মহাশয় লোক মালহোত্র; সব দিকে খর দৃষ্টি, ব্যবস্থা দেখে অবাক হয়ে যাচ্ছি। স্ত্রী দিন পনের দিল্লি চলে গেছেন। তারপর ইনি ক্লাব-বাড়িতে এসে উঠেছেন। কর্তৃস্থানীয় একজন — এঁদেরই চেষ্টায় ক্লাব গড়ে উঠেছে।

শ্রীগুপ্ত এতক্ষণে বিদায় নিলেন। পাঁচটায় (আমাদের ছ'টা) কাবুল-হোটেলে আসবেন আবার, ঐখানে সকলে গিয়ে জুটব। ভারত-দূতাবাসের নিমন্ত্রণ, সেখানে যেতেই হবে। আর কি করা যাবে, তা-ও ভেবে দেখব তখন।

খাদ্য পরিপাটি। বটের পাখির মাংস, পোলাও ও তন্দুরা। ঘি নির্ভেজাল -- সের আড়াই টাকার মতো। চাল এমন মিহি, বোধ করি ফুঁ দিলে উড়ে যায়। হাতে ঠাসা অতিকায় রুটির মতন বস্তুর নাম হল তন্দুরা। চিনি দেওয়া নয়, অথচ চিবিয়ে দেখুন কি মিষ্টি। এখানকার গমের গুণ। খাওয়ার পরে ফল — আঙুর, তরমুজ, আপেল। বড় আঙুরের সের দু-আনা। আপেলের পাউণ্ডও দু-আনার মতো। দেদার খেয়ে যান, এ সুযোগ হেলায় হারাবেন না। কাবুলে মা-বারুণীর সাক্ষাৎ পাবেন না, ইসলামি নিয়মে শহর শুকনো করে রেখেছে। কিন্তু ক্লাববাড়িতে, যদি হুকুম করেন,-বন্যা বইয়ে দেবার ব্যবস্থা রাখেন এঁরা। সমস্ত ভাল, পাবেন না কেবল সঙ্গ। পুরুষের বেলা তবু না হোক, মেয়েদের ভারি কষ্ট। নিতান্ত মজুরনী ছাড়া অতিশয় কড়া পর্দা। পথ-চলতি কদাচিৎ একটি দুটি মেয়ে দেখবেন — দেখতে পাবেন

দীর্ঘ একখানি বোরখা চলেছে জুতোপরা দুটি পায়ের উপর নির্ভর করে। *শ্রীমতী মালহোত্র দিল্লি পালিয়ে গিয়ে আপাতত হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছেন।*

গুরুভোজনের পর পাৎলুন ছেড়ে লুঙি পরে আরামসে লেপের নিচে গিয়েছি, শ্রীযুত মুখুজ্জে এলেন। সুধীরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—ভারত-দূতাবাসের কেষ্ট-বিষ্টু একজন, হাতে একগাদা যুগান্তর কাগজ। সাতদিন অন্তর ভারতের ডাক, একদিনে ওঁরা হপ্তার কাগজ পড়েন। আর বললেন, মাসিক বসুমতীও আসে। দেখুন তাই, অধমের কলমের কসরত হিমালয় পার হয়েও চলে এসেছে। দিব্যি করছি, লিখবার জন্য ভবিষ্যতে এমন কাগজ বাছাই করব কম্পোজিটার ও প্রুফ-রীডার ছাড়া যা কেউ পড়ে না। তা হলে এই সমস্ত নানান কথা শুনতে হবে না। বস্তুত, শ্রীমুখুজ্জে এমন সব বিশেষণ ছাড়তে লাগলেন—মুখটুখ লাল করে একখানা কাণ্ড ঘটিয়ে বসবার কথা, কিন্তু ঈশ্বর-দত্ত পাকা রং বিধায় সে যাত্রা কাটিয়ে উঠলাম। ডেলিগেটদের লিস্টি দিল্লি থেকে আগেই এসে গেছে—তার মধ্যে নাম পেয়েছেন। এতক্ষণ ফুরসত হয় নি, অফিসের পরে এই বেলা তিনটের সময় ছুটতে ছুটতে এসেছেন—নাওয়া হয় নি, খাওয়া হয় নি। যেতে হবে একবার আমার বাসায়, যেমন করে হোক সময় করতে হবে। ছেলে বড্ড দেখতে চায়। ছেলের মা-ও চান। তিনি অবশ্য অ্যাম্ব্যাসির নিমন্ত্রণে যাবেন, সেখানে দেখাশুনো হবে। ছেলে তো সেখানে যাবে না।

মুখুজ্জে চলে গেলেন তো টানা ঘুম তার পরে। অ্যাম্ব্যাসির জীপ উঠানে এসে ভকভক করে তাগাদা দিচ্ছে। উঠে চোখ মুছতে মুছতে পুনশ্চ কাবুলের রাস্তায়। রাস্তা বটে! জীপগাড়ি শক্ত ইস্পাতে বানানো, ভেঙেচুরে তাই ছত্রখান হয় না। বাংলাদেশের তেলে-জলে ধুলোয়-মাটিতে দেহগুলো পাকাপোক্ত করে তবে আমরা পথে বেরিয়েছি, আমাদেরই বা করবে কি?

দেরি দেখে গুপ্ত আমাদের তল্লাসে আবার ক্লাবমুখো চলেছেন। তাঁকে তুলে নেওয়া হল। কিন্তু এলাম কার কাছে? দলপতি গুরুদ্বার-দর্শনে বেরিয়ে পড়েছেন। একসঙ্গে জুটেপুটে হোটেল থেকে অ্যাম্ব্যাসিতে যাওয়া তবে আর হল কই?

গাড়ি ঘোরাতে বললেন গুপ্ত। তবে এই ফাঁকে আমার বাড়িটা একবার ঘুরে চলুন—

আপেল তো জানি ফলের দোকানে বাক্সবন্দি হয়ে থাকে, এবং আঙুর দু-চার থোলো সামনে ঝুলিয়ে রসিকের রসনা লালাসিক্ত করে। এ হেন আঙুর-আপেল গাদা গাদা গাছে ঝুলছে, দেদার ছিঁড়ে ছিঁড়ে খান—আজ্ঞে হ্যাঁ, এ হেন

রূপকথার দেশ মর-ভুবনেই আছে, এই কাবুল শহর। অপূর্ব গুপ্তর উঠানে ঢুকে আঙুরের মাচার নিচে দিয়ে যাচ্ছেন — মাথা নিচু করে যাবেন, নয়তো সুপক্ক আঙুরের থোলোর থাবড়া খাবেন বারে বারে। মাচায় আর কিছু দেখবার জো নেই, খালি আঙুর। এমনি ধারা সর্বত্র — আঙুরের সের দু-আনা হবে না তো কি! খাচ্ছে, শুকিয়ে কিসমিস বানাচ্ছে, আর কি করবে ভেবে পায় না। তারপরে উঠানের আঙুরের অত্যাচার সয়ে সয়ে বারাণ্ডায় উঠলেন তো পাশেই নিচু আপেলগাছ। আপেল পেকে লাল টুকটুক করছে। অতিথিকে যা-ই কিছু খেতে দেবেন, সঙ্গে মস্ত বড় ফলের প্লেট। শ্রীমতী গুপ্ত দক্ষিণ-ভারতের মেয়ে — ইংরেজি বলনেওয়ালা তো বটেই, বাংলা বলেও বহু খাস বাঙালিনীকে লজ্জা দিতে পারেন। রান্নাই বা কী চমৎকার। কিন্তু এক মারাত্মক দোষে সব মাটি করেছে — বিষম খাওয়ান। আসনে বসে বসে খাওয়াচ্ছেন — ছুটোছুটি করে একটা জিনিস আনতে গেছেন, তখনও কড়া নজর — ঐ অবসরে আপনি কোন এক পদে ফাঁকিজুকি না দিয়ে বসেন।

আর কাকে ফেলে কার কথাই বা বলি! শ্রীমতী মুখুজ্জে — ফিরতি মুখে এসে এঁদের দু-বাড়িতে দুই সাজ খেয়েছিলাম। বাপরে বাপ, প্রলয়ঙ্কর কাণ্ড! মেয়েদের শৌখিনতার চোটে বিস্তর পুরুষ ফতুর হয়ে যায়। সকলের সেরা শখ দেখলাম, মানুষ খাওয়ানো। রাশিয়াকে এত প্রগতিবান বলেন, কিন্তু সেখানকার মেয়েরাও এই বনেদি অভ্যাসটা ছাড়তে পারেন নি। পুরুষদের জবর রকম খাইয়ে একেবারে শয্যাশায়ী করে ফেলে এঁরা বিজাতীয় আনন্দ পান।

দেশের বাইরে ঘোরাঘুরি হল তো যৎকিঞ্চিৎ। একটা জিনিস ঠাহর করেছি — অজানা জায়গায় কোন এক গৃহচূড়ায় হঠাৎ যখন আমাদের তেরঙা ঝাণ্ডা দেখতে পাই, মন কেমন তুড়ি-লাফ দিয়ে ওঠে। যেন আমার নিজের বাড়ি, বাড়ির ভিতরে আমার নিজের লোকেরা। আমার দেশভুঁয়ের কথাবার্তা এলাক-পোশাক খাওয়াদাওয়া — দেয়ালে দেয়ালে আমাদের ভালবাসার মানুষদের ছবি। এই হল ভারতীয় অ্যাম্ব্যাসি। অকূল সমুদ্রের মধ্যে সবুজ দ্বীপ। তা-বড় তা-বড় কত নেমন্তন্ন ছেড়েছি, কিন্তু ভারত-অ্যাম্ব্যাসি থেকে যেখানে যে-কেউ ডেকেছেন, কোন দিন অবহেলা করিনি।

অ্যাম্ব্যাসি সদর রাস্তার উপরে, সুন্দর দোতলা বাড়ি, উত্তম কম্পাউণ্ড। আরও বাড়ানো হচ্ছে। দুপুরবেলা এয়ারফিল্ড থেকে হোটেলে যাবার মুখে ইতি-পূর্বেই সামনে দিয়ে গেছি। রাষ্ট্রদূত অধ্যাপক ভগবৎদয়াল; উত্তর প্রদেশের লোক — চিরকাল কলেজে মাস্টারি করেছেন। কূটনীতির কাজ কতদূর কি

করেন আমার জানবার কথা নয়, কিন্তু জ্ঞানবিজ্ঞান ও পড়াশুনোর কথায় প্রবীণ মানুষটি মেতে ওঠেন। এমনি ব্যাপার আরও শুনে এলাম। মস্ত মস্ত জায়গায় ভারত যাঁদের দূত করে পাঠিয়েছে—তাঁদের অনেকে ঝানু ডিপ্লোম্যাট নন, দিক-পাল পণ্ডিত। যেমন রাধাকৃষ্ণণ ছিলেন মস্কোয়। গল্প শুনলাম—সত্যি-মিথ্যে হলপ করে বলতে পারব না—প্রথম সাক্ষাতে স্ট্যালিন নাকি পরমাগ্রহে এদেশ-ওদেশের দার্শনিক তত্ত্ব নিয়ে পড়লেন, রাজনীতির কথাবার্তা হল না। চীনে গেলাম, তার ঠিক আগেই রাষ্ট্রদূত ছিলেন সর্দার পানিকর। পানিকর ও তাঁর মেয়ের গল্পে চীনের ইতরভদ্র পঞ্চমুখ। এমনই সব লোক পাঠিয়ে বাইরের ভুবনে আমরা এত বড় ইজ্জত গড়ে তুলেছি। ভারত বড় ভাল। মানুষ-গুলো কেমন দেখ—শয়তানি-ফেরেব্বাজির ধার ধারে না, আত্মভোলা পণ্ডিত। সেকালে ভারতের সাধুসন্ত ও বিদগ্ধেরা বাইরে ছড়িয়ে পড়ে জনচিত্ত জয় করতেন, সেই ধারাই চলছে খানিকটা।

অ্যাম্ব্যাসিতে উত্তম উত্তম আয়োজন—ও সব তো আখচার হয়ে থাকে, একটা সামান্য জিনিস মনে রয়ে গেছে—নুন-পেস্তা। পেস্তা তো এখানকার জঙ্গুলে গাছে হয়, তার আর কি দাম আছে বলুন। নুনের সঙ্গে জারিয়ে বেড়ে বানিয়েছে—টপাটপ গালে ফেলতে মন্দ লাগে না। শ্রীমতী দয়াল ও তাঁর মেয়ে আছেন—মা-মেয়ে খুব খাটছেন অতিথিদের আদর-অভ্যর্থনায়। আর সেখানে আলাপ হল শ্রীমতী মুখুজ্জের সঙ্গে। আলাপ জমতেই দিলেন না তিনি—অহো কি সৌভাগ্য!–ইত্যাকার বচনের পর কোন পামর টিকতে পারে সেই জায়গায়? আমার তো মনে হয় ভদ্র ভাবে এই এক সরিয়ে দেবার কায়দা।

ষড়যন্ত্র হল, নেমন্তন্নের আসর থেকে টিপিটিপি বেরিয়ে পড়া যাক। এ তো চলবে এখন বিস্তর রাত অবধি। রাশিয়ার প্লেন এসে বসে আছে, সকাল-বেলা আমাদের নিয়ে উড়ে পালাবে। অতএব বসে বসে গুলতানি না করে, যা পারা যায় দেখে নিই।

বাবরের কবর—সেটা রাত্রিবেলা হবে না। আমানুল্লা শহর বসাচ্ছিলেন, প্রাসাদ বানিয়েছিলেন—মাইল চার-পাঁচ এখান থেকে। অ্যাম্ব্যাসির জীপে সেইমুখো বেরিয়ে পড়া গেল। কনকনে শীত। কাবুল নদীর পাশে পাশে পথ। ও হরি, ইনি আবার নদী নাকি! খাল বললেও মান দেখানো হয়—আয়তনে উল্টাডিঙির খালের আধাআধি হতে পারেন। বর্ষায় জল-সম্পত্তি কিছু নাকি বাড়-বাড়ন্ত হয়। সে আর কত—আঙুল ফুলে কলাগাছ হোক, শালগাছ হতে পারে না! ঠাণ্ডা রাত্রে চাখানায় জমজমাট। গরিব হতে পারে—কিন্তু আমিরি জাত এরা, সন্দেহ নেই। জীবনের আমোদ-স্ফূর্তি

ছেড়ে টাকার ধান্দায় ঘুরতে হবে, এ তত্ত্ব তারা মান্য করে না। দিন-রাত্রি চব্বিশ ঘন্টা, তাই দেখবেন, আড্ডা কখনো ফাঁকা নয়। উৎকৃষ্ট আড্ডাধারীদের খাতিরও খুব, পথ চলবার সময় চাখানা কফিখানা তারস্বরে ডাকাডাকি করে, চা-কফি মুফতে মুখের সামনে বাড়িয়ে ধরে। আমাদের জীপের ধুলো ও আওয়াজে বোধ হয় রসভঙ্গ হচ্ছে, ভ্রূকুটি-দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে ওরা। বস্তুত মোটরগাড়ি এ সব জায়গায় বেমানান, মোটরের জন্য রাস্তাঘাটও তাই বানায় নি।

শ্রীযুত মুখুজ্জের বাসা হয়ে ওঁদের ছেলেটিকে তুলে নেওয়া হল। প্রবীর-কুমার মুখোপাধ্যায় — বছর বারো বয়স, স্বাস্থ্য আর বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্যে ফেটে পড়ছে। কি কাণ্ড, বইটই পড়ে নাম জেনে বসে আছে। দেশের মানুষ পায় না তো, বাংলা কথা শুনে কী খুশি! মুজতবা আলী সাহেবের 'দেশে-বিদেশে' বইটা লাইন-কে লাইন পড়েছে। এখানকার লোকের সৌজন্য ও আতিথেয়তার কথা উঠল। দেখা হলে কুশল প্রশ্নের বান ডেকে যায়। বলেই চলেছে গড়গড় করে — কমা-সেমিকোলন নেই, জবাবের জন্য তিলেক থামবে না, জবাবের পরোয়াই করে না —

থামো, থামো, লিখে নিই।

তখন প্রবীর থেমে থেমে বলছে। খাতা বের করে তাড়াতাড়ি টুকে নিলাম। দেখা হলে এক জনে অন্যকে অন্তত পক্ষে এই ক'টি কথা বলবেই :

চেতোর হাস্তেদ্ (কেমন আছ) ? জান মান তন জোর আস্ত্ (তোমার শরীর ভাল আছে) ? বেখ্যার হাস্তেদ্ (ভাল আছ তো) ? চুচা বাচচায়ে তন খুব আস্ত্ (ছেলেপুলে ভাল আছে তো) ? সোমা খুব হাস্তিদ্ (আপনি ভাল আছেন) ? …এমনি ধারা নিরবধি চলল।

পাহাড়ের লম্বা লাইন — আমাদের রাস্তা সেই পাহাড় ফুঁড়ে বেরিয়ে গেছে, রাস্তার জায়গাটুকুতে কেবল পাহাড় নেই। হতে পারে, কোন এক পুরাকালে পাহাড় কেটে সমান চৌরস করে রাস্তা বের করে দিয়েছে। জনশ্রুতিও তাই। নাকি, বিশাল ফটক ছিল রাস্তার এই জায়গায় ; ফটক বন্ধ হলে বাইরের কেউ কাবুল শহরে ঢুকতে পারত না। পাহাড়ের মাথায় বিদ্যুতের আলো — আমাদের ডাইনে বাঁয়ে টানা চলে গিয়েছে। ঝুপসি ঝুপসি জঙ্গলগুলোর কালো কবরীতে আলোর মালা পরেছে যেন। কবেকার কোন রণ-বিজয়ের স্মৃতি। শহরে আলো জ্বালুন বা না জ্বালুন — পাহাড়ে আলো জ্বলবেই।

আরো এগিয়ে চলেছি। জ্যোৎস্না ফুটফুট করছে। পথ নির্জন। ধাবমান মোটরগাড়িতে কনকনে হাওয়া ঢুকে সর্বদেহ কাঁপিয়ে তোলে। উপরে

উঠছি—দার্জিলিঙের রেলগাড়ির মতো আঁকাবাঁকা রাস্তায় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে উঁচুতে নিয়ে তুলছে। হঠাৎ দেখি, আকাশের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে বিশাল এক অট্টালিকা। জ্যোৎস্না পিছলে পড়ছে তার গায়ে। দরজা-জানলা বন্ধ। একটা ক্ষীণ আলো নেই কোন অলিন্দে।

রাস্তা সেই অবধি গিয়ে শেষ। পৌঁছানোর এখনো দেরি আছে, আরও দুটো তিনটে বাঁক ঘুরতে হবে। উঠছি—উঠেই যাচ্ছি। তেমাথার কাছে রেলের কামরা আর রেলের গাড়ি চিত-কাত হয়ে পড়ে আছে। ছোট শিশু রাগ করে যেমন খেলনার গাদা ছড়িয়ে ফেলে যায়। বছরের পর বছর রোদে বৃষ্টিতে বরফে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, উপরে কোন আচ্ছাদন নেই। যেন টাকা-পয়সায় কেনা নয়—মাংনা এসেছে।

গতিক তাই বটে। আমানউল্লার মাথায় পোকা ঢুকেছিল, শিক্ষা শিল্প-রুচি ও সাজসজ্জায় জাগরণের জোয়ার বইয়ে দেবেন। রেললাইন পাতবেন সারা দেশ জুড়ে, বিদ্যুৎগামী প্রগতির রথ ছুটবে। আফগানিস্তানের কামাল পাশা। ফলে যা দাঁড়াল, তাবৎ দুনিয়ার মানুষের জানা আছে। আমাদের চোখের উপরে সামান্য একটু নমুনা এই রেলের সাজ-সরঞ্জাম—ওরে বাবা, কার এমন বুকের পাটা, যত্ন করে রাখতে যাবে অলক্ষুণে বস্তুগুলো! যার দায়ে অত বড় আমিরি খসে গেল আমানউল্লার, পরিজনের হাত ধরে দেশভুঁই ছেড়ে পালাতে হল। প্রাণে মনে যাদের ভাল চেয়েছিলেন, সারাজীবনে তাদের একটু চোখের দেখা দেখবার উপায় রইল না। অতএব থাক এসব দুর্বুদ্ধি ; তামাম আফগানিস্তান বরঞ্চ দেমাক করে বেড়াক, বোরখাবিহীন একটি মেয়ে পথে দেখতে পাবে না ; সিকি মাইলও রেলগাড়ি নেই সমস্ত দেশে। নির্ভেজাল প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী হেন দেশ দেখাও দিকি কোথায় আর একটি আছে!

ঘেউ-ঘেউ কুকুর ডেকে উঠল। বাঘের মতন এক কুকুর তেড়ে আসছে গাড়ির দিকে। নির্মানুষ পুরীর সতর্ক পাহারাদার। যেন হাঁক দিচ্ছে—এগিও না, এক ইঞ্চিও আর নয়, ফিরে চলে যাও।

অবশেষে বিশাল অট্টালিকার চত্বরে এসে পৌঁছানো গেল। বড় বড় কক্ষ, মোটা মোটা থাম। সে কী জ্যোৎস্না, যেন দিনমান! ফুল ফুটে আছে চৌ-দিকে। জায়গা একটা বাছাই হয়েছিল বটে—কাবুল শহর এবং পাহাড়ে-ঘেরা সমগ্র উপত্যকা পরিষ্কার নজরে আসে এখান থেকে। কিন্তু হলে কি হবে, জ্যোৎস্নালোকে মনে হচ্ছে, বিশাল এক গোরস্থান।

মানুষের জন্য চেঁচামেচি করছি, আছ কে এখানে? দেয়ালগুলো গমগম করে ; প্রতিধ্বনি আহ্বান ফেরত দেয়, কে আছ?

ফটক খোলা। দলসুদ্ধ উঠে পড়লাম। ঘুরে ঘুরে দেখছি। তখন দেখি, টাটকা ফুলের তোড়া নিয়ে একটা লোক এগিয়ে আসছে। বাড়ির প্রহরী— থাকে বাগানের ভিতরে কোন অলক্ষ্য কুটিরে কি কোথায়, বলতে পারি নে। লোক দেখে হয়তো বা তাড়াতাড়ি ফুল তুলে তোড়া বাঁধতে বসেছিল। কিঞ্চিৎ দক্ষিণার আকাঙক্ষা।

উপহারের ফুল·হাতে নিয়ে উপর-নিচে চতুর্দিকে চক্কোর দিয়ে এলাম। রূপকথায় যেমন শুনি— পাতালপুরীর রাক্ষসে-খাওয়া এক রাজবাড়ি। লাখ লাখ টাকার এমন প্রাসাদ বিলকুল খালি পড়ে আছে— যাহোক একটা সরকারি অফিসও তো বসানো যেত।…কি বস্তু এটা ? কিনা, প্রাসাদের আবহাওয়া-নিয়ন্ত্রণের জন্য লক্ষাধিক খরচ করে আমানউল্লা ইউরোপ থেকে যন্ত্রপাতি আনিয়েছিলেন। ঐ অভিশপ্ত জিনিস ছুঁতে যাচ্ছে কে বলুন। যে মায়া দেখাতে যাবে, তারও যদি আমানউল্লার দশা হয়। বছরের পর বছর আলগা পড়ে থেকে অত দামের জিনিস এখন অকেজো লোহার আণ্ডিল।

নেমে আসছি। পায়ে হেঁটে নামছি। জীপগাড়ি পিছনে থেমে থেমে আসছে। বাঁক ঘুরতে না ঘুরতে সেই কুকুর। ক্ষেপে গেছে, গায়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে বুঝি। নিশিরাত্রে নির্জন পাথরের কন্দরে কন্দরে কুকুরের ডাক প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। না গো, গতিক ভাল নয়। জীপে উঠে পড়ো— ধুলোয় ধুলোয় জ্যোৎস্না অন্ধকার করে পালিয়ে চলো কাবুল শহরে।

সকাল ৯-২০। গটমট করে প্লেনে উঠে পড়লাম। মাল-মানুষ কিছুই ওজন হল না, কাস্টমস বাক্সপেঁটরায় হাতই ছোঁয়াল না মোটে। রুশ এয়ারশিপ কাল দুপুর থেকে পাখনা মেলে বসে আছে আমাদের ছোঁ মেরে নিয়ে মস্কোয় পৌঁছে দেবার জন্য। ক্যাপ্টেন এসে মাঝের সিটে বসে পড়ল। কেমনধারা ক্যাপ্টেন হে — চড়ন্দারের মধ্যে এসে আড্ডা জমায়? কথা বোঝে না বলে দোভাষি একটাকে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে এলো। এয়ার-হোস্টেসও এসে দাঁড়িয়েছে — কমবয়সি মেয়ে, গাঁট্টাগোট্টা চেহারা, থোপা থোপা চুল ছড়িয়ে পড়েছে মুখখানা ঘিরে। মোটা মোটা দাঁত, হাসলে তবু কিন্তু মন্দ দেখায় না। হাসছেই তো অবিরত। হিন্দুকুশ ডিঙিয়ে যাব, জানেন — পনের হাজার ফুট উপর দিয়ে। সিটের পাশে পাশে নল গিয়েছে, অক্সিজেন সরবরাহ হবে। শুধু-নাকে নিশ্বাস নিতে পারবেন না অত উঁচুতে।

তার পরে সময় হয়ে গেল তো ক্যাপ্টেন সাঁ করে ইঞ্জিনঘরে ঢুকে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে গর্জন, এবং চক্ষের পলকে মালুম হল উঠে পড়েছি আকাশে। পায়-তারা কষল না গ্যাংওয়ের উপর; দু-কানে আমাদের তুলো ঠাসতে হল না, কোমরে বেল্ট আঁটতেও বলল না। হাতড়ে দেখি, বেল্টই নেই আদপে সিটের সঙ্গে। আকাশে ওড়া ওরা একেবারে ডাল-ভাতের সামিল করে ফেলেছে। প্লেনে চড়া আর ট্রামে চড়া একই কথা। যেমন-তেমন সিটের উপর খোপানো ওয়াড় পরিয়ে দিয়েছে। আমরা নেমে গেলে, ওয়াড়ও বদলে দেবে। যে প্লেনে যখনই উঠেছি, সদ্য পাট-ভাঙা এমনি সাদা ওয়াড়। আগে কত কত জাঁদরেল প্লেনে ঘোরাঘুরি করেছেন, লাউঞ্জে তাস পিটেছেন, ঘুমিয়েছেন আরামসে টানটান হয়ে, লিখবার বাসনা হল তো টেবিল বেরিয়ে এলো সামনের সিটের কানাচ থেকে। সে স্ফূর্তি এদের দেশে পাবেন না। এমন কি, পাকা আমের মতো টুপ করে ভুঁয়ে পড়ে লহমার মধ্যে ভবযন্ত্রণা থেকে মুক্তি নেবেন, সে সুখটুকুও এরা হতে দেবে না। পাঁচ বছরেও একটা আকাশ-দুর্ঘটনা

হয় না — বলুন দিকি, অঙ্ক কষার মতো এমন ধারা নির্গোল ভ্রমণে সুখ আছে ?

যাকগে, দুঃখ-সুখের কথা পরে ভাবা যাবে — অধোলোকে তাকান কাচের জানলা দিয়ে। কাত হয়ে চলেছি তো চলেছি — তামাম দুনিয়া কাত হয়ে আছে। গোটা কাবুল শহরটা ছোট্ট এতটুকু — টেবিলের উপর যেন একটা মডেল-শহর বানানো।

তার পরে হিন্দুকুশ। ছোট বয়স থেকে ইতিহাসে ভূগোলে কত এর নাম শুনেছি, আজকে আমি চললাম সেই হিন্দু-পাহাড়ের মাথা ডিঙিয়ে। নিচু হয়ে দেখতে দেখতে যাচ্ছি। প্লেনের গা বেয়ে যে লম্বা নল চলেছে, সেই পথে অক্সিজেন পাঠাচ্ছে। গ্যাসমাস্ক পরে কিম্ভূত-কিমাকার সেজেছি প্রতি জন, কেউ বাদ নেই। আয়না না থাকায় নিজের দিকে দৃষ্টি পড়ছে না, হেসে খুন হচ্ছি অন্য সকলের চেহারা দেখে। হঠাৎ আর এক ছবি মনে এলো, হাসি শুকিয়ে গেল। অনেক দিনের ঘটনা। ভুবনভরা এত বাতাস — আমার দু-বছুরে মেয়ে হাসফাস করছে একটুকু নিশ্বাস নেবার জন্যে। অক্সিজেন-সিলিণ্ডার খুলে ধরেছে, তবু কাজে এলো না। ধীরে ধীরে নিস্পন্দ হয়ে গেল। কত দিনের কথা। একেবারে ভুলে গিয়েছি, এই ধারণা ছিল। আজকে হিন্দুকুশের চূড়ার উপর মহাব্যোমে ঘুরছি — যেখানে শুনতে পাই, নিরালম্ব আত্মারা ভেসে ভেসে বেড়ায় বায়ুভূত হয়ে। আমি সেই নিষ্পাপ দুটি শিশু-চক্ষের করুণ আকুতি দেখতে পেলাম। লিখতে লিখতে স্তব্ধ হয়ে রইলাম কতক্ষণ।

একবার খেয়াল হল, দেখাই যাক না কি ঘটে মুখোস খুলে ফেললে। একটু তুলে ধরেছি — বাপরে বাপ, সঙ্গে সঙ্গে বনবন করে মাথার মধ্যে পাক দিয়ে উঠল। কাজ নেই বীরত্ব দেখিয়ে। বিশাল কঠিন কালো পাহাড় — মনে হচ্ছে, প্লেন গরুর গাড়ি হয়ে পাথরের উপর গড়িয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে ; ময়দা অথবা চুনের গুঁড়ো ছড়িয়ে দিয়েছে পাথরের উপর। তার পরে শুধুই ময়দা — পাথর বিলকুল ঢাকা পড়ে গেছে, ময়দার পাহাড়। আর দেখতে পাচ্ছি, কুণ্ডলী পাকিয়ে ধোঁয়া ধেয়ে আসছে আমাদের দিকে। ফগ। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কোন-কিছুই নেই — শুধু ধোঁয়া আর ধোঁয়া।

তার পরে এক সময় দেখলাম, ধোঁয়া কেটে গেছে — প্লেন আমাদের জাহাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। দুধ-সাগরের উপর দিয়ে হেলতে দুলতে চলেছি। মাটির উপরের সামান্য জীব সপ্ত-সমুদ্রের মধ্যে সব চেয়ে ওঁছা লবণ-সমুদ্রটাই শুধু দেখে থাকেন, আমরা আকাশের উপরের রকমারি সমুদ্র দেখে এসেছি। আচ্ছা,

হল তাই — সাগর নয়, ধবধবে সাদা মেঘ। কিন্তু মেঘে ঢেউ ওঠে, ঢেউ ভেঙে ভেঙে পড়ে, — তবে আর সাগর বলায় দোষ হয়েছে কি !

দিগন্ত-সীমায় নীল রং। দুধ-সাগর পাড়ি দিয়ে এ বুঝি আর এক রাজ্যে পড়লাম। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তালগোল পাকিয়ে ছিল এতক্ষণ, মাটি ও আকাশ আবার আলাদা হচ্ছে। মাটির উপর কালো আর বাদামি পাহাড়, চূড়ায় চূড়ায় সাদা মেঘ। হিন্দুকুশ বোধ করি পার হয়ে এলাম — অন্তত হিন্দুকুশের যে এলাকায় বারো মাস তিরিশ দিন বরফ জমে থাকে। মাস্ক খুলে ফেললাম। ও-রকম আষ্টেপৃষ্ঠে আবদ্ধ হয়ে লেখা মুশকিল। লেখা তবু ছাড়িনি। উপরে উঠলে মন নাকি উদার হয়ে যায়। আমার কই সে সব কোথায় ? ফিরে এসে আপনাদের হাড় জ্বালাতে হবে — আকাশের মেঘ আর পদতলের তুষারের মধ্য থেকে তারই তো মশলা কুড়িয়ে এনেছি।

পাহাড় আর কালো নেই, গেরুয়া রং নিয়েছে। উঁচু পাহাড়ের মাঝখানে মালভূমি। বালুমরুতে এসে যাচ্ছি। পথ পড়েছে বালুর মধ্য দিয়ে — আঁকাবাঁকা, উঁচুনিচু। এয়ারহোস্টেস মেয়েটা গ্যাসমাস্কগুলো গোছগাছ করে তুলছে — কি গো, পথ নয় ঐ নিচে ? তাই। কাবুল আর তাব্রিজের যোজক। এই পথে বাসে গিয়েছেন কেউ কেউ — ঘন্টা দশ-বারো লাগে, বিশ্রী রাস্তা। ঝাঁকুনির চোটে দেহের কলকব্জা খুলে যায়, হাত-পা ধড়-মুণ্ডু আলাদা হয়ে পড়ে। একটা-দুটো দিন তাব্রিজে থেকে ইস্ক্রুপ এঁটে সেরে-সুরে নিতে হয়। হিন্দুকুশের গিরিসঙ্কটে ক্যারাভানের পায়ে পায়ে অনেক শতাব্দী ধরে পথ পড়েছে। দিল্লি থেকে কানাঘুষো শুনেছিলাম আমরাও ঐ পথের পথিক হব। কিন্তু ভাগ্যে ভর সইল না, আগে ভাগে প্লেন এসে আকাশের পথ খুলে দিয়েছে।

হিন্দুকুশ ছেড়ে এসেছি, কিন্তু পাহাড় ছাড়ে নি এখনো। মনে হচ্ছে কি জানেন — মরুর ভিতর এই টুকরো টুকরো পাহাড় একটু আগে ছিল না, বিদায় দেবার সময় সঙ্গে সঙ্গে এগোচ্ছে, আমরা আর খানিক এগিয়ে গেলে পাহাড় ফিরে গিয়ে হিন্দুকুশের আস্তানার মধ্যে আবার মাথা ঢোকাবে। পাহাড়ের এখানে-ওখানে খুবলে খুবলে খেয়েছে কিসে। সত্যি তাই — জন্তু-জানোয়ার নয়, খেয়েছে মরুবালুকায়। নিঃসীম মরু আরম্ভ হল এবার। দিনরাত্রি নির্বাধ বাতাসে পাহাড়ের উপর বালির ঝাপটা এসে পড়ে, বালির ধারে পাহাড় ক্ষয়ে গেছে। তার পরে দেখছি, বালি পড়ে পড়ে পাহাড়ের অনেকখানি চাপা পড়েছে। শেষে পুরোপুরি বালু-ঢাকা পাহাড়। এক-একটা ওরই মধ্যে বিদ্রোহ করে মাথা নাড়া দিয়েছে বুঝি — সমুন্নত দেওদারের মতো কালো গিরিশিখর

মরুভূমি পাহারা দিচ্ছে। বালু আর বালু — রুক্ষ, ধূসর, অন্তহীন। বিক্ষুব্ধ বিশাল সমুদ্র মুনির অভিশাপে যেন মরু হয়েছে — ঢেউগুলো, আহা, স্তম্ভিত হয়ে রয়েছে — ঢেউ জলের নয়, বালির। মাঝে মাঝে হঠাৎ ওয়েসিস দেখি, নয়ন জুড়িয়ে যায়। ধূসরতার মধ্যে খানিকটা ভিজে ভিজে জায়গা, খাবলা খাবলা সবুজ। ঘরবাড়ি ক্ষেতখামার ঐ জায়গাটুকুতে। বালুকার মহাসমুদ্রে টুকরো টুকরো দ্বীপ।

প্রেমচাঁদ গণ্ডা বিশেক রুশ-কথার সম্বলে এয়ার-হোস্টেস মেয়েটার সঙ্গে দিব্যি জমিয়ে নিয়েছেন। এই মূর্খের মরুভূমিতে মেয়েটাও যেন একটা ওয়েসিস পেয়েছে। খুব চোখ-মুখ নেড়ে কথাবার্তা বলছে, হাসছে। খন্তা-কোদাল দাঁত সত্ত্বেও হাসিটুকু খাসা। পাঁচ টাকার নোটখানা প্রেমচাঁদের হাত থেকে নিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছে। আনি-দুআনিও বেরুল কয়েকটা। সে ক'টা আর ফেরত দেয় না — উল্টে-পাল্টে নানান ভাবে দেখে বিশাল পকেটের খোলে ফেলে দিল। হিন্দি বই একটা আবিষ্কার হল প্লেনের বইয়ের গাদার ভিতর। ভারতীয়েরা যাবে বলেই হয়তো নমুনা রেখে দিয়েছে। আনি-দুআনিগুলো পকেটস্থ করে এবারে হিন্দি শিখবার মনন হল। প্রেমচাঁদের কাছে পাঠ নিচ্ছে। যত না পড়ে হাসে তার বিশগুণ।

বিশাল জলাভূমি — প্লেন অনেকখানি নিচু দিয়ে যাচ্ছে, নদী বলে মালুম হচ্ছে। সুদীর্ঘ সুনীল জলধারা এক দিগন্ত থেকে আরেক দিগন্ত অবধি প্রসারিত। জায়গাটার উপর এসে দেখি, হায়রে, কোথায় কি — গৈরিক বালুভূমি, নদীজল ঐ অনেক দূর এগিয়ে গিয়ে চিকচিক করে দাঁত মেলে হাসছে। মরীচিকা — প্লেন মরীচিকার পিছু নিয়েছে। মরু-পথিকের মতোই, কে জানে, কোন এক সময় শঙ্কায় ক্লান্তিতে মুখ থুবড়ে পড়বে কিনা মাটির উপর।

অবশেষে সত্য সত্যই পালে বাঘ পড়িল। ফাঁকি নয়, সত্যিই নদী। আমুদরিয়া — যার জন্য এতক্ষণ তাক করে আছি। বালু-প্রান্তরে পথ হারানো এক শ্যামলা মেয়ে এঁকে-বেঁকে চলছে।

ওপারে সোবিয়েত এলাকার শুরু। সীমানার ঘাঁটিতে প্লেন নামবে — জোর কমিয়ে দিয়েছে তাই, নিচু হয়ে চলছে। নদীর মাঝ বরাবর এসে ঘাড় বেঁকিয়ে একবার এপারে একবার ওপারে তাকাই। নদী খুব বড় বলে মনে হয় না, কিন্তু দুই পারের ব্যবধান আকাশ ও পাতালের। সারবন্দি স্টিমার নোঙর ফেলে আলস্যে ধোঁয়া ছাড়ছে ওপারের ঘাটে ; মাল তুলছে। জল কাটিয়ে ছুটোছুটি করছেও কয়েকটা। আমুদরিয়ার ধারে ধারে গুটগুট করে কেমন রেলগাড়ি চলেছে। আর ও পারে কাল রাত্রে দেখলেন তো — রেলের পাটি ও

কামরাগুলো ইচ্ছে করে পয়মাল করছে। প্লেন আরও নিচু হল — দালান-কোঠা, চোখজুড়ানো সবুজ ক্ষেত, গাছপালা। আর আফগানিস্তানের পারে দেখুন তাকিয়ে, রুক্ষ ধূসর দিগব্যাপ্ত মরু ক্রোশের পর ক্রোশ আতপ্ত তৃষ্ণায় হা-হা করছে। সারা দিনমান রোদে ঝলসায়, সারা রাত্রি হিমে হি-হি করে। অথচ একই ভূমিপ্রকৃতি — এপার-ওপারের এককালে অবিকল এক চেহারা ছিল। দেখে প্রত্যয় হবে না, মনে হবে গালগল্প ছাড়ছে।

সোবিয়েত এলাকায় ঢুকে পড়েছি। পা ছোঁয়াব এখুনি ; সীমান্তের বিমান-ঘাঁটিতে নামছি। উঃ, সত্যি সত্যি এলাম তবে! তেরমেস। নিতান্তই সাদামাঠা জায়গা — গ্যাংওয়েটুকুও পাকা গাঁথনির নয়। চিকচিকে বালুর উপরে নামিয়ে দিল।

দরজা খুলতেই গ্যাটম্যাট করে জন তিন-চার ঢুকে পড়ল। চেহারা কী — মানুষ নয়, আস্ত দৈত্য। একটি বোধ হয় হাত ছয়েক লম্বা, চওড়াও তদনুপাতে। দুটো বড় সাইজের মর্তমান কলার মতো চুমরানো আধ-পাকা গোঁফ ঠোঁটের দু-দিকে। এসেছে পাশপোর্ট পরখ করতে, ফাঁকিঝুকি দিয়ে নেমে পড়তে না পার। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার — হুঙ্কার নয়, মুখভরা হাসি। হাসি ও-মুখের জন্য নয়, ও-বস্তু মোটে মানাচ্ছে না। হলে হবে কি — হাসতে হাসতে আমাদের নেমে পড়বার ইশারা করল।

মরুভূমি ধু-ধু করছে, মাঝখানে একটুকু এক জনালয়। চতুর্দিক তাকিয়ে দেখি, ঝুপসি-ঝুপসি গুল্ম আর আধ-শুকনো লম্বা ঘাস। রাজপুতানায় ট্রেনে যেতে যেতে যেমন দেখতে পান।

আহা, কত ফুল ফুটেছে! রং-বেরঙের বাহারের ফুল — তারই মাঝখান দিয়ে পথ। পথ শেষ হল টানা-লম্বা খানকয়েক পাকা ঘর অবধি গিয়ে। নতুন আনকোরা। অফিস ওয়েটিংরুম রেস্তোরাঁ — যা কিছু চান, সমস্ত ঐ। খোপে খোপে ভাগ করা। বারাণ্ডায় উঠে দেখি, আরও আছে — একটু হাস-পাতালও। ডাক্তার নার্স ওষুধপত্র গোটা দুই-তিন বেড — ঠিক যেমনটা হতে হয়।

সিঁড়ির মুখে নার্স-ডাক্তার যন্ত্রপাতি সহ লোলুপ চোখে তাকাচ্ছে। একটু ঢিলে ভাব দেখিয়েছেন কি বগলদাবায় পুরে নিয়ে তৎক্ষণাৎ বিছানায় শোওয়াবে। অত উঁচু হিন্দুকুশের চূড়ার উপর দিয়ে এলেন — হৃৎপিণ্ডে বা আর কোন যন্ত্রে কিঞ্চিৎ আক্ষেপ হওয়া তো উচিত, সেই প্রত্যাশায় আছে ওরা।' কিন্তু বীর পদদাপে উঠে যাচ্ছি আমরা — ষোল জনের মধ্যে কারো একটু ধুকপুকানি

নেই। শিকার না পেয়ে পরম মর্মাহত ডাক্তার-নার্স অতএব নিজ নিজ বিবরে ফিরল।

দুপুর হয়ে এলো, কিন্তু দুপুরের খাওয়া খাবেন অপরাহ্নে তাসখন্দে গিয়ে। প্রাতরাশ এখানটায় সেরে নিন। মরুভূমি জায়গা — দরজা-জানলায় ডবল কাচ লাগানো। দৈবগতিকে একটা ভেঙেচুরে গেলেও আর একটা রইল। বালি আর গরম হাওয়া না ঢুকতে পারে। খাওয়ার জিনিসপত্র দূর-দূরান্তর থেকে আনতে হয়। টিনের মাছ খাওয়াল — খাসা। লাল পাউরুটি, চিজ — চমৎকার। মাখন — অতুলন। সসেজ — উপাদেয় স্বাদ। কোন কোন মশলায় বানানো হে? আরে ছ্যা, উনিশ শ' চুয়ান্নয় এমন ব্যক্তিও পথে বেরোন — সসেজ বস্তুটা থোড় জাতীয় তরকারি বলে যিনি জেনেবুঝে আছেন। হাঁ-হাঁ করে সায় দিয়েছি ক'জনে, চেখে চেখে উনি তারিফ করে খাচ্ছেন — কে যেন এমনি সময় বলল, শুয়োরের মাংসে চর্বি বেশি বলেই স্বাদ এত চমৎকার। তখন তাজ্জব অবস্থা — গিলতে পারেন না, আবার এত লোকের মধ্যে থু-থু করে ফেলেন বা কোন লজ্জায়?

হেনকালে প্লেটভরতি ক্যাভিয়ার এলো। টেবিলের সব চেয়ে উপাদেয় পদ। বিপ্লবের পর তামাম দুনিয়া রুশকে বয়কট করল, রুশের এই ক্যাভিয়ার শুধু বাদ দিয়ে। যথারীতি তার ব্যাপারবাণিজ্য চলে। যে ভোজে ক্যাভিয়ার নেই, সে ভোজের কৌলিন্য কেউ মানে না। সেই বস্তু পাতের কোলে নিয়ে এসেছে। মাছের ডিম — লালচে রঙের। কালো রঙেরও দেখেছি। ক্যাস্পিয়ান সাগর থেকে মণিমুক্তার মতন তোলে। মণিমুক্তারই তুল্য মূল্য দেয় এরা — শত কণ্ঠে যে রকম ব্যাখ্যান করছে। বড় চামচের পাক্কা দুটো তুলে নিলাম — ফুরিয়ে গেলে, কি জানি, আর হয়তো নিয়ে আসবে না — মনে তখন ক্ষোভ থেকে যাবে। লোভে পড়ে মুখ ভরতি করে নিয়েছি — তার পরে অবিকল সেই ভদ্রলোকের সসেজ ভক্ষণের ব্যাপার। ক্যাভিয়ার খেতে খেতে সাহেবলোকেরা নাকি সপ্তম স্বর্গে ওঠে — আমার কাছে কিন্তু শুধু মাত্র মাছের পচা ডিম, আঁশটে গন্ধ। ভীত হয়ে উঠেছি, শারীরিক প্রক্রিয়া বিশেষে খানা-টেবিলের যাবতীয় বস্তু এবং সকলের খাওয়া নষ্ট করে না দিই। সারা সোবিয়েতে ঐ বস্তু তার পর বহুবার টেবিলে দেখা দিয়েছে। কত অনুরোধ-উপরোধ! আহা, দেখুন না চেখে। সখেদে নিশ্বাস ছেড়েছি: লোভ তো হচ্ছে ভাই, কিন্তু বোকার মতন আগেই যে পেট ভরতি করে ফেলেছি, দাঁতে কাটবারও শক্তি নেই। আর কাণ্ড শুনুন — ফিরে এসে এবার কলকাতা শহরের এক উগ্র-আধুনিক ভোজেও ঐ ক্যাভিয়ারের সাক্ষাৎ পেলাম। বিস্তর মূল্যে টিনে ভরতি

হয়ে এসেছে। আমি একেবারে আদিস্থান ঘুরে এসেছি, খেয়ে খেয়ে অরুচি ধরে গেছে — এইটাই সকলে ধরে নিল। তাই বেঁচে গেলাম। কয়েকটি ভদ্রসন্তান খাচ্ছেন, এবং আনন্দে যেন গলে গলে পড়ছেন। শক্তি ধরেন বটে ওঁরা। কায়ক্লেশে গলাধঃকরণ মাত্র নয়, সেই সঙ্গে স্ফূর্তিও দেখানো।

যাকগে, যাকগে। খানাপিনা অন্তে সিগারেট ধরিয়ে এরোড্রোমের প্রান্তে মাঠের ধারে গিয়ে দাঁড়ালাম (বেঢপ লম্বা সিগারেট — আমাদের দেড়গুণ তো হবেই। অর্ধেকটা ফাঁকা — কাগজের নল মাত্র, ঐ পথে ধোঁয়া এসে কণ্ঠনালীতে ঢোকে)। একটুখানি ঘুরে ফিরে দেখবার ইচ্ছা, কিন্তু সাহসে কুলাচ্ছে না। শুনতে পাই, লৌহ-যবনিকার দেশ — যেটুকু সদয় হয়ে দেখাবে, তাই সকলে দেখেশুনে যায়। নিজের ইচ্ছেয় কোথাও গিয়েছ কি ক্যাঁক করে টুঁটি ধরবে। আজ্ঞে হ্যাঁ, এমনি ভয়াবহ বৃত্তান্ত আপনারা শুনেছেন, আমিও শুনেছি। ভয়ে ভয়ে তাই এগুচ্ছি — এক পা বাড়াই, এদিক-ওদিক তাকাই। কারো দৃকপাত নেই। তখন পুরোপুরি সীমানার বাইরে এলাম। বিস্তর হেলিকপ্টার ত্রিপল দিয়ে ঢাকা। কয়েকটা সৈন্যও দেখলাম। আমি একটা মানুষ চতুর্দিক ঘুরে ঘুরে পাদচারণ করছি, কেউ তারা আমলে আনল না। মাইলের পর মাইল ক্যাকটাস জাতীয় গুল্ম। দোভাষি পাকড়ানো গেল একটা। সে বলে, সমস্ত আর্জানো মশায়। বিস্তর ঝঞ্ঝাট। আগে গবেষণা করে দেখা হল, কোন গাছ হতে পারে এই সব জায়গায়। এবং কি কায়দায় তার চাষ হবে। গাছে দেখুন শুধুই কাঁটা — ফুল নেই, ফল ধরবে না, দেখতেও সুন্দর নয়। পুড়িয়ে দেওয়া হয় এগুলো। সেই ছাইয়ের উপর আবার চাষ হয়, আবার পোড়ায়। বন্ধ্যাত্ব মুছে যায় এমনি ভাবে, জমি ক্রমশ ফসল ফলাতে শেখে। তার নমুনা ঐ এদিকে-সেদিকে সবুজ ক্ষেতের টুকরো আর সারবন্দি গাছপালা। গাছগুলো পাহারাদার — সীমানা পাহারা দিচ্ছে, মরুভূমি বালু উড়িয়ে এনে ঘাঁটির মধ্যে চুপিসাড়ে না ঢোকে।

নদীর ধারে ফ্যাক্টরির সুদীর্ঘ চোঙে ধোঁয়া উঠছে। কিম্বা হুশ-হুশ করে উড়ছে যেন মরুবিজয়ের কেতন।

একজন ওদিকে আচ্ছা জমিয়ে নিয়েছেন। বারাণ্ডায় সারি সারি বেঞ্চি, নানান ধরনের লোক বসে দাঁড়িয়ে। এরোড্রোমের কর্মী প্রায় সবাই — কেউ ড্রাইভার, কেউ বা অন্য কিছু। বেশির ভাগ উজবেকি। তাতার আছে; রুশও দেখছি একটি। বেঞ্চির উপর চেপে বসে আমাদের মানুষটি পাশের লোকের হাত টেনে নিয়ে নিবিষ্ট ভাবে দেখতে লাগলেন। কাঁচা-পাকা দাড়ি লোকটার

— আমাদের গ্রাম্য চাষীদের মতন। জাতে উজবেকি, ধর্মে মুসলমান। কথা বোঝে না, কিন্তু কোরানের বয়েৎ বোঝে। রোজা রাখে, নমাজ পড়ে পাঁচ ওখত। মোরগকে আমরা বলি কুকড়া ; ওদের ভাষায় কুড়া।

তখন আর যাবে কোথা! ভারতের মানুষ যখন, করকোষ্ঠি মারণ-উচাটন ঝাড়ফুঁকে নিশ্চিত মহামহোপাধ্যায়। চারিদিকে ঘিরে ধরল তাঁকে। দোভাষিকে টেনেটুনে নিয়ে এলো — ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কি রায় দেন, জেনে বুঝে নিতে হবে তো! আমাদের মানুষটিও কল্পতরু হয়ে উঠেছেন, সুখসৌভাগ্য দেদার বিলোচ্ছেন। গ্রহের কুদৃষ্টি একেবারে যে নেই, তা নয় — সদয় হয়ে প্রতিষেধকও বাতলে দিচ্ছেন সঙ্গে সঙ্গে।

মক্কেলের ভিড় অতিরিক্ত হওয়ায় আর দু-এক জন আগুয়ান হলেন। এঁদেরও জমে উঠল। কমবয়সি এক মেয়ে — বিশ-বাইশ বয়স — এগিয়ে এল। হাসকুটে মেয়ে, হাসপাতালের কর্মী। ডাক্তার-নার্সের কাজে সোবিয়েতের মেয়েরা হু-হু করে ছেলেদের উৎখাত করে ফেলেছে। প্রায় একচেটিয়া করে তুলল। মেয়েটা এসে তো হাত বাড়িয়ে দিল। গণৎকার বললেন, তুমি যে শিল্পী! যে কাজই করো, শিল্পীর স্বভাব তোমার।

ঘাড় নেড়ে মেয়েটা স্বীকার করে, হাঁ —

দুই বিয়ের যোগ আছে দেখছি।

হেসে সে গড়িয়ে পড়ে, দু-দুটো — ওরে বাবা!

গণৎকার স্থিরদৃষ্টিতে মুখে তাকিয়ে বললেন, একটা ছেলের দিকে মন পড়েছে — মনস্থির করতে পারছ না তুমি।

ভালমন্দ এবারে কিছু বলে না মেয়েটা, গম্ভীর হয়ে থাকে।

বিয়ের দেরি আছে, অনেক বয়সে বিয়ে হবে তোমার।

মুখ শুকনো হল হাস্যমুখ মেয়েটার।

আমি রসভঙ্গ করি, আহা, কি সব হচ্ছে চলুন, চলুন — উঠে পড়তে হবে এবার।

বেলা পৌনে-একটা (ভারতের সময়)। প্লেন গর্জন করে উঠল। পাক দিয়ে আকাশে উঠছি। সবজিক্ষেত ঘরবাড়ি চাষ-করা কাঁটাবন গাছগাছালি ছাড়িয়ে আবার দিগব্যাপ্ত মরুভূমি। আমুদরিয়ার ধারে ধারে চলেছি।

চলেছি, চলেছি। শুধুই বালি, আর কিছু নয়। দেখে দেখে চোখ ক্লান্ত হয়ে পড়ছে, আর এখন বাইরে তাকাইনে। চাঞ্চল্যের এক ঢেউ এসে পড়ল হঠাৎ। এয়ারহোস্টেস বলে ওঠে, সমরখন্দ! পুরানো শহর সমরখন্দের

উপর দিয়ে উড়ছি। জানলায় জানলায় আমরা সকলগুলি প্রাণী। মধ্য-এশিয়ার গৌরবরণ মরু-প্রান্তরে শহরটাও একটি তিলের মতন দেখাচ্ছে উঁচু থেকে। প্রিয়তমার অধরের একটি তিলের লাগি' এমন একটা-দুটো শহর দান করতে মুশকিলটা কি তবে?

আবার নদী, বেশ বড়সড় আছেন। ইনি শিরদরিয়া। মরুর সঙ্গে জন্যালয় গলা-ধরাধরি করে চলেছে এখন। একটা জিনিস বেশি রকম নজরে আসছে —দীর্ঘ জ্যামিতিক রেখায় গোটা অঞ্চল ভাগ করা। চৌকো, তেকোণা — নানান রকমের ক্ষেত্র। যেন গোটা দেশখানা টেবিলের উপর ফেলে মানুষ ইচ্ছামতো খাল কেটে রেলগাড়ি বসিয়ে চিত্রবিচিত্র করেছে।

শিরদরিয়া চলেছে সঙ্গে সঙ্গে। এদিকে-সেদিকে ডালপালা বেরিয়ে গেছে। শেষটা মূল-নদী ছেড়ে একটা শাখার উপরে চলেছি। ডাইনে পাহাড়ের সারি। পাহাড়ের বিস্তর ঝরনা গড়িয়ে গড়িয়ে নদীতে পড়ছে। ঝিকমিক করছে, দশ-বিশ গণ্ডা আয়না ধরে আছে যেন চতুর্দিকে। খাল কেটে কেটে এই জল পৌঁছে দিচ্ছে দেশের অন্ধিসন্ধিতে, মরুভূমির মুঠো থেকে জায়গাজমি ছিনিয়ে নিয়ে মানুষ ফসল ফলাচ্ছে, বসত বানাচ্ছে। মরুর এখানে-সেখানে জনপদ ছড়ানো।

মুশকিল হয়েছে, এয়ারহোস্টেস মোটে ইংরেজি জানে না। কিছু জিজ্ঞাসা-বাদ করবেন কি গল্প জমাবেন — সে জো নেই। ওঁরা ক-জনে তেরমেসের সেই পুরানো ব্যবসা ধরলেন। প্রেমচাঁদ ক-গণ্ডা রুশ কথার সাহায্যে যথাসাধ্য বোঝাচ্ছেন। মেয়েটার ডানহাত মেলে ধরে হস্তরেখার পাঠোদ্ধার করছেন, দুই বিয়ে হবে তোমার। সে কিছু বলে না, বড় বড় চোখ মেলে চেয়ে রইল। বিয়ের দেরি আছে — একটিকে মনে ধরেছে, কিন্তু মনস্থির করতে পারছ না। খিল খিল করে মেয়েটা হাসিতে ফেটে পড়ল, হাসি থামে না কিছুতে। হাসি থামিয়ে শেষে বলে, বিয়ে হয়ে গেছে আমার। এক বাচ্চা আছে। বেকুব, কী বেকুব!

প্লেন কাত হয়েছে। নামছে। তাসখন্দে এসে পড়েছি যে। উজবেকিস্তানের রাজধানী — পুরানো জায়গা, বিস্তর নাম।

প্লেন থেকে নামতে ফুল দিয়ে অভ্যর্থনা। হাতে হাতে ফুলের তোড়া, নানান প্রতিষ্ঠান থেকে স্টেশনে এসেছে। খাসা এরোড্রোম, বিরাট গ্যাংওয়ে। বিস্তর প্লেন ওঠানামা করে। পরিচয়াদি শেষ করে সীমানার বাইরে এলাম। মোটরকার, মোটর-ট্রাক — গাড়িতে গাড়িতে ছয়লাপ। অথচ খাস-রাশিয়া নয়, উজবেকিস্তান। বছর তিরিশেক পিছিয়ে একবার উঁকি দিয়ে দেখুন — মধ্য-এশিয়ার অতি গরিব এক দেশ। উজবুক বলে বাংলায় এক গালি চলিত আছে জানেন তো, সেই থেকে সেদিনের বাসিন্দাদের অবস্থা বুঝে নিন। মরু ও স্তেপভূমি খা-খা করছে, তার মাঝখানে বিশাল ওয়েসিসের উপর শহর। সে কালের শহরের অল্প নমুনা এখনো দেখতে পাবেন। শহর আসলে দুটো — পুরানো আর নতুন। ভাল মতন জোড় পড়ে নি, চেহারার মধ্যে বিস্তর ফারাক।

হোটেলে পৌঁছানো গেল। বিরাট অট্টালিকা — ষাট বছর আগে বানানো। গোড়া থেকেই হোটেল এখানে। পুরানো দেয়াল-ছাতে হাল আমলের পলস্তারা পড়েছে; এখানে-ওখানে একটু বদল-সদল করে হাল-আমলের আরাম জুড়ে দেওয়া হয়েছে। এক বিপদ, কল-পায়খানার সংখ্যা অতিমাত্রায় কম। বিশ-পঁচিশ জনের ভাগে এক-একটা পড়েছে। গোটা মধ্য-এশিয়া জুড়ে এই দেখলাম। ওদের অসুবিধা হয় না। স্নান এক রকম বিলাসের বস্তু, এবং অপর শারীরিক ব্যাপার সম্পর্কেও ওরা নাকি অতিমাত্রায় মিতব্যয়ী। কিন্তু আমরা তো মারা পড়ি মশায়!

দোভাষিও কম দিয়েছে। দুটি মেয়ে — একটি এই উজবেকিস্তানের, হাসিয়ানা (পরে জানলাম, হাসিয়ানা বলে ডাকে বটে — বিশুদ্ধ নাম হাসিয়াৎ)। অন্যটি রুশ — মায়া। রুশ-মেয়েদের এমনি আধুনিক এদেশি নাম হরদম পাবেন। আমাদেরই দলে দুটি মেয়ে দোভাষি ছিল — মীরা আর ইরা।

কী রূপ হাসিয়ানার! বাইশ-চব্বিশ বছর বয়স। বাপের নাম বলল আবদুল বা ঐ গোছের কিছু। স্বাস্থ্যবতী লম্বা ছাঁদের মেয়ে, দুধে-আলতায়

মেশানো গায়ের রং, নাক-চোখ টানাটানা, কালো ভ্রূ, ঘন কালো মাথার চুল। এই মেয়েটাই শুধু নয়, এ তল্লাটের মেয়ে-পুরুষ সকলেরই প্রায় ভাল চেহারা। খাস-রাশিয়ার শ্লাভ জাতীয় মেয়ে বিস্তর নিরেশ এদের তুলনায়। গোলগাল মোটাসোটা — ঐ যেমন চাটুর উপর আটার তাল রেখে হাতের থাবড়া দিয়ে রুটি বানায় না, স্রষ্টকর্তা সেই প্রক্রিয়ায় বুঝি বানিয়েছেন। আর কোন শিল্পী যাবতীয় সুষমার মশলা দিয়ে বাটালি ধরে কুঁদে কুঁদে গড়ে তুলেছেন এদের প্রতিটিকে।

যাকগে, যাকগে, ব্যাঙ্কুয়েটে বসে গেছি। বিকাল চারটেয় মধ্যাহ্ন-ভোজন। আমাদের পাড়াগাঁয়ের মাধ্যাহ্নিক ক্রিয়ার নিমন্ত্রণে যেমনটা হয়ে থাকে। টেবিলে ঠাসাঠাসি, হলের মধ্যে পা ফেলা যাচ্ছে না — জায়গার তুলনায় মানুষ তবু বেশি। বিস্তর রকমের পদ, গুনতিতে আসে না। টিনের মাছ কাঁকড়ার তরকারি রকমারি মাংস ও শাক-সবজির পর সূপ এনে হাজির করল। তার পরে পোলাও — এই অঞ্চলের আদি বস্তু — খাঁটি ঘিয়ে বানানো, গন্ধ ভুরভুর করছে। কিন্তু তখন একেবারে উপায় নেই। এক চামচে নিয়ে নাড়াচাড়া করছি।

ধর্মের কথা উঠল। মুসলমান প্রায় সকলে। হাসিয়ানা পাশে বসেছে; সে হেসে বলে, নানান দিকে এত কাজ আমাদের যে ধর্মকর্মের সময় পাইনে। নবীন কালের এরা ধর্ম নিয়ে মাথা ঘামায় না। প্রবীণেরা রীতিনিয়ম মানেন — গোল টুপি মাথায়, মুখে দাড়ি, পরনে প্রাচীন পোশাক — পথে পার্কে এমন অনেককে দেখলাম। তাজিকিস্তানে এই দল আরও ভারী; জুম্মাবারে মসজিদে জায়গা পাওয়া দায়। পঁচিশ-ত্রিশের মধ্যে যাদের বয়স, অর্থাৎ বিপ্লবের পরে যারা জন্মেছে তাদের সাজ-সজ্জা রীতিনীতি পুরোপুরি আধুনিক ধাঁচের।

বিপদ শুনুন। খাওয়া-দাওয়া অন্তে কাপড় বদলাতে ঘরে গিয়েছি। যৎসামান্য দেরি হয়ে থাকবে — অর্থাৎ খানিক বা শয্যায় গড়িয়ে খানিক বা উঠে দাঁড়িয়ে তৈরি হচ্ছি — বেরিয়ে দেখি ভোঁ-ভাঁ, গাড়িগুলো আর সবাইকে নিয়ে শহরে চক্কোর দিতে বেরিয়ে গেছে। আমাদের একটু মুখের কথাও বলে গেল না।

চার জনে পড়ে আছি — আমি, জ্ঞান মজুমদার, ধীরেন সেন এবং পার্লামেন্টের মেম্বার হায়দরাবাদবাসী শ্রীযুত দাগে। নতুন জায়গা, কোথায় যাই কি করি — ওঁরা তো একেবারে অপেরা দেখে ফিরবেন রাত্রি এগারোটা-বারোটায়। ঘোর-ঘোর থাকতে পুনশ্চ উড়তে শুরু করব, — শূন্য হোটেলে বসে বসে হেলায় নষ্ট হচ্ছে সময়টুকু —

একজনে বলেন, বেড়ানো যাক একটু ঘুরে ফিরে — আর কি হবে?

নিচের তলায় হোটেলের অফিসে গেলাম। শতেক উপায়ে বোঝাতে চেষ্টা করি, কেউ ইংরেজি জানে না। গণ্ডা দেড়েক রুশ কথার সম্বল, তারই একটা ছাড়লাম — ডেলিগাৎসি। অর্থাৎ প্রতিনিধি দলের আমরা। তখনই কিঞ্চিৎ বুঝল, একজনে ছুটে বেরিয়ে অচিরে এক ইংরেজি-নবিশকে পাকড়াও করে নিয়ে এলো। তড়বড়িয়ে ইংরেজি বললেন তিনি খানিক — ইংরেজি শব্দ দু-পাঁচটা ছড়ানো আছে, কিন্তু আর যা-ই হোক ইংরেজ জাতির ভাষা সেটা নয়। আমার এই দেড় গণ্ডার সম্বলে হরদম যদি রাশিয়ান বলে যাই, যে বস্তু দাঁড়াবে তাই। কতকটা ভাষায় কতক বা মুখ-চোখ-হাত নেড়ে বোঝাবার চেষ্টা করা গেল। বুঝলেনও তিনি বিস্তর ধস্তাধস্তির পরে। দেখা যাক, কি করতে পারি।

দশ বিশ জায়গায় ফোন করলেন। গাড়িগুলো এখন কোন মহল্লায় ঘুরছে, পাত্তা মেলে না। বললেন, আলাদা একটা গাড়ির ব্যবস্থা হল ; এক্ষুনি এসে তোমাদের চারজনকে তুলে নেবে। দেখ, খুঁজে পেতে পাও যদি সাথীদের।

সারা শহর টহল দিচ্ছি, তারা কর্পূর হয়ে উবে গেল না কি ? এক জায়গায় দেখতে পাচ্ছি জনারণ্য। সড়ক বন্ধ হয়ে গেছে ; ট্রাফিক-পুলিশ ছুটোছুটি করছে — সামলাতে পারছে না। হয় কোন গুরুতর রকমের দুর্ঘটনা … আমাদের ড্রাইভার ঘাড় নেড়ে ইসারা করে, উঁহু — নেমে পড়ো। তোমাদেরই দল, গাড়ি দেখছ না ঐ যে !

তাই বটে। পার্কে নেমে পড়েছেন ওঁরা। মস্কোয় আছে বেড-স্কোয়ার, এর নামও তাই। অজস্র ডালিমগাছ — ফুল ফুটেছে, ফল ফলেছে। এই সমস্ত দেখছেন ওঁরা, আর শহরের অর্ধেক লোক সেখানে ভেঙে পড়েছে। আত্ম-প্রসাদ জাগে মনে মনে। দেশেঘরে আপনারা হেনস্তা করলে কি হবে, বাইরে এসে বুঝে নিন কি দরের মানুষ আমরা। সাংস্কৃতিক দল পৌঁছেছে, খবর বেরিয়ে গেছে কাগজে — কাজকর্ম ফেলে মানুষ পাগল হয়ে ভিড় জমাচ্ছে। প্রায় তো পাগলামির ব্যাপার — খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে আমাদের প্রতিজনকে, দেখে দেখে যেন আশ মেটে না। তা দেখুক, ভাষার আলাপ জমাতে পারছে না — চোখের দেখায় ভারত-সংস্কৃতির স্বাদ নিচ্ছে।

একটি মুখে হঠাৎ শুনতে পাই -- নার্গিস। চমক লাগে। দোভাষিকে কাছে ডেকে লোকটা কি-সব বলল। সপ্রশ্ন চোখে দোভাষির দিকে তাকাই। দোভাষি বলে, নার্গিস কে আছে তোমাদের মধ্যে তাই জিজ্ঞাসা করছে। অবস্থা মালুম হল তখন। খুঁজছে ওরা আমাদের নয় — ফিল্মের মানুষগুলোকে। ভারতের ছবি নিয়ে খুব হৈ-হৈ চলছে তখনও ; আওয়ারা ও দো-বিঘা জমি

জোরদার চলছে। ফিল্মের একটা দল তামাম সোবিয়েত দেশ চষে বেড়াচ্ছেন। কাগজে কাগজে তাঁদের ছবি ও খবরাখবর। ভারতের লোক দেখে আন্দাজ করেছে, সেই দলটি এসে পড়ল আজ তাসখন্দে। আন্দাজ অকারণ নয়। আমাদের নেতা মশায়ের শিরে রঙিন পাগড়ি, কণ্ঠে কাঁচা-পাকা দাড়ি, যে ওভারকোট পরেছেন তার কলারে ফারের বুনুনি; দাড়ি আর ফারে মিলেমিশে একশা হয়ে গেছে। বেঁটে মানুষ সকলের আগে আগে চলেছেন, সিনেমার মেক-আপ নিয়েই পথে বেরিয়ে পড়েছেন—আনাড়ি মানুষ মনে করে বসে। অতএব প্রশ্ন আসছে, রাজকাপুর কে তোমাদের মধ্যে? নার্গিস কোন জন.? রাজকাপুর বলে কাউকে দেখিয়ে দিয়ে পশার জমানো অসাধ্য নয়, কিন্তু নার্গিস …কে নার্গিস হতে পারেন, এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখি। দলের মধ্যে মহিলা আছেন বটে, কিন্তু ছবির নায়িকা হিসাবে চলে না। অতএব মানে মানে গাড়িতে ঢুকে পড়া ছাড়া গত্যন্তর দেখিনে। পালাবার সময় দোভাষি পরিচয়টা দিয়ে দিল—সিনেমার নয়, সাংস্কৃতিক দল এরা। গাড়ির সঙ্গে সঙ্গে তখন ছোটে। ছায়াবিহারীরা কায়া ধরে ঘুরছে, এই আন্দাজে এতক্ষণ দেখেছে; সংস্কৃতির পাঁচমিশেলি মানুষগুলোকে এবার আর এক চোখে একটু-খানি দেখতে চায়। গাড়ির বেগ কমাতে হল, ভিড় বাঁচিয়ে আস্তে আস্তে এগুচ্ছি। জনতার দিকে চেয়ে চেয়ে প্রসন্নতায় মন ভরে যায়। আহা, কী সব চেহারা! কুরূপ-কুৎসিত একটা নজরে পড়ে না। অপ্সরীর মতো এক পরমা রূপসী দেবশিশুর মতো কোলের বাচ্চাটার হাত বাড়িয়ে ধরলেন শেকহ্যাণ্ডের জন্য। গাড়ির জানলায় হাত বের করে সেই তুলতুলে হাত-টুকুন ছুঁয়ে দিলাম।

শহর চক্কোর দিচ্ছি। পুরানো শহর, নতুন শহর। পুরানো শহরে ছোট-খাট বাড়ি বিস্তর—আমাদেরই দেশের ধাঁচ। টিন ও খড়ে-ছাওয়া ঢালু ছাত, ছাতের উপরে মাটির লেপ দেওয়া, ধোঁয়া বেরুবার জন্য ছাত ফুঁড়ে একটু চিমনি বেরিয়ে এসেছে। নতুন শহরের একেবারে আলাদা চেহারা। পিচ-দেওয়া প্রশস্ত রাস্তা, বড় বড় দোকান, কংক্রিটে তৈরি আকাশ-ছোঁয়া ঝকঝকে বাড়ি। কার্ল মার্কস স্ট্রীট দিয়ে যাচ্ছি—তিন কামরার ট্রাম চলছে, আবার কলকাতার মতো দুটোও দেখছি। ফ্যাক্টরি অজস্র। খুব ব্যস্ততা চতুর্দিকে। আর একটু এগিয়ে তুলার গুদাম। তুলার গাঁইট সাজিয়ে সাজিয়ে পাহাড় করে রেখেছে। তুলা-অঞ্চল এটা—দেশ জুড়ে তুলার চাষ। এমন ফলন. আর কোথাও নেই। ফ্যাক্টরিও বেশির ভাগ তাই সূতা ও কাপড় বানানোর।

আগের আমলে এমন ছিল না, যে ক'টা ফ্যাক্টরি সমস্ত খাস রাশিয়ায়।

এশিয়ার মধ্যে নয়, পুরোপুরি য়ুরোপীয় তল্লাটে। চাষের তুলা চালান হয়ে যেত সেখানে। এ সব দেশ জারের জমিদারি, কাঁচা মাল জোগান দেবার জায়গা। আজকের আলাদা নীতি। কাঁচা মাল দূরদূরান্তরে বয়ে খরচ ও ঝামেলা বাড়ানো হবে না। যেখানকার মাল সেখানেই ফ্যাক্টরি বানিয়ে কাজে লাগাও।

আর চাষই বা কতটুকু হত সে আমলে! মাটি হাঁ করে থাকত এক ফোঁটা জলের পিপাসায়। অঞ্চলটার পুরানো নামও তাই — ক্ষুধার্ত স্তেপ (Hungry Steppes)। রিক্তভূমি খা-খা করছে, আমুদরিয়া-শিরদরিয়ার কিনারা ধরে সামান্য যা ফসল ফলে। আজকে দুই নদীর তাবৎ জলধারা মাঠে মাঠে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। শিরদরিয়ার তো এক বালতি জলও আর অকারণ বয়ে যেতে দিচ্ছে না। আমুদরিয়ার উপর লেগে গেছে এখন; আষ্টেপিষ্টে বাঁধ বেঁধে গোটা নদী মুঠোর ভিতর নিয়ে আসছে।

ফরহাদ হল শিরদরিয়ার উপর সব চেয়ে বড় জলবিদ্যুৎ-স্টেশন।

আরে সর্বনাশ, ফরহাদ কে জানেন না? উজবেকিস্তানের পুরানো প্রেমগাঁথা সিরিফরহাদ — ফরহাদ প্রেমিক, রূপসী সিরির সে প্রেমে পড়ল। সিরিও আকুল হয়ে ভালবাসে ফরহাদকে। তবু মিলন হয় না। জলের অভাবে ফসল হচ্ছে না, দেশ জুড়ে নিরন্নের হাহাকার। এর মধ্যে সিরি ভালবাসার নীড় বাঁধবে কোন লজ্জায়? ফরহাদ বাঁধ বাঁধতে গেল শিরদরিয়ায়। বাঁধ বেঁধে জলধারা নিয়ে আসবে ক্ষেতে ক্ষেতে, তৃষ্ণার্ত মাটির মুখে জল দেবে। হল না, দুর্বার শিরদরিয়া ভাসিয়ে নিয়ে গেল ফরহাদকে। এত কাল পরে ১৯৪৮ অব্দে দরিয়া বন্দী হয়েছে। নতুন কালের কত সিরি ঘরকন্না করছে এবার মনের সাধে।

অনেকক্ষণ থেকে তাগিদ দিচ্ছে, অপেরা-হাউসে যাওয়া যাক — দেরি হয়ে যাচ্ছে। কী ব্যস্তবাগীশ — আটটায় পালা আরম্ভ, সাতটাও বাজে নি, বলছে কিনা এখনই চলুন। শশধর মামার ট্রেন ধরা আর কি! বলতেন, বলা যায় না রে বাপু! আজকে যদি এক ঘন্টা আগেই গাড়ি এসে পড়ে। তার চেয়ে স্টেশনে গিয়ে নিশ্চিন্তে বসে বসে বিড়ি ফুঁকিগে।

ওরা বলছে, আজ্ঞে না — নিশ্চিন্ত বসবার সময় কোথা? পালা আরম্ভের আগে বাড়িটা দেখতে হবে। একটা ঘন্টায় নমো-নমো করেও তো হয়ে উঠবে না।

তাড়া খেয়ে গাড়ি পুরো দমে ছুটতে ছুটতে অপেরা-হাউসে এসে হাঁপাতে লাগল।

বাড়ির কাজ এখনো শেষ হয় নি, অলঙ্করণ চলছে দেয়ালে দেয়ালে।

উঠোনে মস্ত বড় ফোয়ারা — একশ ছাব্বিশটা মুখ। প্রকাণ্ড এক কার্পাসফল, খোলা ফেটে তুলো বেরিয়ে পড়েছে — জলধারা বেরিয়ে আসছে তার ভিতর থেকে। কার্পাসফলটা ক্ষেতের নয়; তিন-চার জনে বেড় দিয়ে ধরতে পারে না অত বড় ফল গাছে ফলে না তা ওরা চাষবাস নিয়ে যত দেমাকই করুক। পাথর কেটে বানানো। অপেরা-বাড়ি না ঢুকে চুপচাপ এই ফোয়ারার পাশে খানিকক্ষণ হাত-পা মেলে বসতে ইচ্ছে করছে। সময় কোথা ?

যা বলেছে — এক ঘন্টায় কিচ্ছু দেখা হয় না। বাড়িটা অনেক বেশি মজাদার অপেরার চেয়ে। ছাতে দেয়ালে অপরূপ কারুকর্ম ও ছবি। উজবেকিস্তানের ছটা বিশেষ অঞ্চলের নামে ছ'টা হল হয়েছে। নিচের তলায় ফরগনা হল ও তাসখন্দ হল। ফরগনা শ দুই মাইল এখান থেকে — সেই যেখান থেকে বাবর শা হিন্দুস্থানে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। দোতলার একদিকে বোখারা হল। অন্যদিকে সমরখন্দ হল। মাঝের সব চেয়ে বড় হলটা মানুষের নামে — আলি শের নবাই হল। আলি শের হলেন জাতীয় কবি, উজবেকি সাহিত্যের জনক ; নিজে উজির ছিলেন যদিচ, সাধারণ মানুষের হয়ে আমীর-ওমরাহদের সঙ্গে বিষম লড়াই লড়েছিলেন। তাঁর বিখ্যাত-বাণী — তুমি যদি মানুষ হও, যে জনমঙ্গলের জন্য কাজ করে না কক্ষনো তাকে মানুষ বলে খাতির কোরো না। পনের শতকের মাঝামাঝি জন্ম ; ১৯৪৮ অব্দে পাঁচ শ বছর পুরল, তাই নিয়ে জাঁকিয়ে উৎসব হয়ে গেল। সিনেমা-ছবি হয়েছে আলি শেরের জীবন নিয়ে। আর অপেরাবাড়ির এত বড় হল তাঁর নামে।

তেতলায় উঠে গেলাম। খিবা হল। পাশে তরমেস হল — সেই যে সকালবেলা যেখানে নামলাম। তরমেস জায়গাটা নিতান্ত অর্বাচীন নয়, জনপদের ঠাট আছে শ পাঁচেক বছর ধরে। এই হলদুটোর কাজকর্ম চলছে, এখনো, শেষ হবার দেরি আছে। কী কাণ্ড, কত অধ্যবসায় ও অর্থব্যয় — দেখে তাজ্জব হতে হয়। যে নামের হল, সেই অঞ্চলের শিল্প-রীতি তুলে ধরা হয়েছে ছাতে-দেয়ালে। পুরানো ইতিহাস ছবি করে আঁকা হয়েছে। সেকালের ব্যাপার শুধু নয়, নিতান্ত হাল আমলও বাদ পড়ে নি। অর্থাৎ অপেরা দেখতে এসে দেশভুঁইগুলোও ভাল করে জেনে বুঝে যাও। মস্কোর কৃষি-প্রদর্শনীতে মেট্রো-স্টেশনগুলোয় কি বিরাট কাণ্ড করেছে, স্বচক্ষে না দেখে তার আন্দাজ পাবেন না। দু-হাতে টাকা ঢেলেছে বললে কিছুই বলা হয় না ; আহার-নিদ্রা বাতিল করে দিয়ে সারাদিন ও সমস্ত রাত্রি টাকা ঢাললেও দু-খানা মাত্র হাত দিয়ে ক'টা টাকাই বা ঢালা যায় ? ওদের টাকা ওরা খরচ করে, চোখে দেখেই আমাদের বুক করকর করে। মেট্রো-স্টেশন নিয়ে একদিন কথা হয়েছিল — পান্নালাল-

পুরীর মধ্যে কোটি কোটি টাকা ঢেলে দিয়েছ, কি কাণ্ড! ওদের একজন বলল, টাকার এমন সার্থক খরচ আর হয়নি কোথাও। লাখ লাখ লোক রোজ ওঠানামা করে — তারা দেশভুঁইকে চিনছে, শিল্পরুচি গড়ে উঠছে তাদের ভিতর, সমগ্র সোবিয়েত-ভূমি নিয়ে ঐক্যচেতনা জাগছে ...

থাকগে, এ সমস্ত পরে আসছে। হলগুলো দেখে-শুনে তার পরে পালা দেখতে ঢুকলাম। উপর নিচে চতুর্দিকে হাততালি। কোন লাটবেলাটেরা এসে কৃতকৃতার্থ করল যেন। টিকিটের দাম শুনলাম দুই রুবল থেকে ষোল রুবল। এক রুবল হল একটাকা দুই আনার মতো, অতএব হিসাব করে নিন। রোজই কিছু না কিছু হয় এখানে — কোনদিন নাটক কোনদিন অপেরা কোনদিন বা নাচ। এই তল্লাটের তাবৎ লোক-নৃত্য দেখানো হয়। আজকে হচ্ছে পুশকিনের লেখা এক পালাগান, চেকবস্কি সুর দিয়েছেন। বড় ঘরের প্রেম — মান-অভিমান-দুঃখ-বেদনার পরে অবশেষে মিলন। গোটা পালাটা ছেঁকে ফেলে আপনি এক কাচচাও হিতোপদেশ পাবেন না, শিক্ষণীয় কিছুই নেই, নিছক রোমান্স। সেকেলে ধনীদের ঘরবাড়ি-বাগান। সিনসিনারি ভাল, তবে আহা-মরি কিছু নয় — আমাদের দেশেও দেখে থাকি এ রকম। আলোক-প্রক্ষেপণটা ভারি চমৎকার। দোতলা ও তেতলা থেকে কোণাকুণি আলো ফেলছে — নানা রঙের গোটা পনের আলো। কনসার্টই অপেরার প্রাণ — স্টেজের নিচে এবং সামনাসামনি প্রেক্ষাঘরের খানিকটা ঘিরে নিয়ে কনসার্টের জায়গা। ব্যাণ্ডমাস্টার বই দেখে দেখে নির্দেশ দিচ্ছে, বাজনার সঙ্গে নিখুঁত মিল রেখে অপেরার গান ও কাহিনী এগিয়ে যাচ্ছে।

সকলের সামনের সারিটা আমাদের জন্য রিজার্ভ করা। পর্দা ঠেলে এক শিল্পী বেরিয়ে এসে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন ভারতীয় অতিথিদের। ভারতের জয় হোক, ভারত সর্বসমৃদ্ধ হোক, ভারত ও সোবিয়েতের প্রীতি চির-জীবী হোক। তার পরে পালা শুরু। পাড়াগাঁয়ে বড়বাড়ির সংলগ্ন উঠান। বাঁশবন অদূরে — গান আসছে আড়াল থেকে। কাঠের টেবিলের ধারে বাড়ির গিন্নি উল বুনছেন — নায়িকার মা ইনি। নায়িকার দিদিমা অদূরে চাতালের উপর বসে। মা-দিদিমাও গান ধরলেন। অপেরার যা নিয়ম; কথাবার্তা হবে না — সবই গানে গানে বলবে। নেপথ্যের নায়িকা দেখা দিল অতঃপর — বাড়ির যুবতী মেয়ে। উঃ স্বাস্থ্য বটে — মন দুয়েকের ধাক্কা। আমাদের মা-লক্ষ্মীরা বলবেন, ওমা, মেয়ে কোথায় — মেয়ের ঠানদিদি যে। যেমন-তেমন নায়ক এ জায়গায় প্রেম জমাতে ভরসা পাবে না। শেষটা নায়ক এসে পড়ল — না, নায়িকার মাপসই বটে। মা-দিদিমা ঝি-চাকর চেহারার দিক দিয়ে

কেউ কম যান না। বিরামক্ষণে প্রেক্ষাঘরের দিকে ভাল করে তাকাই, জোয়ান মানুষ ও জোয়ান মেয়েমানুষের দেশ — রোগা, ডিগডিগে তো একটাও দেখছি নে।

এক একবার পর্দা পড়বার পর হাততালি। হাততালি শেষ হতে চায় না। সেখানেও ঐ গতিক। এ দেশের রেওয়াজই এই। প্রধান চরিত্রেরা বেরিয়ে এসে মাথা নিচু করে অভিনন্দন নেন।

রাত থাকতে রওনা — ঠিক চারটেয় হোটেল ছেড়ে বেরুব। শেষ অবধি অতএব থাকা চলল না, আধাআধি দেখে উঠে পড়লাম। প্লেনে মস্কো দশ বারো ঘন্টার পথ। শেষ রাতে উড়তে শুরু করে সন্ধ্যার কাছাকাছি পৌঁছব পথে কোন রকম বিভ্রাট যদি না ঘটে।

হোটেল অপেরা-হাউস থেকে বেশি দূর নয়। কাঁহাতক গাড়ির অপেক্ষায় থাকি, হেঁটে হেঁটে চলেছি। সঙ্গে হাসিয়ানা। হাসিয়ানা পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। রোমাঞ্চ লাগে। মধ্য-এশিয়ার মরুপ্রান্তরে রাত দুপুরে আজ জোরে হাওয়া দিয়েছে। কুয়াশাচ্ছন্ন আকাশে অস্পষ্ট চাঁদ। সুপ্রাচীন শহর বিদ্যুতের আলোয় নতুন সাজসজ্জায় ঝকমক করছে। তিন জন বাঙালি আমরা গরম কোট ওভারকোট মুড়ে পাথরের রাস্তায় জুতো বাজিয়ে চলেছি। ট্রাম-রাস্তা পার হয়ে এলাম, লোকজন খুব কম। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে তারা। সুন্দর মানুষগুলোর কালো কালো চোখের কৌতূহল-ভরা দৃষ্টি — কী ভাল যে লাগে!

হাসিয়ানা পুরোপুরি নতুন কালের। তরুণী মেয়ে নিশিরাত্রে কুণ্ঠাহীন পায়ে তিন বিদেশিকে কেমন পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে। আর এই শহরেরই এক ব্যাপার — প্রথম মহাযুদ্ধের আমলে। জারের লোক জবরদস্তি করে সকলকে লড়াইয়ে পাঠাচ্ছে। এক মা পাগল হয়ে রাস্তায় ছুটে এলো, কামানের মুখে ছেলে দেবে না সে — কিছুতে দেবে না। সকলে ঝাঁপিয়ে পড়ল সেই মায়ের উপর, মেরে তাকে শেষ করে ফেলল — জারের লোক নয়, ঐ মায়েরই প্রতিবেশী আত্মীয়জনেরা। জারের বিরুদ্ধে কথা বলেছে সেজন্যে নয়, জারকে তারাও খুব অপছন্দ করে। মুসলমান মেয়ে হয়ে বোরখা খুলে মুখ দেখাল — হোক না ছেলের মরণ-বাঁচনের ব্যাপার — মৃত্যু ছাড়া এত বড় পাপের শাস্তি নেই। এই তাসখন্দেই ঘটেছিল উনিশ শ ষোল সালে। চল্লিশটা বছরও পোরে নি।

আর শুনবেন? বর গিয়েছে বিদেশে। একা নারীর মন ফুঁপিয়ে উঠছে ঘরে — বরের কাছে পাঠিয়ে দিল এক গোছা খড় কিম্বা এক টুকরো কয়লা।

প্রিয়তম, আমি খড়ের মতো ফ্যাকাশে হয়ে গেছি তোমার বিরহে। অথবা কয়লার মতো কালো হয়ে গেছি প্রিয়তম। লিখতে জানে না তো — এই হল সেকালের মেয়েদের চিঠি। মা-দিদিমারা এমনি অবোলা ছিলেন, হাসি-য়ানাকে দেখে আজকে মানবেন এ-কথা ? বলবেন, লোকটা মিথ্যে বানিয়ে বলছে।

এক ঢোক চা খেয়ে শুয়ে পড়া যাক এবার। সকাল সকাল উঠতে হবে। চায়ের সঙ্গে এক ধরনের লম্বা বিস্কুট, খাসা লাগল। উঁহু, আব কিছু নয়। নিমন্ত্রণ তো রইল — আসতে হবে এই পথে, থেকে যেতে হবে কয়েকটা দিন। খেয়েদেয়ে সেই সময় তোমাদের সাধ মেটাব।

শেষ রাত্রি। তাসখন্দ শহর আলোর মালা পরে ঘুমুচ্ছে। আমাদের চারটে গাড়ি নিঃশব্দে এয়ারফিল্ডমুখো চলল। এখানকার সময় ভারতের আধ ঘন্টা এগিয়ে। ঘড়ি ঠিক করে নিই নি, একেবারে মস্কোয় পোঁছে কাঁটা ঘোরাব।

ঠিক পাঁচটায় প্লেন আকাশে উঠল। বড় গেটে ভিড় করে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে নেড়ে সবাই বিদায়-অভিনন্দন জানাচ্ছেন। উপর থেকে শহর আরও অপরূপ। ভূমিতলে তারা ছড়ানো। অগুন্তি তারা — শেষ নেই, সীমা নেই। কাত হচ্ছে প্লেন, সোজা হচ্ছে। পাক দিয়ে এসে পড়ল শহরের ঠিক মাথার উপর যেন ইতিহাসের এক সেরা সুন্দরীর ঘুমন্ত রূপ দেখাবার জন্য। আহা, কত হীরা-মানিক জ্বলছে তার সর্ব অঙ্গ জুড়ে। আকাশের তারারা যেমন জ্বলে আর নেভে, শহরের আলোর ঠিক সেই গতিক। কেন তা বলতে পারব না ; যেমন চোখে দেখেছি, তাই লিখে দিলাম। কতক আলো একেবারে স্থির। কতক বড় বেশি উজ্জ্বল, কতক বুড়ো মানুষের দৃষ্টির মতো মিটমিট করছে। অনেকক্ষণ ধরে প্লেন চক্কোর দিল শহরের উপর। আলো কমে আসছে এবার। নির্নিরীক্ষ্য ভুবনের উপর এখানে কতকগুলো ওখানে কতকগুলো আলোর টুকরো। আরও কম, আরও কম। শেষটা একেবারে নেই। মহাব্যোমের অতল অন্ধকারে আমরা ভেসে বেড়াচ্ছি।

কাঁচা ঘুমে উঠে এসেছি, চোখ ভেঙে আসছে। অনুমতি দিন আপনারা, ছোট্ট এক ঘুম ঘুমিয়ে নিই…

তা নেহাত মন্দ হল না। সাড়ে-সাতটায় চোখ মেলে দেখি, রাত্রি যাই-যাই করছে। বিষম কুয়াশা। রবার দিয়ে ঘষে গোটা বসুন্ধরা মুছে দেওয়ার ব্যাপারটা চোখের উপর দেখছি। রবারে মুছে দিলে কিছু অস্পষ্ট চিহ্ন থেকে যায়। তেমনি ঐ অস্পষ্ট ধরালোকে নজর হেনে যদি কিছু পাওয়া যায়, নিরিখ

করবার চেষ্টায় আছি। শিরদরিয়া ধরে যাচ্ছি। পাশে রেললাইন, পিছনে তেপান্তর।

মাঝে মাঝে কুয়াশা একটু বা পরিষ্কার হয়ে যায়। ক্যাস্পিয়ান সাগরের কিনারে পৌঁছলাম। ক্যাস্পিয়ান নাকি কাশ্যপ ঋষির নামে? এই তল্লাটে ওঁদের চলাচল ছিল, এই হল আর্যদের আদি জায়গা? আকাশ থেকেই বেশ আপন-আপন লাগছে। এক ঘন্টার বেশি কিনারা ধরে যাচ্ছি, সাগর তবু শেষ হয় না।

তার পরে ঘন কুয়াশায় একেবারে তলিয়ে গেলাম। পাহাড়, পাহাড়—কার্পেথিয়ান পর্বতমালা ঐ যে! ভোর না হয়ে রাত দুপুর আবার ঘুরে এসে বসল। অন্ধকারের মধ্যে গোঙাতে গোঙাতে প্লেন পথ হাতড়ে বেড়াচ্ছে।

প্রায় তো পাঁচ ঘন্টা কাটল। সকাল হয় না যে! সর্বনাশ, রাত্রির পরে দিন—সে নিয়ম পালটে গেল নাকি আজ থেকে! তার পরে মালুম হল। সূর্যের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দৌড়চ্ছে প্লেন। পুব থেকে পশ্চিমে। কে আগে গিয়ে উঠতে পারে? সূর্য জিতলে তবেই তো সকাল। শেষ অবধি তাই হল বটে। আমার ঘড়িতে ৯-৫০। মস্কোর সময় ৭-২৫। অর্থাৎ আড়ামোড়া ভেঙে রাত্রি এবার বিদায় নিচ্ছেন।

প্লেন খুব নিচুতে এসে পড়ল। মাটির কাছাকাছি। শহরের মতো দেখা যায়। নদী, পাকা ঘরবাড়ি, রেললাইন। কী সাংঘাতিক কুয়াশা! প্রায় তো ভুঁয়ের উপরে, ক্ষণে ক্ষণে তবু সব অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। ধূ-ধূ করছে মাঠ। শহরটুকু ছাড়া কাছাকাছি জনবসতি দেখিনে। শুকনো নদীর খাত। কাজাকিস্তান—কাজাকদের দেশ। খানিকটা দূরে মাঠের মধ্যে চোঙ দিয়ে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। তেলের খনি-টনি নাকি ওখানে?

প্লেন নামল। জায়গাটার নাম আখচুবিনস্ক। এক ঘন্টা থাকবে। আজকের দুপুরের খাওয়া এখানে। চারিদিকে তৃণময় নিঃসীম স্তেপভূমি। সেকালে দলে দলে পশু চরাত এই তেপান্তরে। মানুষগুলোও পশু। এখন ঐ তো দেখছেন শহর, ফ্যাক্টরির চোঙ। প্লেনের খোপ থেকে বেরিয়ে নজর হেনে দেখা যাক।

খটখট খটখট ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনতে পান? দুরন্ত যাযাবরের দল তৃণময় তেপান্তরে পশু তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। তাঁবু খাটানো একদিকে। থাকবে এরা দু-দশ দিন, কিম্বা ভাল লেগে গেল তো দু-মাস। তার অধিক কিছুতে নয়। রক্তে চরে বেড়ানোর নেশা—ঘরদোর বেঁধে পাকাপাকি গৃহস্থালি করবে, তবে তো কাঠের পুতুল ভদ্রলোক হয়ে গেল। ক্লান্ত উটের সারি দিনের পর ক্লান্ত রাতের

পর দিন ব্যাপারির সওদা বয়ে বয়ে বেড়ায়। মারামারি খুনোখুনি লুঠতরাজ ঐ সব ব্যাপারি আর কাজাক-দলের মধ্যে। বেশি নয়, তিরিশটা বছর আগে এলেও এমনি দেখতেন। দেখে যে ঘরের ছেলে সুভালাভালি ঘরে ফিরে যেতেন, এমন কথা হলপ করে বলতে পারিনে।

আজকে দেখুন, ঝকঝকে দালানকোঠা—গেটে দাঁড়িয়ে ওরা ইসারায় ভিতরে যেতে বলছে। দোতলায় উঠে হাত-মুখ ধুয়ে প্রশস্ত খানাঘরে ভোজনে বসে পড়ুন। মাঠের মধ্যে রাজসূয় আয়োজন করে রেখেছে, কোন-কিছুর অভাব নেই। রেললাইন বসিয়েছে যুগযুগান্তের ক্যারাভানের পথ ধরে। সে লাইন চলে গেল সুদূরের সাইবেরিয়া অবধি। ধমনীর মতো লাইনে লাইনে জালবদ্ধ তাবৎ অঞ্চল; অহর্নিশ ঐ সব লাইন বেয়ে প্রাণপ্রবাহ চলাচল করছে। গোটা সোবিয়েত দেশ জুড়ে এই ব্যাপার। পোল্যাণ্ড-সীমানায় যা খেয়ে এলেন, হুকুম করে দেখুন না, প্রশান্তসাগর-কিনারে খানাটেবিলেও ঠিক সেই বস্তু এনে হাজির করবে। অক্সাস আর উত্তর-মেরুতে অঢেল ফারাক—ভূগোলে তাই বলে বটে, কিন্তু দূরত্ব ওরা নিশ্চিহ্ন করে এনেছে।

হাড়-কাঁপানো শীত। একটু আগে ভারি এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে, জল জমে জমে আছে। এখনও গুঁড়ি-গুঁড়ি পড়ছে। বিষম হাওয়া। প্লেনের ভিতরটা গরম করে রাখে—কি করে বুঝব, বাইরে এই ব্যাপার। যেখানটায় প্লেন রেখেছে, গেট তার অতি নিকটে। যেন এক বাগান-বাড়ির ফটকে গাড়ি এসে দাঁড়াল। লাল-ভেরেণ্ডা আর্জানো পথের দু-পাশে। মাঝে মাঝে হলদে-পাতা এক রকমের গাছ। এরোড্রোম-কর্মীরা অবোধ্য ভাষায় নমস্কার জানাচ্ছে। ভিতরে ঢুকে প্রথমেই বইয়ের আলমারি। আকাশ-যাত্রীরা বই কেনাকাটা করে। খাদ্য-বিহনে বরঞ্চ এক-আধ বেলা চলতে পারে, বই চাই-ই। গোটা সোবিয়েত-ভূমে নেশাটা বিষম চালু—নিতান্ত অন্য-মনস্কেরও চোখ এড়াবে না। একজনে ছুটে এসে উপরে উঠবার পথ দেখিয়ে দিল। ওভারকোট ও হাত-ব্যাগ নিয়ে নম্বরের চাকতি দিল।

খাওয়া। শুধু মাত্র আমরা নই, বিরাট হল-ঘরে বিস্তর লোকের খানাপিনা চলছে। আমিষ-নিরামিষ হিসাবে দুটো দল। মহিলাটি, আহা, বিরস মুখে দাঁড়িয়ে দেখছেন। প্লেটে সাজানো পাহাড়-পর্বতগুলো বহুজনের সমবেত অধ্যবসায়ে দেখতে দেখতে বেমালুম হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু এ মহাযজ্ঞে তাঁর কিছু করবার নেই। প্লেনে চড়লেই উদরের যাবতীয় বস্তু ঠেলে বেরিয়ে আসতে চায়। ভূঁয়ে নেমেছেন, তবু এখনো গোলমাল করছে। হেন অবস্থায় বিদেশে বেরুনোই ঝকমারি।

এক ঘন্টা কাটিয়ে আবার প্লেনের খোপে। না মশায়, আঙুর খাইয়েই খুন করবে বুঝতে পারছি। গাদা গাদা আঙুর এনে তুলছে। সাদা আঙুর, লাল আঙুর। সাদা আঙুর খুব মিষ্টি, লাল আঙুর টকে-মিষ্টিতে মেশানো। কাচের গ্লাস রূপোর ফ্রেমে বসানো -- তাইতে চা দেয় নেবুর রস মিশিয়ে। ক্রিম-দেওয়া অথবা দুধ-মেশানো চা-ও পাবেন অর্ডার করলে।

যে প্লেনে হিন্দুকুশ চড়াও হয়েছিলেন — আজকে সেটা নয়; অক্সিজেনের নল দেখা যাচ্ছে না। সেটা আবার কাবুল গেছে পিছনের দল নিয়ে আসতে। তাহলেও একই জাতের প্লেন -- বাবুগিরির আয়োজন নেই, দরকারটুকু মাত্র মিটবে। প্লেনের মেয়েটার দাঁত বাঁধানো, দাঁতের সোনা ঝিকমিক করছে। তরমেসের এয়ারফিল্ডে তিন-চারটাকে এমনি দেখলাম। একটির তো রকমারি দাঁত -- অষ্ট প্রকার ধাতুর গোটা আষ্টেক। আজ দুপুরে আখচুবিনস্কে যে মেয়েটা পরিবেশন করছিল, তার দাঁতও এমনি। ফ্যাসান নাকি, দাঁত তুলে ফেলে হয়তো বা সোনা-রূপোয় বাঁধায়? উঁহু, অতিরিক্ত মাংস খাওয়ার দরুন তাড়াতাড়ি এদেব দাঁত পড়ে যায়।

বেলা দুটোয় আকাশ হঠাৎ পরিষ্কার হয়ে গেল। ভূমি সুস্পষ্ট নজরে আসে। রেল-লাইন, ঘর-বাড়ি, চাষের জমি — সমস্ত যেন ছককাটা; গাছ-পালা থরে থরে সাজানো। নদী ধরে চলেছি — ভল্গা। ধোঁয়া-ধোঁয়া মেঘ ভেসে এসে একবার দৃষ্টি আড়াল করে, দৃষ্টি ছেড়ে দেয় আবার। নিচে হাস্যপ্রসন্ন সমভূমি। গোটা অঞ্চল নজরে আসছে, চৌকো-ত্রিকোণ নানা আকারের জ্যামিতিক ক্ষেত্রে ভাগ করা।

ভল্গা পার হলাম। গাঢ় নীল জলধারা, বেশ চওড়া। মাঝে মাঝে চড়া পড়ে জল ভাগ হয়ে গেছে। পার হয়েই মালুম হল পাহাড়-অঞ্চল — সাদা সাদা কি-সব মাথা উঁচু করে আছে। অগণ্য ঘরবাড়ি নজরে আসছে, ফ্যাক্টরি অনেক। ভেড়ার গায়ের মতো মাটির উপর হলদে রঙের কুঞ্চিত লোম উঠেছে—কোন বস্তু, খোদায় মালুম। আঁকাবাঁকা সরু সরু নদী-খাল — দু-ধারে ঢালাও সবুজ।

হানা সেন বললেন, সবুজটা বোঝা যাচ্ছে — ফসলের ক্ষেত। পিচ-ঢালা জায়গার মতো ঐ যে ঘন কালো — আর হলদে হলদে পায়ের ছাপ ফেলে কারা হেঁটে গিয়েছে তার উপর দিয়ে? কি ওগুলো?

সঠিক কে বলবে? নানান রকম গবেষণা। কালো মাটির দেশ যখন, কালো জায়গাগুলো বোধ হয় ফসল তুলে-নেওয়া ক্ষেতখামার! আর হলুদ-বরণ বিন্দুগুলো — ওখানে ফসল গাদা দিয়ে রেখেছে। নদী, কাটা-খাল —

নদীর বাঁধও দেখা যায়। নদী থেকে বেরিয়ে মাঠের ভিতর খাল শেষ হয়েছে। অগুন্তি খাল এমনি। মোটের উপর টের পাচ্ছি, ভারি সমৃদ্ধ অঞ্চল।

রোদে চারিদিক ভরে গেল। ওরা বলছে, জোর বাতাস বইছে বাইরে— হাওয়ার উজানে প্লেন ধীরে ধীরে এগুচ্ছে। প্রশস্ত রাস্তা—তার দু-পাশ দিয়ে গ্রাম সাজানো। বড় শহর একটা নিচে, ফ্যাক্টরি। নাম পেলাম— বেন্‌থ্‌জা। অরণ্য এসে গেল এবার; জনপদ ও ফসলের ক্ষেত ছুঁয়ে ছুঁয়ে দূরবিসারী অরণ্য চলেছে। ক্ষেত টুকরো টুকরো নয়, অনেকখানি নিয়ে এক-একটা প্লট। যৌথখামার। নদীর বাঁধ বেঁধে খালের পথে যেখানে খুশি জল নিয়ে যায়, যেখানে খুশি জল আটকায়। দেশে দেশে হাজার হাজার মাইল বায়ুবিহার করেছি, এমন পরিপূর্ণ শৃঙ্খলায় সাজানো ঘরবাড়ি বন-মাঠ-ফ্যাক্টরি দেখি নি কখনো। বিরাট যজ্ঞশালা এশিয়া-য়ুরোপের আধেক অঞ্চল জুড়ে— চলতে চলতে এই উপমা মনে আসে বারম্বার।

হোস্টেস ছাড়া আর এক রুশ ছোকরা আছে, সে-ও দেখাশুনা করছে। ইংরেজি জানে না — কি করবে, কথার অভাব হাসিতে পুষিয়ে দিচ্ছে। ক্ষণে ক্ষণে কাছে এসে দাঁড়াচ্ছে, নিচের দিকে চেয়ে আলটপকা নাম বলে দিচ্ছে নদীটার কিম্বা শহরটার। অকারণে একবার নার্গিস-রাজকাপুরের নাম করে বসল। কাল তাসখন্দে ঠিক এই নাম দুটোই শুনলাম— ভারত বলতে এই ওরা চিনে রেখেছে নাকি? তারপরে মালুম হল, সোবিয়েতের এমুড়ো-ওমুড়ো জুড়ে দুটো ভারতীয় ফিল্ম দেখানো হচ্ছে— আওয়ারা ও দো-বিঘা জমিন। মানুষ খুব সিনেমা দেখে এখানে; তারও বেশি অবশ্য অপেরা-থিয়েটার। রাজকাপুর-নার্গিসের টাটকা ছবি ওদের মনে ঘুরঘুর করছে, নাম দুটো অতবার তাই ঠোঁটের আগায়।

কিন্তু কি হল বলুন তো? ভোর পাঁচটায় পাখা মেলেছি, আবার প্রায় পাঁচটা বাজে— পথ শেষ হবার গতিক দেখিনে। রৌদ্রদীপ্ত মেঘের সাগর প্রপেলারের ঘায়ে আলোড়িত করে চলেছি, চলেছি। ভূমিতল এই দেখছি—পরক্ষণে কুয়াশায় চারিদিক একাকার। তা ভাল— লিখে লিখে আঙুলের ডগা ব্যথা হয়ে গেল, চুপচাপ খানিকটা জিরিয়ে নিই। কোন কিছু নজরে না এলে আগডুম-বাগডুম কি শোনাই বলুন?

তখন উঠে পায়চারি করছি। এক সিটের উপর কাঁহাতক থাকা যায়? আমার দেখাদেখি অনেকেই ইতিমধ্যে খাতা খুলে বসেছেন। বিস্তর বই বেরুবে অতএব। একটা খোপের ভিতর এতগুলো লেখক গা-ঢাকা দিয়ে ছিলেন— আমি সরল সোজা মানুষ, একাই কলমসুদ্ধ সকলের আগে ধরা পড়ে গেছি।

বুড়া নেতা তেজা সিং আর তরুণী মেয়ে বিমলা রাঘবাচারী রুমালে ফাঁস লাগানো খেলা খেলছেন। ঝুনা হেডমিস্ট্রেস বিশালাক্ষী দেবী—তিনিও জুটলেন ঐ খেলার মধ্যে। সময় কাটানো আর কি! রুশ ছেলেটাকে বহু জনে ঘিরে দাঁড়িয়েছেন—কোত্থেকে রাশিয়ান প্রথম ভাগ একখানা জোগাড় করে ধেড়ে ছাত্র-ছাত্রী জুটিয়ে সে দিব্যি এক পাঠশালা বসিয়ে দিয়েছে। দাগে তাড়াতাড়ি এসে বলেন, বাংলা বই আছে? আছে নিশ্চয় আপনার কাছে—দিন তো একটা। অর্থাৎ এই বাজারে তিনিও কিছু জমাতে চান; বাংলা বই পড়ে চমৎকৃত করবেন সকলকে। কিন্তু বই বাক্সে বন্ধ, এখন বেরুবে না। অন্য কোন খেলা ভেবে নিন।

মস্কো এসে গেলাম অবশেষে। দু-ঘন্টা দেরি। যারা দাঁড়িয়েছিল, বসে পড়তে বলল তাদের। উঠছে নামছে প্লেন, দুলছে এদিক-ওদিক। কুয়াশায় চতুর্দিক এঁটে আছে, তার ভিতরে নজর চলে না। কুয়াশার মধ্যে নামতে গিয়ে দমদমায় সেই কাণ্ড হল। তা মন্দ হয় না, মস্কোর দ্বারপ্রান্তে নাটকীয় ভাবে ভূতলে পড়ে বেশ খানিকটা হৈ-চৈ জমানো যায়। মুশকিল হল, একেবারে কিছুই দেখতে পাচ্ছিনে নিচে। পেটি বাঁধবার ব্যবস্থা নেই, হাত নেড়ে নেড়ে বোঝাচ্ছে চুপচাপ বসে থাকবার জন্য। নিচে নামছি, অনেক নিচে এসে গেছি। উঁচুনিচু জমি—জমির উপরে যেন বাগান সাজানো। বিষম কাত হয়েছে প্লেন, ভূমির সঙ্গে প্রায় সমকোণ। জলা জায়গা—আর বিস্তর গাছপালা। কিন্তু এত কাত হল কেন?, বড্ড দুলছে, লিখতে পারি না আর যে! কাত হচ্ছে, সোজা হচ্ছে। বহুব্যাপ্ত বিশাল শহর ঐ নিচে। এরোড্রোম নজরে আসছে। সূর্য নেই, আলো নেই, মলিন আকাশ। মস্কো, মস্কো!

কত দূর-আকাশ ভেঙে আমরা এলাম, আর এমন মুখ ভার করে আছ কেন গো?

মাটি ছুঁতে না ছুঁতেই বক্তৃতা। এ-তরফের, ও-তরফের। তোমরা ভাল, আমরা ভাল — মজবুত রকমের দোস্তি গেঁথে ফেলি এসো দুই দেশের মধ্যে। এই সমস্ত আর কি! ফুলের তোড়া দিল দলপতি ও মেয়েলোক ক'জনাকে — সকলকে নয়। খাঁটি ফুল বড় মাগ্‌গি। একটা গোলাপ এই মরশুমে, ধরুন, তিন রুবল অর্থাৎ চোদ্দ সিকের মতো। সে বস্তু বাজে লোকের খাতে ব্যয় করতে যাবে কেন? এন্তার কাগজের ফুলের চলন। কাঁচি-কাটা কাগজে লোকে ফুল লেনদেনের সুখ ভোগ করে।

মাঠ পেরিয়ে ঘরদালান পেরিয়ে বাইরে এসে দাঁড়ালাম। দাঁড়াতে কি দেয়, গাড়ির পর গাড়ি চক্কোর দিয়ে সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে — উঠে পড়ুন, উঠে পড়ুন। আসন্ন সন্ধ্যা — ঘোলাটে ক্ষীণ আলোয় তেপান্তরের মাঠ ধু-ধু করছে। পাকা ঘরবাড়ি এখানে একটা, ওখানে বা দুটো। খানিকটা দূরে সবুজ লেপটে আছে, জঙ্গল বলে মালুম হয়।

কয়েকটা ছেলেমেয়ে গাড়ির জানলায় এসে এসে ইংরেজিতে শুধায়, দোভাষি আছে আপনাদের সঙ্গে? বলেন তো যে কেউ যেতে পারি বুঝসমঝ করে দেবার জন্য। এক ছোকরা উঠে পড়ল। পরে ভাল পরিচয় হয়েছে — এলেক্সি বরখুদারভ, সংস্কৃত ও ফারসির ছাত্র, পণ্ডিত গোছের মানুষ। পাঁচ বছর ইংরেজি পড়েছে — কিন্তু অত্যধিক খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে বলে। ইংরেজির পরীক্ষায় বসলে হেড-মাস্টার পাশ নম্বরটাও দেবেন না তাকে। সলজ্জে বলে, বিদেশির সঙ্গে কথাবার্তা এই প্রথম। ভুলটুল হবে, মাপ করবেন। শহর-মুখো চলেছি, কুতূহলে এটা-ওটা জিজ্ঞাসা করছি — গ্যাঁ-গ্যাঁ করছে লাগসই কথার অভাবে। পকেট-ডিক্সনারি আছে, বোঝাবে কি — ডিক্সনারি হাতড়ে কেবলই কথা খুঁজে বেড়ায়।

জঙ্গল বলে আঁচ করেছিলাম, কসাড় জঙ্গল না হলেও মোটামুটি তাই বটে। বার্চবন পথের দু-ধারে। শহর মস্কো অনেক দূর — বরখুদারভ যা বলল, হিসাব-

পত্তোর করে দেখি বিশ মাইলের ধাক্কা। এক কোলখোজ অর্থাৎ যৌথখামারের সীমানা ধরে যাচ্ছি। চোখ-জুড়ানো ক্ষেত যতদূর অবধি নজর চলে—ঘর-বাড়ি দূর প্রান্তে। ছোটখাট টিনের ঘর, চিমনি বসানো। বড় বাড়িও ক্রমশ দেখা দিচ্ছে। হঠাৎ দেখি, ঝকমকে সাদা অট্টালিকা মেঘ ফুঁড়ে আকাশে উঠে গেছে। য়্যুনিভার্সিটি। সে যে কী কাণ্ড, কেমন করে বোঝাই। কালি-কলম-কাগজের সম্বলটুকুতে সে বস্তুর বর্ণনা হয় না। শহরের উপান্তে লেনিন-পাহাড় অঞ্চলে সদ্য বানানো। ক'বছর আগেও জনবিরল জঙ্গুলে জায়গা ছিল—সেখানে আজকে সারা দেশের তরুণ ছেলেমেয়ে জুটিয়ে আনন্দের হাট জমিয়েছে। সোবিয়েতের ছেলেমেয়ে শুধু নয়, ভুবনের নানান দেশের। মূল রাস্তা ছেড়ে গাড়ি একটুখানি ঘুরিয়ে য়্যুনিভার্সিটি-চত্বর দিয়ে চলল। মস্কো ঢুকবার আগে বিদেশিদের চোখের দেখা দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তা জাঁক করে দেখাবারই বস্তু, তাতে কোন সন্দেহ নেই। শুধু বাড়িই নয়—স্বাস্থ্যবান ফুটফুটে এই ছেলে-মেয়ের দল। একদল ক্লাস থেকে বেরুচ্ছে। একদল দৌড়চ্ছে—বোধকরি এই তাদের ক্লাস বসে গেল। বাগানে ঘুরছে কতক, বসে বসে গুলতানি করছে অনেকে। গাড়ির ভিতর থেকে দেখতে দেখতে চলেছি। বাড়ি বানানো একেবারে শেষ হয়নি—মূল-বাড়ি হয়ে গেছে, এদিকে-ওদিকে আরও বিস্তর বাড়ি উঠছে, কাজকর্ম চলছে। ভর সন্ধ্যাবেলা বড় বড় ক্রেন অশ্রান্ত নৈঃশব্দে ভারী ভারী বোঝা শূন্যলোকে তুলে দিচ্ছে।

য়্যুনিভার্সিটি ছাড়িয়ে এসে এদিকে-ওদিকে বিস্তর বস্তি। মস্কো ঘুরে-আসা কার আছে খবর শুনে জনৈক বন্ধু হুঁশিয়ার করে দিয়েছিলেন, রাশিয়ায় পা দিয়ে চতুর্দিকেই তো ইন্দ্রলোক—আড়ালে-আবডালে গলিঘুঁজির মধ্যে এক-আধ বার উঁকি দিয়ে আসবেন তো মশায়। বন্ধুর কথা যত দূর পারি মান্য করে এসেছি। পায়ে হেঁটে পথে পথে বেড়ানো, ওদের মানুষ-জন একেবারে বাদ দিয়ে ট্রামে ও মেট্রোয় চড়ে যত্রতত্র ঘোরাঘুরি করা। বস্তি দেখতে পাচ্ছেন য়্যুনিভার্সিটির কাছে-পিঠে—বাড়ি তৈরির কাজে বিস্তর জনমজুর খাটছে, এগুলো তাদেরই জন্য বানানো, কাজ চুকে গেলে ভেঙে দেবে। খুদ মস্কোর ভিতরেও সেকেলে বিস্তর চালাঘর। আজ্ঞে হ্যাঁ, চোখে দেখে এসে তবে বলছি। একটার ভিতরে ঢুকেও দেখলাম। বাইরে রং-চটা কাঠকুটো বটে, ভিতরে তাজ্জব। ঘরদোর বিদ্যুতে গরম, হলজোড়া কার্পেট, আহা-মরি স্নানঘর রান্নাঘর, রেডিও বাজছে, দেয়ালে দেয়ালে ছবি—দশ-বিশ তলা বাড়ি-গুলোয় যেমনটা দেখে থাকেন, এখানেও প্রায় তাই। ভোকসের দাওয়াত পেয়ে আমরা গিয়েছি—পয়লা মোলাকাতে স্পষ্টাস্পষ্টি তাঁরা বলে দিলেন,

স্বর্গধাম দেখবার মনন করে এসে থাকেন তো হতাশ হবেন। সেকেলে কাঠের বাড়ি ভেঙে ভেঙে আধুনিক ঘর তোলা হচ্ছে; তবু এখনো অনেক বাকি। আট-শ বছরের শহর ত্রিশ-পয়ত্রিশ বছরে একেবারে পরিপাটি হবে কেমন করে? খাটছে সকলে প্রাণপণে, তবু অঢেল দোষ-ত্রুটি। দোষগুলো আপনারা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে যাবেন, তবেই তো বন্ধুর কাজ হবে।

এই দেখুন, কি কথায় কদ্দুর এসে পড়লাম! খেয়াল আছে তো, য়্যুনিভার্সিটি ছাড়িয়ে খাস শহরের দিকে ছুটেছি। মস্কো। দুনিয়াটা কমলানেবুর সঙ্গে তুলনা দিয়ে থাকেন—সেই নেবুর মোটমাট যদি ছ'টি কোয়া হয়, সোবিয়েত দেশ হল সেই ছয়ের এক। অত বড় জায়গার রাজধানী। আট-শ বছর ধরে গড়ে উঠেছে। কাশীতে যেমন অগুন্তি শিবমন্দির, মস্কো শহরে তেমনি অগুন্তি মিউজিয়াম। অবসর আর উৎসাহ থাকে তো ঘুরে ঘুরে ইতিহাসের নানা অধ্যায়ের পরিচয় নিনগে। মস্কো নামটার সঙ্গে হুড়োহুড়ি করে বিপ্লবের কত রোমাঞ্চক ছবি মনে আসে বলুন তো! আর এক শহর প্যারি। দুনিয়ার মধ্যে এই দুই জায়গার জুড়ি নেই।

বারো শতকে সর্বপ্রথম মস্কোর নাম শুনতে পাচ্ছেন। এক প্রিন্সের ছোট্ট জমিদারি। ১১৪৭ অব্দে দেয়াল ঘিরে শহর হল; মস্কো নদীর কিনারা ধরে ব্যাপার-বাণিজ্যে হৈ হৈ চলছে। ১৯৪৭-এ অষ্টম শতবার্ষিকী পূর্ণ হয়েছে, উৎসব হল তাই নিয়ে। আঠারো শতকের গোড়ায় পিটার দ্য গ্রেট রাজধানী সরিয়ে নিয়ে গেলেন এখান থেকে। ব্যবসায়ের গৌরবে শহর তবু টিকে রইল। ১৮১২ অব্দে নেপোলিয়ানের আক্রমণের সময় পুড়ে গেল শহরের বেশির ভাগ। বিলকুল আবার নতুন করে বানানো।

থাক এখন পুরানো ইতিহাস। শহরে এসে পড়লাম বলে, দেরি নেই। ছাড়া-ছাড়া ঘরবাড়ি ঘন হয়ে আসছে। শহরতলী বলা চলবে না আর এখন। উঁচু-উঁচু গির্জার চূড়া, বিস্তর গম্বুজ। গির্জাগুলো ক্রেমলিনের ভিতরে। ক্রেমলিন মানে হল দুর্গ। দিল্লির লালকেল্লায় যেমন, তেমনি ধরনের পাঁচিলও নজরে পড়ছে। পাহাড়ের পিঠে নদীর ধারে দুর্গ বানিয়ে তারই আশেপাশে জনবসতি হল; এই হল আদি-মস্কো। শতাব্দীর পর শতাব্দী কত গির্জা কত অট্টালিকা উঠল ক্রেমলিনের চৌহাদ্দির মধ্যে। মস্কো-নদীর কিনারা ধরে বেড়ে চলল ক্রেমলিন। আজকে তার বিচিত্রতর মহিমা—দুনিয়ার দুঃখী মানুষদের কত প্রত্যাশা কেন্দ্রিত এখানে। গম্বুজের সোনালি চূড়া। সোনা নয় কিন্তু, পিতল দিয়ে গড়ে সোনার রং ধরানো।

মস্কো–নদীর উপরে লোহার পুল। পুল পার হয়ে এসে পড়লাম। দু'ধারে বড় বড় অট্টালিকা। দেয়ালে দেয়ালে এমন আঁটা, বাইরের কিছু দেখতে পাইনে। সেকালের ধনী ব্যাপারিরা এই সব বানিয়েছিল। ঘুরে ফিরে আবার নদীর ধারে। নদী শুনে পদ্মা-মেঘনা বিবেচনা করবেন না, উল্টোডিঙির খালের দেড়গুণ দু-গুণ হবে বড় জোর। দুই পাড় পাথরে বাঁধানো, মাটি দেখবার জো নেই। যেন পাথরের সড়ক বানিয়ে হুকুম চালাচ্ছে তরঙ্গিণীর উপর, এই পথ ধরে চলতে হবে। দু-চার শ' হাত অন্তর লোহার বা পাথরের পুল। যাবে কোথায় যাদুমণি। ঐ অগণ্য পুলের তলায় গুড়ি মেরে মেরে পাথরের বাঁধা সড়কের উপর নদী মন-মরা হয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে, একটু এদিক-ওদিক হবার জো নেই। সেদিনের সন্ধ্যালোকে আমার অন্তত তাই মনে হল।

মস্কো–নদী ওখা নদীতে পড়েছে, ওখা পড়েছে ডনে। এই জলপথে চির-কাল সওদাগরদলের আনাগোনা। বিজ্ঞানের দেমাকে এখন ওরা ধরাকে সরা বিবেচনা করে; ঘুরপথে চলাচল করতে রাজি নয়। সোজা খাল কেটে মস্কোর সঙ্গে ডনের মিলন ঘটিয়ে দিয়েছে। শহর মস্কো এখন পাঁচ সাগরের বন্দর।

তারা ঝিকমিক করছে। আকাশের হাজার তারার মাঝখানে বাড়তি লাল তারা — এখানে একটা, ঐ যে আর একটা, আরও দূরে একটা। ক্রেমলিন আর কয়েক হাত মাত্র দূরে। আকাশ ফুঁড়ে ক্রেমলিনের স্তম্ভ উঠেছে, মাথায় মাথায় তারা বসানো।

নয় চূড়ার সেন্ট বেসিল ক্যাথিড্রাল। নানান রংচং, সেকেলে ধরনধারণ। আইভ্যান দ্য টেরিবল — নাম শুনেছেন — ষোল শতকে সেই আমলের গির্জা। এখন মিউজিয়াম। ক্যাথিড্রালের সামনে গোলাকার উঁচু বেদী; মাঝখানে ভারী এক কাঠ পোঁতা। দোষীদের সাজা দেওয়া হত এখানে। রক্ত বিস্তর গড়িয়েছে বেদীর উপরে; এখন একটি ফোঁটাও কোনখানে লেগে নেই। অনেক বর্ষায় অনেক বরফে ধুয়ে-মুছে গেছে। মানুষটাকে মাঝের ঐ দণ্ডের সঙ্গে বেঁধে হাত কাটা হত, পা কাটা হত, শেষটা মুণ্ড। আইভান বিস্তর কোতল করেছেন ঐ জায়গায়। প্রথম পিটার বিদ্রোহী দেহরক্ষীদের কেটেছিলেন ঐ বেদীর উপরে নিয়ে। এমনি অনেক। বেদীর পাশ দিয়ে কত সময় কত বার গিয়েছি — গাড়িতে গিয়েছি, পায়ে হেঁটেও গিয়েছি। এক দিনের কথা বলি শুনুন। ফুরফুরে বরফ পড়ছে, টিপিটিপি বৃষ্টি। লোকজন বড় কম। মেঘছায়ায় রাস্তার আলোর জোর নেই — কেমন বুঝি এক-পায়ে দাঁড়িয়ে এক-চোখ বুঁজে তাকিয়ে আছে। আবছায়া রহস্যময় ভাব। সেই রাত্রে সত্যি আমার গা

ছমছম করেছিল মৃত্যুবেদীর পাশ দিয়ে যাবার সময়। পাথরের পথে জুতো খটখট করে চলেছি, মনে হল জুতো দু-গাছা মাত্র নয় — আরও অনেক — চল্লিশ কিম্বা চার-শ গাছাও হতে পারে।

এই দেখুন, মস্কোয় নেমে এখনো আস্তানায় পৌঁছুনো গেল না -- পাঠকদের ভূতের ভয় দেখাচ্ছি। কোথায় যেন আছি? বাঁ-হাতে ক্রেমলিন ঐ যে -- বেসিল ক্যাথিড্রাল ছাড়িয়ে রেড-স্কোয়ারের উপর এসে পড়েছি। কম্যুনিস্ট রাজ্য -- স্কোয়ারের নামটা ভাবছেন সেই কারণে লাল। আজ্ঞে না, ও সব কিছু নয়। পুরানো কালের এই নাম, বিপ্লবের অনেক আগেকার। তখন বাজার বসত এই জায়গায়, মেলা জমত। যে রুশ কথাটার মানে হল লাল, তারই অন্য মানে সুন্দর। ভারি সুন্দর-স্কোয়ার, জায়গাটা তাই রেড-স্কোয়ার বলত। বিপ্লবের দিনে শত শত সর্বত্যাগীর রক্তধারায় স্কোয়ারের কালো পাথর রাঙা হয়েছিল, মানুষের মনে মনে স্কোয়ার আরও সুন্দর হয়েছে সেই দিন থেকে।

লেনিন-মুসোলিয়াম -- ওখানে পাতালপুরীর কক্ষে লেনিন ও স্ট্যালিন ঘুমিয়ে রয়েছেন। তারই পাশে ঘাস ও ফুলে ভরা দুই ফালি জমি। হঠাৎ এই চারি-পাশের ঘরবাড়ি-আলো-মানুষ মুছে গেল আমার দৃষ্টির সামনে। আবছা-আঁধারে রেড-স্কোয়ারে অগণিত নিঃশব্দ নরছায়া দেখছি। মাটি খুঁড়ছে ক্রেমলিনের দেয়ালের গায়ে। মাটির পাহাড় হয়ে গেছে, তবু ক্লান্তি নেই। কোদাল-গাইতি মেরে চলেছে -- হাত কাঁপছে, অবশ হয়ে আসছে, আর একজনে নিয়ে নিচ্ছে তার হাতের কোদাল। মাটি খোঁড়া বন্ধ হয় না। এক সময়ে হয়তো বা কাজ থামিয়ে মাটির স্তূপের উপর উঠে দূরের দিকে তাকায়। আসছে, নিয়ে আসছে বুলেটে ক্ষতবিক্ষত রণবিজয়ী শহীদদের। প্রিয়জনরা কাঁধে বয়ে নিঃশব্দ মিছিলে আসছে। এনে নামাচ্ছে রেড-স্কোয়ারে। ভরে গেল স্কোয়ার। স্কোয়ারের প্রতিটি পাথরের টুকরো পুণ্যময় হল। চারিদিকে অতল নিষুপ্তি -- হঠাৎ এক-একবার তার মধ্যে শোকের ক্ষীণ ধ্বনি উঠছে। উঠেই থেমে পড়ে, লজ্জা পেয়ে শোক বোবা হয়ে যায়। জীবন দিয়েছে বটে এরা, কিন্তু সিদ্ধিও পেয়েছে। তারপর একটি একটি করে সন্তর্পণে শোয়াচ্ছে নিচে গর্তের ভিতর। একের পাশে আর একজন। জায়গা ভরে গেল তো উপরে থাক দিচ্ছে। মানুষের উপর মানুষ শুচ্ছে। বড় বড় দুটো গর্ত নর-দেহে ভরে গেল। পাইকারি কবর। সামান্য স্বস্তিবাচনের পর মাটি দিয়ে দিল। আজকে সেই মাটির উপর দেখুন কত সবুজ ঘাস, কত রঙিন ফুল। সারা সোবিয়েত দেশের মধ্যে সকলের বড় তীর্থ ঐ দু-ফালি জায়গা। গুণী

জ্ঞানী ও যাবতীয় কৃতী পুরুষদের সর্বোত্তম কামনা, মরবার পরে ওরই আশে-পাশে একটু যদি ঠাঁই পাওয়া যায়। তার চেয়ে বড় সম্মান ওদেশের মানুষ ভাবতে পারে না। আছেও তাই বড় বড় বিপ্লবী-নেতার কয়েকটি কবর এদিকে-সেদিকে। জায়গা নেই তো দেহ পুড়িয়ে সেই ছাই পুঁতে রেখেছে জায়গাটার সামনাসামনি ক্রেমলিনের দেয়ালে। গোর্কির ছাই আছে দেয়ালের ভিতর। আরও কত জনের।

প্রশস্ত রাস্তা রেড-স্কোয়ার জুড়ে। জোয়ারের স্রোতের মতো গাড়ি-মানুষের অবিরাম চলাচল। তার মধ্যে, কাণ্ড দেখুন তো, আমি একেবারে উনিশ-শ সতেরোয় চলে গিয়েছিলাম। ইতিমধ্যে আরও কিছু রাস্তা ছাড়িয়ে আমাদের গাড়ি আবার এক স্কোয়ারের সামনে। সেকেলে বাড়ির কার্নিশে কালো পাথরে খোদাই এপোলো চার ঘোড়ার শকটে চড়ে ছুটছেন। ঠিক তাই—আপনিও হলপ করে বলবেন, পাথরের ঘোড়া চারটে ছুটেছে তীরের মতো ; খটাখট আওয়াজ পাচ্ছি বোধ হয়। বলশই থিয়েটার। থিয়েটারের বয়স পৌনে দু-শ বছর ছাড়িয়ে গেছে। বুঝুন। বাইরে কত কাণ্ড, রাজার রাজ্যপাট অতলে ডুবে গিয়ে নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থা পত্তন হল— আর ঐ থিয়েটার-হলে এই পৌনে দু-শ বছর প্রতিটি সন্ধ্যায় পট উঠে গিয়ে পরীরা উড়ে বেড়িয়েছে, স্বর্গ-নরকে লড়াই জমেছে, রাজা-রাণী রাজপুত্র-রাজকন্যা পাদ্রি-পুরুত ইতিহাসের কবর খুড়ে দর্শকের চোখের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন…

কিন্তু থাক এখন। কলম যখন ধরেছি, সহজে কি রেহাই পাবেন ? সমস্ত তোলা রইল। রাত থাকতে সেই তাসখন্দ থেকে বেরিয়েছি, হোটেলে এইবারে ঢুকে পড়া যাক। হোটেল মেট্রোপোল পুরানো হোটেল— বনেদি পাড়ার মধ্যে। মস্কোর যত কিছু কীর্তিচিহ্ন, বেশির ভাগ এই অঞ্চলে। বিপ্লবের অনেক আগে থেকেই হোটেল চালু আছে। দোতলার এক ঘরে থাকতে দিল। ভাল ঘর। খাটে ধবধবে নরম বিছানা। বাথরুমের ব্যবস্থাও অতি উত্তম— আধুনিক সাজসরঞ্জাম। লাগোয়া লাউঞ্জ রয়েছে— আড্ডা দিন অথবা মাথায় পোকার উপদ্রব থাকলে লেখাপড়া করুন টেবিলে গিয়ে। সে যা-হোক পরে দেখা যাবে, সারাদিনের ধকলের পর হাত-পা ছেড়ে গড়িয়ে নিই একটু। তার পরে এক সময় উঠে পড়ে গরম জলে মজাসে স্নান করে আঃ— বলে সোয়াস্তির শ্বাস ফেললাম।

একটা দরকারি কাজ— সকলের আগে মেট্রনের কাছ থেকে ভারতীয় অ্যাম্বাসির ফোন-নম্বরটা নিয়ে আসা। হ্যালো, বাঙালি কেউ আছেন অ্যাম্বাসিতে? এক জন নয়, তিন তিনটি। ফোন ধরেছেনও এক বাঙালি— দাশগুপ্ত,

ইন্দুভূষণ দাশগুপ্ত। চলে আসুন দাশগুপ্ত মশায়। কখন আসছেন, ঠিক করে বলে দিন।

ডিনারের পরে অপেরা। ঐ যে দূর থেকে দেখলাম--ঐ বলশই থিয়েটারে। থাকগে, আমি যাব না। একদিনেতো ফুরিয়ে যাচ্ছে না, আপনি আসুন দাশগুপ্ত।

ডিনারে আপাতত নিরামিষ দলে ভিড়লাম। সুবিখ্যাত ক্যাভিয়ার মুখে দিয়ে সেই এক কাণ্ড হতে হতে বেঁচে গেল, তার পরে দেখেশুনে বিচার-বিবেচনা অন্তে তবে আমিষ ছোঁব। এক ছোকরা পাশে এসে বসল — পাভলিচেঙ্কো, ডাক নাম হল পল -- এসে খুব আলাপ জমিয়ে নিল। দোভাষি, হৃষ্টপুষ্ট সুন্দর চেহারা, ইংরেজিও বলে ভাল। এই কলকতায় আবার দেখতে পেলাম পলকে, বিজ্ঞান কংগ্রেসের দলে দোভাষি হয়ে এসেছিল।

দাশগুপ্ত এসে গেলেন। স্ফূর্তিতে ডগমগ। এসেই প্রথম কথা : ভারতে ফিরে যাচ্ছি অ্যাম্বাসিতে নতুন লোক এসে পেঁাছানো মাত্রেই। তিন বছর একটানা মস্কোয় থেকে একঘেয়ে লাগছে, দিল্লি ফিরে কিছুকাল থেকে আবার কোন নতুন জায়গায় পাড়ি দেবেন। জোর করে দাশগুপ্তকে বসানো হল আমাদের সঙ্গে, ছাড়াছাড়ি নেই। সবাই মুখ চালাবে আর আপনি খালি ঠোঁট নাড়বেন, সেটা কেমনে হয়? ভীষণ আতিথ্য ওদের। আজ্ঞে হ্যাঁ, থরে থরে স্তূপাকার সাজিয়ে রেখেছে -- আসন নিয়ে মুখে এখানে জল ঝরে না, মুখ শুকিয়ে ওঠে। একজন আমাদের, একজন ওদের — এমনি কায়দায় বসেছে। পেট ভরে খাও, ফাঁকিজুকি দিও না। মনে করো নিজেদের ঘরবাড়ি -- যখন যেমন খেতে চাও, আগেভাগে ফরমাশ কোরো, -- সেই মতো চেষ্টা করা যাবে।

কী ভীষণ খায়, না দেখলে প্রত্যয় পাবেন না। অ্যাপিটাইজার বলে গোড়ায় দিয়ে যায়, সেটা হল ভোজনের গৌরচন্দ্রিকা -- বস্তুগুলো চেখে চেখে ক্ষুধায় শাণ দিয়ে নেবেন, এই হল উদ্দেশ্য। তা ক্ষীণজীবী আমাদের এতেই ভরপেট হয়ে যায়, প্রাণ আইঢাই করে, শয্যায় গড়িয়ে পড়তে ইচ্ছে করে। কিন্তু শুনছে কে? সুপ ওদিকে এসে গেল, 'ভোজনে চ জনার্দন' স্মরণ করে পুরোপুরি ক্রিয়া এইবারে। তিনটে চারটে কোর্স -- তার সিকিখানাও তো ধস্তাধস্তি করে মুখ-বিবরে ঢোকানোর উপায় দেখছি নে। আর ওদের ঐ সতর্ক অক্ষিতারকাগুলো অভাগ্য অতিথিকুলের উপর বারম্বার বিঘূর্ণিত হচ্ছে; কথাবার্তা গল্পগুজবে ভুলিয়ে-ভালিয়ে পার পাবেন না। হাতে-কলমে দেখিয়েও দিচ্ছে। রোস্ট-টার্কির আধখানা অর্থাৎ ওজনে সের দেড়েক এক এক কামড়ে কেটে নিয়ে পরমানন্দে চিবাতে চিবাতে বলে, দেখ, খাওয়া যায় না যে? কেউ নাকি খেতে পারে না? এই তবে কি করছি?

পলকে বলি, বন্ধু-বন্ধু করে তো গলা ফাটাও—খাওয়ার টেবিলে এমন শত্রুতা কেন বলো দিকি?

আমাকে শত্রু বলছ?

আলবৎ, একশ বার! এত জবরদস্তি শত্রুতেও করে না।

জবরদস্তির অপবাদ দিলে? হায়, হায়—আমি শত্রু? পলের কণ্ঠস্বর কাঁপছে। টেবিল থেকে ছুরি তুলে বুকের উপর উদ্যত করে: এ জীবন রাখব না, আত্মহত্যা করে জ্বালা জুড়াব। তোমরা আমায় শত্রুর অপবাদ দিয়েছ।

পাষাণ আমরা হি-হি করে হাসছি। ও-ছুরিতে মাখনের দলাই কাটা যায়। দেখ না চেষ্টা করে—ছুরি ভাঙবে, তোমার বুকের কিছু হবে না।

দাশগুপ্তকে চুপিচুপি বলি, দেশটা জুড়ে লোহার ভারী ভারী যবনিকা। ভাল করে বাতলে দিন তো মশায়, কোন্ কায়দায় চলাফেরা করব, কি ভাবে কথাবার্তা চালাব।

দাশগুপ্ত হেসে ফেললেন।

তিন বছর রয়েছি এখানে, আমি তো কই মালুম পাইনে। পরের কথা মানবেন কেন, নিজেরাই দেখুন না খোঁজখবর করে। আমি বলি, বেপরোয়া ঘোরাঘুরি করুন বরঞ্চ। যবনিকার গায়ে দৈবাৎ যদি ঠোক্কর খান, দেশে গিয়ে সে কথা লিখতে পারবেন।

তা চেষ্টা করেছি আমরা যথোচিত। ক্রমশ শুনতে পাবেন। মোটের উপর, লৌহ-যবনিকা এমন সেরে সামলে রেখেছে—দেশেই যা ছাপার অক্ষরে দেখি, অতবড় রাজ্যের ভিতর বাইশ হাজার মাইল চক্কোর দিয়েও কোনখানে হদিশ পেলাম না। বিষম চালাকি খেলেছে, কি বলেন?

দলের আধাআধি লোক পিছনে পড়ে। সকালবেলা খবর শোনা গেল, আবহাওয়া বিষম খারাপ। তাসখন্দ অবধি বড় জোর তাঁরা এসে পৌঁছতে পারেন। তার পরে দিন তিনেক অন্তত সেখানে আটক থাকতে হবে। আকাশের দশা ভাল না হওয়া অবধি প্লেন উড়বে না।

হাওয়া-অফিস থেকে বলছে তো? পুলকিত হয়ে উঠি। আজকে না-ই হোক, নির্ঘাৎ তবে তাঁরা কাল নাগাত এসে হাজির হবেন। দেখে দেখে ঝুনো হয়ে গিয়েছি। ওঁরা যা বলেন, ঠিক তার উল্টো হয়। বৃষ্টি হবে বললেন, সেদিন রোদ। রোদের কথা বললে ঝমঝম করে বৃষ্টি নামবে। অভ্রান্ত হিসাব ওঁদের, লোকের উপকারও হচ্ছে—যা বলছেন, ঠিক উল্টো ধরে নিলে, হুবহু মিলে যাবে।

কিন্তু এখানে নাকি ভিন্ন ব্যাপার। রোদ মানে সত্যিকার চড়চড়ে রোদ, বৃষ্টি মানে বৃষ্টি। সে যাকগে, আসতে লাগুন ওঁরা। সে ক-দিন মস্কোর উপর

বসে আমরাও শুধু শুধু অনুধ্বংস করব না। প্রোগামটা ছকে ফেলা যাক। কিন্তু সকল কর্মের আগে ফুল নিয়ে যেতে হয় তো লেনিন-মুসোলিয়ামে— শ্রদ্ধা জানিয়ে আসি। সকলের আগে এটা। যেমন আমাদের অতিথিরা দিল্লিতে পা দিয়েই রাজঘাটে মালা দিয়ে আসেন।

না, হবার জো নেই এখন। নবেম্বর-বিপ্লবের স্মরণোৎসব এসে পড়ল। মুসোলিয়ামের উপরে নেতারা দাঁড়াবেন, রংচং হচ্ছে। মুশোলিয়ামে আপাতত যেতে দেওয়া হচ্ছে না কাউকে। আছেন তো কিছু দিন, তাড়া কিসের? উৎসব চুকে-বুকে যাক, তখন হবে। পয়লা দিনেই শ্রদ্ধা না দেখালে মহাভারত অশুদ্ধ হবে, এমন বাঁধাধরা নিয়ম নেই।

নিমন্ত্রণ করে নিয়ে এসেছেন ভোকস—সোবিয়েতের সংস্কৃতি-বিভাগ। সেখানে একবার চেহারা দেখিয়ে আসতে হয়: এসে গেছি এই দেখুন। বিরাট নিজস্ব বাড়ি, উপরে নিচে তিন-চারটে লেকচার-হল। উঠানে দেদার মোটরের জায়গা, কর্তাব্যক্তিরা গাড়ি চড়ে এসে এসে নামছেন। কলেজ-জীবনে তিন টাকায় একফালি টিনের ঘর ভাড়া নিয়ে আমরাওএক সমিতি গড়েছিলাম— অখিল-ধরিত্রী সংস্কৃতি সংসদ। বাকি ভাড়ার দরুন ঘর ছাড়তে হল; সংসদও গেল উঠে। তা কি হবে, স্টেট যদি এই রকম পিছনে পাই, টিনের ঘরে না বসে আমরাও চৌরঙ্গির উপর সাততলা বাড়ি হাঁকাব।

ভোকসের সভাপতি হাজির নেই, দাওয়াত প্লেয়ে কোন মুলুকে বেরিয়ে পড়েছেন। আমাদেরই গতিক—এই আমরা যেমন দেশভুঁই ছেড়ে এদের দেশে, এসে পড়েছি। সহ-সভাপতি মশায় আমাদের নিয়ে বসলেন। মাথায় চকচকে টাক রসিক মানুষ — ফষ্টিনষ্টি হচ্ছে। ওসব রেখে কাজের কথা হোক মশায়। ভারতীয় এক দল তো পথের উপর — আপনাদের হাওয়া-বাবুরা ভয় ধরিয়ে দিচ্ছেন, দেরি হবে পৌছুতে। তা সে যাই হোক, ইত্যবসরে প্রোগ্রাম পাকাপাকি করে ফেলা যাক—কোথায় কোথায় যাওয়া হবে, কদ্দিন থাকা হবে কোন জায়গায়। তাঁরা এলেই যাতে তিলার্ধ দেরি না করে সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়তে পারি।

হরি, হরি! একেবারে সাফ জবাব। কোথায় যাবেন, আমরা তার কি জানি? ও-তালে নেই। সকলে মিলে মীটিং করে আপনারাই প্রোগ্রাম ঠিক করবেন। খবরাখবর চাইলে আমরা দিয়ে দেব, যাতায়াতের বন্দোবস্ত করে দেব। পথের কষ্ট যত কম হয়, সেই চেষ্টা করব, বিশেষ রকমের অসুবিধা থাকলে সেটাও বলে দেব স্পষ্টাস্পষ্টি। এই অবধি—তার অধিক আর পেরে উঠব না।

মোটের উপর বুঝে এলাম, খানাপিনা ও মস্কো শহরে ঘুরে ফিরে বেড়ানো আপাতত কাজ আমাদের। যে ক-দিন পিছনের দল না এসে পড়ছেন। একটা বাসে চেপে বসা গেল অতএব। দোভাষি উঠেছে পাঁচ জন। চার কোণে চারটি, বাকি জন কেন্দ্রস্থলে সিট ধরে খাড়া দাঁড়িয়ে। পঞ্চমুখেই বক্তৃতা চলেছে। শহরের কোন তল্লাট দিয়ে যাচ্ছি এখন, ডাইনে বাঁয়ে ও সামনের দিকে কি কি বস্তু দ্রষ্টব্য, তার নাড়িনক্ষত্র ও আদ্যন্ত ইতিহাস। নেমে পড়ছি কোথাও বা। রাস্তা এই যেন আকাশমুখো চলল, এই আবার নিচু হয়ে পাতালে নামছে। পাহাড়ে জায়গার উপর মস্কো শহর, সেই কারণে। এখন পাহাড় কে বুঝবেন? রাস্তা ও ঘরবাড়ি বানিয়ে পাহাড় বিলকুল পালিশ করে দিয়েছে। শহরের প্রতিষ্ঠা করেন য়ুরি ডোলগোরুকি। তাঁর মূর্তি ও তাঁর নামে পার্ক আছে। আছে এমনি বহুতর গুণীজনের নামে। পুস্কিনের নামে, সুরকার চেকো-বস্কির নামে।

সরু রাস্তা ছিল সেকালে। প্রাচীন শহরের যেমন হয়ে থাকে। এখন চওড়া ও চৌরস হয়েছে। এ কাজ এখনও চলছে। গর্কি রোড দিয়ে যাচ্ছি— বারো মিটার ছিল, সেইটে পাঁচ গুণ অর্থাৎ ষাট মিটার চওড়া করেছে। শহরের সেরা এই তল্লাট পুরানো কাল থেকেই। কাজকর্মের অফিস-বাজার; ফুর্তি-ফার্তির অপেরা-থিয়েটার। বিষম ঘিঞ্জি জায়গা ছিল, ভেঙে ভেঙে এখন বিস্তর চওড়া বানিয়েছে। পার্ক দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটা, আবার ঐ যে, ফের দেখুন ঐ ওখানে। শত শত বৎসর আগে শহরের পয়লা আমলে যে জায়গায় বাজার বসত, সেই স্মৃতিতে বাজারের নামেই এক স্কোয়ার।

ঐতিহাসিক বাড়ি অনেক আছে, সেগুলো ভাঙা চলে না। কিম্বা ধরুন বিস্তর খরচপত্রের বিপুল অট্টালিকা। চওড়া করতে গিয়ে রাস্তা তার উপরে পড়ে গেছে। কি করা যায়? আহা, ঠেলে পিছিয়ে দিন না দু-শ চার-শ হাত। এইটুকু মাথায় আসে না?

সত্যি তাই। দেখাতে লাগল, ঐ যে বাড়িটা—মস্কো সোবিয়েত-বিল্ডিং— ঠিক এই জায়গায় ছিল, যেখান দিয়ে আমরা গাড়ি হাঁকিয়ে যাচ্ছি। বিপ্লবের অনেক গৌরব-স্মৃতি জড়ানো, ও-বাড়ি কিছুতে ভাঙা চলে না। সরিয়ে দিয়েছে চল্লিশ মিটার পরিমাণ। সরিয়ে বাড়ির উপরে আরও দুটো তলা তুলেছে। পুরানো বাড়িতে তিল পরিমাণ ফাটল ধরেনি এই সরাসরির ব্যাপারে। আলো-জল-কল-পায়খানা যেমনকে তেমন। একটা দুটো নয়—পঞ্চান্নটা বাড়ি সরানো হয়েছে মস্কো শহরের উপর। চোখের হাসপাতাল সরানো হল,

রোগিরা কেউ জানতেও পারেনি—চোখের অপারেশন চলছে বাড়িটা যখন সরানো হচ্ছে। এমন মৃদু গতিতে সরানো হয়। নইলে তো ফেটে চৌচির হবে।

এ যে আরব্য উপন্যাসের ব্যাপার। কি করে হয় বলুন।

বুঝতে পারলেন না ? খুব সোজা ব্যাপার, ঘোরপ্যাঁচের কিছু নেই। তিন কথায়, সত্যি, একেবারে জল করে বুঝিয়ে দিল। আপনাদের যদি মনন থাকে—ধরুন, সেনেট-হলটা দ্বারভাঙা-বিল্ডিং সহ পিছিয়ে চিত্তরঞ্জন এভিন্যুর উপর নিয়ে যাবেন। ভিতের তলা অবধি খুঁড়ে আলগা করে ফেলুন সকলের আগে। ভিতরে নিচে ইস্পাতের পাত দিয়ে বেঁধে দিন ; পাতের সঙ্গে এঁটে দিন চাকা। ঐ সব চাকার তলায় রেলের পাটি পেতে দিয়েছেন, অর্থাৎ গাড়ির উপরে তুলে ফেলেছেন গোটা অট্টালিকা। ব্যস, আর হ্যাঙ্গামা নেই—ইঞ্জিন জুড়ে টেনে নিয়ে চলুন লোহার পাটির উপর দিয়ে। রাস্তা এক লেবেলে হওয়া চাই কিন্তু, সিকি ইঞ্চির হেরফের হলে সর্বনাশ। এই, যৎসামান্য মাপজোপের ব্যাপার আর কি! আর, বাড়ির ভিতরে-বাইরে আষ্টেপিষ্টে বাঁধন দিয়ে নিয়েছেন তো, কোন দিক বাদ পড়ে না থাকে। ইঞ্জিন শামুকের মতন আস্তে আস্তে সরবে। ঐ যে হাসপাতালের কথা বললাম, পঁচানব্বই মিটার যেতে লেগেছিল দুই দিন দুই রাত্রি। মস্কোর মাটি পাথুরে—আমাদের নরম পলিমাটির উপর নড়াচড়া করতে কিছু বেশি সামাল হতে হবে কিন্তু। আমার কয়েকটি জাঁদরেল ইঞ্জিনিয়ার বন্ধু আছেন—তাঁরা তুড়ি দিয়ে বলেন, এ আর কঠিন হল কিসে ? তবে নতুন বাড়ি বানানোর কত গুণ খরচা পড়বে এই সরানোর ব্যাপারে, সেইটে আগে হিসাব করে দেখো।

বাস থেকে নেমে পড়েছি এটা-ওটা ঘুরে দেখবার জন্য। কালো কালো এক দঙ্গল জীব পিলপিল করে বেড়াচ্ছে—লোকে লোকারণ্য। ভিড় জমানোর বাবদে মস্কোর মানুষ কলকাতার চেয়ে একটুও কম যায় না। ফোটোগ্রাফারের দল সঙ্গে আছে ; মওকা বুঝে হরদম ছবি নিচ্ছে। কত যে ছবি তুলেছে, অন্ত নেই। বইয়ের সঙ্গে দু-চার খানা তার নমুনা দিচ্ছি। আমাদের তোলা ছবি একটাও নয়। আমাদের হলে কি এই রকম ? বুক-চিতানো হাসি-হাসি মুখ, হাতে বই বা অন্য কিছু—দেখে তাজ্জব হয়ে যেতেন।

কত মানুষ—মেয়ে-পুরুষ বাচ্চা-বুড়ো। দুটো-একটা কথা বলবে ওরা, কথা বোঝাবার জন্য আঁকুপাকু করে। কোলের ছেলেটা অবধি উঁ-উঁ করে মায়ের দেখাদেখি। মায়ের কোল থেকে আমাদের মেয়েরা ডাকাতি করে কেড়ে নিচ্ছেন বাচ্চাগুলো। বুকে রাখছেন, কাঁধে তুলে ধরছেন। আদরি সেরে

মস্কো শহরের প্রতিষ্ঠা করেন য়ুরি ডোলগোরুকি
তাঁর মূর্তি ও তাঁর নামে পার্ক (পৃ. ৬৩)

বাস থেকে নেমে পড়েছি, এটা-ওটা ঘুরে দেখবার জন্য (পৃ. ৬৪)

মায়ের নিধি ফিরিয়ে দিচ্ছেন আবার মায়ের কাছে। ক্লিক-ক্লিক—এইসব ছবি তুলে রাখছে তাড়াতাড়ি। না না, আদরের অমন রীতি নয়—সহযাত্রিণী একজনকে সামাল করে দিলাম। মায়ের মুখ কেমন হয়ে যাচ্ছে ঐ দেখুন, গালে হাত দিয়ে আদর ওরা পছন্দ করে না। রোগ-বীজাণু আসতে পারে, স্বাস্থ্যহানির কারণ ঘটে। ভদ্রতা করে মুখে কিছু বলে না, শিউরে শিউরে উঠছে।

দলছাড়া গোত্রছাড়া হয়ে কখন ইতিমধ্যে ভিড়ের ভিতর তলিয়ে গিয়েছি। এই আমার এক দোষ, মানুষের ভালবাসা দেখলে আপনহারা হয়ে পড়ি। পিকিন শহরের রাস্তায় রাস্তায় এমনি কাণ্ড কতবার ঘটেছে! জনসমুদ্রকে ভয় করিনে, স্ফূর্তিতে আমার ঝাঁপ দিয়ে পড়তে ইচ্ছে করে। এত বয়স হল, সামলে থাকতে শিখলাম না। ভাগ্যবশে যদি বড় সরকারি চাকরে হতাম, কী গতি হত যে আমার। চব্বিশ ঘন্টাও তো চাকরি টিকিয়ে রাখতে পারতাম না। মানুষের সমারোহ, বর্ণাঢ্য বিচিত্র কত রকমের মানুষ—আর আমায় তখন দোর-গোড়ায় পিওন বসিয়ে কাগজের স্লিপ টাঙিয়ে একাকী এক জেলখানা বানিয়ে আলাদা হয়ে থাকতে হত। ভাবতেও হৃৎকম্প হয়। চাকরিবাকরি হয়নি ভাগ্যিস। পথ-চলতি অতি সাধারণ এই সব মানুষ—মরি মরি, কী স্বাস্থ্য, কী অপরূপ মুখের হাসি! খোঁড়া মানুষ খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে রাস্তা পার হচ্ছে, তারই মধ্যে ভালবাসায় ভরা চোখে তাকিয়ে একবার দেখে গেল—ভাল হোক ওদের—মিষ্টি স্বপ্নের ঘুমের মতো হাসতে হাসতে সারা জীবন কাটাক। শিশু ঐ জন্মের পরেই যা একটুখানি কেঁদে নেয়, আর যেন কাঁদতে না হয় তাকে কোনদিন।

ভিড়ের মধ্যে কেউ কেউ কথা বলছে, কি সব জিজ্ঞাসাবাদ করছে। তা আমিও ডরাই নাকি—আসবার আগে গণ্ডা দেড়েক রুশবাক্য রপ্ত করে এসেছি। গুরুনাম স্মরণ করে তারই একজোড়া আন্দাজি ছেড়ে দিলাম—ইণ্ডিস্কি ডেলিগাৎসি। অর্থাৎ ইণ্ডিয়ার ডেলিগেট আমি। শুদ্ধ হল কিনা খোদার মালুম। কিন্তু যতদূর হল তারই ঠেলায় যাই-যাই অবস্থা। ওরা ধরে নিয়েছে রুশ-ভাষায় দস্তুরমতো এলেমদার আমি। একে ইণ্ডিয়ান, তায় বিদ্যাদিগ্‌গজ। মুষলধারে প্রশ্ন ছাড়ছে। আঁ-আঁ-আঁ করি, আর অসহায় ভাবে এদিক-ওদিক-তাকাই। অতল সমুদ্রে ডুবে যাবার দাখিল। পেয়েছি—দোভাষি একজন দেখতে পাচ্ছি ঐ যে অনেক দূরে। আসছে সে আমারই দিকে। বাস বিস্তর ক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে, আর সকলে উঠে পড়েছে, আমিই একা কেবল জন-সমুদ্রে আছাড়িপিছাড়ি খাচ্ছি। দোভাষি আসছে উদ্ধার করে নিতে।

তখন তাকেই তোড়ের মুখে ঠেলে নিজে পিছিয়ে আসি। উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিম চতুর্দিক পাক দিয়ে দিয়ে জবাব দিচ্ছে। উৎসাহের প্রাবল্যে কেউ বা তার মুখ ঘুরিয়ে নিজের কথাটা আগে শুনিয়ে দিচ্ছে। যা গতিক, স্বয়ং দশানন হাজির হয়ে দশটা মুখে এক নাগাড় বলেও তো সামাল দিতে পারতেন না। তার উপরে আর এক মুশকিল—আমার কাছ থেকে জেনে নিয়ে তবে তো উত্তর বলবে! কত জনে এসেছ তোমরা, কদ্দিন এসেছ? আছ কোথায়? কেমন লাগছে আমাদের দেশ? ইণ্ডিয়া তো গরম জায়গা, শীতে কষ্ট হচ্ছে নিশ্চয়…

যেন রাস্তার মানুষদেরও পাইকারি অতিথি আমরা। হাতে-নাতে কিছু করতে পারছে না তো দু-দণ্ড দাঁড়িয়ে দুটো-চারটে কথাবার্তা বলে দায়িত্ব পালন করছে। পাকা চুলের এক বৃদ্ধা ওরই মধ্যে একটু বকুনি দিল, খালি মাথায় বেরিয়েছ কেন বাপু? একখানা কাণ্ড ঘটাতে চাও? সব সময় মাথায় ঢাকা দিয়ে বেরুবে। আমার চোখ ছলছল করে আসে। মা কবে চলে গিয়েছেন। মা, তোমার গলা শুনতে পাই মস্কোর পথে, তোমার অবোধ ছেলেটাকে ধমক দিয়ে উঠল।

অতি-সুন্দরী তরুণী এক মেয়ে জিজ্ঞাসা করে, কি করো, পেশা কি তোমার? দোভাষি প্রশ্নটা বুঝিয়ে দিল। তবে রে—পেয়ে গেছি আর এক মওকা বিদ্যে জাহির করবার। জবাব আমার দেড় গণ্ডা সম্বলের মধ্যেই পড়ে গেছে। বুক ফুলিয়ে এগিয়ে গিয়ে স্বমুখে বলি, পিশাতিয়েল—লেখক আমি একজন।

কে জানত, পিশাতিয়েল মানে ওদেশে সাংঘাতিক এক ব্যাপার! চোখে চোখে খবর হয়ে গেল — দূরের মানুষ রে-রে করে ছুটে আসছে! দেখে যা রে, কোথাকার কোন পিশাতিয়েল পথে বেরিয়েছে। ভিড়টা নিরেট হয়ে গেল দেখতে দেখতে। দোভাষির বাপের সাধ্য নেই, উদ্ধার করে বাসে নিয়ে তুলবে। পিশাতিয়েল-দর্শন নয়ন-ভরে হয়ে যাক, তার পরে যদি দয়া করে একটু পথ করে দেয়। তা ছাড়া কোন উপায় দেখি নে।

গোটা সোবিয়েত জুড়ে এমনি কাণ্ড! লেখকদের কেষ্ট-বিষ্টু জ্ঞান করে। বাহার কত লেখকের! যে কাজই করুন, জোরদার ইউনিয়ন আছে। লেখকদেরও আছে। দু-দিন গিয়েছিলাম লেখক-ইউনিয়নে। বলব কি মশায়, মস্ত বড় উঠানে গাড়ির ভিড়ে পা ফেলতে পারিনে। দামি দামি পোশাক পরে এক এক লাটসাহেব নামছেন যেন। এই দেখুন, কি বলে ফেললাম — লাটসাহেবও তো ফতুর হয়ে যাবেন ঐ ছাঁটকাটের পোশাক পরে ঐ দরের গাড়ি চড়ে বেড়ালে। ওদেশের লাটগুলোর কথা বলছি অবশ্য — সোবিয়েত দেশের শাসনভার যে-কর্তাদের উপর। অনেক গরিব তারা লেখকদের তুলনায়। সাম্যবাদীর দেশ

বটে, তা বলে মানুষ এক সমান নয় — বড়লোক আছে, গরিব লোক আছে। আর বড়-লোকের পয়লা সারিতে বিরাজ করছি আমরা — পিশাতিয়েলবর্গ। আর আছেন বিজ্ঞানী, গবেষক ও অধ্যাপকেরা, এবং ব্যালেরিনা মেয়েগুলো অপেরায় যারা নাচে। অর্থাৎ শিল্পী ও পণ্ডিতদল — নতুন বর্ণাশ্রমে যাঁরা হলেন ব্রাহ্মণ। খাতির কুড়ান, রুবলও লোটেন।

হবে না কেন? মেয়ে-পুরুষ বাচচা-বুড়ো — জাত ধরেই যে নেশাগ্রস্ত। বই পড়ার নেশা। গাঁজা-ভাঙ এর চেয়ে অনেক ভাল মশায়, তার তবু সন্ধ্যা-সকাল আছে। এ নেশার সময়-অসময় নেই। আশি মাইল বেগে মাটির নিচে মেট্রোয় ছুটেছে, এক একখানা বই মুখে ধরে আছে প্রায় সকলে। জিনিসপত্র কেনা তো ঝকমারি ঐ হতভাগা দেশে। ডিম-মাংস সবজি-আনাজের কথা ছেড়ে দিন — ক্যামেরা কিনবেন, সেখানেও সিকি মাইলের এক কিউ। গ্রামোফোন কিনতে যান, সেখানেও। এমন দেখেছি, বরফ পড়ছে — কিম্বা টিপটিপে বৃষ্টি আর কনকনে হাওয়া, অবিচল ধৈর্যে তারই মধ্যে মানুষ কিউয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বই হাতে আছে এক-একখানা — ব্যস, তাতেই হয়ে গেল। নেশায় বুঁদ হয়ে আছে, ভুবন লণ্ডভণ্ড হয়ে গেলেও কেউ টের পাবে না। এমন যে উৎকট নেশা, তার জোগানদার হলেন পিশাতিয়েলগণ। হাত-গাঁটে তাঁদের দু-চার পয়সা আসবেই, আমি-আপনি হিংসা করে করব কি?

আবার তা-ও বলি, হিংসা করতে গেলে পাপ হবে। আমার বাঙালি পাঠকেরা যেন কিছু কম যান ওদের চেয়ে। কত দিকে কত দারিদ্র্য, নিজেদের তবু নানা রকমে বঞ্চিত করে আপনারা বই কেনেন। বই কিনে কিনে আমাদের বাঁচিয়ে রাখেন, উৎসাহ দেন। প্রাণপাত করে লিখে যাই আমরা। বাংলায় তাই এত লেখক, বাংলার সাহিত্যে তাই এমন বৈচিত্র্য আর এত প্রাণবত্তা। মস্কোর এক সভায় বলেছিলাম আমি আপনাদের কথা বুক চিতিয়ে। — আমি এই মানুষ মশায়, চাকরিবাকরি করি নে — নিতান্তই বেকার; পাঠকেরাই আমায় খাওয়ান পরান। চেহারাখানা দেখছেন তো? (শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে কিঞ্চিৎ গায়ে-গতরে আছি) পাঠকেরা তা হলে খুব খারাপ খাওয়ান না, কি বলেন?...

যাকগে, যাকগে। মস্কোর রাস্তায় ভিড়ের ভিতর দাঁড়িয়ে আছি কিন্তু। টেনে বের করে নিয়ে যাবার জন্য ওঁরা দোভাষি পাঠিয়েছেন, আর আজেবাজে বকতেলেগেছি আপনাদের সঙ্গে। সেই তরুণী মেয়েটা জিজ্ঞাসা করে, লেখক! লেখক বট হে তুমি? নামটা কি শুনি —

নাম আবৃত্তি করে দু-তিন বার। স্মৃতি হাতড়ে বেড়াচ্ছে। হাসি পেয়ে

যায় আমার। পারবে না মানিক, মিথ্যে হয়রান হচ্ছ। লিখি তো ভালই (অন্তত আমারনিজের মতে) -- কিন্তু বশম্বদ ঢাকি জোটাতে পারি নি, কলম ছোঁয়াতে না ছোঁয়াতে যারা ড্যাডাং-ড্যাডাং করে কাঠি পিটতে লেগে যাবে। কান বাঁচাবার খাতিরে মানুষ তখন তাড়াতাড়ি রায় দিয়ে দেবে, হাঁ, হাঁ।—ক্ষমতা ধরো তুমি লেখক ; এবারে থামাও বাজনা। আমার তা হল না, গোড়ায় ভুল করে বসে আছি। নাম শুনে আমার নিজের দেশের মানুষই তিনবার মাথা চুলকায়, তোমা অবধি নাম পৌঁছবে কি করে দূরের-কন্যা ?

তরুণী ভাবতে থাকুক ভ্রূ কুঁচকে। ইতিমধ্যে এক মাঝবয়সি মহিলা এগিয়ে এসে পরিচয় দিচ্ছেন। আমার স্বামীও লেখক ছিলেন। আর আমি হলাম আর্টিস্ট, ছবি আঁকি। কলম ফেলে লড়াইয়ে ছুটলেন আমার স্বামী, আর ফেরেন নি। শোন লেখক, এই খবরটা শুনে যাও—লড়াইয়ে আমরা জিতেছি, কিন্তু গোটা সোবিয়েত দেশে এমন বাড়ি নেই যেখান থেকে একটি বলি অন্তত না গিয়েছে। ফুলের মতন কত ছেলে প্রাণ দিল, কোন দিন তার হিসাব হবে না। ছবি আঁকি আমি, আর অভিশাপ দিই যারা লড়াই বাধায়...

এমন একটি-দুটি নয়—লড়াইয়ের কথা উঠলেই, দেখেছি, বলতে বলতে মানুষ ক্ষেপে যায়, চোখ দিয়ে আগুন বেরোয়, চোখ ফেটে ধারা ছোটে। মস্কোয় লেনিনগ্রাডে এমন কি মধ্য-এশিয়ার মুসলমানি দেশগুলোয়—যেখানে যাবেন এমনি ব্যাপার। রাস্তাঘাটে পঙ্গু বিকৃতাঙ্গ অনেক দেখতে পাবেন, লড়াই দয়া করে যাদের প্রাণটুকু রেখে গেছে।

আর নয়, মহিলার দৃষ্টির সামনে থেকে এক ছুটে বাসের গহ্বরে। চালাও, চালিয়ে দাও—। আমাদের ওরা কত আপন ভাবে, তাই ভাবতে ভাবতে যাচ্ছি। রাস্তার নগণ্য মানুষটাও আনন্দে ডগমগ হয়। ভারত বড় ভাল, ভারত কোন দিন মারামারি-কাটাকাটি করেনি ইতিহাসের কোন অধ্যায়ে। ইণ্ডিস্কির কাছে মন খুলে দিতে বাধে না তাদের। দাশগুপ্তর কাছে ওদের ভালবাসার কত গল্প শুনলাম। বিনয় রায় আছেন—মস্কো রেডিওয় বাংলা-বিভাগের কর্মকর্তা, তাঁর কাছেও শোনা গেল। অপেরা-থিয়েটারের নামে পাগল ও-দেশের লোক— টিকিট কেনার জন্য কিউ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কখন থেকে। দাশগুপ্ত গুটিগুটি পিছনে গিয়ে জায়গা নিচ্ছেন—কোন দিক দিয়ে একজন এসে হাত চেপে ধরে হিড়হিড় করে নিয়ে চলল। সকলের আগে যে জন, তারও আগে দাঁড় করিয়ে দিল তাঁকে। তুমি ভারতের মানুষ—লাইন-টাইন তোমার জন্য নয় গো! এ-সব আমাদের। আর মেট্রোর ব্যাপার তো বিকেলবেলা নিজের চোখেই দেখতে পেলাম আজ। অফিস-ফিরতি ভিড়—এত জন আমাদের বসবার জায়গা

হচ্ছে না। মানুষ-জন উঠে দাঁড়িয়ে জায়গা করে দিচ্ছে। খুনখুনে বুড়ো-মানুষটা ডাণ্ডা ধরে ঝুলবে আর আমি মজাসে বসে বসে পা দোলাব, এটা কেমন হয়। হাত ধরে ঝুলোঝুলি করি তাঁকে বসাবার জন্য। জান কবুল, বসবেন না। দূর-বিদেশে রেলের কামরার ভিতর মারামারি করা তো যায় না, রণে ভঙ্গ দিয়ে আমাকেই তাই বসে পড়তে হল।

আরে, মস্কো–নদীর ধারে এসে পড়েছি যে। বাস থামল। ওপারের কূল ঘেঁসে ক্রেমলিন। একদল বাচচা ছেলেমেয়ে ইস্কুল থেকে ফিরছে। ধরতে যাই একটিকে। ভয় পেয়েছে, দৌড়ে অন্য প্রান্তে গিয়ে দাঁড়াল। আরও অনেকে ছুটছেন ধরবার জন্য। ওরাও ছুটেছে। কিন্তু একেবারে পালিয়ে যায় না -- দৌড়ে আর-এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে পড়ে কৌতুকদৃষ্টিতে তাকায়। শহর মস্কোর রাস্তার উপর ছোটয় আর বড়য় ওদেশ আর এদেশে লুকোচুরি খেলা শুরু হল দস্তুরমতো। রাস্তাটা খুব ফাঁকা, একটা-দুটো মোটর যাচ্ছে কদাচিৎ। দেখতে দেখতে খেলা খাসা জমে উঠল। অনেক শতাব্দীর বুড়ো ক্রেমলিন মিনার-গম্বুজের দশ-বিশটা মাথা তুলে মাথার উপর সোনার মুকুট চড়িয়ে আমাদের ছেলেখেলা দেখতে লাগল নদী-পার থেকে। শিশুদলের মধ্যে হঠাৎ এক বীর-পুরুষ খাড়া হয়ে দাঁড়াল, ছুটোছুটির মধ্যে তার কোন রকম নড়াচড়া নেই। ভারি পরোয়া করি কি না তোমাদের -- ভাবখানা এই প্রকার। বছর সাতেক বয়স। গায়ে হাত দিলাম, মুঠির মধ্যে হাত নিয়ে নিলাম -- দৃকপাত নেই। হাতে বই রয়েছে -- রংচঙে ছবির বই। সগর্বে দেখাচ্ছে খুলে। দেখাদেখি আরও সব আপোষে ধরা দিচ্ছে কাছ ঘেঁসে এসে। গ্রেপ্তার হয়ে গেল এবারে সকলেই। ক্যামেরায় ছবি নিচ্ছে। তখন তারাই হুড়োহুড়ি করছে পাশে এসে ছবির মধ্যে ঢোকবার জন্যে। বাচচা হলে কি হবে, জনতান্ত্রিক পৃথিবীতে ছবির মহিমা এরই মধ্যে বুঝে ফেলেছে।

ঘুরে ঘুরে রেড-স্কোয়ারে এলাম। আবছা আঁধারে কাল দেখে গেছি, আজ এই দিনের আলোর রেড-স্কোয়ার। মুসোলিয়ামের সামনাসামনি এসে দাঁড়িয়েছি। ঝকঝকে মিলিটারি পোশাকে চারজন নত-মাথায় বন্দুক নামিয়ে সারাদিন সারা-রাত্রি পাহারা দেয়। ঘুমোও ঘুমোও—হাজির রয়েছি আমরা ; রয়েছে আমাদের সঙ্গে কোটি কোটি মানুষের অতন্দ্র ভালবাসা। ঠিক একটা বেলা ; পাহারা বদল এইবার। ক্রেমলিনের বড় গেট দিয়ে গটমট মার্চ করে নতুন পাহারাদাররা এসে পড়ল। ঘুরে দাঁড়াল এরা, জায়গা ছেড়ে নেমে এলো। নতুনেরা ঠাঁই নিল সেখানে। মার্চ করে পুরানো দল ঢুকে পড়ল ক্রেমলিনের ভিতরে। আমাদের সঙ্গে ভিড় করে কত মানুষ এই পাহারা-বদল দেখছে !

অদূরে ডান হাতের দিকে বেসিল ক্যাথিড্রাল। কাল এত ইনিয়ে-বিনিয়ে বললাম, মনে পড়ছে না ? এটা নিয়ে মুশকিলে পড়েছে ওরা। সরায় নি, সরাবার জায়গা নেই। এমন ঐতিহাসিক বস্তু নষ্টও করা যায় না। রাস্তার ঠিক মাঝখানে নয় — ধারের দিকে বেমানান রকমে দাঁড়িয়ে আছে। চারিদিকে পথ। আর ঠিক সামনে, বলেছি তো, উঁচু বধ্যভূমি। রেড-স্কোয়ারের চেয়ে ঢের ঢের বড় স্কোয়ার মস্কো শহরেই অনেকগুলো আছে। পাশে, ঐ দেখতে পাচ্ছেন, ক্রেমলিনের উল্টো দিকে বিরাট ডিপার্টমেন্টাল-স্টোর। আর ক্যাথিড্রালের মুখোমুখি হল বিপ্লবের মিউজিয়াম ইত্যাদি। মস্কো ইতিহাসের পনের আনা ছড়ানো রেড-স্কোয়ারের আশে-পাশে এদিকে-সেদিকে। চৌহদ্দি বাড়ানো যায় কেমন করে তবে বলুন।

এক রাস্তায় এসে পড়লাম — তার একদিকে বেঁটেখাটো কাঠের বাড়ি, কতক বা কাঠে-ইঁটে মেশাল করা ; উপরে টালির ছাউনি। আর উল্টো দিকে দশতলা বিশতলা অট্টালিকা আকাশ ফুঁড়ে দাঁড়িয়ে আছে। এ-ও এক একজিবিশন যেন — কেমন ছিল পুরানো শহর, আর কি এখন হয়ে দাঁড়াচ্ছে। হুড়মুড় করে যা ভাঙাচোরা লাগিয়েছে — দশ-বিশটা বছর সবুর করুন, পুরানো মস্কোর চেহারা তখন ঐতিহাসিক বাড়ি কয়েকটা ছাড়া আর কোথাও খুঁজে পাবেন না।

এত করেও জায়গার অকুলান এখনো। এই শহরের এবং বড় বড় সকল শহরের যাবতীয় ঘরবাড়ি জায়গাজমি সরকার নিয়ে বসে আছে। লাখ টাকা ঢালুন কোটি টাকা ঢালুন, এক কাঠা জমি কেউ কিনতে পাবেন না। শহরের বাইরে অবশ্য পেতে পারেন -- জমি কিনে ঘরবাড়ি বানান, কয়েকটা গাছপালা এবং একটু সবজিক্ষেতও করতে পারেন আশেপাশে। শনি-রবিবারে ছেলেপুলে ও ইয়ারবন্ধু নিয়ে নিজের বাড়ি বসবাসের সুখভোগ করে আসুন। মরবার পর সে সম্পত্তি পুত্রপৌত্রেও পাবে। ব্যস, ঐ অবধি — ওর থেকে দু-এক বিঘে অন্যের কাছে বিলি করে যৎকিঞ্চিৎ খাজনার বন্দোবস্ত করবেন, সেটি চলবে না। আর শহরের মধ্যে যতক্ষণ আছেন ভাড়া-বাড়িতে থাকতেই হবে, তা সে ইন্দ্র-চন্দ্র-বায়ু-বরুণ যে দরের মানুষ হন না কেন আপনি। ঘরের জন্য নগর-সোবিয়েতে দরখাস্ত ঝেড়ে বসে থাকুন।

ঘর কি রকম দেবে, সেটাও শুনে নিন। এক মজার দেশ মশায়, আজব হিসাবপত্তোর। ষাট রুবল ভাড়ায় দুটো ঘর দেবে তো ষোল রুবলে পাঁচটা। ধরুন, য়্যুনিভার্সিটির অধ্যাপক আপনি বেতন তিন হাজার। এতৎসত্ত্বেও বিয়ে করেননি, একলা থাকেন। অতএব দুটো ঘরেই আপনার তোফা চলবে—বেশি

চাইলে দিচ্ছে কে ? ভাড়ায় তা বলে রেহাই পাচ্ছেন না, দু-পার্সেন্ট হিসাবে ষাট রুবল থোক দিয়ে যান। আর এক মাস্টার আছেন, নতুন ইস্কুলে ঢুকেছেন, মাইনে পাচ্ছেন আটশ'। ইতিমধ্যে বিয়েথাওয়া করে মাস্টার মশায় দিব্যি এক সংসার বানিয়ে ফেলেছেন, পাঁচটা ঘরের কমে কুলোয় না। বেশ, হল তাই, পাঁচ-ঘরওয়ালা ফ্ল্যাট পেলেন তিনি। ভাড়া ঐ মাইনের দু-পার্সেন্ট—ষোল রুবল। বিচার দেখুন তবে ষোল রুবলে একজনে পাচ্ছে পাঁচটা ঘর; আর ষাট রুবল দিয়ে অন্য জন দুটো। মোটামুটি একই ধরনের ঘর—কার্পেট বিছানো মেজে, আলো, রেডিও, গরম জল, ঠাণ্ডা জল, ঘর গরম রাখার বন্দোবস্ত—মাঝামাঝি আরামে থাকতে গেলে মানুষের যা-সমস্ত লাগে। অর্থাৎ জায়গা পাচ্ছেন যতখানি আপনার প্রয়োজন, ভাড়া দিচ্ছেন যত দূর আপনার সাধ্য। এই হল বিধি। মানুষের কম পক্ষে কতটা আরাম ও আনন্দের প্রয়োজন, তা-ও ওরা ছকে নিয়েছে। ভাড়ার ঘর বানাচ্ছে বলে তার নিচে নামতে পারবে না।

হোটেলে পা দিয়েই আবার এক ফ্যাকড়া। ফরম দিল প্রতি জনকে—এইটে পূরণ করে দিয়ে তার পরে উপরে যাও, খাওয়া-দাওয়া করোগে। বিয়ে করেছ কিনা—না করে থাক ভালই, করে থাকলে বউয়ের নাম-ঠিকানা ইত্যাদি সবিস্তারে লেখো। ব্যাপার কি ? আমরা স্ফূর্তি করে দেশ-বিদেশ ঘুরছি, দেশেঘরে সে বেচারিরা সংসার বহন করছে, তাদের নাম নেবার হঠাৎ গরজটা কি হল ? এখন নেই বটে, গরজ হতেও তো পারে। আইন ছিল, রুশ-মেয়ে বিদেশি কাউকে বিয়ে করতে পারবে না। সে আইন বাতিল এখন। কপালে থাকে তো প্রেম জমান, এবং সাহস থাকে তো বউ করে স্বচ্ছন্দে ঘরে নিয়ে চলুন। তার আগে জানা দরকার, ঘর আপনার ভরভরতি নয়। আগেভাগে সত্যি খবরগুলো লিখিয়ে নিচ্ছে, প্রেম একবার জমে উঠলে ঘরের গোলমাল তখন কি আর বলতে যাবেন ? পরম-সৌম্য বৃদ্ধ একজন আমাদের মধ্যে—মাথার চুল একটি কাঁচা নেই, তাঁকে দিয়েও ফরম পূরণ করাচ্ছে। আরে বাপু, সাড়ে তিন কাল গিয়েছে, আমি প্রেম জমাতে যাব কোন নাতনির সঙ্গে ? হলে কি হবে, আইন বয়সের হিসাব শুনবে না। এবং শুনতে পাই, প্রেম জমজমাট হলেও অবিকল সেই গতিক। ঐ অবস্থায় কফিনের মড়াও নাকি পাশমোড়া দিয়ে উঠে মিষ্টি মিষ্টি বুলি ছাড়তে শুরু করে।

বিকালে মেট্রোয় চড়লাম। মাটির নিচে রেলপথ, তার এই নাম। মস্কোর রাস্তায় বেড়াচ্ছেন কিম্বা অট্টালিকায় শুয়ে আছেন—টেরও পাচ্ছেন না, অনেক নিচে বিষম আওয়াজ তুলে পাতালের রেলগাড়ি ছুটোছুটি করছে। বিদ্যুতে

ছুটিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে; লাখ লাখ মানুষ ওঠানামা করছে। এত কাণ্ড, উপর থেকে তার ভাঁজ পাবেন না। পঞ্চাশ কোপেক অর্থাৎ আধ রুবল দিয়ে টিকিট কিনে টুক করে সিঁড়ির উপর উঠে পড়ুন। এসক্যালেটের অর্থাৎ চলতি-সিঁড়ি—সর্বক্ষণ সিঁড়িই উঠানামা করছে, মানুষ নয়। কষ্ট করে পা ফেলে নেমে যেতে হবে না, সিঁড়িই আপনাকে পাতালপুরী নিয়ে চলল। পাশাপাশি দেখতে পাবেন, আর এক কেতা সিঁড়ি হাজার হাজার মানুষ বয়ে ভূ-পৃষ্ঠে তুলে দিচ্ছে।

মেট্রোর মতলব ১৯২১ অব্দে মাথায় আসে। প্যারি লণ্ডন বার্লিন সর্বত্র আছে, মস্কো কেন বাদ যাবে? সেই থেকে বছরের পর বছর লাইন বেড়েই যাচ্ছে। শহরের তলদেশও অতএব একেবারে ফোঁপরা। গোটা শহর ঘুরে গোল হয়ে লাইন গেছে, আবার সোজাসুজিও বিস্তর লাইন ঐ বৃত্ত ভেদ করেছে। মস্কো-নদীটাও রেহাই করেনি, তার তলা দিয়ে লাইন (প্যারির সীন এবং লণ্ডনের টেমসে যেমন)। নদীতলের লাইন আরো—আরো নিচুতে। তাই দেখুন, পাতালে তলিয়ে গিয়েও নিস্তার নেই—দফায় দফায় সিঁড়ির উঠানামা। সিঁড়ি চড়ে এ-লাইনের পাশে এলেন, ঘুরে গিয়ে দেখুন ভিন্ন লাইন। খানিকটা নেমে নতুন আর-একটা। আবার বা উঠে পড়লেন খানিকটা। তলায় তলায় লাইনের জাল, গোলকধাঁধা ছাড়া কি বলবেন একে? ভাড়া কিন্তু ঐ একবার যা টিকিট করে নেমেছেন; টিকিটটা নিয়ে নিয়েছে নামবার মুখে। মেট্রো চলে সকাল ছ'টা থেকে রাত্রি একটা অবধি। পঞ্চাশ কোপেকের মূল্যে এই উনিশ ঘন্টা ধরে স্বচ্ছন্দে আপনি এ-গাড়ি ও-গাড়ি করুন—কেউ কিছু বলতে যাবে না। কত গাড়ি চড়বেন চড়ুন না। একবার ভূলোকে উঠে আবার যদি নামতে চান, তখনই নতুন টিকিট।

চতুর্দিক কাঁপিয়ে ভয়াবহ রকমের গতিতে এ-লাইনে ও-লাইনে ট্রেন এসে দাঁড়াচ্ছে। থামলেই দরজা আপনা-আপনি ফাঁক হয়ে গেল। উঠল নামল মানুষ। কয়েক সেকেণ্ড পরে আবার রওনা। দরজা সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ। স্টেশনে গিয়ে না থামা পর্যন্ত কুড়াল মারলেও এখন দরজা খুলছে না। একশ' পাঁচ সেকেণ্ড অন্তর গাড়ি; এক ঘন্টায় বত্রিশখানা।

আহা, পাতালে ইন্দ্রলোক বানিয়েছে রে! একেবারে দিনমান। আলো প্রখর নয়, অথচ আবছায়া ভাব নেই কোন দিকে। দিনমান বলেই অতি সহজে মেনে নেবেন। স্টেশনগুলো অপরূপ; কোটি কোটি রুবল খরচ করে সাজিয়েছে। এই এদের এক রেওয়াজ—যেখানে লোকের আনাগোনা, সে জায়গা আহা-মরি করে সাজাবেই। শিল্প-পরিবেশে প্রসন্নতা ও পরিতৃপ্তি আসুক পথের মানুষদের, রুচি জন্মাক। মার্বেল ও রকমারি পাথরের উপর কারুকর্ম—
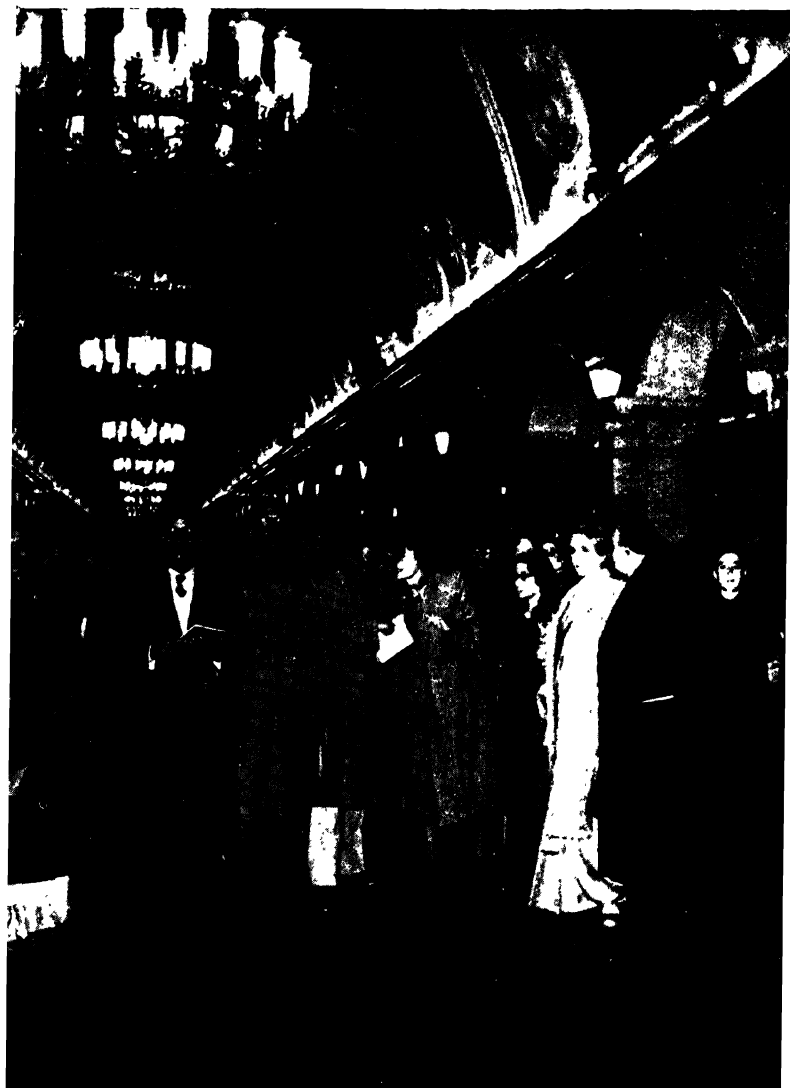
মেট্রোর স্টেশন। পাতালে ইন্দ্রলোক বানিয়েছে রে (পৃ. ৭২)

রেড-স্কোয়ার (পৃ. ৬৯)
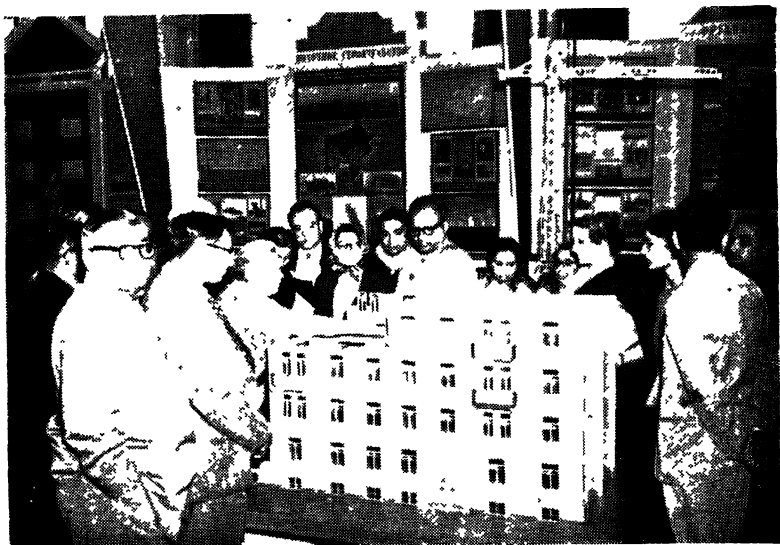
বিল্ডিং-একজিবিশন। মডেল সাজিয়ে রেখেছে (পৃ. ৯৯)

তার একটা টুকরোও বাইরের আমদানি নয়। হাঁকডাক করে দেশের মানুষদের যেন বলছে — তোমার কত কি আছে, চোখে দেখে নাও; গর্ব ও আত্মপ্রত্যয় জাগুক। চুয়াল্লিশটি স্টেশন — প্রতি স্টেশনের চেহারা আলাদা, আলাদা ছাঁদের অলঙ্করণ। দেয়ালে দেয়ালে ফ্রেস্কো। ইউক্রেন থেকে উজবেকিস্তান — বিভিন্ন জীবন-যাত্রা দেয়ালে দেয়ালে অদ্ভুত হয়ে ফুটেছে। এক স্টেশনের দেয়ালে আটটা খোপ বানিয়ে রঙবেরঙের টুকরো পাথরে ছবি করেছে। সাড়ে তিন লক্ষ টুকরো লেগেছে এক এক ছবিতে। পুরানো কাল থেকে জনমুক্তির যত চেষ্টা হয়েছে, সেই সব ছবি। পিটার দ্য গ্রেট আছেন, আরও সব আছেন; লেনিন স্ট্যালিনকে নিয়ে হাল আমলের ইতিহাস হল, তারও কিছু কিছু রয়েছে ছবিতে। আশিটা বিশাল ব্রোঞ্জমূর্তি — এঁরা সব বিপ্লবের বলি; সামান্য সাধারণ মানুষ প্রাণ দান করে চিরজীবী হয়ে আছেন। কী খরচ করেছে রে। পয়সাকড়ি আমাদের নয়, পদে পদে তবু আঁতকে উঠি। মানুষের চোখের সামনে দেশের পরিচয় তুলে ধরা, এর চেয়ে বড় সদ্ব্যয় ওরা ভাবতে পারে না।

একেবারে-খালি এক-একটা ট্রেন আসছে মাঝে মাঝে। প্ল্যাটফরমে একটা মেয়ে হাতের পাখা নাড়ছে, আর চিৎকার করছে: এ গাড়িতে উঠে পড়ো না কেউ। চার-পাঁচ ঘন্টা অন্তর গাড়ি সাফসাফাই করবার জন্য সাইডিঙে নিয়ে যায়; পরি-চ্ছন্ন ও বীজাণুমুক্ত করে পনের মিনিটের মধ্যে গাড়ি দিয়ে দেয় আবার লাইনে। মেয়েটা হল সিগন্যালার, স্টেশনে স্টেশনে প্রত্যেকটা লাইনের মুখে একজন করে আছে। হাতে যে পাখার কথা বললাম, ঠিক পাখা নয় — দেখতে জাপানি পাখার মতো গোলাকার চাকতি; এক পিঠে তার লাল। সতর্ক নজর রয়েছে। যদি ধরুন, কোন চড়ন্দার উঠতে না উঠতে গাড়ি ছেড়ে দিয়েছে, দু-দিক দিয়ে দরজা এসে চেপে ধরছে তাকে — পাখার লাল পিঠ ঘুরিয়ে ধরে তখুনি গাড়ি থামিয়ে দেবে। প্ল্যাটফরমে দুটো করে ঘড়ি। একটার সময় দেখে নিন; আর একটার কাঁটা ঘুরছে, পরের ট্রেনটা যত কাছে আসছে কাঁটা ঘুরে যাচ্ছে চিহ্নিত জায়গায়। বিকালবেলা এখন চড়ন্দারেরা বাজার-সওদা নিয়ে যাচ্ছে — রুটি, ফল-পাকড়, টিনের কৌটোয় এটা-সেটা। মাঝারি সাইজের স্যুটকেশ দেখছি মেয়েদের হাতে। স্টেশনে কুলি নেই, কেউ বয়ে দেবে না আপনার মাল, নিজে বইতে হবে। আর ঐ যা বলেছি — ভারতীয় দেখে জায়গা ছেড়ে সকলে উঠে দাঁড়াচ্ছে।

বিস্তর ঘোরাঘুরি হল। এবার উপরে উঠে যাব। মানুষ গুনতি করে একজন কম হয়ে যাচ্ছে। নিজেকে বাদ দাওনি তো হে, দেখ দেখ — অমুক আছেন, তমুক আছেন? মহিলা একজনকে দেখা যাচ্ছে না তো। গাড়ি বদলানোর

মুখে উঠতে পারেন নি, আগের স্টেশনে পড়ে আছেন। দোভাষি গাড়ি চেপে ছুটল তাঁর খোঁজে। আর এদিকে মিনিট খানেকের মধ্যে তিনি এসে হাজির। তখন আমরাই উঠে চললাম; দোভাষি থাকুক পড়ে পাতালপুরে। ওদের দেশ, চিনে ফিরতে পারবে ঠিক।

আজকেও থিয়েটার। থিয়েটার রোজ আছে। এমন থিয়েটার-পাগলা জাত আর দেখবেন না। শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা-বরফ সুযোগ দুর্যোগ বাইরে যেমনই হোক থিয়েটারের সমস্ত সিট ভরতি। সেই বড় বিপ্লবের দিনগুলোয় কি হয়েছিল, জানতে ইচ্ছে করে। থিয়েটার বন্ধ নিশ্চয় — অন্তত এই বাবদে মানুষগুলোর কি মর্মান্তিক অবস্থা !

যেখানে আছি, বলতে গেলে, থিয়েটার-পাড়া এটা। সকলের বুড়ো বলসই থিয়েটার। আশেপাশে আরও বিস্তর — তারাও কিছু কম যায় না। যাচ্ছি বাচ্চাদের থিয়েটারে। ভাববেন না, বাচ্চা ছেলেমেয়ের হৈ-চৈ মাত্র — অভিনেতারা শিশু নয়, সবাই পাকাপোক্ত; সিনসিনারিতে ফাঁকি নেই। দর্শকের চোদ্দ আনা শিশু, এই বয়স থেকে থিয়েটার দেখায় পরিপক্ক হয়ে উঠছে। অভিভাবকেরা ধরে ধরে পেঁাছে দিয়ে যান, ক্কচিৎ কদাচিৎ কেউ বা হলের ভিতরে ঢোকেন। শতকরা দশভাগ হলেন তাঁরাই। পরিচ্ছন্ন ভাল নাটক, উৎকৃষ্ট অভিনয়, ভাল গান — যা থেকে আনন্দ পায় শিশুরা, সব মানুষকে ভালবাসতে শেখে, দেশের সম্বন্ধে গৌরব বোধ করে, সৎ হতে উদ্বুদ্ধ হয়। ছেলেখেলা মনে করে না — এদের ভারি মনোযোগ শিশু-নাট্যশালার উপর। ইস্কুলের বাড়া — মজাসে পালা দেখছে, ওর মধ্যে কখন যে বড় হবার ভাল হবার মানুষ হবার চিনি-মাখানো পিল খাইয়ে দিচ্ছে, শিশুরা তা মালুম পায় না।

হলের ভিতরে ঢুকে দৃষ্টি আর ফেরাতে পারিনে। উপরে নিচে, এতলায় ওতলায় অজস্র ফুল ফুটে আছে। আজ্ঞে হঁ্যা, হলপ করে বলছি, ঝকমকে মুখ, ঝিকমিকে হাসি, পরিচ্ছন্ন বেশভূষা — ফুলই তারা। কৃষ্ণমূর্তি আমরা সব ঢুকছি, সমস্ত থিয়েটার উচ্ছলিত হয়ে উঠল। হাততালি দিয়ে সম্বর্ধনা করছে, আওয়াজ উঠল স্ফূর্তির। কতক্ষণ কেটে গেল — এ কী জ্বালা, থামতে চায় না।

ঐ-বড় থিয়েটার-হল বোঝাই একেবারে। আমাদের ক'জনকে পিছন দিকে এক জায়গায় নিয়ে বসাল। কাল টিকিট করে এনেছে, সামনের জায়গাগুলো তার অনেক আগে খতম। দেখতে পেয়ে শিশুর দঙ্গল এসে চড়াও হল। আগে নিয়ে বসাবে। তাদের কেনা সিট আমাদের ছেড়ে দিয়ে তারা এই পিছনে এসে বসবে। তাই কি হয় রে বাবা, এই লম্বা-ধিড়িঙ্গে মানুষগুলো সামনে পাঁচিল হয়ে

বসবে, বালখিল্য তোমরা দেখবেই না তো কিছু। যুক্তি মানবে না, হাত ধরে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাবে, এমন আবদেরে ছেলেমেয়ে দেখিনি কখনো। উঁহু, মিছে কথা বলা হল — দেখেছি এমনিধারা চীনে। বিদেশি মানুষ, ভিন্ন চেহারা, আলাদা পোশাকআশাক তা বলে এক বিন্দু সমীহ করবে না। ভাল-বাসার পুতুলটাকে যথা ইচ্ছা নিয়ে যেমন শোয়ায় বসায়, সেই রকম বিবেচনা করে আমাদের। আর আমার মনে পড়ে, অনেকদিন আগে কালিম্পং-হোমসের অদূরে পাহাড়ের পথে বিচরণের সময়কার এক ঘটনা। নিচের মাঠে খেলা করছে ছেলেরা। খেলা থামিয়ে 'কালা -- কালা--' বলে চেঁচাতে লাগল। সে সময়টা ঘোরতর ইংরেজি আমল, ছেলেগুলোও ষোল আনা না হোক, আধা ইংরেজ-বাচচা। অতএব শুনলাম না শুনলাম না — এমনি ভাবে এগোচ্ছি। তাই কি ছাড়ে, সদলবলে কাছে এসে চেঁচাতে লাগল -- 'বাঙ্গালি বাবু ডাল-ভাত খাবু ?' পদ্য মেলানোয় খুব মুখ পাকিয়েছে, দেখা গেল, ঐ বয়সে -- বাংলা পদ্য। এখন আজাদির পরে কি ধরনের পদ্য মেলাচ্ছে, শুনে আসতে মাঝে মাঝে লোভ হয়।

যাকগে, যাকগে। ড্রপ উঠল ঐ যে। পুসকিনের লেখা গল্প, তার নাটক হয়েছে। সুরকার চেকভস্কির দেওয়া সুর। জলা জায়গায় একটা ছেলে ছিপে মাছ ধরছে, এক মেয়ে এসে খুনসুটি করতে লাগল, ঢিল ফেলছে চারের মাছ যাতে সরে যায়। জলে শব্দ হচ্ছে, জল ছিটকেও উঠল একটু। সত্যি, আয়োজন ষোল আনার উপর আঠারো আনা। বাচচা বলে অবহেলা নেই। বাচচাদের ভাগ্য দেখে হিংসা হয়।

একটা ড্রপের পরে বেরিয়ে এসেছি। দোভাষি পল সঙ্গে। রক্ষে আছে ? সবাই প্রোগ্রাম এগিয়ে দিচ্ছে, অটোগ্রাফ দাও ওর উপর। পড়তে পারবে না — তা কি হয়েছে -- দাও লিখে ওর উপরে নাম, আমরা রেখে দেব। বাঁধানো খাতাও বেরুল কয়েকখানা। সইয়ের পরে বিনয়ে ঘাড় হেঁট করে ধন্যবাদ জানায়। আমরা বড়-মানুষরাও এত দূর পারিনে কিন্তু। দেদার সই মেরে যাচ্ছি — শ'খানেক হয়ে গেল বোধ হয়। আমি একা নই, সবাই এমনি পাইকারি হারে চালাচ্ছেন। এমনি সময় ঘন্টা বাজল, ভিতরে যেতে হবে। বেঁচে গেলাম রে বাবা, নয় তো আঙুল ব্যথা হয়ে যেত। তাড়াতাড়ি করে এবারে খাটনির বখশিস্ দিচ্ছে আমাদের। কেউ ইস্কুলের ব্যাজ পরাচ্ছে, পায়োনিয়ররা গলার লাল রুমাল খুলে জড়িয়ে দিচ্ছে আমাদের গলায়।

ঝিরঝিরে বৃষ্টি হচ্ছে, কনকনে বাতাস। হোটেলের দরজা খুলে বাইরে পা দিতে কাঁপুনি ধরে যায়। বেরিয়েছি এক একটা যেন পশমি কাপড়ের বাণ্ডিল। সামলে ওঠা তবু দায়। এই হল এখানকার সাধারণ আবহাওয়া। বলি, এমন মুখ-আঁধারি আকাশের নিচে এত ঠাণ্ডায় থাক কি করে তোমরা ? মাস কয়েক পরে প্রথম অঘ্রানে ঐ দোভাষিদের একজন—যীরা এসেছিল কলকাতায়। সে এসে পাল্টা শোধ দিয়ে গেল, উঃ—এমন জ্বলজ্বলে রোদের মধ্যে এত গরমে থাক কি করে তোমরা ?

ফুটপাথের গা ঘেঁসে সারবন্দি মোটরগাড়ি। ইঞ্জিন গর্জাচ্ছে। স্টার্ট এমনি দেওয়াই থাকে—গাড়ির ভিতরটা কুসুম-কুসুম গরম, গরম করার যন্ত্রটা চালু রাখে স্টার্ট এই রকম বন্ধ না করে। ফটক থেকে ফুটপাথটুকু মাত্র পায়ে হেঁটে পার হওয়া। মোটরের গর্ভে ঢুকে পড়লে আর শীত নেই, দিব্যি আরাম।

বাচ্চাদের বইয়ের কেন্দ্রভবনে (The Central House of Books for Children) যাচ্ছি। শিশু-শিক্ষণের যত রকম ব্যবস্থা হতে পারে, সোবিয়েত দেশে কোনটা তার বাকি রাখে না। কত ভাবেন পণ্ডিতেরা, কত রকমের তোড়জোড় ! কেন্দ্র-ভবনে গিয়ে কিছু কিছু তার নমুনা দেখে আসি।

গাড়িগুলোএকে একে ভবনের ফুটপাথের কিনারায় গিয়ে থামল। একছুটে দুয়োর ঠেলে ভিতরে ঢুকে পড়ি। টুপি খুলে ওভারকোটের বোঝা নামিয়ে পুনশ্চ ভদ্রলোক। উপরে-নিচে এঘর-ওঘর ঘুরে ঘুরে এবার ওদের কাজকর্ম দেখুন। আর কোন ঝামেলা নেই।

কর্ত্রী এলেন, ইয়া লম্বাচওড়া দশাসই মানুষ—স্বাস্থ্যে ঝলমল করছেন। আয়তনে মালুম হবে অনেক বয়স ; কিন্তু মুখের দিকে চেয়ে উল্টো ভাববেন। কচিকাঁচা মুখ—যে শিশুদের ব্যাপার নিয়ে মেতে আছেন, তাদেরই একজন যেন। বললেন, বসুন একটুখানি—চা-টা খেয়ে নিন। আগেভাগে প্রতিষ্ঠানের দু-চার কথা শুনুন, পরে তা হলে দেখবার সময় সুবিধা হবে।

বাচচাদের বই লেখা ভারি কঠিন, অন্য দশরকম বইয়ের মতন নয়। ছাপায় ছবিতে বিস্তর ভাবনাচিন্তা করতে হয়। বিষম দায়িত্বের কাজ। লড়াইয়ে কত ক্ষতি হয়েছে দেশের, কত মানুষ মরেছে, কত সমস্ত পরিগঠন-ব্যবস্থা বানচাল হয়েছে। শিশুরাই এখন ভাবীদিনের ভরসা, তাদের ঘিরে যত উদ্যোগ-আয়োজন। সত্যিকার মানুষ হয়ে যাতে তারা গড়ে ওঠে, সেইটে দেখতে হবে সকলের আগে। অতএব ওদের হাতে যে বই দেব, তা হেলাফেলার বস্তু নয়। খাটতে হবে এর জন্য। শিশুগ্রন্থ-প্রকাশনের মস্তবড় প্রতিষ্ঠান -- বিশ বছর ধরে চলছে। এই গ্রন্থভবন তারই ভিতরে। এর বয়স পাঁচ।

একগাদা রংচঙে বই রয়েছে টেবিলে। নেড়েচেড়ে দেখি। ভাষাটা রুশীয়, পড়তে পারিনে। কিন্তু ছবি দেখে ভিতরের বস্তু বড় অজানা থাকে না। প্রতি বইয়ের শেষে ছাপা রয়েছে, ঐ দেখুন -- আপনারা আর পড়ছেন কি করে? --- ছাপা রয়েছে, বই পড়ে কেমন লাগে জানিও, দোষগুণ সমস্ত লিখো। তা নতুন কোন বই বেরুলে হৈ-হৈ পড়ে যায় ছেলেপুলের মাঝে। খুব চিঠিপত্র লেখে। আর বই তো হামেশাই বেরুচ্ছে। কমপক্ষে তিন শ চিঠি পাই রোজ আমরা।

এক একটা বই নিয়ে যত চিঠি আসে, আলাদা ফাইল করে রাখা হয়। ছ-মাসে যত চিঠি এসেছে, আমাদের দেখালেন। গাদা হয়ে গেছে।

শিশুরা নিজের জিনিস ভেবে স্ফূর্তি করে লিখছে, প্রত্যেকটা চিঠির জবাব দিই। এর জন্য পুরো এক ডিপার্টমেন্ট। বুলেটিন বেরোয় প্রতিষ্ঠান থেকে -- তাতে বিশেষ এক বইয়ের সম্বন্ধে যেসব ভাল চিঠি এসেছে তার কতক তুলে দেওয়া হয়। বই যিনি লিখলেন বা সম্পাদনা করলেন, এবং যিনি ছবি আঁকলেন, বিশেষ বিশেষ চিঠি তাঁদের কাছেও পাঠাই। অথবা ডেকে এনে শুনিয়ে দিই। শোন তোমরা, কি বলছে তোমাদের পাঠক। শিখে যাও, ভবিষ্যতে এই অভিজ্ঞতা যাতে কাজে লাগাতে পার। শিশুমনের অন্ধিসন্ধি লেখক-চিত্রকররা জেনে নেন এই সব চিঠিপত্রের ভিতর দিয়ে।

শুনবেন নাকি একটু-আধটু? চিঠির গাদার ভিতর হাত ঢুকিয়ে খান কয়েক টেনে নিয়ে শোনাতে লাগলেন। দশ বছরের ছেলে লিখছে -- টমাসকে নিয়ে কবিতা লিখেছ, তা পড়লাম। আমাদের এখানে ঠিক ঐ ধরনের দুষ্টু ছেলে আছে একটা। তোমার কবিতায় টমাসের মতপরিবর্তনের কথা আছে। আমরা কিন্তু ঠিক ঐ পথ ধরে এ-ছেলের কিছু করতে পারলাম না। আবার কবিতা লেখো, নতুন দু-একটা কায়দা থাকে যেন তাতে।...

আর এক বছর আষ্টেকের ছেলে লিখছে, জাদুদণ্ড কোথায় পাওয়া যায় হ্যাগো

লেখক মশাই ? ঠিকানাটা অতি অবশ্য পাঠিও। যেমন করে হোক, আমার চাই একটা ...

এক গল্পের নায়ক ডায়েরির আকারে আত্মকাহিনী বলেছে। শিশু-পাঠক সেই নায়ককে চিঠি দিয়েছে, তোমার ডায়েরি পড়লাম ভাই। আমার বাবা বারাণ্ডার উপর ঘর বানাতে দিচ্ছে না তোমার মতো। কি করি বলো তো ? তোমার বাপ-মা'কে আমার ভালবাসা জানিও।

এ তো গেল সাদামাঠা চিঠিপত্র। সমালোচনাও আছে—লেখা ও ছবি নিয়ে বাচ্চা পাঠকদের অভিমত। খানিক খানিক পড়ে দোভাষির মারফতে মানে বুঝিয়ে দিলেন। ওরে বাসরে, কী কঠোর নির্মম ক্ষুদে বিচারকরা! বড়দের সমালোচনায় দয়াধর্ম থাকে, রেখে ঢেকে বলেন তাঁরা চক্ষুলজ্জার খাতিরে। এদের হাতে মাথা-কাটার গতিক। বই লিখে ফেলে লেখক বোধ করি থরহরি কাঁপেন পাঠক মশায়দের রায় কি রকমটা দাঁড়াবে। ছোট মানুষ বলে মতামত হেলা করা হয় না। আট বছরের ছেলে ছবির সম্পর্কে লিখে পাঠিয়েছে—সেই ছবির পাতাটা খুলে মিলিয়ে দেখলাম। ওদের দৃষ্টি দিয়ে দেখেছে, বড়রা অনেক সময় অমন করে ধরতে পারেন না। মতামতটা চিত্রকরের অতএব নিশ্চয় কাজে লাগবে!

এখান থেকেই ঠিক করা হয়, কোন কোন বই চলবে। সেগুলো ছাপতে চলে যায়। যাঁরা শিশুদের বই লেখেন, সকল রকমে সাহায্য করা হয় তাঁদের। বই যত দূর নিখুঁত করা যেতে পারে, সেই চেষ্টা। শিশুদের মাঝে মাঝে নিমন্ত্রণ করা হয়; লেখকেরা তার মধ্যে থাকেন। শিশু-পাঠক আর লেখকের মধ্যে বুঝসমঝ হয় এমনি ভাবে, মিষ্টি সম্পর্ক গড়ে ওঠে। লেখক বই লিখে এনেছেন। ছাপানোর আগে সেটা পড়া হল এমনি এক সভায়। লেখক ভেবেছিলেন, ছেলেমেয়েরা খুব হাসবে। উল্টো হল, তারা গম্ভীর হয়ে বসে রইল। একটা মানুষকে ব্যঙ্গ করা হয়েছিল লেখার মধ্যে। আমরা বড়রা হেন ক্ষেত্রে হাসা-হাসি করি, ওরা বেদনা পায়। লেখককে পালটাতে হল সেই সব ব্যঙ্গের জায়গা। পাণ্ডুলিপি লেখকেরা অনেক সময় এখানে রেখে যান, শিশু-পাঠকেরা ধীরে সুস্থে পড়ে যাতে সমালোচনা করতে পারে। শিশু মানে আড়াই থেকে সতের বছরের ছেলেমেয়ে। এদের পাঠযোগ্য বই নিয়ে ভাবনা-চিন্তা-গবেষণা। যাদের সতের পেরিয়েছে তাদের বই অন্য প্রতিষ্ঠানের হাতে। ইস্কুলপাঠ্য বইও এঁদের এক্তিয়ারে নয়।

শুধুই রুশ-ভাষার বই। লেলিনগ্রাডে শাখা আছে। নানান ভাষাগোষ্ঠী নিয়ে সোবিয়েতের বিভিন্ন রিপাবলিক; প্রতি ভাষার জন্য আলাদা আলাদা

লাইব্রেরি আছে শিশুদের জন্য। রকমারি সংগ্রহ (পৃঃ ৭১)

ফুটফুটে কত ছেলেমেয়ে একমনে পড়ছে (পৃঃ ৭৯)

এমনি প্রতিষ্ঠান। ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকে বিভিন্ন ভাষা-প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে। একে অন্যকে সাহায্য করে; একের গবেষণার ফল সকলে ভাগ করে নেয়। ধরুন, একখানা অতি উপাদেয় বই বেরুল তাজিক ভাষায়। সঙ্গে সঙ্গে সেটা রুশে তর্জমা করে এখানকার শিশুদের সামনে ধরবে। রুশীয় অবশ্য সকলের প্রধান। রুশভাষাটা সকলের শিখতে হয়। সোবিয়েতের সকল প্রান্তের তাবৎ শিশু কোন প্রকার উত্তম উপভোগ থেকে বঞ্চিত না হয়, শিক্ষানেতারা তার জন্য কোমর বেঁধে আছেন।

মাসে একবার দু-বার শিশুসাহিত্য নিয়ে বৈঠক বসে। লাইব্রেরির লোক, সমালোচক, লেখক, শিল্পী, শিক্ষক — এঁরাই সব আসেন। কেমন কাজ হচ্ছে, কি ধরনের বইয়ের অভাব আছে, চাহিদা বেশি কোন বইয়ের — এমনি সব শলাপরামর্শ চলে। বার্ষিক কাগজ বেরোয়, তাতে বৈঠকের বিবরণ থাকে। কনফারেন্স হয়; সোবিয়েতের নানা অঞ্চল থেকে গুণী-জ্ঞানীরা বিস্তর আসেন। শিক্ষাদপ্তর থেকে বিচারক নিযুক্ত হন — কনফারেন্সের যাবতীয় আলোচনা থেকে ভাল ভাল পেপার বাছাই করে দেওয়া হয় রিপোর্টে। যেমন — 'রুশীয় উপকথা শিশু-শিক্ষণের দিক দিয়ে কি কাজ করেছে?' 'গোর্কিকে শিশুদের সামনে কি ভাবে উপস্থাপিত করা হবে?' এমনি সব বিষয় নিয়ে লেখা।

লাইব্রেরি আছে শিশুদের জন্য। রকমারি সংগ্রহ। শুধু মাত্র রুশীয় নয়, অন্যান্য ভাষার বইও আছে! রুশ ভাষারই বেশি অবশ্য। কাছাকাছি শিশুরা এসে পড়াশুনা করে, কিন্তু দূরের কারো আসতে মানা নেই। একজিবিশন হয়, সেই সময় বড়রা আসেন। অভিভাবকেরা আসেন — তাঁদের বিশেষভাবে আমন্ত্রণ করা হয়। লেখকে লেখকে মেলামেশার ব্যবস্থা রয়েছে। পাকা লেখকেরা নতুনদের শেখান, ছোটরা কি চায় — কোন কায়দায় লিখতে হয় তাদের বই।

লাইব্রেরিতে ঘুরতে বেরুলাম। ফুটফুটে কত ছেলেমেয়ে এক মনে পড়ছে। নিঃশব্দ, পরম শান্ত। উল্টেপাল্টে দেখছি নানান বই। কী ভাল যে লাগল! আমরাও করেছি এই ভারতে—দেখো না, ক'টা বছরে আমরাও কত ভাল ভাল বই দেব আমাদের বাচ্চাদের সোনার হাতে। জীবন-চরিতের চাহিদাই বেশি — তা আবার লেখকদের জীবন, আদিকাল থেকে লিখে লিখে যাঁরা এদের আনন্দ দিয়ে আসছেন। লেখক, লেখক, লেখক — কোথায় লাগে রাজ্য-দিক্‌পালেরা লেখকের কাছে! লেখায় আর ছবিতে মরা-লেখকদের বাঁচিয়ে ধরেছে শিশুদের সামনে। এ সব বই পাতার এক পিঠে ছাপা, ইচ্ছে হলে কেটে নিয়ে দেয়ালে টাঙাতে পারো।

একেবারে বাচ্চাদের জন্য তিন রকমের ছবির বই — খেলনার ছবি; বাচ্চা

যে সব জিনিস ব্যবহার করে তার ছবি ; আর, ঘরের ঠিক বাইরে বাচ্চা যা সমস্ত দেখতে পায়। পৃথিবীর নানান দেশের উপকথা ছবি দিয়ে বের করেছে। ভারতের সম্পর্কে খুব আগ্রহ। ভারতের কাজকর্মের খবরাখবর ওঁরা পেতে চান ; শিশুদের জন্য ভারতে যে সব ভাল ভাল বই রয়েছে, পেতে চান সেগুলো। অনেক ভারতীয় মানুষ কথা দিয়ে গেছেন, দেশে গিয়েই ভারী ভারী প্যাকেটে বই পাঠিয়ে দেবেন। কর্ত্রী হেসে বললেন, ভুলে যান তাঁরা — একটা প্যাকেটও আজ অবধি আসেনি। আমরাও তৎক্ষণাৎ প্রতিশ্রুতি দিলাম, এবং ভবনের বাইরে এসে ভুলে গেলাম যথারীতি।

মাইনে-ভোগী সর্বক্ষণের সম্পাদক পঞ্চাশ জন। লেখকেরা এঁদের কাছে পাণ্ডুলিপি দেন। এখানে নামঞ্জুর হলে উপদেষ্টা-সমিতি আছে — তাঁদের কাছে দাখিল করতে পারেন। তাঁদের উপরেও আছে। এবং সকলের উপরে খুদ শিক্ষা-মন্ত্রী। শিশুদের বই শিক্ষা-দপ্তরের ; অপর যাবতীয় বই সংস্কৃতি-মন্ত্রীর তাঁবে।

চলুন, বলসই থিয়েটারে।, পালা দেখা যাক। তাড়াতাড়ি ডিনার সেরে টুপি-ওভারকোট মুড়ি দিয়ে নিন। বলেছি তো, একেবারে পাড়ার মধ্যে। পায়ে হেঁটে যাওয়া যাবে পথটুকু।

বলসই থিয়েটার অথবা ম্যাজেস্টিক স্টেট থিয়েটার। দুনিয়ার সেরা থিয়েটারগুলোর মধ্যে একটি। বয়সে খুব প্রবীণ—উনিশ শ' তিপান্নয় একশ' পঁচাত্তর পুরে গেছে। সেই বাবদে উৎসব হল জাঁকিয়ে। বাড়িটার চেহারাতেও পুরানো বনেদিয়ানা। মোটা মোটা থাম, ভারী ভারী খিলান — কার্নিশের উপর ব্রোঞ্জের এপোলো-মূর্তি। সোনালি কাজকর্মের ছড়াছড়ি হলের ভিতরে। অতিকায় বেলোয়ারি আলোর ঝাড়, দেয়ালচিত্র — যেদিকে তাকাবেন বিপুল আতিশয্য ঘরবাড়ি-ময় এলিয়ে ছড়িয়ে আছে। আধুনিক রীতির অল্প-বিস্তর ছিমছাম কাজকর্ম নয়।

সুবিশাল ঐতিহাসিক এই রঙ্গক্ষেত্রে ঢুকে মনটা অন্য রকম হয়ে যায়। পুরুষ পুরুষান্তর ধরে লক্ষ লক্ষ মানুষ আনন্দ কুড়াতে এসেছে এখানে — সেই অবিরাম প্রবাহের সঙ্গে মিলেমিশে আমরাও কত সমুদ্র কত পর্বতের ওপার থেকে আজ এসে পড়লাম।

পোর্টিকো পার হয়ে গিয়ে — বাপরে বাপ, শুধু এক ওভারকোট জমা দেবারই বা কত দিকে কত জায়গা ! জমা দিয়ে এক একটা নম্বর পকেটে ফেলুন। তারপর সিট খুঁজে বসে পড়ুনগে যান। সে বড় সহজ ব্যাপার নয়। ছ-তলা

বলশই থিয়েটার। মোটা মোটা থাম ..
কার্নিশের উপর ব্রোঞ্জের অ্যাপলো-মূর্তি (পৃ. ৮০)

কৃষি-প্রদর্শনী। রাক্ষুসে আয়তনের আলু... (পৃ. ১১০)

বাড়ি, রকমারি সিট — ডাইনে-বাঁয়ে উপরে-নিচে এদিক-সেদিক হরেক গলিঘুঁজি সিটে পৌঁছবার। দোভাষিরা ছিল তাই — নইলে সেই গোলকধাঁধার মধ্যে নিজের ঠাঁই খুঁজে নেওয়া বাইরের লোকের সাধ্য নয়। সাধারণের সিট বাইশ-শ। টিকিটের দাম পাঁচ থেকে পঁয়ত্রিশ রুবল — অর্থাৎ মোটামুটি সাড়ে-পাঁচ থেকে টাকা চল্লিশ। একটা সিটও খালি পড়ে থাকে না এর মধ্যে।

ভিতরে ঢুকে দেখুন শুধুই নরমুণ্ড। তিন দিন আগে টিকিট করেছে, তবু আমাদের ছত্রিশ জনের জায়গা একত্র নয়, এক তলাতেও নয় — দশ জন এখানে বসল, সাত জন ঐ ওখানে, জন পনেরো হয়তো সুদূর ঊর্ধ্বলোকে — সাদা চোখে যাদের ক্ষুদে ক্ষুদে দেখাচ্ছে। আজ্ঞে না, বাড়িয়ে বলছি নে — ছ-তলা পাঁচ-তলায় যারা বসেছে, নিচে থেকে তাদের মোটের উপর মানুষ বলেই বুঝতে পারা যায় — ব্যস, ঐ পর্যন্ত। বাইনোকুলার সঙ্গে নিয়ে সকলে থিয়েটারে আসে। জাতটা ধরেই থিয়েটার-পাগলা। খাওয়া-পরা যেমন, থিয়েটার দেখাও তেমনি। বাপ-মা বাচ্চা ছেলেমেয়েদের সঙ্গে করে এনে থিয়েটারে রপ্ত করে। শুধু এক মস্কো শহরেই চুয়াল্লিশটা থিয়েটার, কালে ভদ্রে তার মধ্যে দুটো-একটা সিট খালি থাকে। অতএব যেমন এদের জামা-জুতো চাই, থিয়েটার দেখার বাবদে বাইনোকুলারও চাই এক একটা। এখন ড্রপ পড়ে আছে। অন্য কাজের অভাবে বাইনোকুলারগুলো, দেখি, আমাদের দিকে তাক করেছে। একই টিকিটে এটা হল উপরি-পাওনা — বাইনোকুলার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এই যে ভারতীয় মানুষ দেখে নিচ্ছে।

মীরা ইরা পল ডিমিট্রোভ বরখুদারভ — যে ক'টি দোভাষি আমাদের খেদমত করে বেড়ায়, শশব্যস্ত সকলে। অনেকগুলো দল হয়ে গেল, একজন দু'জন করে দলের সঙ্গে বসেছে। পল আমাদের মধ্যে। এত বড় প্রেক্ষাধরের কোথাও তিল-ধারণের জায়গা নেই, কিন্তু স্টেজের ঠিক সামনাসামনি দোতলার উপরে প্রশস্ত একটা খোপ একেবারে খালি। মখমলে-মোড়া বিস্তর কারুকার্য-করা — হলের মধ্যে সব চেয়ে লোভনীয় জায়গা। জারেরা ঐখানে বসে থিয়েটার দেখতেন। রাজা-রাণী রাজপুত্র-রাজকন্যা ইত্যাদি ছাড়া বাজে লোকের ঢোকবার জো ছিল না। জারের দিনকাল খতম হয়েছে, এখনও বিশিষ্টদের জায়গা ওটা। আমাদের জওহরলাল ঐখানে বসে থিয়েটার দেখে এসেছেন। ভারি দরের মানুষ না পেলে অমন খাসা জায়গাটা খালি পড়ে থাকে।

কনসার্ট আরম্ভ হয়ে গেল। ব্যাণ্ডমাস্টার উঠে দাঁড়িয়ে বাদ্যচালনা করছে। আশি জন বাজনদার, গুণে দেখলাম। বলশই থিয়েটারে নাটক হয় না, শুধু অপেরা আর ব্যালে। কোন পালাতেই পাত্রপাত্রী কথা বলে না, গান গেয়ে

বলে যায়। সাজপোষাক সিনসিনারি আর আলোর খেলা। অনেকগুলো পালা দেখেছি এখানে। এই স্বর্গ, চক্ষের পলকে আবার নরক হয়ে গেল। পরীরা উড়ছে, গাছ ফুলে ফুলে ভরে গেল — আরও কত কি! বলে বোঝান যাবে না। স্টেজের একেবারে সামনে বসে দেখছি, কোত্থেকে যে কি হয়ে যাচ্ছে, মালুম পাইনে। ক্ষণে ক্ষণে চোখ কচলে বুঝতে হয় যে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছি না — সত্যি সত্যি খোলা চোখের সামনে এই সব দেখাচ্ছে।

আজকে এক ঐতিহাসিক পালা। পল প্রোগ্রাম এনে দিল — কি বুঝব, আগা-পাশুলা রুশীয়। চীনে সুবিধা ছিল -- প্রোগ্রাম দিত, চীনা ছাড়াও তাতে ইংরেজি অনুবাদ থাকত। এরা ওসব ধার ধারে না। প্রোগ্রাম দেখে দেখে পল গল্পটা একটু বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করছে, হেনকালে ড্রপ উঠে গেল। পল বলে, চিনতে পার?

জবাব দেব কি, সবাই হাঁ হয়ে গেছি। এ বস্তু ধারণায় আনা যায় না। স্টেজ নয়, গড়ের মাঠ। মাঠ বলছি অবশ্য জায়গার পরিসর বিবেচনায়। মাঠের মতন ফাঁকা নয়। গোটা স্টেজ জুড়ে, দেখতে পাচ্ছি, সেকেলে শহর একটা।

এক ধারে আঙুল দেখিয়ে পল জিজ্ঞাসা করে, দেখ তো কি ওটা? চিনতে পারছ না?

তাই তো হে! নয়-চূড়ার বেসিল-ক্যাথিড্রাল -- হোটেল থেকে ক্রেমলিনের দিকে বেরুলেই হামেশা যা নজরে আসে। কী কাণ্ড, পুরো ক্যাথিড্রালটা এই রাত্রিবেলা যেন তুলে এনে স্টেজের উপর বসিয়ে দিয়েছে। ক্যাথিড্রালের ওদিকটায় -- হাঁ, ক্রেমলিনেরই দেয়াল বটে!

পল বলে, ষোল শতকে ক্রেমলিন মোটামুটি এই রকম ছিল। আর পুরো সিনটা হল সেই সময়ের মস্কো শহর।

শেষ রাত্রি। মেঘ ভাসছে আকাশে। কে বলবে, সত্যিকার মেঘ নয়? ক্রেমলিনের ফটকের উপর দিয়ে ক্যাথিড্রালের চূড়া ছুঁয়ে মেঘ ভাসতে ভাসতে অদৃশ্য হয়ে গেল। আবছা আঁধার কেটে ভোরের আলো ফুটছে ক্রমশ। কনসার্টে প্রভাতী বাজনা। সূর্য উঠল। ঘড়াং করে খুলে গেল ক্রেমলিনের ফটক। ডিউকের সাঙ্গোপাঙ্গরা বেরিয়ে আসছে। আসছে তো আসছেই — শ-দুই হবে গুণতিতে। তার পরে ঘোড়ায় চড়ে খোদ ডিউক মশায় দেখা দিলেন। ছ-জন পাত্রমিত্রও ঘোড়ায়। এতগুলো ঘোড়া স্টেজে এসে দাঁড়াল, কত বড় স্টেজ এর থেকে আন্দাজ করে নিন। সত্যিকার ডিউক চোখে দেখিনি; এ যুগের মানুষ হয়ে ডিউক দেখার ভাগ্য হবে না কখনো। তবে হ্যাঁ, এদের দেখে মনে হল -- এই রকম চেহারা গোঁফদাড়ি পোশাকআশাক চালচলনই ডিউকের হওয়া

উচিত। ধর্মীয় কলহ নিয়ে নাটক। দুই প্রতিপক্ষ—ডিউক আর পাদরি।

এক একটা সিন অনেকক্ষণ করে চলে। পর্দা পড়ে, খানিকটা বিরাগ। আবার কনসার্ট শুরু হয়ে যায়। পর্দা উঠে গিয়ে নতুন দৃশ্য। বন্দুকধারী সৈন্যদের আড্ডাখানা। বন্দুক সেকেলে, সাজপোশাকও তাই। মাতলামি করছে সৈন্যরা, খুব তড়পাচ্ছে। হেনকালে বউরা দল বেঁধে এসে পড়ল। সৈন্যেরা যত বড় বীরই হোক, বউরা ততোধিক; তাদের সামনে সৈন্যদল একেবারে কেঁচো। সকল দেশে এবং সর্বকালে, দেখা যাচ্ছে, এই এক গতিক।

শেষ দৃশ্যটা সকলের চেয়ে জমজমাট। ডিউকের প্রাসাদের ভিতর উৎসব-সমারোহ। নাচওয়ালীরা এসেছে নানান দেশ থেকে। নাচের পর নাচ। পালার ভিতরে কায়দা করে পৃথিবীর অনেক জায়গার বিস্তর পুরানো নাচ ঢুকিয়ে দিয়েছে। অঢেল নাচ দেখা গেল। সর্বশেষে মেরে ফেলল ডিউককে। তখন পাঁচ-শ লোক স্টেজের উপরে অভিনয় করছে। আমি গণেছি, আরও কেউ কেউ গণে থাকবেন। কী বৃহৎ কাণ্ড, ভেবে দেখুন। তার পরে পর্দা পড়ল।

এক-একটা সিন হয়ে পর্দা পড়ে, অমনি হাততালি। ঐ রেওয়াজ।—ভারি আনন্দ পেয়েছি, তাবৎ দর্শকের প্রাণঢালা ভালবাসা নাও। সে কী হাততালি, থামতে চায় না কিছুতে। পর্দা তুলে পাত্রপাত্রী সকলকে সামনে এসে দাঁড়াতে হয়। যে যার ঢং নিয়ে বেরিয়ে আসে। পরী আসে আধা-উড়ন্ত অবস্থায়; ব্যালেরিনা নাচের ঠমকে আসে, রাজা আসেন গম্ভীর চালে পা ফেলে। আর শেষ দৃশ্যে ঐ যে ডিউক মরে পড়ে গেল, সে-ও দেখি গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে সকলের সঙ্গে দাঁড়িয়ে গেছে। তারপর মাথা নুইয়ে বারম্বার নমস্কার। পর্দা পড়ে যায়, তবু হাততালি থামে না, মানুষজন নড়ে না কেউ। ছ-তলা বাড়ি গমগম করছে। আবার পর্দা তুলতে হয়, আবার অমনি নমস্কার। পালা শেষ হয়ে কম-সে-কম পনের মিনিট হয়ে গেল, ঝামেলা তবু মেটে না। বিরক্ত হয়ে আমরা শেষটা বাইরে আসার পথ খুঁজি। হাততালি তখনও চলছে।

সোয়ান-লেক নাচ — 'সোয়ান-লেকের' বাংলা নাম কি দেবেন, হংসবাপী? চুলোয় যাকগে, নাম খুঁজে কি হবে? এই নাচটার ভারি নামডাক। সেবার কলকাতায় এসে এই নাচ ওরা দেখিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বলশই থিয়েটারের ব্যাপারই আলাদা। অত বড় স্টেজ আর অমন তোড়জোড় দুনিয়ার আর কোথায় পাবেন? বাইরে যত আয়োজন করেই দেখাক, বলশইর কাছে দাঁড়াতে পারবে না।

কাল রাত দুপুর অবধি বলশই থিয়েটারে পালা দেখে এসেছি, সকালবেলা ব্রেকফাস্ট সেরে আবার চলেছি। ঠিক দশটায় শুরু — পালার সেরা পালা সোয়ান-লেক নাচ। রবিবার আজকে, তারিখটা সতেরোই অক্টোবর। ছুটি-ছাটা পেলে সকালবেলাটাও বাদ দেয় না। ঐ যা দেখলাম দেশটা জুড়ে — খাটে মানুষ অসুরের মতো, খায় যেন এক এক রাক্ষস। হাসবে তো কানে তালা লেগে যাবে আপনার, সভয়ে ছাতের দিকে তাকাবেন — ফাটল ধরে গেল কি না। আর আমোদ-মচ্ছবে, দেখবেন, মধুপায়ী পিঁপড়ের সারির মতন লাইন দিয়ে আছে। ভাবনাচিন্তার পোকামাকড় মগজে ঢুকবে, তার জন্য দু-দণ্ড ঠাণ্ডা হয়ে বসতে হবে তো মানুষটাকে — কিন্তু সে ফুরসৎ কবরের মাটি নেবার আগে বড় একটা ঘটে ওঠে না।

এই থিয়েটারে কাল এসে গেছেন — ঘরবাড়ির কথা বলতে হবে না, দু-কথায় পালাটার একটু আঁচ দিয়ে যাই। প্রোগ্রাম দিয়ে গেল নিতান্ত সাদামাঠা — না ছবি, না মুদ্রণের বাহার, বাজে কাগজে পাতা দুই ছাপা রুশীয় হরপে। পাকিয়ে কান চুলকানো ছাড়া আমাদের কোন কাজে আসবে না। অতএব পালা দেখে যা বুঝি, টুকে যাচ্ছি তাড়াতাড়ি। আলো-নেবানো হল — একাগ্র দৃষ্টি আমার এবং সর্ব মানুষের ঐ স্টেজের দিকে। নিমেষ মাত্র দৃষ্টি ফেরাবার জো নেই, সেইটুকুর মধ্যেই না জানি কোন কাণ্ড ঘটে যাবে। স্টেজের দিকে চোখ — এবং হাতের কলম অন্ধকারে নিজের তাগিদে কাজ করে যাচ্ছে। প্লানচেট ধরেছেন

কখনো, খানিকটা সেই কায়দা। পরের সারির লেখা বেঁকে এসে আগের সারির উপর দিয়ে চলে গেছে, পাঠোদ্ধার করতে বসে আজ এখন জান বেরিয়ে যাচ্ছে।

রাজার প্রমোদোদ্যান। রাজপুত্র বড় হয়েছে, বিয়ে দিতে হবে। পাত্রী পছন্দ হবে কাল। আসন্ন শুভ ব্যাপারে রাজা রাণী ও পুরনারীদের আনন্দের অবধি নেই। রাজপুত্রের কিন্তু ভাল লাগে না — কি জানি কেন, উৎসাহ নেই মনে। বিষাদের বাজনা। হঠাৎ এক হংস এলো উড়ে। ছুটে গিয়ে রাজপুত্র তীরধনু নিয়ে এলেন। ধোঁয়া হয়ে গেল চারিদিক, কুয়াশায় ঢেকে গেল। লীলায়িত ভঙ্গিতে হংস উড়ে চলল, রাজপুত্র পিছু পিছু ছুটেছেন।

নাচে নাচে পালা এগিয়ে চলছে। আর বাজনা -- সে কী অপরূপ বাজনা! কথা দিয়ে কতটুকু আর অনুভূতি জাগানো যায়। সে হল নিতান্তই সীমানার বেরে বাঁধা। বাজনা পাত্র-পাত্রীর মধুময় মনখানি মেলে ধরে দর্শকের সামনে ; হল-ভরা মানুষ কাঁদে, হাসে, স্ফূর্তিতে ডগমগ হয়।

তার পরে আবার পর্দা উঠল। দ্বিতীয় দৃশ্য। ঘন অরণ্য — প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ। পিছন দিকে লতাপাতা জঙ্গল-আগাছার ভিতরে লেক। ধীর বাতাসে লেকের জলে অল্প অল্প ঢেউ দিয়েছে। জঙ্গলের কোন অলক্ষ্য অংশ থেকে হংসীরা সাঁতরে আসছে — একের পিছনে এক। সগর্ব গ্রীবাভঙ্গিতে হংসীদল মন্থর ভাবে ভেসে ভেসে জলকেলি করছে। রাজপুত্র তীরধনু নিয়ে বন-জঙ্গল ভেঙে শিকারে এসে দাঁড়াল। তীর ছুঁড়বে কি — দেখেই তাজ্জব। সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত্রি হল ; বনভূমি আঁধার হয়ে আসছে। হংসীর দল জল থেকে উঠছে। ডাঙায় উঠে আর হংসী নয়, হয়ে গেল এক এক লাবণ্যবতী মেয়ে। নাচছে তারা, আনন্দ করছে।

সেই ভাঙা দুর্গের ভিতর শয়তান থাকে — নীল পোষাক, নীল চেহারা, বড় বড় পাখনা। বেরিয়ে এসে সে শ্যাওলা-ধরা এক দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়াল। মিশে গেছে একেবারে দেয়ালের সঙ্গে। যত বজ্জাতি ঐ শয়তানের -- মায়ামন্ত্রে মেয়েগুলোকে সে হংসী করে দিয়েছে।

এক রাজহংসী এলো সকলের পরে। জল থেকে উঠে এলো ডাঙায়। তার আশ্চর্য রূপ আর নয়ন-ভুলানো নাচ দেখে রাজপুত্র পাগল। রাজপুত্র বলে কি — আপনি আমি, এবং যত লোক বসে আছি—সবাই। পার্টে নেমেছে গোলোবকিনা, স্ট্যালিন প্রাইজ-পাওয়া ব্যালেরিনা — পাগল না হয়ে উপায় আছে? স্ট্যালিন প্রাইজ-পাওয়া আরো সব আছে -- তারাও এই পার্টে নামে। একজন হচ্ছে মায়া — সে আমাদের ভারতে এসেছিল।

নাচছে কন্যা ও সখিবৃন্দ -- রাজপুত্র মুগ্ধ হয়ে দেখছে। নিজেই শেষটা

ভিড়ে গেল নাচের মধ্যে। হংসকন্যা ও রাজপুত্র যুগলে নাচছে। প্রেমের কত ছলাকলা! রাজপুত্র বলল, ওই মেয়ে ছাড়া কোনদিন কাউকে সে ভালবাসেনি; ভালবাসবে না কাউকে আর এ-জীবনে। দেয়ালের সঙ্গে পাখনা মিলিয়ে দেয়ালের গায়ে লেপ্টে থেকে শয়তান চেয়ে চেয়ে সমস্ত দেখছে। ক্রূর দৃষ্টি থেকে আগুনের হল্কা বেরুচ্ছে যেন। চলছে নাচ—নাচের পর নাচ। সারারাত্রি ধরে এই নাচের উৎসব। ভোর হয়ে এলো, আকাশে অরুণ-আভা। মেয়েগুলো চক্ষের পলকে অমনি যেন হাওয়ায় মিশে যায়। সঙ্গে সঙ্গে জলের উপর হংসী। দেখতে পাচ্ছি, হংসীর দল লেকের জলে ভেসে ভেসে অদৃশ্য আস্তানায় চলেছে। একের পর এক অদৃশ্য হয়ে গেল—শুধু অরণ্য আর লেকের জল। আর আধ-অন্ধকারে বিজীর্ণ ভয়াল দুর্গ।

পরের দৃশ্যে রাজবাড়ির এক প্রকাণ্ড হল। রূপকথার রাজবাড়ি যেমনটি হতে হয়। কনে-পছন্দর উৎসব। তা-বড় তা-বড় অতিথিরা আসছে—কত দেশের মানুষ, কত বিচিত্র সাজসজ্জা। ক্লাউনেরা এসে জুটেছে—মেয়ে ক্লাউন, পুরুষ ক্লাউন। নেচে নেচে তারা অতিথিদের স্ফূর্তি দিচ্ছে। কনেরা আসছে এইবার একটি-দুটি করে—এদের ভিতর থেকে রাজপুত্র পছন্দ করবে। নাচছে কনেরা—স্পেনের নাচ, হাঙ্গেরির নাচ, ইরানের নাচ, পোলিশ নাচ। কনেরা নিজ নিজ দেশের নাচ দেখাচ্ছে। রাজপুত্র মুখ বাঁকাচ্ছে, কাউকে পছন্দ নয়। রাজা, রাণী ও অতিথিরা ম্রিয়মান—এত বড় আয়োজন পণ্ড হয়ে যায় বুঝি!

হয়েছে—কনে পছন্দ হয়েছে এবার। এক কোণে দাঁড়িয়েছিল, অবিকল সেই হংসকন্যা। রাজপুত্র হাত ধরে তাকে নিয়ে এলো। চারিদিকে উল্লাস, নাচে নাচে ছয়লাপ। মেয়েটা কিন্তু ছদ্মবেশিনী। শয়তানের মেয়ে—বাপের হুকুমে হংসকন্যার মূর্তি ধরে এসেছে। রাজপুত্রের সঙ্গে নাচছে—অপূর্ব নাচ, হাততালি পড়ছে বারম্বার চতুর্দিকে। শয়তান-কন্যার পার্টও গোলোবকিনা নিয়েছে।

হঠাৎ দেখা গেল, সেই আসল হংসকন্যা। শোকাহত মূর্তি। মুখের কথা নয়, কিন্তু আকুল দৃষ্টির মধ্য দিয়ে বলছে—তুমি যে বলেছিলে, আর কাউকে ভালবাসবে না জীবনে। সেই কন্যা মুহূর্তে রাজহংসী রূপ ধরে দূরে দূরে ভেসে চলে গেল।

শেষ দৃশ্য। অন্ধকার অরণ্য, মেঘভরা আকাশ। দেয়া ডাকছে কক্কড় আওয়াজে। হংসকন্যা মারা গেছে—শোকব্যাকুল তার সখীরা। কান্নার নাচ—নাচের মধ্যে সখীরা যেন ভেঙে ভেঙে পড়ছে। রাজপুত্র ছুটে

এলো। লড়াই শয়তানের সঙ্গে — শয়তান ও তার দলবল মারা গেল। বেঁচে উঠল হংসকন্যা। দয়িতের সঙ্গে চির-মিলন; তারই সঙ্গে বিমোহন নাচ। প্রেম ও জীবন অবিনাশী; শয়তান হারবেই শেষ অবধি, ধ্বংস হয়ে যাবে। — পালার মর্মকথা এই।

বেরিয়ে এসে দেখি, একটা। নাকে-মুখে লাঞ্চ গুঁজে এখনই ছুটব হাসপাতালে। দেশের মানুষ একজন—এক বঙ্গবাসী নিদারুণ রোগে পীড়িত হয়ে পড়ে আছেন। পাঁচুগোপাল ভাদুড়ি। এক বছরের উপর আছেন, দেশে হদ্দমুদ্দ দেখে শেষটা এইখানে পাড়ি দিয়েছেন।

হাসপাতাল জায়গা — মিছিল করে যাওয়া চলে না, সাকুল্যে চার জন। অনেকটা পথ ঘুরে একটা খালি মতন জায়গায় গাড়ি থামল। প্যাচপেচে বৃষ্টি — এই সময়টা মস্কোর যা গতিক। গাড়ি থামিয়ে দোভাষি সরে পড়ল কোন দিকে। আর জনহীন পথের উপর মোটরের গর্ভে আমরা বসে আছি তো আছিই। চুরি-ডাকাতির কাজে এসেছি যেন, চর হয়ে আগে-ভাগে সুলুকসন্ধান নিতে গেল।

ফিরে এসে দোভাষি গাড়ি এগিয়ে নিতে বলে। গলি ছাড়িয়েই বড় রাস্তা, এবং হাসপাতালের সদর দরজা। যথারীতি ওভারকোট খুলছি। তাতেই রেহাই নয় — জুতো খুলে হাসপাতালের রবারের জুতো পরতে হল। হাতের ফোলিও-ব্যাগ কেড়ে নিল এক টানে; পরনের কোট-পাৎলুন দয়া করে ছাড়তে বলল না, তার উপরে সাদা আলখেল্লা চড়িয়ে আগা-পাস্তলা ঢেকে দিল। অপারেশনের সময় ডাক্তারে যে বস্ত্র পরে। এই আজব সজ্জায় সাজিয়ে সিঁড়ি দেখিয়ে উপরে নিয়ে চলল। মতলব বুঝলেন তো — রোগ-বীজাণু যদি এসে ধরে, সে ওদেরই জুতো-আলখেল্লায় লেপটে গিয়ে হাসপাতালের চৌহদ্দির মধ্যে থেকে যাবে; বাইরে বেরুবার পথ পাবে না।

রুগ্ন বিশীর্ণ মুখে মিষ্ট হাসি — পাঁচুগোপাল তাড়াতাড়ি বিছানার উপর উঠে বসলেন। ভিন্ন ঘর থেকে আর এক বাঙালি রোগি এসে বসে আছেন — মুঙ্গেরের দিকে বাড়ি। এবং কি আশ্চর্য — অধমের লেখা পড়ে পরিচয়ের জন্য এসেছেন তিনি। আর আছেন দক্ষিণ-ভারতের এক তরুণী। আমরা এদিকে চার, এবং ওঁরা তিন — হাসপাতালের ঘরে দিব্যি এক ভারতীয় বৈঠক শুরু হল।

অলক্ষ্যে চোখ ইসারা ইত্যাদি হয়েছে কিনা বলতে পারিনে — নার্স মেয়েটি চা বানিয়ে আনল, তৎসহ ফল ও কেক-বিস্কুটের বিপুল সম্ভার। আরে মশায়,

রোগি দেখতে এসেছি—মেয়ে দেখতে এলেও তো এদ্দূর করে না। পাঁচু-গোপাল না-না—করেন। এমন কিছু নয়—আমাদের জন্য যা সব আসে, তাই থেকে অতি-সামান্য এই দিয়ে দিয়েছে।

ওরে বাবা, এই নাকি পথ্যের যৎসামান্য নমুনা! রোগি না রাক্ষস, কি ভেবেছে কে জানে? আরও দেখছি তাকিয়ে তাকিয়ে চতুর্দিক। তকতকে ঘর, ঝকঝকে আসবাবপত্তোর—মায় রোগির মনোরঞ্জনের জন্য ঘরে ঘরে একটা করে টেলি-ভিসন। সর্বক্ষণের জন্য নার্স মোতায়েন আছে—হুকুমের তোয়াক্কা রাখে না—আগে থাকতেই দরকার জুগিয়ে যাচ্ছে। ঐ নিরীশ্বর দেশের হাস-পাতালের ঘরে বসে মন আমার হঠাৎ গাঁয়ের হরিতলায় উড়ে চলে গেল। গ্রামে ঢোকবার মুখে দেখতে পাবেন দু-খানি বাহুর মতো দু-দিকে অতিকায় দুই শাখা বিস্তার করে বহু প্রাচীন বট-অশ্বত্থ। আহা, গাছ বলি কেন,—গাছ কখনো নন—জাগ্রত গ্রামদেবতা গ্রাম রক্ষা করছেন চিরকাল ধরে। ছোট্ট বয়স থেকে কত কি চেয়ে আসছি ঠাকুরের কাছে—আমি ভুলে গেছি, ঠাকুরেরও খেয়াল নেই নিশ্চয়। সেই হরিতলায় মনে মনে মাথা খুঁড়ে আজ বলছি, থাকগে—এদ্দিন ধরে যা-সব চেয়েছি, জোগান দিয়ে উঠতে পারলে না তো! কাজ নেই সে সবের। নিদেনপক্ষে একটা অনুগ্রহ করো—খুব এক আচ্ছা অসুখে ফেলে দাও আজকালের মধ্যে। যে অসুখ দু-চার বছরে না সারে। তবে তো এইখানে এনে তুলবে, এনে জামাই-আদরে রাখবে…

পাঁচুগোপালও অকস্মাৎ আমার গাঁয়ের প্রসঙ্গ তুললেন: আপনি মস্কোয় এসেছেন; খবর পেলাম, হাসপাতালে আমাদের কাছে আসছেন—তখন থেকেই আপনার গাঁয়ের কথা মনে আসছে। আপনি অবশ্য জানেন না—

খুব জানি আজ্ঞে। জেনে-শুনে বোকা সাজতে হল। একেবারে বোবা হয়ে ছিলাম সেই তখন—

ঘোরতর ইংরেজ-আমল তখন। আমার এক ভাইপো স্বদেশি করত। পাঁচুগোপাল ফেরারি, ভাইপোর বন্ধু-পরিচয়ে আমাদের গাঁয়ের বাড়ি গিয়ে উঠলেন তিনি। ভারি দুর্গম জায়গা, রেল-লাইন থেকে বিশ-পঁচিশ মাইল। খুদ যম-রাজেরও সেখানে নিশানা পাওয়ার কথা নয়, ইংরেজের সি. আই. ডি. অতএব কি করতে পারে? পাঁচুগোপাল থাকতেন বাইরের একখানা খোড়ো-ঘরে—সমস্তটা দিন ঘরের মধ্যে শুয়ে বসে কাটাতেন। গাঁয়ের লোক কেউ কেউ জেনেছিল, কলকাতার এক ভদ্রলোক এসে অসুখ হয়ে পড়েছেন। কি অসুখ তা কেউ জানে না, ডাক্তার-কবিরাজের আনাগোনা নেই, ঠিক-দুপুরে এদিক-ওদিক তাকিয়ে বাড়ির মেয়েরা সুড়ুৎ করে ঘরের ভিতর ভাত দিয়ে আসেন। মাস্টারি করি—

ক-দিনের ছুটিতে বাড়ি গিয়ে আমিও শুনলাম অসুস্থ মানুষটির কথা। তার পর চোখাচোখি হয়ে গেল এক রাত্রিবেলা। রাত্রি গভীর হলে রোগটা বোধ করি সাময়িকভাবে আরোগ্য হয়ে যেত — বিলের ধারে তিনি ঘুরে বেড়াতেন, কখনো কখনো গ্রামান্তরে চলে যেতেন। ভোর হবার আগে ফিরে আসতেন আবার। সেই বেরুবার মুখে দেখা হল একদিন। শ্রীরামপুর অঞ্চলে আগে দেখেছি আমি তাঁকে। কিন্তু আমি চিনতে পারলাম না, অমন অবস্থায় চিনতে গেলে চলে না। অজানা অচেনা মানুষের বেলা যেমন করি — অবহেলায় ঘাড় ফিরিয়ে সরে এলাম।

আমার লেখা চীনের বই দিলাম পাঁচুগোপালকে — শুয়ে শুয়ে চীনে বিচরণ করুন। আবার আসব, যাওয়ার আগে নিশ্চয় দেখা হবে — বারম্বার বলে বিদায় নিয়ে এলাম। ভূয়ো প্রতিশ্রুতি, তিনিও বুঝেছিলেন বোধ হয়। জেনে-বুঝে একটু হাসলেন।

হোটেলে এসে সুখবর মিলল। আকাশ সাফ হয়েছে। পিছনের ওঁরা কাবুলে ও তাসখন্দে এই ক'দিন বন্দী হয়ে ছিলেন — কাল উড়বেন। সন্ধ্যা নাগাদ পৌঁছে যাচ্ছেন, তাতে আর ভুল নেই। অতএব মস্কো-বিহার আপাতত ইতি। সকলে একত্র হলেই বেরিয়ে পড়া যাবে। যাবেন কোন দিকে, এবারে ভাবতে লাগুন। নিমন্ত্রণ এসেছে তাজিকিস্তান থেকে। বাসিন্দারা মুসলমান। জারের তাঁবেদারিতে বোখারার আমির মধ্য-এশিয়ায় তামাম অঞ্চল জুড়ে রাজত্ব করতেন। বিপ্লবের গুঁতোয় পালিয়ে গিয়ে আমির সাহেব ঐ তল্লাটে ভর করলেন শেষটা। বহুত লড়ালড়ি। ঝামেলা চুকেবুকে ১৯২৯ অব্দের ১৬ অক্টোবর নতুন রাষ্ট্রতন্ত্র পুরোপুরি চালু হল ওখানে। এবারে পঁচিশ বছর পুরছে — রজত-জয়ন্তী উৎসব। উৎসব দেখতে ভারতীয়দের ডেকেছেন ওঁরা।

দলের কেউ কেউ নাক সিঁটকাচ্ছেন। রদ্দি জায়গা — এই সেদিন অবধি অশিক্ষা আর গোঁড়ামি নিয়ে সকলের পিছনে পড়ে ছিল। তা ছাড়া কষ্ট করে এত দূর এসে পত্রপাঠ ঘরমুখো হতে যাই কেন? পামিরের পায়ের গোড়ায় তাজিকিস্তান। দক্ষিণে আফগানিস্তান; এবং পূর্ব-দক্ষিণে সরু একটুকু ফালি পার হয়ে কাশ্মীর ও পশ্চিম-পাকিস্তান। একেবারে আলাদা রাষ্ট্র হওয়া সত্ত্বেও অনেক প্রাচীন তাজিক এখনো আফগান-এলাকায় মাদার শরীফে তীর্থ করতে আসেন। অতএব বলছেন ওঁরা মিছা নয় — প্রায় তো বাড়ির উঠোনই। তার চেয়ে চলুন সোচি — কৃষ্ণসাগরের উপরে প্রমোদনগরী। ইউরোপের ঐ প্রান্তটি চষে বেড়াইগে চলুন।

আমরা না-না করে উঠি, এবং দলে ভারী আমরাই। যাঁরা সোবিয়েতে আসেন, ভাল ভাল কয়েকটা জায়গা ঘুরে উত্তম আহারাদি করে ফিরে চলে যান। কপাল ক্রমে দুর্গম তল্লাটের দাওয়াত এসেছে তো এ মওকা ছেড়ে দেব না। দুর্গম আর বলি কেন, মজা করে আকাশে আকাশে উড়ে বেড়াব। সে ছিল বছর ত্রিশ আগেও বটে, পলায়িত আমির বহাল-তবিয়তে তাই অতদিন টিকে থাকতে পেরেছিলেন। ব্যবস্থা করুন মশাইরা, আমরা যাব—আলাদা দল হয়ে যাব আমরা। এ আর কি বলছেন—শীতের মরশুম না হলে সাইবেরিয়া মুখোই তো ধাওয়া করতাম।

তবু পাকাপাকি হবে না সকলের না পোঁছানো পর্যন্ত। ওঁরা কবুল জবাব দিয়ে বসে আছেন, আগ বাড়িয়ে কিছু করতে পারবেন না। হুকুম করব আমরা, যথাসম্ভব তামিল করে যাবেন।

যাই হোক, সন্ধ্যাটা কেন বরবাদ যায়, সিনেমায় চলুন। সিনেমার নামে কেউ গা করিনে, ও-বস্তু আমাদের অলিগলিতে। তার চেয়ে শীতের দেশে খাটের উপর কম্বল জড়িয়ে পা দোলানো মন্দ হবে না। আজ্ঞে না—হামেশা যা দেখেন সে বস্তু নয়, থ্রি-ডাইমেনসন ছবি। আপনারা দেখে থাকেন চ্যাপটা ছবি, পর্দার গায়ে লেপটে থাকে। এ ছবি রীতিমতো গায়ে-গতরে আছে। মালুম হবে, জ্যান্ত মানুষের থিয়েটারই দেখছেন যেন। মেরু-অঞ্চল ও আজব সাজপোশাকের মানুষদের নিয়ে এক গল্প—রঙে রঙে ছয়লাপ। পর্দার উপরে নয়, পর্দা ছেড়ে মানুষগুলো যেন বেরিয়ে এসেছে। অন্ধকার হলের মধ্যে, মনে হচ্ছে, আপনার গা ফুঁড়ে আমার কোল ঘেঁষে তাদের অবাধ নিঃশব্দ চলাচল। বল খেলছে, গুলি করছে—মাথা কাত করি, এই রেঃ—আমারই ঘাড়ে এসে পড়ল বুঝি! তিন দিক দিয়ে তিনটে যন্ত্রে একসঙ্গে ছবির প্রক্ষেপ—পর্দার ঠিক সামনাসামনি বসেছেন তো খুব ভাল দেখবেন; এপাশ-ওপাশ থেকে কিছু বেয়াড়া লাগবে। মোটের উপর এই জেনেবুঝে এলাম, আগামী দিনের ছবি এই। পর্দার উপরে উপরে লেপটে-যাওয়া ছবি আর ভাল লাগবে না। সেকালের বোবা ছবি এখন যেমন দূর-ছাই করি। বিমল রায়কে—আজ্ঞে হ্যাঁ, সিনেমা-ডিরেক্টর সেই তিনিই, পরের দিন এই মস্কো শহরেই তাঁদের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল—তাঁকে বললাম আমার ধারণা।

সৌরাষ্ট্রের এক শহরের মেয়র — শান্তি শাম। সকালবেলা শাম মশায় আমার ঘরে ফোন করছেন, ভারতীয় সিনেমা-দল নানা তল্লাট ঘুরে মস্কোয় ফিরেছেন কাল রাত্রে। ব্রেকফাস্ট সেরে দেখা করতে যাই চলুন। জানাজানি না হয়, দু-জনে টুক করে বেরিয়ে পড়ব। সিনেমা-দলটার সেক্রেটারি শামের জানাশোনা লোক, তিনিই খবর জানিয়েছেন। আবার হয়তো আজ রাত্রেই চলে যাবেন ওঁরা, দেশের দিকে পাড়ি জমাবেন। ওঁদের অনেককে আমি জানি। শামের কিঞ্চিৎ আলাপ-পরিচয়ের ইচ্ছা — আমার সঙ্গে সেজন্যে দল জোটাচ্ছেন।

সোবিয়েতস্কায়ায় এসে উঠেছেন ওঁরা। সদ্য-বানানো অতি-আধুনিক হোটেল, একেবারে ভিন্ন পাড়ায়। ফোনে খবরটা অতএব যাচাই করে নেওয়া যাক। ডায়াল ঘুরিয়ে অচিরে সাড়া মিলে গেল। কিন্তু ঘর জানিনে, কোথায় দিতে বলি? ফোনের এ-প্রান্তে আমি বলছি ইংরেজি, ও-প্রান্তে হুড়হুড় করে রুশ বলছে। ইংরেজি জানে না বোঝা যাচ্ছে — উপায় কি এখন বলে দিন। আমার রুশ-ভাষার ঝুলি ঝেড়ে বার কয়েক 'ইণ্ডিস্কি ডেলিগাৎসি' ইত্যাদি বলা গেল, কাজে আসে না। বলেই চলেছে ওদিকে, তার মধ্যে কমা-সেমিকোলন নেই। ফোন ছেড়ে দিয়ে তখন বাঁচি।

গিয়েই পড়ি অতএব, দেখা না পেলে ফিরে আসব। একটা মোটরগাড়ি চাই — ভোকসের যে মেয়েটি খবরদারি করেন, কমরেড জুলিয়া — তাঁকে বললাম গাড়ির কথা। ফিসফিস করে কথাটা বলেছি কি না বলেছি — উঃ মশায়, কত সেয়ানা আমাদের ভারতের লোক, 'চাচা' ডাকতেই ওঁরা 'কান্তে হারিয়েছে' বুঝে ফেলে দেন। গাড়ির কথা বলে ঘরে ফিরবার ঐটুকু পথের মধ্যেই ধরাধরি হচ্ছে — 'আমিও যাব, শুধু এই একলা আমি' 'আমায় নেবেন, একজন বাড়তিতে কি আর হবে!' — ফিরে গিয়ে তখন দুটো গাড়ির ব্যবস্থা করতে বলি। যাত্রার সময় সেই দুটো গাড়িতে দেখি, গুড়ের ভাঁড়ের মতো মানুষ বোঝাই

হয়েছে। ললনাদেরই ভিড় বেশি, সিনেমা-স্টার সম্পর্কে তাঁরা অধিক ওয়াকিবহাল।

হোটেলে ঢুকলাম। ঝকমকে বাড়ি, মেজেয় পা পিছ্‌লানোর গতিক। মেট্রন জিজ্ঞাসার চোখে তাকাচ্ছে। হাত-মুখ ঘুরিয়ে আমার দু-গণ্ডা রুশ-বাক্যের ঝুলি ঝেড়ে বোঝাবার চেষ্টা করছি—কত দূর কি বুঝল খোদায় মালুম। হেন কালে দেখি, হৃষীকেশ মুখুজ্জে এদিক পানে আসছে। আজ্ঞে হ্যাঁ, ঠিক ধরেছেন—বম্বের সিনেমারাজ্যে হৃষী কেও-কেটা ব্যক্তি। বিমল রায়ের ডান হাত, ছবির সম্পাদনায় ভারি নাম। একদা ইস্কুল-মাস্টারি করতাম, হৃষী তখন আমার কাছে পড়েছে। এবং পরমাশ্চর্য ব্যাপার, বড় হয়েও সিনেমা-লাইনে গিয়েও এখনো অতিশয় খাতির করে। মাথায় নিশ্চয় ছিট আছে, নইলে এমন হয় না। বলতে পারেন, সেই ইস্কুল-মাস্টারই যদি আমি থাকতাম এবং তৎসত্ত্বেও চিনে ফেলত, পরীক্ষাটি পুরোপুরি হত তা হলে।

হৃষীকেশ আমায় দেখে মেজের উপর গড় হয়ে প্রণাম করল। অমন মেজেয় প্রথম এই মানুষের মাথা ঠেকল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। সঙ্গীরা, দেখতে পেলাম, ড্যাব-ড্যাব করে তাকাচ্ছেন। কদর বেড়ে গেল নির্ঘাৎ তাঁদের কাছে। লেখক জেনে বসেছিলেন—অর্থাৎ কাজকর্ম নেই, কি করবে, কলম পিশে টাকাটা-সিকেটা রোজগার করে। কিন্তু সিনেমার মানুষ পদধূলি নিচ্ছে, তবে তো লোকটা লেখকের উপরেও আরো-কিছু।

হৃষীকেশ বলে, আপনাকেই টেলিফোন করতে যাচ্ছি। মেট্রোপোলে আছেন, খবর নিয়েছি। সেবারে পিকিন থেকে আমায় বম্বে চিঠি দিয়েছিলেন; তাসখন্দে পেঁছেই আমি তার শোধ নিলাম কলকাতায় আপনাকে লিখে। চিঠি পাননি নিশ্চয়, পাওয়ার কথাও নয়। কেমন করে বুঝব, আপনিও সঙ্গে সঙ্গে এই মুলুকে রওনা হয়ে পড়েছেন।

আর অসুবিধা নেই, হৃষীকেশ লিফটে নিয়ে তুলল। বিমল রায় স্নানঘরে। সলিল চৌধুরি একটা ক্যামেরা নিয়ে গভীর মনোযোগে কলকব্জা পরখ করছে। কোন বিদ্যা ছাড়াছাড়ি নেই সলিলের কাছে। গান গায়, বাজনা বাজায়, সুর দেয়, গান লেখে; আবার দু-বিঘা জমির গল্প ও সংলাপ লিখেছে। এবার বুঝি ক্যামেরা নিয়ে পড়ল, ওটুকু আর বাকি থাকবে কেন?

হঠাৎ দেশের মানুষ দেখে হৈ-হৈ করে ওঠে। আজকের দিনটাও ওদের থেকে যেতে হল, কাল সন্ধ্যায় বিদায় নিয়ে যাচ্ছে। সুরকার অনিল বিশ্বাস আছেন, খুব জানাশোনা তাঁর সঙ্গে—আমার গল্পের এক ছবিতে সেই সময়টা

স্থর দিচ্ছিলেন। সকলে চলে যাবে, অনিল বিশ্বাস থেকে যাচ্ছেন আপাতত। রাশিয়ার গান-বাজনায় তাঁকে পেয়ে বসেছে, এ বস্তু খানিকটা রপ্ত না করে নড়বেন না। আর থাকবেন খাজা আহমেদ আব্বাস, সিনেমা-দলের নেতা হয়ে তিনি এসেছেন।

সাজসজ্জা সমাপন করে বিমল রায় এসে পড়লেন হেনকালে। অনেক দিনের বন্ধু — তখন এত বড় হন নি। গুণপনা বলতে গেলে খোশামুদির মতো শোনাবে — আপনারা চোখ-টেপাটেপি করবেন। এ সব মানুষকে ভাল বলতে গেলেও বিপদ আছে। অতএব থাক পুরানো কথা। কিন্তু মস্কোয় এসে একটা খবর শুনলাম — যতগুলো বক্তৃতা করেছেন, সমস্ত বাংলায়। আমার মাতৃভাষায় বলব আমি, ভিন্নদেশ থেকে যে-কেউ আসে সবাই মাতৃভাষায় বলে — লালাযুক্ত ভাঙা ইংরেজিতে নয়। দোভাষি জোটাতে পার ভালই, নয়তো কিছুই বলব না, মুখ বুজে চুপ করে থাকব। সোবিয়েত দেশে বাংলা দোভাষি পাওয়া দায়, দিনকে-দিন কমে আসছে, হিন্দি-উর্দুর উপর জোর দিচ্ছে। সবুর, সবুর — এসব পরে শোনাব। সমস্ত শুনবেন — এমন কোন দাদা নেই যে মুখ চেয়ে চেপেচুপে বলতে হবে। মোটের উপর বিমল রায়ের জন্যে ওঁরা সর্বক্ষণের বাংলা দোভাষি মোতায়েন রেখেছেন; বিদেশে তিনি মাতৃভাষার ইজ্জত ক্ষুণ্ণ হতে দেন নি।

ডিরেক্টর রায়কে কাছে পেয়ে সকাতরে দরবার জানাই। আজ্ঞে না, গল্প গছানোর দরবার নয় — বললাম, কলম ছোঁব না আর, ঘেন্না হয়ে গেছে। সিনেমার ছবিতে পার্ট দিতে হবে আমায়। সবাই যে কন্দর্পকান্তি নায়ক হবে তার মানে নেই — দূত, গ্রাম্য পথিক, মৃত চাষী — এসবেও মানুষ লাগে তো আপনাদের।

বিমল রায় বলেন, হল কি বলুন তো?

সবিস্তারে বললাম তাসখন্দের সেই কাহিনী। জনারণ্য দেখে বড্ড খুশ হয়েছিল—ভারত থেকে তা-বড় তা-বড় সাংস্কৃতিক দিকপাল এসেছেন, তাঁদেরই গুণগ্রাহী ভক্তদল বুঝি। ও হরি, খুঁজে বেড়াচ্ছে নার্গিসকে। অতএব গল্পলেখক রূপে পর্দার বহির্দেশে আর নয়, পর্দার উপরিভাগে যৎকিঞ্চিৎ ঠাঁই চাই।

এমন আক্ষেপোক্তি — কিন্তু বিমল রায় তেমন যে আমল দিলেন, মনে হল না। বললেন, ফিরবার পথে বম্বে হয়ে যাবেন। আমার বাড়িতে থাকবেন, সেই সময় বিচার-বিবেচনা হবে।

বটেই তো। ফিরবার সময় কাবুল হয়ে নামব গিয়ে দিল্লিতে। সেখান থেকে

ট্রেনে কলকাতা। বম্বে অতএব পথের উপরেই যখন পড়ছে, সেখানে নেমে পড়তে অসুবিধা কিসের?

হৃষীকেশ গল্প করছে: তাসখন্দের ব্যাপার ঐ তো দেখলেন — আর কোন্ এক শহরের হোটেলে তাদের একেবারে আটক করে ফেলেছিল। গেটের মুখে হাজার মানুষ — সেই ভিড় ঠেলে বেরিয়ে পড়বে হেন বীরপুরুষ কে? সিনেমা-হাউসেও এমনি কাণ্ড। অফুরন্ত কিউ সর্বক্ষণ। ছবি দেখানো একবার সারা হল তো নতুন লোক ঢুকিয়ে আবার তক্ষুণি গোড়া থেকে দেখানো শুরু হয়ে গেল। দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টাই চলছে। কিউয়ের মাথা থেকে খানিকটা হলে ঢুকে গেল। লেজের অংশ পড়ে রইল। তার পিছনে ক্রমাগত নতুন লোক এসে এসে জুড়ে যাচ্ছে। ভারতীয় ছবির এমন চাহিদা। লোকে যেন ক্ষেপে গেছে। একমাস চলবার কথা, সে ছবি একাদিক্রমে ছ-মাস চালিয়েও তুলে দেওয়া মুশকিল হবে। সব প্রোগ্রাম উলটপালট হয়ে যাচ্ছে। টেলিভিসনে রাতের পর রাত ভারতীয় ছবি — নইলে মানুষ ছাড়ে না। তিন দিন ধরে গোটা সিনেমা-দল বন্দী হয়ে রইলেন হোটেলের ভিতর। একটা জায়গায় এমনধারা পড়ে থাকলে চলে কেমন করে? অবশেষে অনেক মারপ্যাঁচ করে পিছন-দরজা দিয়ে তাঁদের উদ্ধার করা হল।

গল্পেরও সময় নেই, মীটিং আছে কোথায়, বেরিয়ে পড়বেন। বিমল রায় বলেন, নিচে চলুন খাবার ঘরে। সকলের সঙ্গে দেখা হবে, চলুন।

এসেছেন অনেকেই। রাজ কাপুর, নার্গিস, নিরূপা রায়, দেব আনন্দ বলরাজ সাহানি, রাধু কর্মকার — আরও সব আছেন, সঠিক মনে করতে পারছিনে। ওঁরা হাত তুললেন, আমিও পালটা হাত তুলে নমস্কারের দায় সেরে সোজা চলে আসি আব্বাসের কাছে। আলাপ ছিল না, কিন্তু ও-মানুষের সঙ্গে আলাপ জমাতে দেড় সেকেণ্ডও লাগে না। যতই হোক, স্বজাতি আমার — লেখক। সিনেমা নিয়ে অধিক মাত্রায় পড়েছেন বটে, তা বলে লেখার অভ্যাস একেবারে ছাড়েন নি। লেখক মানুষ হাজির থাকতে অন্য কাউকে মনে ধরবে কেন?

আব্বাসও ভারি বিপন্ন। অনেক রুবল জমে গেছে। তাই বলছেন, বিষম বড়লোক হয়ে গেছি এখানে এসে। পুরানো লেখার দরুন পাচ্ছি, নতুন লিখে আর রেডিও-য় বলেও রোজগার করছি। রুবল দেশে নিয়ে যাওয়া যাবে না, এখানে খরচ করে যেতে হবে। রুবলের দরকার থাকে তো বলুন, দিয়ে কিছু ভারমুক্ত হই।

বিপদটা শুরু হল যেদিন মস্কোয় পা দিয়েছেন ঠিক তার পরের দিন থেকে।

রাত্রিবেলা পৌঁচেছেন, সকালের কাগজে নাম-ধাম সহ খবর বেরিয়েছে। অনতিপরেই টেলিফোন এলো, হ্যাঁ মশায়, আপনিই কি লেখক আব্বাস?

আজ্ঞে হ্যাঁ, লেখাটেখার অভ্যাস আছে বটে।

অমুক নামের একটা গল্প আপনিই তো লিখেছিলেন?

না --

এমনও হতে পারে, অনুবাদের সময় গল্পের নাম পালটানো হয়েছে। গল্পের ঘটনা হল এই --

ফোনের মুখে গল্পের কাঠামোটা বলে গেল। আব্বাস বললেন, হ্যাঁ, লেখা আমারই।

বিকেলবেলা এই ধরুন চারটে থেকে সাড়ে-চারটে অনুগ্রহ করে আপনি হোটেলে থাকবেন।

যথাসময়ে তারা এসে ন'শ রুবল অর্থাৎ হাজার খানেক টাকা দিল। বছর তিন-চার আগে গল্পটার রুশ অনুবাদ একটা কাগজে বেরিয়েছিল; আব্বাসের হিসাবে দক্ষিণাটা লেখা ছিল। ঋণের বোঝা টানছিল এত দিন, অবশেষে শোধ করে দিয়ে বাঁচল।

তা দক্ষিণার কথা যখন উঠল, তবে শুনুন। ঐ সামান্য সময়ে অত ছুটো-ছুটির ফাঁকে ফাঁকে অধমও কিঞ্চিৎ রোজগার করেছে -- সাত-আট শ'র মতো দাঁড়াবে। কিছু লেখা ছেড়ে এসেছিলাম -- সেগুলো ছাপা হচ্ছে এখন, দক্ষিণা হিসাবে জমছে। আবার যদি কখনো যাই, স্বদেশের মতন ফাঁকা পকেটে ঘুরব না সুনিশ্চিত জানবেন। ঐ যে বললাম -- বিষম রুজি-রোজগার ওদেশে লেখকের। আব্বাসের সঙ্গে পরে অনেকবার দেখা হয়েছে। সিনেমা-দল কবে চলে গেছে, তার পরেও জমিয়ে রয়েছেন। সে যে কী খাতির, বর্ণনা পড়ে প্রত্যয় হবে না। হোটেলের সব চেয়ে ভাল ঘর দিয়েছে তাঁকে, বিরাট মোটরগাড়ি। সেকালের জার-জারিনার কথা শুনেছি, প্রায় সেই মেজাজে সর্বত্র টহল দিয়ে বেড়ান। ভারি ওজনের একটা বই লিখছেন -- ওখান থেকে ছাপা হবে বলে।

একদিন দুঃখ করলেন, কত ভাষায় বই ছাপা হল। আপনাদের বাংলা ভাষায় আমার কোন বই নেই।

কেন থাকবে না? একটা বই অন্তত জানি -- এডিশানও হয়েছে বইটার।

আব্বাস অবাক হলেন, বলেন কি?

আপনি জানেন না?

জানাতে যাবে কোন্ বোকারাম? কিঞ্চিৎ ভাগ চেয়ে বসি যদি? দুনিয়ার

কত দেশই তো দেখলাম! কিন্তু তেড়ে ধরে লেখার দক্ষিণা দিয়ে যায়, এই সোবিয়েত দেশের মতন আর দেখি নি।

ভারতীয় দুটো ছবি চলছে—আওয়ারা এবং দো-বিঘা-জমিন। এ দেশে যা দেখেছেন তাইই—খানিকটা সংক্ষেপ করে নিয়েছে শুধু। এবং পাত্র-পাত্রীর মুখ থেকে হিন্দী ছেঁটে ফেলে রুশভাষা বসিয়েছে। ভারি কায়দায় পালটেছে কিন্তু—গানের সুর হিন্দিতে যা শোনেন অবিকল তাই; গানের কথাও এমন বেছে নিয়েছে, দূর থেকে ভাববেন হিন্দি গানই শুনছি। সেই ভুলই করেছিলাম আমরা কাস্পিয়ান সাগর-কূলে বাকু শহরে। উঁহু, আজকে নয়—আর একদিন সে গল্প। আমাদের দোভাষি ইরা—সুন্দরী তরুণী, ভারি চালাক, পড়াশুনোও আছে—তাকে একদিন জিজ্ঞাসা করলাম, কোন্ ছবিটা ভাল ঐ দুয়ের মধ্যে?

ইরা জবাব দেয়, দো-বিঘা-জমিন এক আশ্চর্য সৃষ্টি, গৌরব করবারই মতো। কিন্তু—

ঢোক গিলে বলে, কিন্তু আমার কথা যদি জিজ্ঞাসা করো, আওয়ারাই বেশি পছন্দ আমার। চার বার দেখেছি—আরও দেখবার বাসনা আছে।

হেতুটা কি?

উদ্দাম বেপরোয়া যৌবনের ছবি—

এমনি সর্বত্র। কাগজে দো-বিঘা-জমিন নিয়ে হৈ-হৈ করছে, এমনটি আর হয় না। লোকে উন্মাদ কিন্তু আওয়ারার নামে। ঠিক যেমনটা এদেশে দেখেছিলেন। আওয়ারার শতেক নিন্দা করে চুপিচুপি টিকিট কেটে ঢুকছে আবার সেই ছবিই দেখতে। হীরেন মুখুজ্জে মশায় রুচিবান বিদগ্ধ ব্যক্তি—তাঁর পরিচয় আপনাদের কি দেব? সদুঃখে তিনি বললেন, এত বড় প্রগতিশীল দেশেও এই?

আমি বললাম, দুনিয়া জুড়ে মানুষের মনের গড়ন মোটামুটি একই—এখানে এসে সেইটে আর একবার প্রমাণ হয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু আরও কিছু ছিল, এখন বুঝতে পারছি। চীনেও গিয়েছে ঐ ছবি দুটো, সেখানেও হুল্লোড়। বীরেন্দ্রনাথ সরকার মশায় চীনের দলে ছিলেন, তাঁর কাছে সেখানকার গতিক জিজ্ঞাসা করলাম। চীনের মাতামাতিটা দো-বিঘা-জমিন নিয়েই বেশি, আওয়ারা তেমন নয়। এবারে যেন মালুম হচ্ছে। ভূমিসংস্কার চীনে অল্প দিন হয়েছে, সমস্যাগুলো টাটকা রয়েছে মানুষের মনে। দো-বিঘা-জমিনের মধ্যে চীনারা নিজেদের ব্যাপারই খানিকটা দেখতে পায়।

কিন্তু সোবিয়েতের ভূমি-সমস্যা চুকেবুকে গেছে তিরিশ বছরের উপর। আজকের ছেলেমেয়েরা সিনেমা দেখছে, নতুন সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে তারা মানুষ। দো-বিঘা-জমিনের আবেদন বুঝতে পারে না, ফ্যালফ্যাল করে তাকায়, কোন পুরানো কালের ইতিহাস — মনের উপর আঁচড় কাটে না।

ওদের থিয়েটারে বিস্তর পালা দেখেছি, সিনেমার ছবিও দেখেছি কিছু কিছু। শিশুদের একটা পালায় যৎকিঞ্চিৎ নীতিবাক্য — ঐটে বাদে বাকি অতগুলোর ভিতরে মহদাদর্শ তিল পরিমাণ হাতড়ে পাবেন না। মিষ্টিমধুর রোমান্স; রাজরাজড়ার কাহিনী — যাদের ওরা অনেক দিন উৎখাত করে দিয়েছে। অথবা পরী-দৈত্য-দানবের রূপকথা। ঐ রকম নাটক আমি লিখলে প্রগতি-বিহীন বলে এ-দেশের লেখক-সমাজে অচিরে আমার হুঁকো বন্ধ হবে। ব্যাপার বুঝতে পারছেন? আমাদের যা-কিছু বৃহৎ সমস্যা, অনেক দিন আগেই ওখানে তার নিরসন হয়ে গেছে। দু-দশটি প্রাচীন মানুষ ছাড়া হাল আমলের কেউ সে সব বোঝে না। আমাদের সমস্যা ও বেদনা অনেকখানি অবান্তর ও অবাস্তব তাদের কাছে। ভাবনাহীন চিত্তে তারা নেচে-কুঁদে হুল্লোড় করে বেড়ায়।

সোবিয়েতস্কায়া থেকে ফিরে এসে দেখি, সেজেগুজে সকলে তৈরি। বিল্ডিং-একজিবিশনে যাওয়া হচ্ছে।

মস্কো শহরে খুশি মতন ঝড়ি সরায়, পুবমুখো বাড়ি ঘুরিয়ে উত্তরমুখো করে দেয়। আবার মতলব হল তো ময়দানব লাগিয়ে রাতারাতি আকাশ-ছোঁয়া ইমারত তুলে ফেলল। চারতলা এক বাড়ি, তাতে আটচল্লিশটা ফ্লাট, ফ্লাটে চারটে করে ঘর — এমনি বাড়ি হয়ে যাচ্ছে এক মাসের মধ্যে — ময়দানবের কাণ্ড ছাড়া কি বলবেন তাকে? বাড়ি তোলা কিছুই নয়, অতি সহজ ব্যাপার। জায়গা পছন্দ করে ভিত খুঁড়ে ফেলুন; রেলের পাটি বসিয়ে দিন ভিতের গর্তের চারিদিকে। পাটির উপরে ক্রেন এনে ফেলুন একটা কি দুটো — বাড়ির আয়তন বুঝে। ক্রেন অতি-অবশ্য চাই। আলাদা ধরনের ক্রেন — পাটির উপরে ঘুরে ঘুরে কাজ করে। ক্রেনের বন্দোবস্ত হল তো এবারে যেতে হবে একবার ফ্যাক্টরিতে। নক্সার মাপ মিলিয়ে বাছাই করে ফ্যাক্টরি থেকে দেয়াল কিনুন, ছাত কিনুন, ভিতে বসাবার জন্য কংক্রিটের চাঁই কিনুন। — মালপত্র কিনে গাড়ি বোঝাই করে এনে ফেলুন ভিতের জায়গায়। আর হাঙ্গামা নেই — যা করবার এখন ক্রেনই করছে। কংক্রিটের চাঁই বসিয়ে ভিতের গর্ত ভরাট করে দিল; দেয়ালগুলো যেখানকার যেটা খাড়া করে বসাল; দেয়ালের খাঁজে

ছাত লাগিয়ে দিল। দেয়ালে ছাতে ভিতের কংক্রিটে জোড়ের মুখে মুখে আংটা বেরিয়ে আছে—ঐ সব আংটায় ইস্ক্রুপ বসিয়ে আচ্ছা করে এঁটে দিন এবার। পলস্তারা করে ঢেকে দিন জোড়ের মুখগুলো। পছন্দমত রং করে নিন। ব্যস, হয়ে গেল বাড়ি। দুটো তলার দেয়াল একেবারে একসঙ্গে তৈরি হচ্ছে ফ্যাক্টরিতে। দেয়ালের মাঝে মাঝে দরজা-জানলা বসানো। জলের পাইপ ও বিদ্যুতের তার গিয়েছে দেয়ালের ভিতর দিয়ে। মোটামুটি অলঙ্করণও হয়ে আছে। নিখুঁত পরিমাপে সমস্ত বানানো—জায়গায় নিয়ে গিয়ে শুধুমাত্র খাপে খাপে বসিয়ে জুড়ে দেবার ব্যাপার। সাউণ্ড-প্রুফ করবার ব্যবস্থা রয়েছে—ছাতের উপরে কিম্বা দেয়ালের বাইরে শুম্ভ-নিশুম্ভব লড়াই বেধে যাক না, ঘরে শুয়ে নিরুপদ্রবে পা দোলানোর ব্যাঘাত ঘটবে না। মস্কোব এপাড়া-ওপাড়া সর্বত্র বাড়ি বানাচেছ্। পাশ দিয়ে যেতে যেতে কত দিন দেখেছি, অশ্রান্ত উদ্যমে ক্রেন কাজ করে যাচেছ্। বাড়ির কাজে ক্রেন এত খাটায় কেন, মনে কৌতূহল ছিল। বিল্ডিং-একজিবিশনে এসে পদ্ধতিটা এবাবে মাথায় ঢুকল।

বারোমেসে একজিবিশন, নিজস্ব ঘববাড়ি। এ-ঘরে ও-ঘবে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাচেছ্, কম সময়ে কম খরচে মজবুত বাড়ি বানানোর কত কি পদ্ধতি আছে। প্রিফ্যাবরিকেটেড পদ্ধতিতে পাইকারি হারে অংশগুলো তৈরি হচেছ্, প্রত্যেক বাড়ির ব্যাপারে আলাদা আলাদা বানাবার গরজ নেই। এ যেন হল, রান্নাঘবে তালাচাবি এঁটে হোটেলের রান্না কিনে এনে খাওয়া। খরচ কম, হ্যাঙ্গামাও বাঁচে। তা-ও প্রশ্ন তুলেছিলাম: একঘেয়ে হয়ে যাবে মশাই, বাড়িতে বাড়িতে বৈচিত্র্য থাকবে না। কেন থাকবে না? নানান মাপের দেয়াল, নানান মাপেব ছাত—মাথা খাটিয়ে নক্সা বানিয়ে ঐ সবের রদবদল ও রকমফের করে সাজান, উপরেব কারুকর্ম ও সাজগোজ আলাদা করুন—দেখবেন ইমারতের ভিন্ন চেহারা।

শুধু আমরাই নই, ঘুরে ঘুরে কত লোকে দেখছে। বাড়ি বানানো নিয়েও এত আগ্রহ, অথচ শহরের উপর এক কাঠার একটি বাড়িও কারও নিজস্ব নয়! একজিবিশনের লোকগুলো পণ করবে লেগেছে, আনাড়িদের এক লহমায় স্থাপত্য-বিদ্যায় পণ্ডিত করে তুলবে। গলা ফাটিয়ে বোঝাচেছ্। তা দেখতে দেখতে শুনতে শুনতে খানিকটা পণ্ডিত হয়ে উঠলাম বই কি। সাত-আট তলা অবধি এই প্রিফ্যাবরিকেটেড পদ্ধতিতে বানানো চলে, তার উপরে হলে আলাদা রীতি। এমনি সাত-আট তলা শেষ করতে লাগবে বড় জোর ছ-মাস। কারখানার বাতিল যে সব ধাতু, তাই দেদার লাগাচেছ্ কংক্রিটের কাজে। আচ্ছা, দোতলা অবধি তো এক দেয়ালে চালাচছ্—মেরামতের সময় কি হবে? দুটো তলাই তো

ভেঙে ফেলতে হবে তখন? কোন বাড়ি আজ অবধি মেরামতের দরকার হয়নি। কত দিনে হবে, ঠিকঠিকানা নেই। তখন ভাবনা করা যাবে। সে দিনের অনেক — অনেক বাকি।

ঘরে ঘরে মডেল সাজিয়ে রেখেছে। দেখাচ্ছে যত্ন করে। বাড়ির কোন অংশের জন্য দেশের বাইরে যেতে হয় না। ককেশাস ও উরাল পর্বত থেকে মার্বেল আর রকমারি পাথর আসছে। কাচের উপরেই বা কত রকম নক্সা। মস্কো শহরটা কেমন হয়ে দাঁড়াবে, বৃহৎ প্ল্যান রয়েছে তার। প্ল্যানমাফিক তড়ি-ঘড়ি কাজ চলছে। শহরের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকটা বিশেষভাবে বাড়ানো হচ্ছে। সে দিকটায় ফ্যাক্টরি নেই—পাহাড়। বাতাস অতএব নির্মল। নতুন য়্যুনিভার্সিটি-বাড়িও ঐ অঞ্চলে। মস্কো এত বড় হয়ে পড়ছে, জল-সরবরাহের সমস্যা দেখা দিতে পারে। সোজা খাল কেটে তাই মস্কো-নদীর সঙ্গে ডনের যোগাযোগ করা হয়েছে। জলের প্রাচুর্য হল, নির্মলতা বাড়ল; ব্যাপার-বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা হয়ে গেল। এক ঢিলে তিন পাখি। মেট্রো তো দেখলেন সেদিন — তার আরো দুটো লাইন বাড়ছে। একটা ঐ য়্যুনিভার্সিটির নতুন অঞ্চলে, আর একটা কৃষি-প্রদর্শনীর দিকে। আট-শ বছর আগে রাজপুত্র য়্যুরি ডোলগোরুকি ওকগাছের গুঁড়ির দেয়াল বানিয়ে মস্কো শহর বসিয়েছিলেন— বছরের পর বছর শহর কী অপরূপ হয়ে উঠছে দেখুন! বিপ্লবের ঠিক আগেও শহরের পনের আনা জুড়ে ছিল একতলা-দোতলা কাঠের বাড়ি। কমতে কমতে এখন সেগুলো গণনার মধ্যে এসে গেছে। নতুন এক বড় রাস্তা হচ্ছে য়্যুনি-ভার্সিটি থেকে ক্রেমলিন অবধি; দু-পাশের দুটো পুলে নদী পার হবে — মাঝখানে ঠিক কূলের উপরে স্টেডিয়াম।

কত ভাবছে বাড়ি তৈরির কায়দাকানুন নিয়ে, কত খাটছে। তাজ্জব হয়ে যেতে হয়। লড়াইয়ে শহরকে শহর তছনছ করেছে, তাড়াতাড়ি বাড়ি বানিয়ে মানুষের জায়গা দিতে হবে। কত কম খরচে ও কত কম সময়ে মজবুত ইমারত বানানো যায় — বাস্তুকারের দল একেবারে ক্ষেপে উঠেছেন। ভিতের তলার জল বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পাতালের দিকে চালান করে মাটি পাথরের মতো জমিয়ে তুলছে--তারই উপর ইমারত। আমেরিকায় আকাশ-ছোঁয়া বাড়ি তুলেছে, জোর হাওয়ায় সে-সব বাড়ির মাথা কাঁপে; তিরিশ-বত্রিশ তলায় যারা থাকে, ভয়ে বুক কাঁপে তাদের। কিন্তু মস্কোর আকাশ-ছোঁয়া বাড়িগুলোর ঝাঁকুনি অতি সূক্ষ্ম যন্ত্রেও নগণ্য পরিমাণে ধরা যায়।

অভাবিত ভাগ্য। হঠাৎ দেখতে পেলাম পলিতকেশ দীর্ঘকায় এক ব্যক্তি — মাথার সামনে টাক, গলায় ক্রশ ঝুলানো — কি রকম চোখে তাকাচ্ছেন

আমার দিকে। হাত বাড়াতে যাচ্ছেন -- একটু তবু দ্বিধাগ্রস্ত। চিনতে পেরেছি, ছবি দেখেছি ওঁর বইয়ে — হিউয়েট জনসন, ডীন অব কান্টারবেরি। সোবিয়েত ও চীন ঘুরে তার উপরে বই লিখছেন — ধর্মজ্ঞ পাদরি মশায়ের কাণ্ড দেখুন, কম্যুনিস্ট দেশকে বাপান্ত না করে প্রশংসা করেছেন। বুড়া মানুষটির নাম হয়ে গেছে তাই লাল-ডীন। সকালে যখন সোবিয়েতস্কায়ায় গিয়েছিলাম, হৃষীকেশ বলেছিল আমায় বটে, লাল-ডীন মশায় মস্কোয় আছেন — এই হোটেলেই। অতএব সন্দেহ কি বা? শেকহ্যাণ্ড করে বললাম: ভারত থেকে আসছি আমি।

উনিও সেই আন্দাজ করেছেন, আলাপনে উৎসুক সেই জন্য। উঃ, রঙে ভগবান এমন মেরে রেখেছেন যে, সাহেবি পোশাকেও কারো চোখ ফাঁকি দেওয়া যায় না।

বাঙালি লেখক আমি, বাংলা ভাষায় লিখি। সোবিয়েত ও চীন নিয়ে লেখা আপনার বই দুটো পড়েছি আমি। চীনের উপর আমিও বই লিখেছি, রাশিয়ার উপরেও লিখবার বাসনা।

এক নেশার মানুষ পেয়ে লাল-ডীন মজে গেলেন।— আমার চীনের বই মন দিয়ে পড়েছ তো? বড় যত্ন করে লেখা।

বললাম — রীতিমতো ওজন বাড়িয়েই বললাম — জানি যে পড়া ধরতে আসবেন না। — প্রত্যেকটা লাইন পড়েছি। মুখস্থও বলতে পারি অনেক জায়গা।

ডীন বললেন, তোমাদের বাংলার খুব উঁচু সাহিত্য। বইটার বাংলায় অনুবাদ হয়, আমার ইচ্ছা।

তার জন্যে কি, সে ঠিক হয়ে যাবে।

বলছি মুখের কথাই। বললে যদি খুশি হন, আপত্তি কিসের? আর বেশি বললে ব্যবসাদারির মতো শোনাবে। অনেকেই এসে ডীন মশায়কে ঘিরে ধরেছেন ইতিমধ্যে।

ভারতে চলুন আপনি।

ভিসার গোলমাল হবে হয়তো।

কে বলল? ভারত-সরকারের তরফ থেকে কিছু বলবার অবশ্য এক্তিয়ার নেই। তা হলেও আপনার মতন মানুষ ভারতে যাবেন — এতে বাধা আসবে মনে করিনে। ভারতের মানুষ সমাদরে আপনাকে গ্রহণ করবে।

তারপর জিজ্ঞাসা করি, বয়স কত হল আপনার?

এবারে একাশিতে পড়ব। জীবনের সবে শুরু — কি বলো হে?

হাসছি। ক্যামেরার লোকেরা এসে ওদিকে চুপিসারে মনের খুশিতে ফোটো তুলে যাচ্ছে। একজনকে দেখিয়ে অনুযোগের সুরে ডীন বলেন, যেখানে যাব সেইখানে আছেন ঐ ভদ্রলোক। সর্বত্র তাড়া করে বেড়ান ফোটো তোলার জন্যে।

হেসে বললাম, শোনাচ্ছেন কাকে? কীটস্য কীট আমাদেরও ঐ দশা। 'বাপ' 'বাপ' বলে কোন দিন এদেশ থেকে ছুটে পালাব ওঁদের ঐ ফোটো তোলার উৎপাতে।

বিল্ডিং-একজিবিশন থেকে ফিরতে দুপুর গড়িয়ে যায়। বিকালটা আজ ঘরে কাটালাম। দাশগুপ্ত এলেন। দেশে যাচ্ছেন, স্ফূর্তিতে ডগমগ। তাঁর জায়গায় ধর এসে পৌঁচচ্ছেন দু-এক দিনের মধ্যে। ধরের ভাইয়ের সঙ্গে আমার চেনা; কলকাতা থেকেই ধরের মস্কো আসার খবর শুনে এসেছি। ধরের জন্য দাশগুপ্ত পথ চেয়ে আছেন। আর পাঁচটা দিন কাটাতে পারলে যে হয়! পাঁচদিন পরে গৃহস্থালির যাবতীয় লটবহর জাহাজে রওনা করে দিয়ে স্বামী-স্ত্রী ও বাচচারা আকাশে উড়বেন। এতদিন আছেন, অন্তরঙ্গ ভাবে মিশেছেন এখানকার মানুষজনের সঙ্গে। ঘরোয়া খাঁটি খবর পাওয়া যাবে, সেই জন্যে বলে দিয়েছিলাম—যাওয়ার আগে একদিন সময় করে আসতে। এসেছেন তাই তিনি আজ। নিচু টেবিলের ধারে চা ইত্যাদি সহ জমিয়ে বসেছি।

হেনকালে পল এসে উপস্থিত। ডাকতে এসেছে: কনসার্ট ও লোকনৃত্য আছে সন্ধ্যার পর—তৈরি হয়ে নাও। এ কি কথা শুনি আজ পল—তোমার দেশে নাকি কৌমার্যের উপরে ট্যাক্স? নির্দিষ্ট বয়সের মধ্যে বিয়ে না করলে ট্যাক্স দিতে হয়—মেয়েপুরুষ বাছবিচার নেই? মেয়েরা গুণতিতে পুরুষের চেয়ে অনেক বেশি, ইচ্ছে করলেও সবাই বর জোটাতে পারবে না। লড়াইয়ে দেশের জোয়ান-যুবা কচু-কাটা করে গেছে, সে ক্ষতি সামলে ওঠেনি এখনো। তবু কিন্তু মেয়েদেরও ব্যাচিলর-ট্যাক্স থেকে রেহাই নেই। বর পাবে না, তার উপরে আবার ট্যাক্স দিয়ে মরবে। এটা অন্যায়—ঘোরতর অন্যায়।

পল বলে, ঠিক তাই। কিন্তু কেউ কিছু মনে করে না। ব্যাচিলর-ট্যাক্সের সমস্ত টাকা আলাদা করা থাকে—লড়াইয়ে বাপ-মা মরে যে সব শিশু অনাথ হয়েছে, তাদের কল্যাণে খরচ হয়। বড় বড় প্রতিষ্ঠান আছে ঐ সব অনাথদের মানুষ করে গড়ে তোলবার জন্য। দেখে যাবেন এমনি একটা-দুটো প্রতিষ্ঠান। ঐ সব শিশুদের জন্য জাত ধরে আমাদের বড় মমতা,

বড় বেশি উদ্বেগ। মেয়েরা হল মায়ের জাত—তাদের তো আরও বেশি। মেয়েদের উপর ট্যাক্স অন্যায় বলে ঠেকলেও কেউ তারা কোনদিন আপত্তি তোলে নি।

ট্যাক্স ধরে দিল আপনার উপর—ক্ষেত্র বিশেষে মার্জনাও আছে। ধরুন আপনি ছাত্র, অথবা গবেষণা করেন কোন এক বিষয়ে—স্ত্রী-ঘটিত ঝামেলা এ সময়টা হিতকর হবে না। কিম্বা ধরুন রোগে ভুগছেন। প্রমাণ দেখিয়ে ট্যাক্স মকুব করে আনুন। দায়িত্ব আপনারই উপর।

বিয়ে তো করলেন, দায় তা বলে একেবারে চুকল না। বিয়েই শুধু নয়, বাচ্চা হওয়া চাই বিয়ের কয়েক বছরের মধ্যে। নয় তো আবার ট্যাক্স। এই ট্যাক্সও অবশ্য মাফ হতে পারে উপযুক্ত কারণ দর্শাতে পারেন যদি। পল বলে, উঃ—কম ট্যাক্স দিয়েছি! আমি দিয়েছি—আর ও-তরফে আমার স্ত্রীও দিয়েছে। আরে মশায়, বয়স হলেই তো হয় না—যাকে জীবন-সঙ্গিনী করব, তাকে দেখেশুনে একটু বাজিয়ে নিতে হবে না? স্ত্রীরও তেমনি—স্বামী দেখেশুনে নিতে দু-চার বছর লাগেই। কিন্তু আইন সবুর মানবে না, দিয়ে যাও ট্যাক্স ততদিন। বিয়ে হয়েছে আমাদের বছর তিনেক, গত বছর একটি ছেলেও হয়েছে। ব্যস, বাঁচোয়া। স্ত্রীর বরঞ্চ এবার নতুন পাওনার পথ খুলে গেল। কপালে থাকে তো বড়লোক।

পল চলে গেছে তৈরি হবার জন্য আর একবার তাগিদ দিয়ে। দাশগুপ্তর কাছে ঐ নতুন পাওনার পদ্ধতিটা সবিস্তারে শুনছি: এক বাচ্চা জন্মানোর পরে এ সব বাবদে কখন আর ট্যাক্স দিতে হবে না স্বামী স্ত্রী কোন তরফের। স্ত্রীর এর পর থেকে রোজগারের মওকা। দ্বিতীয় বাচ্চা হল, তৃতীয় বাচ্চা হল। তার পরেরটা যেই ভূমিষ্ঠ হয়েছে, সরকার থেকে মাসিক পঁচাত্তর রুবল বরাদ্দ, তা ছাড়া থোক কিছু। কেমন দেখুন বিনা চাকরির মাইনে। চতুর্থ থেকে সপ্তম চলল এই ভাবে—প্রত্যেক বাচ্চার জন্মের সঙ্গে সঙ্গে নগদও পেয়ে যাচ্ছেন, এবং তার পরিমাণ বাড়ছে সন্তানের সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে। অষ্টম সন্তানের জন্ম থেকে মাস-মাইনে পঁচাত্তরের জায়গায় একশ রুবল। এগারো অবধি চলল এই রেট। বারো সন্তানের মা হতে পারলেন তো খাতিরের আর অবধি নেই। হয়ে গেলেন বীর-মাতা। থোক রুবলও এত পেয়েছেন যে, স্বচ্ছন্দে পায়ের উপর পা দিয়ে বাকি জীবন কাটাতে পারবেন।

বাদুড়বাগানে আমার নিরঞ্জন-দা থাকেন—এই গল্প শুনে তো লাফিয়ে উঠলেন: উঃ, তোমার বৌদিকে ছা-বাচ্চা সহ পাঠাতে পার ওদেশে? দেখ না চেষ্টা করে। তাই বটে! দাদার উপর ষষ্ঠীর বিষম দয়া—নানা বয়স ও

আয়তনের তেরোটি ছেলে-মেয়ে। আপাতত এই, ভবিষ্যতের আরও আশা রাখেন। সন্তানসংখ্যা নিরঞ্জন-দা'র নিজেরই গুণতে ভুল হয়ে যায়।

অর্থাৎ সোবিয়েতেরে ওরা মানুষ চাচ্ছে—আরো বিস্তর মানুষ। মানুষ হল লক্ষ্মী—ভাল ভাল মানুষে দেশ ভরে যাক। মরু আর স্তেপভূমিতে সোনার ফসলের বন্যা বহাচ্ছে, ধরণী-গর্ভের সুগুপ্ত ভাণ্ডার লুঠ করে এনে সম্পদের পাহাড় বানাচ্ছে, নিশ্চেতন তুষারময় উত্তর-মেরু অঞ্চল অবধি প্রাণের জোয়ার—কোন্ কাজে লাগবে এত সমৃদ্ধি, কারা ভোগ করবে? বীর সন্তান প্রসব করো মা-জননীরা।

তবু যত তাড়াতাড়ি চায়, জনবৃদ্ধি ঘটছে কই তেমন? কানীন সন্তানও সরকার স্বীকার করে নেয়—পয়লা বাচচা থেকেই মায়ের বৃত্তি। অবশ্য এ জাতীয় সন্তান জন্মে অল্পই। মেয়েগুলোর ঘর বাঁধবার বড় লোভ—সব দেশেই। উচ্ছৃঙ্খলতা বরদাস্ত করে না।

গল্পে গল্পে আটটা বেজে গেছে। দাশগুপ্তর খেয়াল নেই; আমারও নেই। ঘড়ি দেখে ব্যস্ত হয়ে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। আর দেখা হবে না মস্কো শহরে, কপালে থাকলে দেশে গিয়ে হতে পারবে। কনসার্টে যাব—লাউঞ্জে গিয়ে দেখি ভোঁ-ভোঁ—সকলে বেরিয়ে পড়েছেন। আমাদের পিছনেব দল অবশেষে আজ সন্ধ্যায় এসে পৌঁচেছেন। গল্পে মত্ত ছিলাম, দেখা হল না তাঁদের সঙ্গে। তাঁরাও কনসার্টে গেছেন।

কি করা যায়? আরও একজনের কি গতিকে যাওয়া হয় নি। বেরিয়ে পড়লাম উভয়ে পায়দলে। আপনারা বলেন, বেরুতে দেয় না যত্রতত্র—পুলিশ ওত পেতে থাকে। দেখুন, এই টহল মেরে বেড়াচ্ছি—কেবা কার খোঁজ রাখে? হোটেলের নাম-ছাপা চিঠির কাগজ পকেটে নিয়েছি—পথ হারালে মুখের কথা কেউ বুঝবে না, তখন এই জিনিসটা বের করে ঠিকানার হদিস নেবো। আছি বটে ক'দিন এখানে, কিন্তু অবিরত মোটরে চলাচলের দরুন পথঘাটের তেমন আন্দাজ হয়নি।

শহরের সরগরম অঞ্চলটায় হোটেল আমাদের। ঠিক সামনেই থিয়েটার-স্কোয়ার। স্কোয়ারের পশ্চিম দিয়ে চললাম মেট্রো-স্টেশনের পাশ দিয়ে। সতর্কভাবে ঘরবাড়ি ঠাহর করে করে এগুচ্ছি—এই সমস্ত চিহ্ন ধরে ফিরে আসব। কনকনে ঠাণ্ডা। ফুরফুরে বরফ পড়ছে সুরলোকের পুষ্পবৃষ্টির মতন—বরফগুঁড়ি জামায় পড়ে, মুখে পড়ে, সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে যায়। পথে বিস্তর লোক-চলাচল। সেই কথাই বলতে বলতে যাচ্ছি। স্বাস্থ্য কি দেখুন মশাই, একটা রোগাপটকা লোক

দেখতে পান কোনদিকে কোথাও? উত্তম সাজগোজ—মেয়ে-পুরুষ সকলের অঙ্গে ওভারকোট, পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি। সকালে যখন কাজে যাচ্ছিল, কারো কারো মলিন পোশাক দেখেছি, কিন্তু এখনকার সাজপোশাকে উজ্জ্বল সাচ্ছল্য ঠিকরে পড়ছে যেন। সাহস কি রকম গো—বাচ্চাদের অবধি এই বরফগুঁড়ির রাত্রে নিয়ে বেরিয়েছে। হাঁটিয়ে নিয়ে চলেছে—যে-সময়টা বন্ধ কামরার ভিতর লেপে-কম্বলে চাপা দিয়ে রাখবার কথা।

বাঁ-দিকে ক্রেমলিন, মিনারের মাথায় মাথায় রক্ততারকা। বাঁয়ে ঘুরে রেড-স্কোয়ারে এসে পড়লাম। ক্রেমলিনের প্রায় লাগোয়া বিপ্লব-মিউজিয়াম, উল্টো দিকে লেনিন-মিউজিয়াম। লেনিন মিউজিয়ামের কিনার ঘেঁসে যাচ্ছি। একটা রাস্তা পার হয়ে ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের ফুটপাথে এসে পড়লাম। কাচের জানলায় জানলায় দাম-সাঁটা হরেক জিনিস—লুব্ধ পথিকজন দাঁড়িয়ে দেখছে। ওপারে লেনিন-মুসোলিয়াম—দরজার দু-পাশে দুই সৈন্যের নিশ্চল প্রহরা। পাহারা বদল দেখবার জন্য যথারীতি মানুষের ভিড়। মুসোলিয়ামের দু-দিকে ক্রেমলিনের দুই মিনারের দুটি রক্ততারকা—মৃত্যুশান্ত মানুষ দুটির উপর চোখের তারা মেলে ক্রেমলিন তাকিয়ে আছে। আরও খানিক এগিয়ে বধ্যভূমি ও বেসিল ক্যাথিড্রাল পার হয়ে পথ নিচু হয়ে নেমে গেছে। এই পথ ধরে পায়ে পায়ে চললাম অনেক দূর অবধি।

দেখে বেড়াচ্ছি শুধু আমরাই নয়। আমাদেরও দেখছে। এক তরুণী দুড়দাড় করে পাশ কাটিয়ে আগে চলে গেল। সঙ্গী বললেন, নজর রাখুন, ফিরে আসবে এখুনি আবার। স্পষ্টাস্পষ্টি তাকানো অভদ্রতা—চুরি করে আড়চোখে একবার দেখে নিয়েছে। ভাল করে মুখোমুখি দেখবার জন্য আবার ফিরবে, দেখতে পাবেন। ঠিক তাই। সেই মেয়েই সামনের দিক দিয়ে এসে পিছনে চলে গেল। এমন ব্যস্ত, তাকিয়েও দেখল না একটুকু—ভাবখানা এই প্রকার, আপনারা দেখলে হয়তো এমনি বুঝে যাবেন। কিন্তু আমরা জানি, দেখবেই সে কায়দা করে। না দেখে উপায় নেই 'কালো জগতের আলো' এই ব্যক্তিদ্বয়কে। আজ্ঞে হ্যাঁ, কালোর বড় কদর ওদেশে। কালোর মতো কালো হলে রঙের দেমাকে ভুতলে পা পড়বার কথা নয়। সে গল্প আজকে পথের মাঝখানে নয়, আর একদিন।

এতদিন ইতি-উতি দেখে বেড়িয়েছি। পুরো দল এসে গেছে, পরশু-তরশুর মধ্যে লম্বা পাড়ি। প্লেনের তোড়জোড়, এবং এ-জায়গায় ও-জায়গায় মান্য অতিথিদের পদার্পণ-বারতা বাতলাবার জন্য আজ আর কাল দুটো দিন হাতে রাখা যাক। তরশু নয়, পরশুদিনই আমরা মস্কো ছাড়ছি।

অতএব কারা কোন দিকে যাচ্ছেন, সেটা আজ পাকাপাকি হবে। দক্ষিণে মধ্য-এশিয়ার দিকে যাচ্ছেন কারা, এবং পশ্চিমে ইউরোপীয় তল্লাটেই বা যাচ্ছেন ক-জন? দলসুদ্ধ আমাদের ভোকসে টেনে নিয়ে চলল। ভোকসের প্রেসিডেন্ট মশায় চীনে গেছেন তাদের বার্ষিক উৎসব দেখতে (এই উৎসব বাবদেই আমি চীনে গিয়েছিলাম দু-বছর আগে)। প্রফেসর ইয়াকোভলেভ — মাথায় চকচকে টাক, কথায় কথায় রসিকতা — আপাতত সভাপতির কাজ চালাচ্ছেন।

মুখপাতে ভদ্রলোক মিষ্টি মিষ্টি বচন ছাড়ছেন আমাদের তাক করে। ইণ্ডিয়া থেকে দলের পর দল ডেলিগেশন আসছেন — লোকে তাই কি বলাবলি করে জান, এটা হচ্ছে ইণ্ডিয়ান ডেলিগেশনের মরশুম। তোমার দেশের নতুন প্রাণের আবেগ — এত দূর থেকেও আমরা তার স্পন্দন পাচ্ছি। আমার দেশের মানুষ নতুন ভারতকে ভাল করে বুঝতে চায় — ভারত সম্পর্কে উৎসাহ শতগুণ হয়েছে আগের দিনের তুলনায়। তোমাদের বই পড়ছে লোকে প্রচুর — একাল-সেকালের বিস্তর বইয়ের অনুবাদ হচ্ছে। আরও বেশি বই ভাল ভাল বই চাচ্ছি অনুবাদের জন্য। কিন্তু বুঝসমঝের সবচেয়ে ভাল উপায় হল মানুষে মানুষে প্রত্যক্ষ দেখাসাক্ষাৎ ও আলাপ-পরিচয়; তাতেই মানুষকে ঠিকমতো বোঝা যায়। সম্প্রতি সিনেমা-দল এসে গেলেন; ছবির মধ্য দিয়ে ভারতের জীবন-পরিচয় কিছু কিছু পেলাম। এমনি নানানতরো উপায়ে চেনাজানা করতে চাই মানুষের সঙ্গে—বিশেষ করে ভারতের মানুষের সঙ্গে। নানা রকম বৃত্তি ও মতবাদের মানুষ বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে দল হয়ে এসেছ — এদেশ-ওদেশের সৌহার্দের ভিত্তিভূমি হলে তোমরা। আমাদের প্রীতির সম্পর্ক,

শুধুমাত্র সরকারি চেষ্টায় নয়, এমনি নানান বেসরকারি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়েও গড়ে তুলতে হবে। তোমাদের প্রধান মন্ত্রী নেহরু বিরাট ব্যক্তি। তাঁর নেতৃত্বে আমাদের মধ্যেকার ঘনিষ্ঠতা নিবিড়তর হচ্ছে দিনকে দিন (মনে রাখবেন, নেহরু তখনো রাশিয়ায় যান নি ; আমরা ফিরে আসার অনেক পরে তিনি গিয়েছিলেন)। বিভিন্ন জাতি ও মানুষের মধ্যে সকলের আগে সাংস্কৃতিক সম্পর্ক গড়ে তোল -- এই হল লেনিনের কথা। আমাদের স্বার্থ আছে ভাইসব, এমনি এমনি দাওয়াত করিনি। সাহিত্য বিজ্ঞান ইতিহাস লোকচর্চা যে যা জান, বলতে হবে আমাদের কাছে। মুখে মুখে শুনে আর জিজ্ঞাসাবাদ করে নিয়ে পূর্ণতর হবে আমাদের শিক্ষা। কৃষি ও শিল্প নিয়ে ভারত ও সোবিয়েতে অশেষ চেষ্টা চলছে। দুটো দেশের ভূমিপ্রকৃতি সামাজিক পরিবেশ ও মানুষ একেবারে আলাদা বটে, কিন্তু লক্ষ্যে কিছুমাত্র তফাত নেই -- মানুষকে সর্বসম্পদে ও সর্বাঙ্গীণ আনন্দে প্রতিষ্ঠিত করা। প্রপাগাণ্ডার কারণে নয় -- জনশিক্ষার জন্যই জ্ঞানীগুণীদের এমনি আসা-যাওয়ার প্রয়োজন।

এবারে পরিচয় হচ্ছে, যাঁরা যাঁরা এখানে হাজির আছেন তাঁদের সকলের মধ্যে। দোভাষি হয়ে খেদমত করে বেড়ায় -- এরা আবার কি, মাইনে-খাওয়া আধা-পরিচারক -- মনে মনে এমনি ধরনের অবজ্ঞা ছিল ছেলেমেয়েগুলোর সম্পর্কে। পরিচয় পেয়ে তাজ্জব হচ্ছি। পেশাদার আছে অবশ্য কয়েকটি -- কিন্তু বেশির ভাগই ভাল স্কলার, কেউ কেউ গাঁটের খরচা করে এসেছে বিদেশির সঙ্গে ঘোরাঘুরি করে সেদেশের হালচাল বুঝবে, দুনিয়ার যৎকিঞ্চিৎ আস্বাদন নেবে বলে। সকলের বেশি অবাক হলাম জুলিয়ার পরিচয়ে। ঘিয়ে-ভাজা শুকনো চেহারা, ইংরেজিটা বড্ড খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে বলে -- এই দোভাষিণীকে আমল দিতাম না আমরা কেউ। এখন জানা যাচ্ছে ভোকসের প্রতিনিধি সে-ই। এশিয়ার বিভিন্ন দেশের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে তোলার বিশেষ একটা বিভাগ আছে, জুলিয়া তার প্রধান কর্মকর্ত্রী। দরকার-বেদরকার সমস্ত কিছু জুলিয়াকে জানিয়ে তবে ব্যবস্থা হয়। অন্যদের কাছে এতদিন যত কিছু কাজের কথা বলেছি, জেনে বুঝে নিয়ে পৌঁছে দিয়েছে তারা জুলিয়ার কাছেই।

কোথায় কোথায় যাচ্ছেন, ঠিক করে ফেলুন এবারে। এখনই। এত বড় দেশ বেড়ানোর পক্ষে সময় হাতে আছে অত্যন্ত কম। ট্যুরিস্টদের মতন কতকগুলো জায়গায় শুধুমাত্র নজর বুলিয়ে যেতে চাইনে, যথাসম্ভব জানতে বুঝতে চাই। যার মুখে যেমন এলো, বলে ফেললাম নানান জায়গায় কথা। তা বেশ তো, বাধা কিছুই নেই -- কিন্তু কি ভাবে কোনখানে যাওয়া হবে, কোথায় কত দিন লাগবে, হাতে যা সময় আছে তাতে কুলোবে কিনা -- আমাদের

ক'জন ওঁদের ক'জন একত্র বসে ঠিক করে ফেলবেন আজকের দিনের মধ্যেই।

আপাতত দুটো দল হয়ে তো বেরিয়ে পড়ি। ওসব চিন্তা হল ফিরে এসে যখন আবার মস্কোয় একত্র হব তার পরের। তাজিকিস্তানে কে কে যাচ্ছেন বলুন। নিতান্তই দুয়োরের পাশের জায়গা — ভারত থেকে জোরে ঢিল ছুঁড়ে দিলে হিন্দুকুশের মাথা টপকে পামিরে টুক করে পড়বে। এই সেদিন অবধি পিছিয়েপড়া দেশ — এক মাইলও রেললাইন ছিল না, পাহাড় জঙ্গল আর মরুভূমি। তাড়া খেয়ে বোখারার আমির এ হেন দুর্গম জায়গায় এসে আশ্রয় নিলেন। আফগানিস্তানের একেবারে লাগোয়া — আমির ঘাঁটি বানালেন তো ইংরেজ এবং মতলববাজ আরও কেউ কেউ টাকাকড়ি ও লড়াইয়ের সরঞ্জাম পাঠাতে লাগল আফগানিস্তানের ভিতর দিয়ে। অনেক বছর চেপে ছিলেন আমির। এখন গিয়ে সেই দেশে নতুন জীবন দেখবেন। যেতে কষ্ট হবে কিন্তু — অনেক ক্ষণ উড়বেন, অনেক সময় লাগবে। যাবেন?

আমাদের মধ্যে নির্ভেজাল ভদ্রলোকেরা আছেন, তাঁরা মুখ বাঁকাচ্ছেন। দূর, মাথা খারাপ না হলে কেউ ঐ পোড়ারমুখো দেশে যায়! কৃষ্ণসাগর-কূলে মনোহর স্বাস্থ্যবাস সোচি, শস্যশ্যামল ইউক্রেন, আরও কত সব ভাল ভাল জায়গা — কত আরাম ও আনন্দ!

ভোকস বলেন, তথাস্তু।

আর আমরা ইতর-ভাবাপন্ন যতগুলি আছি, প্রস্তাব শোনা থেকেই লাফালাফি করছি। দলে আমরা অনেক ভারী। রাশিয়ার যাঁরা আসেন, ভাল ভাল ক'টা জায়গা দেখে তাঁরা ফিরে যান। এসব অঞ্চলে যাওয়ার সুবিধা হয় না। নরনারী ছিল প্রায়-নিরক্ষর, মানবাত্মা সমাজ ও ধর্মের গোঁড়ামিতে নিৰ্জিত — হঠাৎ সে দেশে কত আলো আর আনন্দ! ভাগ্যক্রমে সুযোগ এসেছে তো নিশ্চয় যাব আমরা। ব্যবস্থা করুন।

ভোকস বললেন, তথাস্তু।

ভারি খুশি হলেন ওঁরা। যেহেতু ওঁদের আহ্বানে এসেছি, ওঁরাই আমাদের গার্জেন। তাজিকিস্তানের নিমন্ত্রণ কাজেই ও'দের মারফতে এসেছে। এখন যদি তাদের লিখতে হত, না মশায়, তোমাদের ধাপধাড়া জায়গায় কেউ যেতে চাচ্ছে না — লজ্জার তবে অন্ত থাকত না। উল্লাস ভরে ভোকসের কর্তা বললেন, দুটো প্লেনের ব্যবস্থা হবে তোমাদের এই বড় দলের জন্য।

তারপরে সামাল করে দিচ্ছেন: সোবিয়েতে ঘোরাঘুরি করে সব-কিছুতেই যে খুশি হবে, এমন কথা বলি না। ত্রুটি-গ্লানি বহুত আছে। যেমনটি হওয়া উচিত,

এখনো তা হয়ে ওঠে নি। এই মস্কোতেই দেখবে সেকেলে জীর্ণ কত কাঠের বাড়ি। বিপুল বেগে শহর-সংস্কারের কাজ চলছে, তা-ও এক নজরে মালুম হবে তোমাদের। আট শ' বছর ধরে যে শহর গড়ে উঠেছে, পঁচিশ-ত্রিশ বছরে সে বস্তু পুরোপুরি পালটে যায় কেমন করে? তার উপরে সাংঘাতিক লড়াই গেল। মস্কো শহরের তেমন-কিছু ক্ষতি হয় নি অবশ্য, লড়াইয়ের ডামাডোলের মধ্যেও পরিকল্পনা অনুযায়ী নগর-নির্মাণের কাজ চলেছে। সে যাই হোক, জারের আমলের কাঠের বাড়ির জন্য আমাদের সোশ্যালিস্ট রাজ্য দায়ী হতে পারে না। সংস্কার অতি-দ্রুত বটে, তবু যথেষ্ট নয়। আরও—আরও ত্বরা করতে হবে। ফুলের মতন হাজার হাজার যুবা লড়াইয়ে প্রাণ দিয়েছে, সকল বিভাগের পাকাপোক্ত কর্মীরা সৈন্য হয়ে ফ্রন্টে চলে গেল, কাজ তা বলে থেমে থাকে নি একটা দিনও। ছেলেরা গেল তো মেয়েরাই এগিয়ে এসে সকল দায় কাঁধে তুলে নিল। তার জের এখনো চলছে। তাজিকিস্তানে যাচ্ছ তো—একটা দেশ কত তাড়াতাড়ি এগিয়ে নেওয়া যায়, দেখতে পাবে সেখানে। শুধুমাত্র রুশ-দেশ দেখে গোড়ায় আমরা কেমন ছিলাম বুঝতে পারবে না। তাজিকিস্তান দেখলে কতক কতক বুঝবে।

কৃষি-প্রদর্শনী। কী বস্তু সে চোখে না দেখে আন্দাজ হবে না। উত্তরমুখো ধাওয়া করেছি। দিব্যি ফাঁকা-ফাঁকা। শহর বলব না আর এখন, শহরতলী। হোটেল থেকে মাইল ছয়েক। অগণ্য গাড়ি আনাগোনা করছে—মোটরকার, মোটরবাস, ট্রলিবাস। কাতারে কাতারে মানুষ। ঐ একটা জায়গা নিরিখ করে যাচ্ছে সকলে। চাষবাসের তো ব্যাপার—এত মানুষ তবে কি মজা দেখতে চলেছে? তা-ও মাংনা নয়, তিন রুবল করে দক্ষিণা। নগদ দক্ষিণা দিয়ে প্রতিদিন লাখের বেশি মানুষ দেখতে যায়। বুঝুন। সোবিয়েত দেশের এমুড়ো-ওমুড়ো থেকে মস্কোয় এসে ভিড় করে প্রদর্শনী দেখবার মনন নিয়ে। শুধু সোবিয়েত কেন—ভুবনের নানা অঞ্চল থেকে। আমরা এই ভারতের দল যেমন চলেছি।

প্রদর্শনী বলতে একটা কি দুটো কিম্বা আট-দশটা বাড়ি ভেবে বসে আছেন নাকি? বিশাল এক উদ্যান-নগরী। মস্তবড় ফটকে ঢুকে পড়ে আর দিশা করতে পারবেন না। নিবিড় অরণ্য ছিল জায়গাটায়; তার থেকে অনেকগুলো বড় বড় পাইনগাছ রেখে দিয়েছে। এখন চওড়া রাস্তা, পার্ক, লেক, ফোয়ারা, ফুলবাগান, ফলবাগান, লতাগুল্ম, মহীরুহ, ঘর-বাড়ি ও বিচিত্র মণ্ডপমালা এদিকে-ওদিকে। কী যে নেই, সেই ক'টি বস্তুর নাম বলে দেওয়া বরঞ্চ সোজা।

ইস্পাতের এক যুগলমূর্তি সামনে -- এক তরুণ কর্মিক আর এক তরুণী কৃষাণী। পাখনার মতন হাত মেলেছে তারা আকাশে ; তরুণের হাতে হাতুড়ি, তরুণীর হাতে কাস্তে। সোবিয়েতে নগর ও গ্রামের সমন্বয় ঘটাচ্ছে, শিল্প ও কৃষির মিলন হচ্ছে — যুগল-মূর্তি তার প্রতীক। প্যারিতে অখিল-বিশ্ব শিল্প-মেলা (১৯৩৭) বসে, সেই সময় এটা বানিয়েছিল।

দুটো বড় বড় ফোয়ারা — একটার নাম 'মানুষের মৈত্রী'। সোবিয়েতের ষোলটা গণতন্ত্র -- সেই ষোল দেশের মানুষের ষোলটা সোনার বরন মূর্তি ফোয়ারার চারিদিকে ঘেরা। লক্ষ লক্ষ ধারায় তাবা স্নান করছে। আর এক ফোয়ারার নাম 'পাথরের ফুল'। উজবেকিস্তানের প্রাচীন রূপকথা — তারই নামে এই ফোয়ারা। সেই রূপকথা নিয়ে অপেরা হয়েছে, বলশই থিয়েটারে দেখলাম একদিন।

চওড়া স্কোয়ার, ফুলে ফুলে আচ্ছন্ন। আরো অনেক ফোয়ারা — ফুরফুর করে ঝরছে অবিরাম। পাশ দিয়ে এগিয়ে চলুন। কত মানুষ যাচ্ছে পাশাপাশি -- পুরুষ-মেয়ে বুড়ো-শিশু সাদা-কালো -- রকমারি চেহারা, বিচিত্র সাজপোশাক। দুটো মণ্ডপ সকলের মাথা ছাড়িয়ে উঠেছে — মুখ্যমণ্ডপ আর যন্ত্রমণ্ডপ। একটার সোনালি মাথা, অন্যটার মাথা কাচের। মুখ্যমণ্ডপ হল গোটা কৃষি-প্রদর্শনীর ভূমিকা। অক্টোবর-হলে ঢুকলেন -- অগ্নিবর্ণ দেয়াল, বিপ্লবের আগুনের মধ্যে নব-রুশের জন্ম সেইটে মনে করিয়ে দেয়। আসুন এবারে কনস্টিটুশান-হলে। উজ্জ্বল আলোয় বিভাসিত --বিপ্লবের পরে জনগণ বিপুল অধিকাব লাভ করল, ঘরময় সেই আনন্দ ঝলমল করছে। পাশের হলগুলোয় দেখুন এবার -- ধাপে ধাপে জাতির অগ্রগমন — আটত্রিশ বছর আগে সমাজতন্ত্র চালু হল, ঘুণ-ধরা রাষ্ট্র-কাঠামো চুরমার করে অর্থনৈতিক নতুন বিধান গড়ে তুলল, সেই ইতিহাস ছেঁকে তুলে ধরেছে লোকজনের সামনে।

ইতিহাসই শুধু নয় -- বাইরে আসুন, ভূরিপরিমাণ উৎপাদনের আন্দাজ নিন ঘুরে ঘুরে। ভবিষ্যতের আরও বিপুলতর পরিকল্পনা। মা বসুন্ধরার কাছে এতকাল ভিক্ষা চেয়ে চেয়ে জুত হল না -- দামাল সন্তানেরা জোর-জবরদস্তি করছে এবারেঃ পেট ভরে না, তবে আরো দিবিনে কেন আমাদের -- আরো আরো চাই। ম্যালথসের আতঙ্ক এরা অমূলক প্রমাণ করেছে। ম্যালথস হিসাব করে দেখালেন, পঁচিশ বছরে কোন দেশের জনসংখ্যা যদি দুনো হয়ে যায়, খাদ্য-উৎপাদন সেই বিশেষ অবস্থায় কিছুতেই দুনো হতে পারবে না। অতএব উপবাস ও দারিদ্র্য অনিবার্য যদি না জন্মনিয়ন্ত্রণ কর। এরা হাতে-কলমে দেখিয়ে দিয়েছে অন্য রকম। পঁচিশ বছরে খাদ্যশস্যের উৎপাদন দুনো নয়, চারগুণ

হয়েছে। আলুও হয়েছে চারগুণ, দুধ তিনগুণ, মাংস দ্বিগুণের কিছু বেশি। অতএব বাড়ুক জনসংখ্যা, বেশি বেশি খাবে তবু মানুষে।

রুশ-মণ্ডপে ঢুকেছি। অনেকগুলো ঘর-বারাণ্ডা ও প্রাঙ্গণ নিয়ে এক এক মণ্ডপ। মানুষের ছবি দেয়াল-ভরা — যারা ফসল ফলাচ্ছে, শিল্পকর্ম করছে। পৃষ্ঠপট সোনার রঙের। মানুষই হল সোনা — রাষ্ট্রের সর্বোত্তম সম্পদ। নানা রকম সংখ্যাতত্ত্ব দিয়েছে, পণ্ডিতজনেরা টুকে টুকে নিচ্ছেন — কোন ফসল কি পরিমাণ ফলল তার হিসাব। রুশ গণতন্ত্রের মধ্যে নিরক্ষর একজনও নেই। বই ছাপা হয় — তারও হিসাব রয়েছে — প্রতি বছর সত্তর কোটি। কাচের আবরণের মধ্যে দিগব্যাপ্ত গমের ক্ষেত। সত্যি-কার ফলন্ত গম সামনের খানিকটা জায়গায়, পিছন দিকটা ছবি — সত্যিকার ফসল আর ছবির ফসলে আশ্চর্য রকম মিলিয়ে দিয়েছে। লাল রঙের বাঁধাকপি দেখলাম। আর রাক্ষুসে আয়তনের আলু। সূর্যমুখী ফুলের দেদার চাষ হচ্ছে — শোভার জন্য শুধু নয়, বীজ থেকে তেল আদায় করে।

পশুপালনের ঘরেও অমনি অনেকটা জায়গা কাচে ঘেরা। তার মধ্যে সুবিস্তীর্ণ ঘাসের জমি — ছবির পশুরা চরে বেড়াচ্ছে। দেয়ালে দেয়ালে গরু-ভেড়া ছাগল-শূকর হাঁস-মুরগির ছবি। টিনের দুধ ও পনীর থেকে শুরু করে জুতো ব্যাগ কার্পেট ও মাংসের তৈরী নানা খাদ্যদ্রব্য টেবিলে সাজানো।

উজবেকিস্তানের মণ্ডপে ঢুকে পড়ে অবাক — ঘর না তুলার ক্ষেত? দেয়ালের প্লাস্টারেও যেন থোপা-থোপা সাদা তুলা সাজিয়ে রেখেছে। উজবেকিস্তানের কথা তো জানেন — মরু ও স্তেপভূমি। অগণ্য খাল কেটে আর বাঁধ বেঁধে দেশময় জলসেচের ব্যবস্থা করে ফেলেছে — মরুভূমি সবুজ ফসলে হাসছে এখন। তুলার ফসল সব চেয়ে বেশি। একদিককার দেয়ালে সারবন্দি বড় বড় ছবি। কোন মহাজন এঁরা — চেহারায় তো চিনতে পারিনে। কৃষক-বীর — চাষে খুব দড়, ক্ষেতে বিস্তর ফসল ফলিয়েছেন। বীরবৃন্দের উপর মহাবীরেরা আছেন — বড় বড় যৌথখামারের যাঁরা অধিনায়ক ছিলেন। মার্বেলপাথরের মূর্তি, বিস্তর মেডেল ও সম্মান-চিহ্ন বুকের উপর। তুলার ঘর থেকে চলুন রেশমের ঘরে। বাঁশ জন্মাচ্ছে খুব, আস্ত এক বাঁশঝাড় পুঁতে নমুনা দেখাচ্ছে। আগে বলত আখের চাষ ওখানে সম্ভব নয়। কিন্তু মিচুরিন ও তাঁর শিষ্যপ্রশিষ্যের যে দেশে ঘাঁটি, কোন গাছের সাধ্য নেই গোঁ ধরে থাকার। যাকে যেখানে খুশি নিয়ে বসাবে — প্রসন্ন হয়ে ডালপাতা মেলতে হবে, ফুলফল ফলাতে হবে। অতএব আখ ফলছে ১৯৪৭ অব্দ থেকে। আখে, চিনি নয়, রম-মদ বানায়।

চিনি তৈরি হয় সুগার-বীট থেকে ; তার চাষ প্রচুর। সেরাকুলের জন্য বিখ্যাত এই তল্লাট। এক রকম পাতলা কোমল চামড়া। কালো রঙের টুপি ও পোশাক বানায় সেরাকুল দিয়ে।

জর্জিয়া স্ট্যালিনের দেশ। মণ্ডপে ঢুকেই স্ট্যালিনের প্রকাণ্ড ছবি। রকমারি ফলের জন্য জর্জিয়ার নাম। আর মদের জন্য। সিনেমা-ছবির মতো পর পর সাজিয়ে দিয়েছে — আগে দেশটার কেমন হাল ছিল আর এখন কি অবস্থা। সেকালের পতিত জলাজমি ফলে শস্যে মানুষের আনন্দে ঐশ্বর্যে অভিনব রূপ নিয়েছে।

ছোট-বড় সকল অঞ্চলের নামে নামে এমনি সব মণ্ডপ। প্রতিটি মণ্ডপ সেই অঞ্চলের বিশেষ শিল্পরীতিতে সাজানো। প্রদর্শনীর ফল-উৎপাদন বিভাগে চলে যান এইবার। গিয়ে মজাটা দেখুন। রকমারি ফল। মিচুরিন ও লাইসেঙ্কোর হাতের জাদু। বৈজ্ঞানিক মিচুরিন প্রকৃতির উপর বিষম এক হাত নিয়েছেন, দুনিয়ার মানুষ সে খবর জানেন। গাছপালার চরিত্র অবধি বদল হয়ে যাচ্ছে। এক আবহাওয়ার গাছ শক্তি জুটিয়ে নিয়েছে অন্যত্র গিয়ে বেঁচে থাকবার। ফলে নতুন স্বাদ আসছে। ধরুন, আমড়া হবে মিষ্টিফল, এবং পেঁপে হবে টক। কিম্বা আমে-কাঁঠালে মিশাল করে এক রকম ফল, যার মধ্যে আমের মিষ্টতা কাঁঠালের গন্ধ। হেসে উড়িয়ে দেবার কিছু নেই — বলুন না মিচুরিনের দলবলকে চেষ্টা করে দেখতে। চুলের মুঠি ধরে খেলাচ্ছেন ওঁরা প্রকৃতিকে। উৎকৃষ্ট পিয়ার-ফল, সুগন্ধ ও ওজনে ভারী, উষ্ণ অঞ্চলে ফলত — সে গাছকে এখন হিমসহন ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। গম ফলছে এখন সকল অঞ্চলে, এবং প্রায় সর্বঋতুতে। সব চেয়ে মজা লাগল, লতানো আপেলগাছ ও চেরিগাছ দেখে। মহীরুহ হয়ে মহা দাপটে বিরাজ করতেন — কি হাল করেছে দেখুন, একেবারে ললিত লবঙ্গলতা।

বিস্তর মানুষ ফল-তরকারি নিয়ে বেরুচ্ছে। বাজার আছে নাকি এর ভিতরে ? বাজারই বটে। প্রদর্শনীর যাবতীয় ফল-তরকারি তিন-তিন দিন পরে বিক্রি করে দেয়, নতুন এনে সাজিয়ে রাখে। আর ক'দিন পরে নবেম্বর পড়লে প্রদর্শনী বন্ধ। বন্ধ থাকবে কয়েক মাস — বরফে চতুর্দিক ঢেকে থাকবে। টাটকা ফলপাকড়ও দুর্লভ সেই সময়টা।

একটি মেয়ে আলাপ জমিয়েছে প্রফেসর গুপ্তর সঙ্গে। ভারি হাসে। বয়স কম, মিষ্টি হাসি মাখিয়ে দেয় প্রতি কথায়, ভারি সুন্দর লাগে। গুপ্ত আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন : খুব নামকরা লোক। মেয়েটি বলে, আমি কিন্তু একেবারে অনামি। নাম লিউবা। অর্থাৎ লভ — ভালবাসা।

লভ নামটা বেমানান নয় তোমার--

চোখ বড় বড় করে লিউবা বলে, বলেন কি! ভালবাসায় পড়ে যাবেন না সত্যি সত্যি। খেটে খেতে হয় আমায়, প্রদর্শনী দেখিয়ে বুঝিয়ে বেড়াতে হয়। ঝামেলায় পড়লে মুশকিল।

খিলখিল করে হাসল তরুণী। জড়তা নেই, নির্ঝরের মতো। হাসতে হাসতে গল্প করতে করতে চলল আমাদের সঙ্গে। ঘরোয়া সাদামাঠা কথা। প্রদর্শনীর সম্বন্ধে যা দু-একটা জিজ্ঞাসা করি, জবাব দেয়।

ওদিকে আটক করেছে একদল বাচ্চা আমাদের। দোষ বাচ্চাদের নয়, মায়েরা লেলিয়ে দিচ্ছেন-- ঐ যাচ্ছে সবাই, পাকড়ো--। ছুটোছুটি করে এলো তারা, কাছে এসেই কিন্তু লজ্জা। কচি কচি হাত লজ্জা ভরে একটু-খানি বাড়িয়ে ধরে। শেকহ্যাণ্ড করো, অন্তত পক্ষে ছুঁয়ে দাও একটু। শিশু-লাইব্রেরি দেখবার সময় বলেছিলঃ সব দেশের মানুষ এক, সব মানুষ আপন-- ছেলেদের এইটে ভাল করে শেখাই আমরা। মায়েরাও তাই শেখান, এই তো দেখতে পাচ্ছি। চীনেও ঠিক এই বস্তু দেখেছি--বাচ্চা-বয়স থেকে সকল দেশের মানুষকে ভালবাসতে শেখায়।

পল চেঁচাচ্ছে ওদিকে, হল কি তোমাদের? চায়ের পিপাসা পেয়েছে, চলো। খেয়ে এসে তারপরে যন্ত্রমণ্ডপটা দেখা যাবে। অন্য-কিছু দেখার সময় হবে না আর।

আর্তকণ্ঠে আমরা বলি, বন্দী করেছে এই দেখ। এসে উদ্ধার করে নিয়ে যাও।

বিস্তর কষ্টে ফাঁক কাটিয়ে হন-হন করে বেরিয়ে পড়লাম। মোটরে নিয়ে তুলল। চলেছে তো চলেইছে। কোথায় নিয়ে যায় রে বাপু চা খাওয়াতে? কেউ বলে হোটেল মেট্রোপোলে ফেরত নিয়ে যাচ্ছে--চা খাইয়ে আবার পাঠাবে। লেকের ধারে ধারে গাছপালার ছায়ার মধ্যে রেস্তোঁরায় নিয়ে তুলল--ও হরি, প্রদর্শনীরই রেস্তোঁরা, এলাকার ভিতরে। কত বড় জায়গা নিয়ে প্রদর্শনী বানিয়েছে, ঘোরাঘুরিতে ভাল করে মালুম পাই।

রেস্তোঁরায় যাওয়া মাত্র খাবার মেলে না--অর্ডার মতন গরমাগরম বানিয়ে দেয়, বিস্তর সময় লাগে। খেয়ে এসে দেখি, মণ্ডপগুলোর দরজা বন্ধ হয়ে গেছে, লোকজন বড় বেশি নেই, নির্জনতার থমথমে ভাব। শুধু মাত্র যন্ত্রমণ্ডপটা খুলে রেখে জনকয়েক অপেক্ষা করছেন আমাদের দেখানোর জন্য। কাচের গম্বুজ-- ভিতরে ঢুকে আয়তনের আন্দাজ পাই, বাইরে থেকে বোঝা যায় না। এত বড় কাচের ঘর মস্কো শহরে আর নেই। ট্রাক্টর, চাষের নানান যন্ত্র, নানা জাতীয়

কৃষি-প্রদর্শনী। শুধুমাত্র যন্ত্রমণ্ডপটা খুলে রেখে জন কয়েক অপেক্ষা করছেন আমাদের দেখানোর জন্য (পৃ. ১১২)

কিণ্ডারগার্টেন ইস্কুল, লেনিন-কোলখোজ (পৃঃ ১৫৩)

লেনিন লাইব্রেরি। ভারতীয় বইয়ের তালিকায় চোখ বুলিয়ে গেলাম (পৃ.১১৮)

প্লেনের নক্সা ও নমুনা, অসংখ্য বৈদ্যুতিক কলকব্জা — এঘরে-ওঘরে ছুটোছুটি করে এক রকম নমো-নমো করে দেখতেও ঘন্টাখানেক লেগে গেল।

হোটেলে ফিরে দেখি, বিনয় রায় এসেছেন। অন্যায় হয়ে গেছে, বিনয় রায়ের কথা বলিনি এদ্দিন আপনাদের। মস্কোয় পৌছে সেই সন্ধ্যাবেলাই তাঁর বাসার খোঁজ নিয়ে ফোন করেছি। বাসায় পাত্তা মিলল না তো রেডিওয়। মস্কো রেডিও-র বাংলা বিভাগ -- বাংলা কথাবার্তা ও বাংলা গান শোনেন যেখান থেকে— বিনয় তার কর্তা। আরও তিনজন আছেন ঐ বিভাগে -- বিনয়ের স্ত্রী জয়া দেবী, গুজরাটের মেয়ে তিনি ; এবং রুশ তরুণী ভাল্যা ইসোরিবোভা ও রুশীয় যুবা বরিস কার্পুস্কিন। রেডিও-অফিসেও বিনয় ছিলেন না সেদিন। আজকে নিজে এসেছেন খবর নিতে। চুপচাপ এক জায়গায় বসা ওঁর কোষ্ঠিতে নেই, এসে অবধি চক্কোর মেরে বেড়াচ্ছেন এঘর-ওঘর উপর-নিচে।

বিনয়কে জানেন আপনারাও। আই. পি. টি. এ. নিয়ে মেতে ছিলেন এক-সময়ে, তার সেক্রেটারি -- উঁহু, কিছুই বলা হল না -- ঐ প্রতিষ্ঠানের সর্বস্ব। বছর কয়েক এখন মস্কোয় পাকাপাকি আস্তানা নিয়েছেন। ভারতের মানুষ পেলে স্ফূর্তির অবধি থাকে না, সর্ব উপায়ে খেদমত করেন। আর বাঙালি হলে তো কথাই নেই, একবেলা বিনয়ের বাড়ি মাছের ঝোল-ভাত বাঁধা। এবং গুজরাটিদেরও তাই -- মাছ খান না বলে তাঁদের ডাল-ভাত। দু-তরফেব সম্পর্কই অতি-ঘনিষ্ঠ -- আমরা জয়া দেবীর শ্বশুরবাড়ির লোক, গুজরাটিরা বিনয়ের শ্বশুরবাড়ির লোক।

বিনয়কে দরকার, তাঁর কাছ থেকে সোবিয়েত দেশের ভিতরের কথা শুনব। যেমন দাশগুপ্তকে পেয়ে গিয়েছিলাম।— এরকম ছটফট করলে হবে না কিন্তু। ফিরে আসি তাজিকিস্তান থেকে, একদিন ঠাণ্ডা হয়ে বসে সমস্ত কথার জবাব দিতে হবে ভাই।

হাঁ-হাঁ--

একবার হাঁ বলে সুখ হয় না, দু-বার বলা বিনয়ের রীতি। দুটো-একটা কথার পরেই উঠে দাঁড়ালেন তিনি। কাজের অন্ত নেই। রেডিও-র অতবড় দায়িত্ব, তার উপর য়ুনিভার্সিটিতে পাঁচ বছরের পুরো কোর্স নিয়ে পড়াশুনো করছেন। ফাঁক কাটিয়ে এর মধ্যে ঘোরাঘুরিও আছে।

দেশে-ঘরে যাবেন না?

হাঁ-হাঁ, দেশে যাব বই কি! দেশ ছাড়ব কার ডরে? তবে পাকাপাকি থাকা যাবে না। এখানে ধরুন আমি আর আমার স্ত্রী দু-জনে মিলে —

আঙুলের কর গুণে হিসাব করছেন। দু-জনের মাইনে এবং লেখা ও অনু-বাদের দক্ষিণা নিয়ে মাসে পাঁচ হাজার রুবলের মতো দাঁড়িয়ে যায়। হেসে বললেন, দেশে ফিরে গেলে আপনারা পঞ্চাশ টাকাও তো দিতে চাইবেন না।

২০ অক্টোবর, বুধবার। সকালবেলা উঠে কাচের জানলার পর্দা সরিয়ে দেখি, আশ্চর্য ব্যাপার, কুন্দফুলের বৃষ্টি হচ্ছে মস্কোয়। ঘরে কি থাকা যায়? তাড়াতাড়ি পোশাক এঁটে দুড়দাড় সিঁড়ি ভেঙে ঘড়াং করে ভারী ফটকটা খুলে একেবারে রাস্তায়। ছাতের তলে দাঁড়িয়ে সুখ হল না — বাই ...র সংখ্যা বাড়িয়ে বরফ মাড়িয়ে মাড়িয়ে থিয়েটার-স্কোয়ারের কাছ বরাবর চলে কাজ বন্ধ নেই, রোজই মধ্যে মুখের ইঞ্চি চারেক জায়গা তো আলগা — হিমে একটা ভারতীয় বইয়ের ক্ষণে ক্ষণে হাত চাপা দিতে হয় মুখের উপর। জমে ... বাংলা বই — মতন পাথর হয়ে না যাই! আরে, স্ট্যাচুই বা গেল কোথায় — ... বরফ গাদা দিয়ে রেখেছে যেন ওখানটায়। পথে পার্কে সর্বত্র রাতারাতি যেন বস্তা বস্তা ময়দা ঢেলে সাদা করে দিয়েছে। গাছের গুঁড়ির খানিক খানিক কালো বেরিয়ে পড়েছে — ডালপাতা সমস্ত সাদা। এমন জিনিস একলা দেখে সুখ হয় না — ঢুকে পড়লাম আবার হোটেলে। মনে মনে শঙ্কা, দুর্যোগ দেখে আজকের বেরুনো বাতিল করে না দেয়। ব্রেকফাস্ট-টেবিলে অবিরত তাগাদা দিচ্ছি: কই গো, কখন বেরুচ্ছি আজ? বাইরে বড় মজা। তাড়াতাড়ি করো।

পর্দা সরিয়ে দিয়ে কাচের জানলায় বসে বসে চিঠি লিখছি। দেশের জন্য মন কেমন করে উঠল, আপন-মানুষদের কথা মনে পড়ছে — আহা, এমন ছবি দেখলে না তোমরা। পুরাণে পুষ্পবৃষ্টির কথা পড়ি, তাই দেখ ঐ চোখের উপরে।

প্রোগ্রাম বিলকুল বাতিল নয় — শুধুমাত্র এক জায়গায় যাব, লেনিন-লাইব্রেরি। তা ঐ এক জায়গা দেখেই স্বচ্ছন্দে একটা মাস কাবার করা যায়। সোবিয়েত দেশের মানুষ মোটামুটি দু-শ কোটি; আর বই কেনাবেচা হয় আশি কোটি বছরে। অর্থাৎ কোলের বাচ্চা থেকে থুথুড়ে বুড়ো অবধি হিসাব করে গড়ে আড়াই জনে একটা করে বই কেনে। যথাধর্ম বলছি — এর মধ্যে গালগল্প নেই, আঙ্কিক যোগভাগের ব্যাপার। বই তা হলে কি সাংঘাতিক বস্তু ওদের জীবনে ভেবে

দেখুন। লাইব্রেরি গোটা সোবিয়েত জুড়ে তিন লাখ সত্তর হাজারের উপর। যাচ্ছি এখন মস্কো-শহরের কেন্দ্রে আঠারোতলা প্রাসাদের বনেদি লাইব্রেরিতে। কোথায় যে নেই এ বস্তু! তুষারে ঢাকা মেরুর দেশে লাইব্রেরি, পৃথিবীর ছাত পামিরের উপরে লাইব্রেরি। আবার আছে অসংখ্য চলতি লাইব্রেরি— রাখালেরা এদেশ-সেদেশ গরু-ভেড়া চরায়, সৈন্যরা ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে ঘোরে, তাঁবুর লাইব্রেরিগুলোও চলে তাদের সঙ্গে সঙ্গে। নেশাখোর লোকের ভাত জুটুক না জুটুক নেশার বস্তু চাই-ই, এদের সেই ব্যাপার। মরার পরে কফিনের ভিতর খানকতক বই ঢুকিয়ে দেয় না কেন তাই ভাবি।

লেনিন লাইব্রেরির পাশ দিয়ে কত দিন বেরিয়ে গেছি, আজকে তার চত্বরে এসে নামলাম। চারতলা বাড়ি সামনে থেকে মালুম হয়, ভিতর দিকে নিচু ছাতের আঠারো তলা বানিয়েছে বই রাখবার প্রয়োজনে। লেনিনের বিশাল মূর্তি সামনে। [illegible] ঢুকলাম। এবং যেমন হয়ে আসছে, চীফ-সেক্রেটারি হাঁ-হাঁ [illegible]: আসুন — আসতে আজ্ঞা হোক। ডিরেক্টর মশায় একটা [illegible]ড় গেছেন, এসে পড়বেন এখনই। সেক্রেটারির ডান- [illegible] দান করে এসেছেন। বাঁ-হাতে শেকহ্যাণ্ড চলছে।

[illegible]তের মধ্যে সকলের সেরা লাইব্রেরি — দুনিয়ার যে সব বড় বড় লাইব্রেরি আছে, তার একটি। বই আছে এক কোটি সত্তর লক্ষ। এত বড় একটা অঙ্ক সহসা মাথায় আসে না। মনে করুন — আঠারোটা তলা জুড়ে যত বইয়ের শেলফ আছে, সমস্ত মাটিতে নামিয়ে পাশাপাশি শুইয়ে দেওয়া হল; তা হলে একশ তিরিশ মাইল অর্থাৎ কলকাতা থেকে আসানসোল পার হয়ে চলে যাবে। আমেরিকার কংগ্রেস-লাইব্রেরি ছাড়া এত বই কোথাও নেই। কিন্তু পাঠক দশগুণ এখানে। এটা ছাড়া আরও দু-হাজার লাইব্রেরি আছে মস্কোয়। সে সব জায়গাতেও ভিড় বিষম। কুলোচ্ছে না — আরও বড় নতুন বাড়ি হচ্ছে লেনিন-লাইব্রেরির। রিডিংরুমগুলোয় মাত্র পাঁচ হাজার জায়গা। এতে কি হবে বলুন? নতুন বাড়ি হয়ে গেলে পাঁচ হাজারের জায়গায় দশ হাজার মানুষ বসে পড়াশুনো করবে। এত ঘিঞ্জিও হবে না তখন।

সকাল নটা থেকে রাত সাড়ে-এগারোটা পর্যন্ত লাইব্রেরি খোলা। পড়াশুনা করবেন তো ঝটপট একটা কার্ড করে ফেলুন। এক বছর চলবে, তার পরে কার্ড বদলে নেবেন। গবেষক কিম্বা লেখক হন তো বই বাড়ি নিতে দেবে, অন্যথা ঐখানেই বসে পড়ুন যতক্ষণ আপনার খুশি। গবেষকদের ভারি খাতির — এরই মধ্যে নিরিবিলি ব্যবস্থা আছে, বিশেষ রকম সুযোগ-সুবিধা তাঁদের জন্য। উঁকিঝুঁকি দিয়ে দেখলাম সেদিকে। চলতে ফিরতে সঙ্কোচ হয়,

গা ছমছম করে। সুঁচ পড়লেও বুঝি শব্দ পাওয়া যাবে। বইয়ের পাতা ওল্টাচ্ছে কাগজের উপর, তারই যৎসামান্য খশখশানি।

চার-শ বছর আগে ওদের বই ছাপা শুরু—সমস্ত ছাপা বইয়ের সংগ্রহ এখানে, একখানিও বাদ নেই। বই ছাপা হলেই তিন কপি করে পাঠাবার নিয়ম; অতিরিক্ত পয়সা দিয়ে কেনে। চাহিদা বুঝে কোন কোন বইয়ের আড়াই-শ কপিও কিনেছে। জায়গার অকুলান না হলে আরও বেশি কিনত। বিদেশি বইও বিস্তর কেনে। বছর বছর বই বেড়ে যাচ্ছে—জায়গা বাঁচাবার এক কায়দা বের করেছে—মাইক্রোফিলম। পুরো পৃষ্ঠার ফোটো নেওয়া আধ-ইঞ্চি জায়গার মধ্যে। সাদা চোখে কিছুই বুঝবেন না—রেণু পরিমাণ কতকগুলো ফুটকি। যন্ত্রে ফেলে অবাধে পড়ে যান, সাধারণ বইয়ের চেয়েও মোটা হরফ দেখাবে। একটা দুষ্প্রাপ্য বই কিছুতে সংগ্রহ হচ্ছে না, দু-চার দিনের জন্য চেয়েচিন্তে এনে মাইক্রোফিলম তুলে যার বই তাকে দিয়ে দিল। অথবা যে বইয়ের একটা কপি জোগাড় হয়েছে, ফিলম তুলে তার সংখ্যা বাড়িয়ে নিল। ষাট হাজার মাইক্রোফিলম তুলেছে এখন অবধি। কাজ বন্ধ নেই, রোজই তুলছে। আমাদের ভারতীয় দল দেখে তড়িবড়ি একটা ভারতীয় বইয়ের মাইক্রোফিলম যন্ত্রে ফেলে পড়তে লাগল। ভাগ্যবশে সেটা বাংলা বই—ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্কলিত 'সমালোচনা-সাহিত্য'। ভারি স্ফূর্তি লাগল নানান এলাকার ভারতী ভাইদের সামনে বাংলা বইয়ের খাতির দেখাল বলে। স্ফূর্তির চোটে ঐ লাইব্রেরিতে বসেই দু-ছত্র চিঠি লিখে ফেললাম ডক্টর বন্দ্যোর নামে। চিঠি তখনই ডাকে ফেললাম।

আমাকে-আপনাকে ইচ্ছামতো বই বাড়ি নিতে দেবে না, কিন্তু অন্য লাইব্রেরিতে দেদার ধার দিচ্ছে। বই মস্কোর বাইরে চলে যাচ্ছে—সেই মধ্য-প্রাচ্য অবধি। সেদিকে দিব্যি দরাজ ব্যবস্থা। তা হলে দেখুন, লেনিন-লাইব্রেরির বই মস্কোয় বসে পড়া যায়; আবার পড়ছে দেশের অতি-দূর প্রান্তে বসেও। বাইরের অনেক লাইব্রেরির বইয়ের হিসাব রাখে এরা, তাদের ক্যাটালগ বানায়, নানা বিষয়ে সাহায্য করে। ভারতীয় বইয়ের খবরাখবর নেওয়া ও ক্যাটালগ বানানোর ভার অধ্যাপক বগদানভের উপর।

লাইব্রেরির বয়স পুরো একশ বছরও নয়, বয়সের হিসাবে নিতান্ত অর্বাচীন। আগে রাশিয়ার মধ্যে পিটার্সবার্গ লাইব্রেরি সকলের সেরা ছিল, এটা দ্বিতীয়। বিপ্লবের পর রাজধানী মস্কোয় চলে এলো, সেই থেকে লাইব্রেরি পুরোপুরি সরকারি প্রতিষ্ঠান। ব্রিটিশ মিউজিয়ম অনেক পুরানো (১৭৫৩ অব্দে প্রতিষ্ঠা)। এক-শ বছর আগে একজন রুশীয় ব্রিটিশ মিউজিয়াম দেখে এসে উচ্ছ্বসিত বর্ণনা

দেন। তখন ব্রিটিশ মিউজিয়ামের উপদেশ নিয়ে তাদেরই পথ ধরে লাইব্রেরি গড়ে তোলা হয়। ১৯৪২ অব্দে আশি বছর বয়স হল; উৎসবে ব্রিটিশ মিউ-জিয়ামের ডিরেক্টর নিজে এসে অভিনন্দন জানালেন। বইয়ের দিক দিয়ে ব্রিটিশ মিউজিয়াম আজকে কিন্তু পিছনে পড়ে গেছে; লেনিন-লাইব্রেরির বেশি সচ্ছলতা। দুই কোটি পাঁচ লক্ষ পাণ্ডুলিপি জোগাড় করেছে; বেশির ভাগ রুশীয়, বিদেশিও আছে কিছু কিছু। এগারো শতকের পাণ্ডুলিপি দেখলাম, আশি বছর আগেকার সংগ্রহ। মোটমাট একশ-ষাটটি ভাষার বই এখানে।

আঠারো-শ কর্মচারী কাজ করে। মাইনে দু-শ থেকে চার হাজার রুবল। দুই কোটি সত্তর লক্ষ রুবল বছরের খরচ। কর্মচারীদের নিজেরা ট্রেনিং দিয়ে নেয়। কেমিস্ট্রির জ্ঞানও কিছু কিছু চাই তাদের, বই পরিরক্ষণ শিখতে হয়—বইয়ে পোকা না ধরে, ড্যাম্প না লাগে, কাগজ শুকিয়ে খড়খড়ে না হয়। বইয়ের কাগজ সুদীর্ঘস্থায়ী করবার কায়দাও ওরা আবিষ্কার করেছে।

বাইবের হাজার তিনেক লাইব্রেরির সঙ্গে বইয়ের লেনদেন। এই ব্যবস্থার ফলে কত লোকে পড়তে পায় সঠিক হিসাব নেই। হাজার পঞ্চাশের মতন হবে। বই ধার দেয় এক মাসের জন্য—পৌছে দিতে এবং ফেরত আনতে যে সময়, সেটা এর মধ্যে নয়। বই দুষ্প্রাপ্য হলে অথবা বইয়ের এক কপি মাত্র থাকলে মূল-বই হাতছাড়া করে না, মাইক্রোফিলম পাঠায়।

ক্যাটালগ হাতড়াচ্ছি। ভারতীয় বইয়ের তালিকায় চোখ বুলিয়ে গেলাম। বাংলাই বেশি, শ-দুয়ের কাছাকাছি। সবই প্রায় সেকালের। মাইকেল-বঙ্কিম আছেন, তার এদিকে বেশি নেই। রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি অনুবাদ খানকয়েক আছে, মূল-বাংলা দেখতে পেলাম না। আধুনিক বইও অতি সামান্য। (এখানে না থাক, গর্কি-ইনস্টিট্যুট ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ অনেক পরিমাণে আছেন।)

প্লিনির লেখা বই আছে, ১৪৬৯ অব্দে ইতালিতে ছাপা। টমাস মুরের বিরাটবপু বই 'উটোপিয়া' (১৫১৮)। কোপার্নিকাসের বইয়ের প্রথম সংস্করণ (১৫৪৩)। ভগবদ্‌গীতার মস্কো সংস্করণ (১৭৮৯)। নলদময়ন্তীর মস্কো সংস্করণ (১৮৪৫)। রামায়ণ মহাভারতের পুরোপুরি অনুবাদ। রুশ-পরিব্রাজক আলফান্সি নিকিতিন পনের শতকে ভারত ভ্রমণ করেছিলেন, তাঁর লেখা ভ্রমণ-কথা দেখলাম। উনিশ শতকে ছাপা ভারিক্কি রকমের এক এলবাম দেখে মজা লাগল—শিল্পীর নাম সালতিকোপট্‌ (Saltykopt),—মলাটে বাংলার মন্দির, ভিতরে খাসা খাসা ছবি এদেশের।

আঠারো-তলা ভাণ্ডারের অন্ধিসন্ধি থেকে বই এনে রিডিংরুমগুলোয় পৌছে

দিচ্ছে। দেখছি অবাক হয়ে। অনেকগুলো লিফট ওঠানামা করছে এতলা-ওতলার বই বোঝাই হয়ে। ছাতের নিচে ঘর-দালানের ভিতরে ছোট রেললাইন পাতা; ছোট্ট ছোট্ট গাড়ি, লিফটে নামানো বই বোঝাই করছে গাড়ির ভিতর! বিদ্যুতের ইঞ্জিনে গড়গড় করে নিয়ে চলল। অবিরত এই কাণ্ড চলছে। পাঠক ফরমায়েস করল, ঠিক তার পনের মিনিটের মধ্যে বই এসে হাজির হবে। কি কায়দায় হচ্ছে, হঠাৎ মাথায় আসে না।

উপরের ব্যালকনি থেকে তাকাচ্ছি একটা রিডিংরুমের ভিতরে। নিঃশব্দ, কদাচিৎ জুতোর অতি মৃদু আওয়াজ। কেতাব সরবরাহ করে বেড়াচ্ছে লাই-ব্রেরির লোক। মহা ব্যস্ত। নানান বয়সের মানুষ সারি সারি মগ্ন হয়ে পড়ছে। পলিতকেশ বুড়ো থেকে তরুণী ছাত্রী। উজ্জ্বল আলো। সন্তর্পণে পা ফেলছি আমরা, শব্দ উঠে ধ্যান বিচলিত না হয় ওদের।

বেরিয়ে এসে — আমাদের গাড়ি কোথায় গো ?— কালো রঙের গাড়ি বিলকুল সাদা। ইঞ্চি দুয়েক পুরু বরফ ছাতের উপরে। স্টার্ট বন্ধ হয়নি, সেই তখন থেকেই চলছে — গাড়ির ভিতরে কোমল উষ্ণতা। বাইরে এমন কাণ্ড চলছে, কিন্তু গাড়ি কিম্বা বাড়ির ভিতরে ঢুকে পড়লে শীত বুঝতে পারবেন না।

রাত থাকতে উঠে পড়েছি। মস্কো ছাড়ছি আজ, তাজিকিস্তান যাব। দূরের পথ—কথা হয়েছিল, রাত আড়াইটেয় বেরুনো হবে হোটেল থেকে। সকাল সকাল তাই শুয়েছি। যদি কিছু ঘুমানো যায়। ঘুমিয়েও পড়েছি। রাত একটায় শুনি, দুয়োর ঝাঁকাচ্ছে কে। বিষম রাগ হল। কার ধেরে খেয়েছি, এই রাত্রে হানা দেয় কে? লুঙ্গি পরে খাঁটি স্বদেশি মতে শুয়ে পড়ি, এ-অবস্থায় বেরুই বা কেমন করে? দোর ওদিকে ভেঙে ফেলার গতিক। তাড়াতাড়ি ঐ লুঙ্গিরই উপরে ওভারকোট চাপিয়ে অ্যান্টি-চেম্বার পার হয়ে গর্জন করে উঠি: কে বট হে তুমি?

আরে মশায়, ঘুমোন, মনের সুখে কষে ঘুম দিন। প্লেন রাত্রে ছাড়বে না। সাতটায় ব্রেকফাস্ট, পোশাকটোশাক পরে একেবারে তৈরি হয়ে খানাঘরে যাবেন। ওখান থেকেই রওনা।

আমাদেরই একজন। ভারতের মানুষ—দোর খুলতে তবে বাধা নেই। এই শোনাতে রাত দুপুরে ডেকে তুললেন মশায়? ঘুম আর হল না তার পরে, ছেঁড়া-ছেঁড়া স্বপ্ন। স্নান বিনে বাঁচিনে আমি। তাসখণ্ড হয়ে যাব—সেই হোটেলে নিয়ে তুলবে তো! স্নানের ভারি মুশকিল। কাজটা অতএব সেরে যাই এখান থেকে। পাঁচটা তখন, অন্ধকার আছে। গরম জল কলে আসে সাড়ে-ছটার আগে নয়। বয়ে গেল, ঠাণ্ডা জলই সই। তুরতুর করে কাঁপতে কাঁপতে তাড়াতাড়ি জামা-টামা পরে নেওয়া গেল। সময় আছে তো চিঠি লিখে ফেলা যাক খান কয়েক। দূরের পাল্লায় পাড়ি—শুধু তাজিকিস্তান নয়, ঐ উপলক্ষে তামাম মধ্য-এশিয়ার আকাশে চক্কোর দিয়ে বেড়াব। ডাঙার মানুষ পাখনা মেলছি—ভবিতব্যের কথা বলা যায় না, হয়তো বা এই শেষ চিঠি লেখা।

ব্রেকফাস্ট সারা করে বসেই আছি। কখন রওনা হব গো? দুটো প্লেন ভাড়া করেছে আমাদের জন্য। আবহাওয়া খারাপ বলে দেরি হচ্ছে, ভাল রিপোর্ট পেলে তবে ছাড়বে। সেই সময় এরোড্রোম থেকে হোটেলে ফোন করবে।

এই এক নিয়ম, দুর্ঘটনার তিলেক সম্ভাবনা থাকতে নড়বে না। তাই দু-চার বছরেও একটা প্লেন দুর্ঘটনার সংবাদ পাওয়া যায় না। রেল-দুর্ঘটনাও হয় না। রাস্তায় দুর্ঘটনা দুটো-চারটে ঘটে—যার দোষে ঘটে, বিষম শাস্তি পেতে হয় সেই লোকটাকে। গাড়ি চালায় এরা অতি সতর্ক হয়ে।

অবশেষে খবর হল। চলেছি এরোড্রোমে। সে তো কম পথ নয়! পল উঠেছে আমাদের গাড়িতে। রাস্তার দু-পাশে সারবন্দি গাছ। একটা পাতা নেই, শুধু গুঁড়ি আর ডাল। কালো কটকট করছে। আগুনে পুড়ে গেছে যেন, দগ্ধ অঙ্গার খাড়া দাঁড়িয়ে গাছের মূর্তিতে। শীতকাল আসছে, কাল এক চোট বরফ পড়ে গেল। বরফ পড়ার আগেই গাছপালা সর্বরিক্ত হয়েছে। গ্রীষ্মকাল এলে পত্রশ্যামল হবে আবার।

গির্জা দেখতে পাচ্ছি ডান হাতে, রাস্তার অল্প একটু দূরে। সেকেলে বাড়ি, কিন্তু ঝকমক করছে। কি গো, গির্জায় যায় এখনো মানুষ?

পল বলে, ফিরে এসে কোন এক রবিবার যেও গির্জায়। নিজের চোখে দেখো। আমাদের মুখের কথা মানবে কেন?

তাই গিয়েছিলাম। বেশি ভিড় না হলেও লোক নিতান্ত কম আসে না। সাড়ে পনের আনাই বুড়োবুড়ি। সব দেশেরই গতিক ঐ। হাল আমলের ক'টা তরুণ-তরুণী আমাদের মন্দিরে পুজোয় গিয়ে বসে? গির্জায় ঘন্টা বাজানো মানা। ধর্মচর্চা ব্যক্তিগত ব্যাপার—যার যেমন খুশি উপাসনা করবে। কিম্বা করবেই না মোটে। ঘন্টা বাজিয়ে লোক-ডাকাডাকি করবে এবং সাধারণের শ্রুতির ব্যাঘাত ঘটাবে—এটা হতে দেবে না।

খেলার মাঠ। স্কী করবার মাঠ—আর দিন কতক পরে বরফে ঢেকে যাবে, মজা জমবে তখন এখানে। আরও অনেক দূর গিয়ে নতুন য়ুনিভার্সিটি-অঞ্চল ছাড়িয়ে শহরের বাইরে এসে পড়লাম। রাস্তা এই আকাশমুখো উঠছে, এই পাতালমুখো নামছে। লেনিন-পাহাড় বলে অঞ্চলটাকে—এমন চৌরস করে ফেলেছে যে পাহাড় বলে ধরা মুশকিল। ঘরবাড়ি, দেখতে পাচ্ছি, প্রায় সব সেকেলে। কাঠের তৈরি। টালি দিয়ে ছাওয়া। কাঠের বাড়ি বানাত শীত ঠেকানোর জন্য—খুব বেশি ঠাণ্ডাতেও কাঠের ঘর খানিকটা গরম থাকে। এখন সব বাড়িতে তাপের বন্দোবস্ত—কাঠের বাড়ি চুরমার করে দৈত্যসম কংক্রিটের বাড়ি বানাচ্ছে। একটা কোলখোজের পাশ দিয়ে যাচ্ছি—যাচ্ছি তো যাচ্ছিই। ফসলে ভরা মাঠের পর মাঠ, ঘাসে ঢাকা গোচারণ-ভূমি, দূর প্রান্তে চাষীদের ঘর-বাড়ি। অরণ্যভূমে এসে পড়লাম এবারে—রাস্তার দুধারে বার্চ-এলম-পাইন জাতীয় গাছ। দু-দিকে অনেক দূর অবধি উঁচু-নিচু পতিত জমি

— খানিক জঙ্গল, খানিকটা বা ফাঁকা। অঞ্চল জুড়ে সর্বত্র এমনি অরণ্য ছিল, এখন এই নমুনা রয়ে গেছে।

এরোড্রোমে এসে সুখবর পেলাম। প্লেন যাচ্ছে তাসখন্দ হয়ে নয়— খানিকটা দক্ষিণে ঘুরে আমাদের নতুন নতুন জায়গা দেখাবার জন্য। স্ট্যালিনগ্রাড শহরের উপর দিয়ে অস্ট্রাখান গিয়ে নামব। সেখান থেকে কাস্পিয়ান-সাগরের কিনারা ধরে চলতে চলতে দক্ষিণ-পশ্চিমে বাকু শহরে রাত্রিবাস আজকে। সকালবেলা চা-টা খেয়ে পাড়ি দেওয়া যাবে কাস্পিয়ান-সাগর। তার পর আরল-হ্রদের দক্ষিণের পথে সমরখন্দের উপর দিয়ে উৎসবের দেশে পৌঁছে যাব— স্ট্যালিনাবাদ, তাজিকিস্তানের রাজধানী।

দুটো প্লেন, আমরা দ্বিতীয়ের যাত্রী। আকাশে উঠে যেতেই ঘন কুয়াশার মধ্যে ভুবন অন্ধকার। সাত হাজার ফুট উঠে গিয়েছি— সাত হাজার ফুটের উঁচু আসনে আরামসে চেপে বসে খাতা খুলে টুকে যাচ্ছি। খোপ থেকে হঠাৎ পাইলট বেরিয়ে এসে দাঁড়াল। বাঙ্ক ধরে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে বকবক করছে, দোভাষি ব্যাখ্যা করে দিল, যাবতীয় পথঘাট আমাদের বুঝিয়ে দিচ্ছে। শেষ-কালে প্রশ্নঃ কিছু জিজ্ঞাসা করবে তোমরা ?

অস্ট্রাখান জানেন তো ? জায়গাটা না জানুন, টুপি নিশ্চয় দেখেছেন— অস্ট্রাখানের টুপি। এর পরে এই অধীনের মাথায় মাঝে মাঝে ঐ টুপি দেখতে পাবেন, উপহার পেয়েছিলাম। ভল্গা এসে কাস্পিয়ানে পড়ল, মোহানার উপর শহরটা। মাছ ধরার এমন জায়গা সোবিয়েতে তো নেই-ই— গোটা দুনিয়ার মধ্যেও বেশি পাবেন না। ফলেরও বড় বাজার — রকমারি ফল ফলে এই তল্লাটে। শহরের ভিতর দিয়ে অনেক খাল চলে গেছে। চতুর্দিকে উঁচু বাঁধ-দেওয়া, বন্যার জলে শহর যাতে ডুবিয়ে না দেয়।

বেলা ডুবে আসে। অস্ট্রাখানের এরোড্রোমে নেমে আজ বড় ভাল লাগল। তেপান্তরের মাঠ, মাঠের ওধারে সূর্য ডুবছে। চেহারাটা অবিকল আমার বাংলা-দেশের মতো। মস্কোর মতন হাড়-কাঁপানো শীত নয়, ঝিরঝিরে হাওয়া। এরোড্রোমে নতুন-বানানো ঘরবাড়ি উঠেছে— আরও অনেক উঠছে। শহর বেশ খানিকটা দূর এখান থেকে। ভারতীয়দের পুরানো আড্ডা ; সেকালে বণিকেরা দলে দলে এসে ব্যাপার-বাণিজ্য করত, তাঁতি-ছুতোর এসে কাজকর্ম করত। শহরে তাদের তৈরি ঘরবাড়ি আছে এখন অবধি। ১৮১২ অব্দে নেপোলিয়নের সঙ্গে রুশরা যখন জীবন-মরণ লড়াই করছে, বিশ হাজার রুবল চাঁদা দিয়েছিল এই শহরের ভারতীয়েরা। পরবর্তী কালে এসে সে সম্পর্ক হারিয়ে গেল।

চা খেতে নিয়ে যাচ্ছে, তা-ও মাইল দেড়েক হাঁটা-পথ। দেশের মতন

নিশিন্দার গাছ পথের দু-ধারে। প্রকাণ্ড কুকুর, নাদুসনুদুস বিড়াল কয়েকটা। এই কার্তিকে দেশেরই মতন অল্প অল্প শীত করছে। সন্ধ্যা হল তো চারিদিক আলোয় আলোয় ভরে গেল। দলছাড়া হয়ে ফাঁকা মাঠের এক দিকে একা একা আমি ঘুরে বেড়াই। আর্যদের আদিভূমি ইলাবৃতবর্ষ— ভল্‌গা যেখানটায় কাস্পিয়ান সাগরে পড়েছে।

প্লেনে উঠতে গিয়ে বলছি, একটু মাটি তুলে নিই পকেটে ভরে। দেশে গিয়ে দেখাব, আমার বাপ-ঠাকুর্দার ভিটের মাটি।

এক বন্ধু টিপ্পনি কাটলেন, বাঙালি আপনারা সত্যি সত্যি আর্য যদি হন।

সুপ্রাচীন আর্যভূমির উদ্দেশে নমস্কার করে আবার আকাশে উঠছি।

ঝিকিমিকি কত তারা-ফুল মাটির গায়ে! তেলের খনির আলো, শহরের আলো। তারই উপর দিয়ে প্রকাণ্ড এই জটায়ু পাখি ধীরে ধীরে সঞ্চরণ করছে, কোথায় তার বিশাল পাখা নিয়ে একটুখানি ঠাঁই পেতে পারে। কতক্ষণ ধরে কতবার ঘুরল, এদিক-সেদিক কত চক্কোর দিল। তার পরে নেমে পড়ল।

সন্ধ্যারাত্রে বাকুর সঙ্গে দেখা হল। উঁহু, হয়নি এখনো। শহর বিশ মাইল এরোড্রোম থেকে। ওরা বলল বিশ মাইল, চলতে চলতে আমাদের তো মনে হল অনেক বেশি। প্লেন থামতে না থামতে জানলা দিয়ে দেখছি, কী শোরগোল পড়ে গেছে! জোরালো আলো চতুর্দিকে, সিনেমা-স্টুডিও-য় যে ধরনের আলো দেখতে পান। দিনমান করে ফেলেছে। মোভি ও ক্যামেরা ইত্যাদি নিয়ে তৈরি। কত দলে কত দিক দিয়ে যে ছবি তুলল, তার অবধি নেই। সে পর্ব চুকল তো বক্তৃতা। কত রকমে ভালবাসা দেখাবে, যেন ওরা ভেবে পাচ্ছে না। সম্প্রতি ভারতের সিনেমা-ছবি দেখানো হয়েছে, দেখে বিমুগ্ধ হয়েছে, সেই কথা বারবার উঠছে। তার পরে পরস্পরের সঙ্গে আলাপনের কী মর্মান্তিক মনোরম প্রয়াস! দোভাষি নেই তো কি হল, মুখের হাসি আছে—দুটো করে হাত আছে, কোলের মধ্যে টেনে নিতে বাধা কি? প্রাচ্য দেশে এসে পড়েছি— ম্যাপ দেখতে হবে না, অভ্যর্থনার রকম দেখেই মালুম হয়। হৈ-হৈ করে লাফিয়ে পড়ে পালোয়ানরা বুকে তুলে ধরছে। হাড় তেমন মজবুত না হলে মড়মড়িয়ে ভেঙে পড়া বিচিত্র নয়। এক গায়ক — নাম মিঞাজী — চলেছে আমাদের গাড়িতে। মানুষটা আধপাগলা, কিন্তু ভারি দরের শিল্পী— স্ট্যালিন পুরস্কার-পাওয়া। সবাই স্ফূর্তিবাজ, কিন্তু মিঞাজী দেখতে পাচ্ছি সকলের সেরা। গাড়ির অতটুকু গহ্বরে অত স্ফূর্তি আটক রাখা দায়— আছাড়ি-পিছাড়ি খাচ্ছে। গান গেয়ে উঠছে— সেটা

ভালই, সুর বুঝতে ভাষা লাগে না। সুরও খানিকটা আমাদের দেশ-ঘেঁসা—অথবা এ তল্লাটেরই সুর চলে এসেছে আমাদের দেশে। কথাও দু-চারটে চেনা চেনা লাগছে। আজারবাইজান দেশ—ভাষাটা আজারবাইজানি, তুর্কির সমগোত্র, ফারসির দিব্যি আমেজ পাওয়া যায়। মোটরের রেডিও ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নানান দেশের স্টেশন ধরছে; দিল্লি স্টেশন ধরে লাইন খানেক হিন্দি গান শুনিয়ে দিল একবার। দু-পাঁচটা ইংরেজি কথা জানা আছে—সেই সম্বলে বোঝাবার প্রয়াস পাচেছ, কোন জায়গা দিয়ে যাচ্ছি এখন আমরা।

তেলের শহর। যেদিকে তাকাই তেলের কূয়া। গাড়ি চলেছে কূয়ার কিনার ঘেঁসে—কখনো বা পাইপ-লাইনের উপর দিয়ে। কৃষ্ণপক্ষের রাত—কিন্তু বুঝবার জো নেই, বিদ্যুতের আলোয় ঝলমল চারিদিক। সভ্যতা ও রাষ্ট্র-শক্তির প্রাণকেন্দ্র আজ পেট্রোল, যার অপর নাম তরল-সোনা। ধরণীর গূঢ় গর্ভ থেকে সেই সোনা হাজার হাজার ধারায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছে। বারো ভূতে লুটে খেত, ইদানীং আর একটি ফোঁটার অপচয় নেই। মাটির নিচে নল বসিয়ে দূর-দূরান্তরে তেল নিয়ে যাচেছ। মোটর একটুখানি থামাল খনির এক কর্মিক-পাড়ার মধ্যে নিয়ে। আপনি আমি অমনধারা ঘরবাড়িতে থাকতে পাইনে মশায়।

গাড়ি ঘুরিয়ে নিতে বলল মিঞাজী। কাস্পিয়ান-সাগরের কূলে কূলে যাব। সকালবেলা চলে যাচ্ছি, কম সময়ের মধ্যে যতখানি দেখে নেওয়া যায়। শহরের পূব দিকে কাস্পিয়ান-সাগর। একেবারে জল ঘেঁসে রাস্তা। রাস্তার আলো জলে ছায়া ফেলেছে, তা-ও নজরে আসছে। নৌকো বেঁধে আছে সারি সারি, চলাচল করছেও দশ-বিশটা এদিক-ওদিক। ঠাণ্ডা জোলো হাওয়া দিচ্ছে, গাড়ির কাচ খুলে হাওয়ায় আমি নিশ্বাস নিচ্ছি। উঃ, কত কি উপভোগ হল আমার এই জীবনে!

আরে, কাণ্ড! কে গেয়ে উঠল কোন্ দিক থেকে—'আওয়ারা হো!' কূলে বাঁধা ঐসব নৌকোর কোন একটি থেকে হয়তো। 'আওয়ারা' ছবি চলেছিল কিছুকাল ধরে, গান এখন মানুষের মুখে মুখে। স্বদেশ থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে মধ্য-এশিয়ার বিশাল হ্রদপ্রান্তে রাত্রিবেলা পরিচিত লাইনগুলি হঠাৎ শুনতে পেলাম। গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে কিনা বলুন?

বহু প্রাচীন এক দুর্গ আছে বাকুতে, আরবি পদ্ধতির কারুকর্ম। বছর পঞ্চাশ আগে একটা হিন্দু-মন্দিরের নিশানাও নাকি ছিল। আর আছে পুরানো রাজপ্রাসাদ—বাকুখান সরাই। ভিতরে মসজিদ। ভাঙাচোরা দেয়ালের গায়ে সাগরের জল ছল-ছল করে। ভাঙা দেয়ালের আড়ালে মাছের নৌকো সামলে রাখবার বড্ড জুত হয়েছে।

যেখানে নিয়ে তুলল সে এক প্রকাণ্ড বাড়ি। একেবারে কাস্পিয়ান-সাগরের উপরে। চার বাঙালি আমাদের এক ঘরে দিয়েছে। মস্কোয় এখন বরফ পড়ছে, আর এ জায়গা দস্তুরমতো গরম। এই অক্টোবরে কলকাতায় যেমনটা। গরম পোশাক গায়ে সইছে না, কিন্তু উপায়ও নেই কিছু। একটা রাত্রি কাটিয়ে যাব, সকালেই আবার রওনা — বাক্স-পেঁটরা সব প্লেনে পড়ে আছে। হাতে-মুখে জল দিয়ে একটু শীতল হব, তারও ফুরসত দেয় না। খাওয়ার তাড়া। তোমাদের জন্য হল-ভরা মানুষ হাত গুটিয়ে বসে আছে। খানাপিনা শেষ করে সারা রাত্তির ধরে যত খুশি হাত-পা ধুয়ো ; কেউ মানা করতে যাবে না।

বিরাট ব্যাঙ্কুয়েট-হল, অগণ্য অতিথি। ঘরের নক্সা ছবি আসবাবপত্রে সেকেলে বনেদিয়ানা। বড় বড় ঝাড়লণ্ঠন ঝুলছে ছাত থেকে। পশ্চিমের জানলাগুলো খোলা — আকাশের তারা ও কাস্পিয়ান-সাগরের জলতরঙ্গ দেখা যায়। হু-হু করে জোলো হাওয়া ঢুকে আলো দুলিয়ে দিচ্ছে এক-একবার।

মুসলমানি আতিথ্যের কথা শোনা ছিল। সে যে কী বস্তু, হাড়ে হাড়ে আজ টের পেলাম। আমার পাঠককুল তো নয়ই, অতি বড় শত্রুও যেন হেন আতিথ্যের পাল্লায় না পড়ে। ঘড়ি দেখে ঠিক আটটায় টেবিলে বসেছি। ভোজ শুরু হল। খিদমতগারেরা পদের পর পদ এনে দুড়দাড় করে পাতে ঢালছে। জিজ্ঞাসাবাদের পরোয়া করে না। পাতগুলো যেন বারোয়ারি জায়গা — যার যা খুশি ঢেলে গেলেই হল। সাহেবি ভোজের দস্তুর — জিনিস এনে এনে সামনে ধরে, অতিথিরা উদরের চাহিদামতো তুলে নেয়। এদের অত ধৈর্য নেই। দেওয়া-থোওয়া করতে এসেছে তো ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়ে যাচ্ছে; আপনার খাওয়ার কাজ —তীরবেগে হাত চালিয়ে যান। এক হাতে না কুলোয় তো দু-হাতে। রেওয়াজ হল, যা পাতে পড়বে খেতেই হবে আপনাকে ; নয়তো গৃহস্থের অপমান করা হল। কী বিদঘুটে রেওয়াজ ভেবে দেখুন। গোটা হিমালয়ই উপড়ে এনে যদি ভোজের পাতে রাখে, পলকে লোপাট করতে হবে। পারবেন ?

বেশ খানিকক্ষণ ঝড় বইয়ে দিয়ে, হঠাৎ দেখা যায়, খিদমতগার-বাহিনী অন্তর্হিত হয়েছে। সোয়াস্তির নিশ্বাস ফেললেন, ইতি পড়ে গেল রে বাবা। খুদ সাংস্কৃতিক মন্ত্রী — আজকের আসরের সভাপতি ইনি — বক্তৃতায় উঠলেন। ওঁদের নিজস্ব ভাষায় বলছেন, দোভাষি মানেও বুঝিয়ে দিচ্ছে — বিস্তর ভাল ভাল কথা, কিন্তু কান পেতে নিতে যাচ্ছে কে ? সর্বত্র এসব হয়ে থাকে। মন্ত্রীর ডান পাশে আছেন সকলের সেরা গাইয়ে বুলবুল। বক্তৃতার পরে তাঁর পালা। একটু স্টেজ মতন করেছে হলের একদিকে ; ধীরে ধীরে তার উপরে

গিয়ে আসন নিলেন। চেহারায় বুলবুল-পাখি নন আদপে। বয়স হয়েছে, মাথা-ভরা টাক — রং অবশ্য ফর্সা, সেটা ওদেশের আপামর-সাধারণের। কী অপরূপ যে গাইলেন। কখনো গম্ভীর মেঘমন্দ্রে, কখনো এক ফোঁটা কচি মেয়ের গলায়। বারম্বার ফরমাশ আসে, আরো আরো —। গাইলেন তারপরে ওখানকার অপেরার নাম-করা গায়িকা আখনাদোয়া ফেরেঙ্গি। আশ্চর্য কণ্ঠে আর একটি মেয়ে পর পর দুটো গান গাইলেন, মেয়েটির নাম সারা খাদিমোভা। গাইলেন মিঞাজী এবং আরও জন তিনেক — তাঁদের নাম টুকে আনিনি।

দুনিয়ার মানুষ যখন তেলের মহিমা জানত না, সুরার জন্য এই বাকুর নামডাক ছিল। সে খ্যাতি এখনো। আসবার পথে মস্ত বড় চোলাই কারখানা দেখে এলাম। সাকিরা ঐ তো একের পর এক গিয়ে বসছে স্টেজে — ঐ কাস্পিয়ান-সাগরের মতোই অতল কালো সুর্মা-আঁকা চোখ, পাকা আপেলের মতো টুকটুকে অধর, ডালিমের কোয়ার মতন ঝিকঝিকে দাঁতগুলি। নানান চেহারার তারযন্ত্র তাদের হাতে, কয়েকটার নাম শুনুন — তার (সারেঙ্গি), কেমেনকা (স্বরোদ), কাবাল (তম্বুরিন)। গাইছে গজল, গাইছে রুবেইয়াৎ। ওমরখৈয়ামের বইয়ের ছবি থেকে মেয়ে কটি যেন উঠে এসে স্টেজে বসল।

বক্তৃতা হল, গান-বাজনা হয়ে গেল — যাওয়া যাক এবারে? ওরে বাবা, সুরের রেশ না মেলাতে সেই খিদমতগারের দল হুড়মুড় করে আবার এসে ঢোকে। ভূতপ্রেতের ইঁট-পাটকেল ছোঁড়ার গল্প শুনেছেন — দেখতে দেখতে সামনের পাত্রে নানা খাদ্য স্তূপাকার হয়ে উঠল তেমনি। সমস্ত নতুন নতুন পদ, আগের কোনটাই এর মধ্যে আসেনি। যেন এক ভোজ সেরেই সঙ্গে সঙ্গে নতুন ভোজে বসে গেলাম। এ ভোজের শেষ ভাগেও বক্তৃতা ও গীতবাদ্য। এবং পুনশ্চ এক নতুন পর্ব। কী কাণ্ড, ভোজের পরে ভোজ — অনন্ত কাল চালাবে নাকি? এখানকার পথঘাট এবং মানুষগুলোর গতিক জানা থাকলে জায়গা ছেড়ে এক্ষুণি দৌড় দিতাম।

আমাদের মিঞাজীরও একটু বক্তৃতা: তোমাদের গঙ্গায় স্নান করব, দিল্লি-বোম্বাই ঘুরব, বাল্যকাল থেকে আমার সাধ; আজকে এই রাত্রিবেলা তোমাদের সঙ্গে বসে সেই সাধ মিটে গেল। আধ-পাগলা মিঞাজী কেমন কাব্য করে বলছে একবার শুনুন। আর বললেন আজারবাইজানের সবচেয়ে বড় লেখক সোলেমান রুস্তম। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পড়েছেন তিনি তর্জমায়। মুগ্ধ হয়ে পড়েছেন, শতকণ্ঠে তারিফ করতে লাগলেন। ভারতের সকল লেখক অমনি ভাবে, সর্ব মানুষকে বড় হবার প্রেরণা জোগান, এই তাঁর প্রার্থনা।

আমার দফা শেষ ঐ বক্তৃতার ফলে। কুমতলব চাগাল এক জনের মাথায় — চোখ ঠেরে বলে দিয়েছে, লেখক একটি এখানেও আছে; ঠাকুরেরই খাস-এলাকার মানুষ। আমি এত সব জানিনে, ঘাড় গুঁজে নিজ মনে খাদ্য-সমস্যা নিয়ে আছি — শুধু মাত্র মুখ-বিবরে সম্ভব নয়, অন্য কোন কৌশল আছে কিনা খাদ্য পাচার করবার?— হেন কালে দু-দিক দিয়ে বিশাল দুই রোস্ট-মুরগি পাতে এসে পড়ল। আমার ডাইনে ও বাঁয়ে দুই নারী — লেখক বুঝতে পেরে এবারে তাঁরা সমাদরে প্রবৃত্ত হলেন। রামা-শ্যামা লোক নন তাঁরা — একজন সুপ্রিম-সোবিয়েতের মেম্বর, অপরজন ওখানকার শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী। তা সে যা-ই হোন, গদগদ হবার কিছু নেই। চেহারা সুন্দরই বলতে হবে, নাক-মুখ খাসা, কিন্তু রীতিমত তাগড়া জোয়ান। দু-জনেই। লম্বায় আমাদের সাধারণ মাপের দেড়া তো হবেনই, চওড়াতেও পাক্কা দেড় হাত ঘেঁসবেন। আমি রোগা-পটকা নই, গতর দেখে হিংসাই তো করেন আপনারা — কিন্তু এই দুই বস্তুর মাঝখানে আমায় মাছি-পিঁপড়ের সামিল দেখাচ্ছে। এখন দেখতে পাচ্ছি, টেবিলের ধারে খাবার এসে পড়লে পরিবেশনের লোককে এঁরা দিতে দিচ্ছেন না, কেড়ে নিয়ে দুজনে পাল্লা দিয়ে পাতের উপর ঢালেন। ইংরেজি জানেন না — ঠারেঠোরে খেতে বলেন, আর হাসেন মিটিমিটি। আমার কপালে ঘাম দিচ্ছে — ভোজের সুবিধা করতে পারছিনে বলে এতক্ষণ লজ্জা-সঙ্কোচ ছিল, এবারে আতঙ্কে দাঁড়িয়ে গেছে। সমাদরের আবেশে দু-দিক দিয়ে এই দু-জন আরও কিঞ্চিৎ যদি চেপে আসেন, স্যাণ্ডউইচের ভিতরকার পুরের দশা হবে আমার।

রাত পৌনে-তিনটেয় বিরিয়ানি এলো। গন্ধ ভুরভুর করছে। তখন আমরা মরীয়া — কেটে কুচি-কচি করে ফেল, এক কণিকা আর দাঁতে কাটতে পারব না। হুল্লোড় করে অগত্যা স্বাস্থ্যপান চলল এদেশের-ওদেশের। মন্ত্রী মশায় ইতি করতে উঠলেন: ভারি ভাল লাগছে। আড্ডা ভাঙবার ইচ্ছে ছিল না মোটে — কিন্তু প্লেনে সারাদিন তোমাদের ধকল গেছে, ভোরে আবার চলে যাচ্ছ, সকাল সকাল তাই শেষ করে দিলাম। যাও, বিশ্রাম করো গে।

আটটার সময় বসেছি, আর ভোজ চুকিয়ে রাত তিনটেয় ঘরে ফিরলাম। ভোরে যাবার তাড়া, সেই জন্য সকাল সকাল ছেড়ে দিয়েছে; নইলে বোধ হয় অষ্টপ্রহর অবিশ্রাম এই করাল ভোজ চালাত। শুতে গিয়ে এক ভাবনা, পশমি প্যান্ট পরে গরমে ঘুম হবে না তো! খেয়াল করে লুঙি কি পায়জামা একটা যদি প্লেন থেকে নিয়ে আসতাম। কি করি, কি করি? বিছানার চাদর তুলে লুঙির মতো পরে নিলাম — আমাদের অজ পাড়াগাঁয়ের গতিক। ঠিক তখনই শুয়ে পড়তে মন যায় না। কাস্পিয়ান সাগর-কূলে তারা-ভরা আকাশের নিচে

জীবনের পরম রাত্রি। একটি মাত্র রাত্রি এই। বাইরের বারাণ্ডায় বসে কতক্ষণ ধরে সাগর দেখছি। শুধু মাত্র তেল নয়, নানা খনিজে ভরা অঞ্চল। গন্ধক-জলের ঝরনা আছে, শুনেছি। সুরাখান পাহাড় থেকে যখন তখন দাউ-দাউ করে অগ্নিস্তম্ভ ওঠে আকাশমুখো। মাটি ফুঁড়ে আগুন ওঠে আরও নানান জায়গায়; বিস্ফোরণ হয়ে আগুন ছড়িয়ে যায়। আদিকাল থেকে এমনি হয়ে আসছে। ভয়-সম্ভ্রম আসে কি না বলুন হেন আগুনের উপর, পূজো করতে মন যায় কি না? জরথুষ্ট্র এই তল্লাটে জন্মেছিলেন, অগ্নিপূজার বিধান দিলেন যিনি। কেন দিলেন, আজকে মালুম হচ্ছে। আপনি বলছেন, মাটির নিচের গ্যাস বেরুবার সময় আগুন ধরে গিয়ে এই সব হয়। বুদ্ধি-বিচার করে মেনে নিচ্ছি। কিন্তু সেকালের কর্তাদের বলতে গেলে বুঝতেন ঠেলা-- অবিশ্বাসী নাস্তিক বলে ঠেঙানি খেতে হত।... কাস্তের মতন চাঁদ উঠছে সাগরের প্রান্তে, জল ঝিল-মিল করছে। আচ্ছা, কাস্পিয়ান সাগরের নাম নাকি কাশ্যপ মুনি থেকে? এদিকে চলাফেরা ছিল তাঁদের?

ট্রাম চলতে শুরু করেছে রাত থাকতেই। কুয়াসার রহস্য-গুণ্ঠন খুলে সাগর আস্তে আস্তে মুখ খুলছে। চারিদিক স্পষ্ট হল। এ কোন জায়গায় এসে আছি! যে দিকে তাকাই, তেলের কূয়া। জাহাজের মাস্তুলের মতো পাম্পের মাথা উঁচু হয়ে আছে।

দিনের আলোয় সরকারি পাড়াটা একবার চক্কোর দিয়ে এরোড্রোমে ছুটলাম। মিলিটারি গাড়ির খুব চলাচল, পলকে পলকে চোখে পড়ছে। অঞ্চলটা নিয়ে অতি সতর্ক এরা। ট্রাফিক-পুলিশ নেই, তবু দুর্ঘটনা হয় না; মানুষজন নিয়ম মেলে চলে। ঘোড়ার গাড়ি দেখতে পাচ্ছি। মস্কোতেও দেখেছি এমনি এক-আধখানা। ক্রমশ আদি-শহরে এসে পড়লাম। উঁচু-নিচু পথ। দেয়াল-ঘেরা নিচু ঘরবাড়ি। মসজিদ এদিকে সেদিকে। কাবুলেও অবিকল এমনিধারা দেখে এসেছি। তারপরে আর্মেনিয়ান পাড়ায় এসে পড়লাম। শহর আর নয়, গ্রামই বলুন এবারে। তেলের খনি ডাইনে-বাঁয়ে, সামনে পিছনে। পাইপে পাইপে জাল বুনে গেছে। মাটির নিচের পাইপ তবু তো দেখা যাচ্ছে না।

কত বড় তৈলক্ষেত্র, আকাশে উঠে আরও ভাল রকম মালুম হল। দিগ্‌ব্যাপ্ত পোড়ো জমি, জল জমে আছে এখানে ওখানে, খাল চলে গেছে, মাঝে মাঝে পিচ-দেওয়া বিসর্পিল কালো রাস্তা। তারপর কাস্পিয়ান-সাগরের উপর এলাম। প্লেন নিচু হয়ে উড়ছে। জলের মধ্য থেকে তেলের পাম্প মাথা খাড়া করে উঠেছে, নিস্তরঙ্গ নীল জল নিচে। ডাঙা থেকে সাতচল্লিশ মাইল অবধি

গেছে এমনি — জলের তলে কুয়া খুঁড়ে তেল আদায় করছে। প্লেন উপরে উঠছে এবার। উঁচুতে — অনেক উঁচুতে। আর জল দেখা যায় না, মেঘদল নিচে। মেঘ নয়, আকাশ ভরে পেঁজা-তুলো ছড়ানো।

কাস্পিয়ান-সাগর পুব-দক্ষিণে কোণাকুণি পাড়ি দিয়ে অনেক মরু ও স্তেপভূমি পার হয়ে ঠিক দুপুরে হাঁপাতে হাঁপাতে অস্কাবাদে নেমে পড়লাম। তুর্কমেনিস্তানের রাজধানী। বাইশ-শ বছর আগে পার্থিয়ানরা নিশা নগরী গড়েছিল — সেই নগরী ভেঙে-চুরে পড়ে আছে অনতিদূরে। ফাঁকা মাঠের এদিকে-সেদিকে শ্যামল সতেজ গাছপালা, মসজিদ আর বেঁটেখাটো ঘরবাড়ির মধ্যে একটা-দুটো দৈত্যাকার অট্টালিকা — এই হল জায়গাটা। বর্ষার মেঘের মতো ঘননীল কোপেতদাগ পাহাড় একটা দিক ঘিরে রয়েছে। পাহাড়টুকু পার হলে পারশ্য। একেবারে সীমান্তের উপরে শহর।

আধঘণ্টা টাক এখানে থেকে জলটল খেয়ে আবার উড়বার কথা। অথচ, বসেই আছি। লোকগুলো ফুসফুস-গুজগুজ করছে, ব্যস্তসমস্ত ভাবে ছুটছে এদিক-ওদিক, ফোন করছে। বসেই আছি আমরা। অবশেষে ডাকল, রেস্তোঁরায় চলুন। খেয়ে নিন ভাল করে। তারপর শহরে যাবেন। আজকে আর প্লেন ছাড়বে না।

ব্যাপার কি হে ? দোষ নাকি আমাদেরই — বাকু থেকে দেরি করে বেরুলাম কেন ? আরও খানিক পরে গাঢ় কুয়াশা নামবে, সূর্য ঢেকে যাবে পাহাড়ের আড়ালে। পাহাড় পেরুতে ভরসা করছে না এখন ; সকালবেলা অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা। পাহাড় ভারি মজার এখানে — নতুন পাহাড় জন্মাচ্ছেন, পুরানোরা বেড়ে চলেছেন এখনও। ঐ যে কোপেতদাগ, উনিও বড় হচ্ছেন বছর বছর ; ফুলে উঠছেন। আগ্নেয়গিরি হয়ে ফুঁসে উঠবেন কবে। পাঁচ বছর আগে এই অক্টোবর মাসেই বিরাট ভূমিকম্প হয়েছিল এখানে। একটা বাড়ি আস্ত ছিল না, নতুন করে শহর গড়তে হচ্ছে। মেয়র সেই ভয়ানক দিনের গল্প করতে করতে এরোড্রোমের হাতার ভিতরে রেস্তোঁরায় নিয়ে চললেন।

হয়েছে ভাল। মনে প্রাণে চেয়েছিলাম, মধ্য-এশিয়ার দেশগুলো একটু দেখব। পাকেচক্রে প্রোগ্রামের বাড়তি দেশও অনেক দেখা হয়ে যাচ্ছে। দুনিয়ার মধ্যে সকলের পিছনে পড়ে ছিল এই অঞ্চল। উনিশ-শ পঁচিশ সালের হিসাবে পাচ্ছি, সারা দেশের মধ্যে পঁচিশটা মেয়ে একটু-আধটু লিখতে পড়তে পারে। মেয়ে কেনাবেচা ছিল এই সেদিন অবধি। মোটা পণ দিয়ে বউ ঘরে আনলাম — সে বউয়ের মরণ-বাঁচনের ষোল আনা হকদার আমি পুরুষ-মানুষ।

মরূদ্যানে তুলো আর গমের অল্প সল্প চাষ। স্তেপ-ভূমিতে ভেড়া-ছাগল চরানো। তাঁতের কাজের খুব নাম — গালিচা ও কার্পেট বোনে হাতের তাঁতে। এমনি করে অন্ন ও শীত-গ্রীষ্মের বস্ত্র হয়ে গেল — আবার কি ? নুনের ভাবনা নেই, পৃথিবীর সব চেয়ে বড় নুনের পাহাড় এই রাজ্যে। গন্ধকও প্রচুর। এবং পারা-সীসে। মরুদেশে কালো রঙের এক রকম বালু পাওয়া যায়। আর জোড়া-কুঁজওয়ালা উট দেখতে পাচ্ছেন ঐ পথে-ঘাটে —

ছোট এরোড্রোম, সামান্য রেস্তোঁরা। হালকা রকমের চায়ের ব্যবস্থা ছিল আমাদের জন্যে, গতিক বুঝে আয়োজনটা ভারী করতে হল। তাই কিছু সময় নিয়েছে। হাতি-ঘোড়া কিছু নয় — রুটি-মাখন, আধ-শুকনো আঙুর আপেল — এবং খরমুজা। আমাদের দেশের খরমুজ আর কি, মরু অঞ্চলে জন্মানোর দরুন চেহারাটা অধিক নিরেশ। বড় বড় ফালি কেটে বারকোশে করে এনেছে। ও-বস্তু কে খেতে যাচ্ছে, পাতের কোল থেকে সবাই ফিরিয়ে দেয়। মেয়র মশাই অনুনয়-বিনয় করছেন : একটুখানি চেখেই দেখুন না। পুরো ফালি না নেবেন তো কেটে নিন। সন্তর্পণে একটুকু জিভে ঠেকাতে, বলব কি মশায়, মাখনের মতো গলে আপনা-আপনি নেমে গেল বস্তুটা। যেমন সুবাস তেমনি স্বাদ। আরও দাও, আরও দাও — রব উঠল টেবিলের সর্বপ্রান্ত থেকে। মেয়র মশায় মুচকি মুচকি হাসেন। খরমুজা ফল ভুবনের বিস্তর জায়গায় ফলে, কিন্তু এখানকার মতো নয়। এখান থেকে এই ফল ভিস্তির মশক চাপা দিয়ে হিমালয়ের অন্ধিসন্ধি ঘুরিয়ে লাহোরের মোগল-দরবারে পৌঁছে দেওয়া হত, নিদারুণ গ্রীষ্মে বাদশাহেরা খেয়ে পরিতৃপ্ত হতেন। এর পর ও-তল্লাটে যত ঘুরেছি — খানা-টেবিলে বসে সকলের আগে খোঁজ করি : খরমুজা কই মশায়, সেইটে নিয়ে আসুন।

সেই যে ব্যস্তসমস্ত হয়ে টেলিফোন করছিল, হোটেলের ব্যবস্থাও হয়ে গেছে। অবেলায় নতুন করে সেখানে রান্নাবান্না চাপিয়েছে। জলযোগ অন্তে শহরে চললাম। ধুলোমাটি-ভরা রাস্তা দিয়ে চলেছি — দূর কম নয়। ঘোড়ার পিঠে চড়ে উটের পিঠে চড়ে যাচ্ছে অনেকে ; গাধা চড়েও যাচ্ছে। ধূ ধূ করছে মাঠ — মরুভূমি বলতে পারেন। শহরের কাছাকাছি এসে গাছপালা পাচ্ছি। পিচ-দেওয়া চওড়া রাস্তা। ভূমিকম্পের ধ্বংসাবশেষের উপর নতুন নতুন বাড়ি উঠছে। বেশির ভাগ বাড়ির দেখছি মাটির দেয়াল, ছাতও মাটির। বাড়ির চারিদিক ঘিরে পাঁচিল থাকবে অতি অবশ্য। থাকতেই হবে। বাড়ি তৈরি হয় নি, সেখানেও জমির চতুর্দিকে আগেভাগে পাঁচিল দিয়ে রেখেছে। গোটা অঞ্চল ধরে মুসলমান। বিশাল মসজিদ একটা, কারুকার্য-খচিত বৃহৎ

গম্বুজ — কিন্তু নিচের অংশটা ভেঙেচুরে ইঁট গাদা হয়ে আছে। কসাড় জঙ্গল ভিতরে, লোহার শিকের ভারী দরজায় কুলুপ আঁটা — কেউ কোন দিন ঢোকে বলে তো মনে হয় না। মসজিদের পাশে জাতীয় মিউজিয়াম। খেয়েদেয়ে সন্ধ্যার দিকে বেড়াতে আসব এখানে, অনেক বস্তু দেখবার আছে।

মেয়রের কাছে গল্প শুনছি। ষষ্ঠ শতকের ইতিহাসে প্রথম এদেশের নাম পাচ্ছেন। আরবরা জয় করল; আদি সংস্কৃতি বিলকুল নষ্ট হয়ে গেল তাদের কবলে পড়ে। পার্থিয়ানদের শহর নিশা ধ্বংস করল মঙ্গোলিয়ানরা। কি অবস্থায় ছিলাম, আজকের চেহারা দেখে কিছু আন্দাজ করতে পারবেন না। বিপ্লবের আগে শতকরা ·৭ জন লিখতে পড়তে পারত; এখন কি পুরুষ কি মেয়ে একটি নিরক্ষর নেই। গোর্কি য়ুনিভার্সিটি আর অগণ্য ইস্কুল-কলেজ গড়ে উঠেছে। ম্যালেরিয়া-প্লেগে গোটা মধ্য-এশিয়া উৎখাত হয়ে যাচ্ছিল, এ সব রোগ ঝাড়ে-বংশে নিপাত হয়েছে এখন। সিল্ক, কাপড় ও নানান রাসায়নিক দ্রব্য তৈরি হয়; বড় বড় মিল-ফ্যাক্টরি হয়েছে। যৌথখামার হাজার খানেক হবে — প্রতি চাষী-পরিবার গড়ে সত্তর আশি হাজার রুবলের ফসল ফলায়। তুলা বেশি। মেষপালনও খুব হয়। পঞ্চাশ-ষাট হাজার অস্ট্রাখান ভেড়া প্রতি যৌথখামারে। আর কার্পেটের তো আদি জায়গা — কার্পেটের কথা আলাদা করে বলতে হবে না। কারাকুম মরুর মাঝখান দিয়ে খাল কাটা হচ্ছে; দিন-রাত যন্ত্রপাতি খাটছে; দেড় বছর লাগবে আর। খাল কেটে আমুদরিয়ার জল নিয়ে আসবে, চাষবাস ডবল হয়ে যাবে তখন।

ভূমিকম্পের কথা উঠল। এখনো গা কাঁপে সেই দৃশ্য মনে উঠলে। একটা বাড়ি ছিল না শহরে, কত লোক মরেছিল গোণা-গুণতি নেই। খবর যখন চারি দিকে চাউর হল — বলব কি মশায়, বাকু তিবলিসি তাসখন্দ সর্বত্র হৈ-হৈ পড়ে গেল। খাবার, অষুধ ও রকমারি জিনিসপত্র আসতে লাগল সকল অঞ্চল থেকে। সাহায্য বয়ে নিয়ে এরোপ্লেন এত আসছে যে আকাশ দেখা যায় না। বুঝলাম, আমাদের তুর্কমেনিয়ার দুঃখ গোটা সোবিয়েত দেশ ভাগ করে নিয়েছে। সোবিয়েতের কেন্দ্র-সরকার একশ মিলিয়ন রুবল মঞ্জুর করলেন। নতুন বাড়ি বানানোর সাজসরঞ্জাম ভারে ভারে এসে পড়ছে। কেন্দ্র-সরকার এখনও প্রতি বছর পঞ্চাশ মিলিয়ন রুবল দিচ্ছেন। কিন্তু লোকের অভাবে কাজকর্ম তাড়াতাড়ি এগোচ্ছে না। এবারে এমন ঘরবাড়ি হচ্ছে, ভূমিকম্পে যা ভাঙতে পারবে না। এই নতুন পদ্ধতি সকলে জানে না, শিখিয়ে পড়িয়ে লোক তৈরি করে নিতে হচ্ছে।

সবই ভাল সন্দেহ নেই। স্বাচ্ছন্দ্যে আছ। একটা শঙ্কা কিন্তু মনে খচখচ

করে। কালকের আসরে খাদিমোভা গান গাইলেন। এমনি নাম অনেক পাচ্ছি। আরবি নাম থেঁতো করে রুশীয় ধরন এনেছে। রুশ ভাষাটাও শিখতে হচ্ছে সকলের। শিখতেই হবে। আরবেরা জয় করে আদি সংস্কৃতি লোপাট করেছিল। অনেক শতাব্দী ধরে আবার যা গড়ে তুললে, তার উপরে ঘা পড়ছে না তো এই সোবিয়েত আমলে?

কালকের বিপাকে আমরা সেয়ানা হয়ে গেছি, মালপত্র প্লেনে নেই, সমস্ত এসে গেছে হোটেলে। লাঞ্চ শেষ হতে ঘোর হয়ে এলো। বেরুনো যাক, এর মধ্যে যত কিছু দেখে নেওয়া যায়। লেনিন পার্ক। লেনিনের অতিকায় মূর্তি পার্কের ঠিক মাঝখানে। জায়গাটা গালিচার জন্য বিখ্যাত বলে মূর্তির পদতলে পাথরের উপর গালিচার নানান রকমের নক্সা। যত ছেলেমেয়ে ঘোরাঘুরি করছিল, সবাই এক ঠাঁই হয়েছে এখন। আমাদের কাছে এসে দাঁড়াল, সম্বর্ধনা জানায় রুশ ভাষায়। আমরা ঘুরছি, তাদেরও এক দঙ্গল ঘুরছে পিছু পিছু। মিউজিয়াম যাব এখান থেকে, গাড়িতে উঠেছি—গাড়ি ঘিরে তারা উল্লাস করছে, পথ ছেড়ে দিতে চায় না।

শহরটা দ্রুত এক পাক দিয়ে এসে পড়লাম মিউজিয়ামে। মেয়েরা লাল পোশাক বড় ভালবাসে; লাল কাপড়ের টুকরো মাথায় বাঁধে গামছার মতন। এই হল জাতীয় সাজ। এখন রাত্রিবেলাও লাল পোশাকে গোটা কয়েক মেয়ে পিছন দিককার বাগানে গল্পগুজব করছে, হাসছে খিলখিল করে। মিউজিয়ামে হরেক রকম গালিচা দেখাল, জাঁক করে দেখাবার বস্তুই বটে। কার্ল মার্কস, লেনিন, স্ট্যালিন ও স্থানীয় অনেকের ছবি তুলেছে গালিচায়। পুরো এক ঘটনা ধরে তুলে ফেলেছে। পটে-আঁকা ছবিতেও এমন নিখুত হয় না। নক্সা বোনে মেয়েরাই বেশির ভাগ; কি ভাবে কোন পদ্ধতিতে বোনে, তা-ও হাতে-কলমে দেখিয়ে দিচ্ছে। পাহাড়ের অরণ্যে বাঘ ইত্যাদি জন্তুজানোয়ার; বিস্তর মরা জীবজন্তু সাজিয়ে রেখেছে একদিকে।

অপেরায় ছুটলাম। পায়োনিয়র-বাচ্চারা পথে এগিয়ে আছে অভ্যর্থনার জন্য। হাততালি দিয়ে ভিতরে নিয়ে চলল। ছুটে গিয়ে কোথা থেকে এক-গাদা ফুল নিয়ে এলো। ফুলের তোড়া হাতে হাতে গুঁজে দেয়। অপেরা-হলে ঢুকতে পুনশ্চ এক দফা হাততালি। হাততালি থামে না, হলসুদ্ধ মেতে গেছে। রোমান্টিক নাটক—নিছক প্রেমের গল্প। সোবিয়েতে যত পালা দেখলাম, বেশির ভাগ এমনি। ছেলেটার নাম তাহের; মেয়ে জোহরা। জোহরার বাপ মন্ত্রী; তাহেরের বাপ রাজা। অত্যাচারী রাজা—ক্রীতদাসদের নির্মম ভাবে খাটায়। তাহের বিরুদ্ধে দাঁড়াল—প্রিয়তমাকে পেতে বাধা ঘটল

সেই কারণে। বিস্তর ছুটোপুটির পর মিলন অবশেষে।

[ডায়েরি]

আজ আটাশে অক্টোবর শুক্রবার অগ্লাবাদ শহরের হোটেলে আটাশ নম্বর ঘরে রাত্রি এগারোটায় এই অবধি লিখলাম। খুব ভোরে বেরিয়ে পড়ব। রোজ রাত জাগলে শরীর খারাপ হবে, এই ভয়ে তাড়াতাড়ি ইতি করছি আজ। জীবনে আর কখনো আসব এখানে? লেখা থাক, রাতের চেহারাটা দু-চোখ ভরে দেখে নিই। ঘরের সামনে একটু ব্যালকনি, আপেল-গাছ ঝুঁকে পড়েছে। একটা ডাল ধরে দাঁড়ালাম সেখানে। এরই মধ্যে চারিদিক নিশুতি, কী রকম শহর রে বাবা! ছুটোছাটা দুটি একটি মানুষ চলাচল করছে। কালো ওভারকোট গায়ে একটা মেয়ে ও এক পুরুষ হাত ধরাধরি করে চলেছে; গলে গলে পড়ছে দেখ দুটিতে। আমার টেবিলের উপর ফুলের তোড়া — অপেরা থেকে নিয়ে এসেছি। সুবাসে মন ভরে গেল……

ভোরবেলা আবার পাখা মেলেছি। মরু আর পাহাড়—ঈশ্বর, দুনিয়ার এত জায়গা জুড়ে গেরুয়া বালি বিছিয়ে রেখেছ! উঠতে উঠতে তেরো হাজার ফুট উপরে তখন। তাকিয়ে আছি নিচের দিকে। হঠাৎ চোখ জুড়িয়ে যায়। দু-কূলপ্লাবিনী নদী—স্নিগ্ধশ্যাম গালচে বিছানো নদীর এপারে-ওপারে। পাহাড়ের গায়ে সবুজ সিঁড়ি উঠে গেছে—লক্ষ্মী ঠাকরুন পা ফেলে ফেলে শিখরে উঠে যাচ্ছেন হাতের ঝাঁপি উপুড় করে দিয়ে। তুষার-গিরির বেড়া-ঘেরা ফসলের রাজ্যে পৌঁছে গেছি। মানুষের রাজ্যে।

ভূমির মানুষ প্রীতির বাহু বাড়িয়ে আকাশমুখো চেয়ে আছেন। কত মানুষ এসে জুটেছেন এরোড্রোমে। পুরুষেরা তো আছেনই—আর এই মুসলমানি দেশে সেদিন অবধি ঘোড়ার পুচ্ছলোমে-বোনা কড়া বোরখায় যাঁদের চন্দ্রমুখ ঢাকা থাকত, বোরখা ছুঁড়ে দিয়ে তাঁরাও চলে এসেছেন কত জনে। মস্কোয় ফুলের কঞ্জুষপনা—নেতা ও নারীদের শুধু ফুল দিয়ে খাতির। এখানে জনে জনের হাতে ভারী ওজনের তোড়া দিয়ে ফুরাতে পারে না ; এক গাদা বাড়তি থেকে যায়। সেগুলো তখন আমরা দখল করে নিয়ে ওদের উপহার দিই। পরের ধনে পোদ্দারি। ফুল দিয়েই শেষ নয়—সে উপহার হাতে ছুঁতে না ছুঁতে, দেখি, বুকের মধ্যে লুফে নিয়েছেন। একই সোবিয়েত দেশের মধ্যে ঘুরছি বটে—বুঝতে পারলাম, এ এক ভিন্ন এলাকা। নিখুঁত ভদ্রতাসঙ্গত শেকহ্যাণ্ডের ধার ধারেন না এই মশায়েরা, বীরবিক্রমে বুকে চেপে ধরেন। ম্যালেরিয়াজর্জর পিলে-সর্বস্ব কেউ নেই ভাগ্যিস আমাদের মধ্যে ; ভালবাসার দারুণ চাপে তবে তো পটাশ করে পিলে ফাটবার কথা। যেদিকে তাকাই, শুনতে পাচ্ছি—'সালাম' 'সালাম'। ঐ 'সালাম' শুনে আরও মনে হয়, দেশভূঁইয়ে ফিরে এসেছি। তা স্বদেশ আর কত দূরই বা। ক'টা পাহাড় পাড়ি দিয়ে আফগানিস্তান ; তার পরে পাকিস্তানের উপর দিয়ে সাঁ করে ভারত-এলাকায় ঢুকে পড়তে পারি।

তুরসুন-জাদে মির্জা—তাজিক দেশের সেরা কবি। তিনি সকলের আগে

দাঁড়িয়েছেন। আশেপাশে বিস্তর হোমরাচোমরা ব্যক্তি। কবিবরের সঙ্গে চীনের পিকিন শহরে সেবার আলাপ হয়েছিল। ছোটখাট একটু বক্তৃতা ছাড়লেন—অভ্যর্থনার প্রথম মুখে যেমন রেওয়াজ। তাজিক ভাষা আর ফারসির মধ্যে তফাত সামান্য; বুঝতে বেশি আটকায় না। বললেন, ফেরদৌসি-সাদি-হাফেজের ভূমিতে পা দিয়েছেন মশায়েরা—আমরা জানি, পূব অঞ্চলের বাংলা দেশ অবধি আমাদের দেশের এই সব কবির সমাদর। রবীন্দ্রনাথ প্রেমচন্দ ও ইকবালের লেখা থেকে এ দেশে আমরাও তেমনি আনন্দ ও প্রেরণা ছেঁকে নিই...

আর এই এক ব্যাপার—ঘড়ির কাঁটা ঘোরানো। মস্কো থেকে তিন ঘন্টার ফারাক এই জায়গায়। সোবিয়েত দেশটা কত বড় বুঝে দেখুন তবে, কত অঞ্চল জুড়ে আমরা চক্কোর দিচ্ছি। কাঁটা ঘোরাতে ঘোরাতে জ্বালাতন হয়ে গেলাম। মস্কোয় বরফ পড়ছে, আর এখানে দুপুর বেলাটা রীতিমত আইঢাই করতে হয়। রাত্রে অবশ্য ঠাণ্ডা পড়ে—বেশ ঠাণ্ডা, মরুদেশের যা দস্তুর।

তাজিকিস্তান অনেক পরে—১৯২৯ অব্দে সোবিয়েত গণতন্ত্রে মাথা ঢুকাল। আজ ১৯৫৪-য় রজত-জয়ন্তী। জোরদার উৎসব—দেশবিদেশে নিমন্ত্রণ গিয়েছে। নানান চেহারায় ও নানান পোশাকে মিলে শহরের পথে পথে বিজলী খেলে যাচ্ছে। একাশি বৎসর বয়সের তরুণ ডীনকে জানেন আপনারা—মস্কোর বিল্ডিং-এক-জিবিশনে যাঁর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল—মচ্ছবে তিনিও চলে এসেছেন। তুরস্থন বক্তৃতায় সেই সমস্ত বললেন—ধ্বংস থেকে ঐশ্বর্যে এসেছি আমরা, মৃত্যু থেকে আনন্দে। ভুবনের তাবৎ বন্ধুদের ডেকে ডেকে জাঁক করে আজ দেখাব।

তাই বটে! আনন্দ সাগরতরঙ্গের মতো উচ্ছলিত চতুর্দিকে। এরোড্রোম থেকে শহরে যাচ্ছি। যে দিকে তাকাই—নিশান উড়ছে, ছবি সাজিয়ে দিয়েছে। দশ-বিশ পা গিয়েই লেনিন-স্ট্যালিনের মূর্তি। এই বস্তুটা বড্ড বেশি সোবিয়েত দেশে, বিতৃষ্ণা লাগে। দোকানপাট ঘরবাড়ি দেয়াল দেখবার জো নেই—পতাকায় পতাকায় ঢেকে গেছে। তাজিকিস্তান-গণতন্ত্রের আলাদা পতাকা। সোবিয়েতের ষোলটা গণতন্ত্র—ভিন্ন পতাকা সকলেরই। মার্চ করছে একেবারে বালখিল্য একদল পায়োনিয়র। এদের চেয়ে একটু বড় আর একদল মার্চ করছে পিছন-দিকে। তারও পিছনে মার্চ করছে—তারা আর একটু বড়। এমনি চলল। কালকের মহোৎসবে মিছিল হবে, শহর ভরে তার তোড়জোড়। চীনেও ঠিক এই ব্যাপার দেখেছি, সে আয়োজন অবশ্য অনেক বড় এর চেয়ে। এত বড় যে তুলনাই চলতে পারে না।

খাসা শহর। ছবির মতো। তুষারধবল হিসার পর্বতমালা ঘিরে ধরেছে—

পর্বতের পদতলে ওয়েসিসের মধ্যে একটি যেন সাজানো বাগান। উত্তর-দক্ষিণে লম্বা লেনিন স্ট্রীট দিয়ে যাচ্ছি — পপলার-উইলো-থুজা-এলম নানান গাছের ছায়ায় স্নিগ্ধ রাজপথ। পথের দু-পাশে বড় বড় গাছ — আবার ঠিক মাঝখানেও গাছের তিন-চার সার। এদিকে ওদিকে পিচের রাস্তা। ফুলের বাগান এখানে ওখানে। বাড়িগুলো পাহারাদারের মতো বুক চিতিয়ে রাস্তার উপরে দাঁড়িয়ে নয় — খানিকটা পিছনে সরে। মানুষের আরাম-আনন্দের নীড় এক একটি। রাস্তাঘাট ঘরদুয়োর খেয়ালখুশি মাফিক নয়, রীতিমতো হিসাবপত্র করে বুদ্ধি খাটিয়ে বানানো।

অথচ কী ছিল এই পঁচিশ-ত্রিশ বছর আগেও। নগণ্য এক আধা-শহর — দিউশাম্বে। নিচু-ছাত নিচু-দরজা মানুষ নামক পশুর ইতস্তত-ছড়ানো বাসগুহা। বাহনের মধ্যে গাধা ও খচ্চর — মালপত্র ও মানুষ পিঠে নিয়ে বেড়াচ্ছে ধুলো-ভরা রাস্তায়। রেলরাস্তা আড়াই-শ মাইলের এদিকে নয়। শহরের পাশেই কুষ্ঠরোগির আস্তানা — কুষ্ঠীরা অবাধে যত্রতত্র ঘুরে বেড়ায়। গোঁড়া মোল্লাদের কড়া শাসনে সন্ত্রস্ত ইতর-ভদ্র সর্বজন। বনেদি বে মশায়দের বাড়ি অহোরাত্রি জুয়ার হুল্লোড়। আর হামেশাই দেখতে পেতেন, সৈন্যরা একজন দু-জনের হাত-পা বেঁধে কোতল করতে নিয়ে যাচ্ছে। বাজারটা ঘুরিয়ে নিয়ে যায়, লোকে দেখে দুটো-চারটে পয়সা দেয়, সৈন্যদের উপরি রোজগার সেটা। এই ছিল সেদিনের চেহারা।

আমাদের মোটরগুলো সারবন্দি ঢুকে পড়ল মামুলি কোন হোটেলে নয়, মস্ত বড় এক বাগিচার ভিতরে। কত রকমের ফুল ও ফল, গণে পারবেন না। মাঝ-খানে বাংলো প্যাটার্নের দুটো বাড়ি। অনেকগুলো ঘর — ছিমছাম সাজানো গোছানো। নতুন করে রং দিয়েছে — হয়তো বা আমরা আসছি বলেই — রং এখনো কাঁচা। দলটা দু-ভাগ হয়ে সেই দু-বাড়ির ঘরে ঘরে আমরা ঠাঁই নিলাম।

একটি মেয়ের উপর আমাদের বাড়ির খবরদারির ভার। তার নিচে আরও সব। মেয়েটি ভালো ; সুশ্রী প্রসন্ন মুখ। আলস্য নেই, মুখের কথা মুখে থাকতে ষোল জন আমাদের খেদমত করে বেড়াচ্ছে। নতুন জায়গায় পয়লা দিন নানান রকমের ফাই-ফরমাস — খেটে তবু যেন তৃপ্তি হয় না মেয়েটার। এক খাটনি খেটে এসে সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে আছে। করো আর-কিছু হুকুম। পলকের মধ্যে সেটা সেরে ফেলে আবার এসে দাঁড়ায়। বলো আরো কিছু। খাটনির এই হ্যাংলাপনা দেখে কষ্টও হয় মনে মনে। কিন্তু মুশকিল হল, একদম ইংরেজি জানে না, এক কথা বললে অন্য রকম বোঝে। বাথরুম কোন দিকে

গো ? বিছানার চাদর পালটে দিল এসে তাড়াতাড়ি। জুতোর বুরুশ দিতে বলো কাউকে — দৌড়ে এক কাপ কফি বানিয়ে আনল। এমনি গতিক। তখন সেই আদিম পদ্ধতির শরণ নিতে হল — মুখের কথা নয়, চোখ ঘুরিয়ে হাত নেড়ে ঠারেঠোরে বলা।

চায়ে চলে আসুন তাড়াতাড়ি —। পৌঁছুতে দেরি হয়েছে, একটা রাত অস্কাবাদে আটক থাকতে হল। সুপ্রীম-সোবিয়েতের অধিবেশন বসে গেছে, এক ঢোক চা মুখে দিয়ে ছুটতে হবে এখনই।

টেবিলে থরে থরে চায়ের আয়োজন — বড় ভয়ানক চা দেখতে পাচ্ছি। মৎস্য-মাংসের রকমারি তরকারিও চায়ের অন্তর্গত। তাহলে এর পর লাঞ্চে কি ব্যাপার হবে -- হিসার পর্বতমালার এক একখানা চূড়া তুলে এনে টেবিলে স্থাপনা করবে না কি ? যাই হোক সে পরের ভাবনা। টেবিলেই আমাদের হাতে-হাতে চিঠি দিল -- সুপ্রীম সোবিয়েতের কর্তারা দাওয়াত পাঠিয়েছেন। নোটবুক দিল, ফাইল দিল -- অধিবেশনের কাজকর্ম টুকে আনতে চান যদি।

তাজিক অপেরা ও ব্যালে হল। বাড়িটা আনকোরা নতুন। মস্ত বড় উঠান — মাঝখানে অনেকগুলো ফোয়ারায় উঁচু হয়ে জল পড়ছে; ফুলগাছ ও লতাগুল্মে সাজানো অবিকল মস্কো স্কোয়ারের মতন। নামও দিয়েছে মস্কো স্কোয়ার। অধিবেশন বসে গেছে ব্যালে হলের মধ্যে। সাজিয়েছে খুব। অগুন্তি গাড়ি একদিকে, আর এক দিকে মানুষ। পুলিশ ও মিলিটারি ঘোরাফেরা করছে। সসম্ভ্রমে তারা আমাদের পথ দেখিয়ে দিল। সিঁড়ি দিয়ে উঁচুতে উঠে নিচু হয়ে — আবার কিছু উঁচুতে উঠে হলে ঢুকলাম। ভিতরে আরও আহা-মরি সজ্জা। উঁচু প্লাটফরম পতাকা দিয়ে সাজানো, মাঝখানে মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন-স্ট্যালিনের সম্মিলিত ছবি। লম্বা-আঁশ মিশরীয় তুলার বিস্তর ফলন এখানে — সেই তুলা এঁকে দিয়েছে; ধান ফলে বলে ধানের শীষ এঁকেছে; ফল-পাকড়ের দেশ, সেজন্য তারও ছবি। আর ফুলের পাহাড় — প্লাটফরম কাঠের না লোহার না পাথরের বোঝবার জো নেই, শুধুই ফুল। সামনের সারিতে চার জন সভাপতি — রমণী হলেন তার একটি। পিছনে অপর নেতৃবৃন্দ। বক্তৃতার জায়গা আরও আগে — বক্তারা এক এক করে মাইকের কাছে এগিয়ে এসে বক্তৃতা পড়ছেন। চায়ের গেলাস ঘন ঘন বদলে দিয়ে যাচ্ছে বক্তার পাশে। বক্তা চুমুক মেরে গলা ঠিক করে নিচ্ছেন, আর পড়ছেন।

আমরা গিয়ে দাঁড়াতে বিষম হাততালি। কাজকর্ম বন্ধ, হাততালি আর থামে না। মোভি ও অসংখ্য ক্যামেরা নানান দিকে। জোরালো বাতি জ্বলে

উঠছে ক্ষণে ক্ষণে — সেই আলোয় কত বার কত রকমে যে ছবি নিচ্ছে তার অবধি নেই। এক ক্যামেরাম্যানের ডান-হাত কাটা — বাঁ-হাতে অবলীলাক্রমে টকাটক ছবি তুলে যাচ্ছে।

শ্রোতাদের মধ্যে কারো কারো সেকেলে সাজসজ্জা, মাথায় ফুল-কাটা চৌকো টুপি। মেয়েরা আছেন, তবে মস্কোর মতন সংখ্যাধিক্য নয়। আগে একেবারেই তো হারেমবর্তিনী ছিলেন, প্রতাপ কিছু কম তাই পুরুষের চেয়ে। কিন্তু হাওয়া যে রকম, এ সুখ পুরুষের বেশি দিন আর থাকছে না। বক্তৃতার পর বক্তৃতা — তাজিকি ভাষায় বলছে, দু-চার কথা যে না বুঝছি এমন নয়। নানা কৃতিত্বের কাহিনী। অপর গণতন্ত্রের মুরুব্বিরা উপহারের পর উপহার এনে ঢালছেন, আর ইনিয়ে বিনিয়ে বাহবা দিচ্ছেন তাজিকিদের।

আজও এক ঘুমের রাত থাকতে উঠেছি। তার উপরে বক্তৃতার ধকলে মাথা ধরেছে, বসতে পারছি না। হীরেন মুখুজ্জে মশায়ের তো স্পষ্টাস্পষ্টি জ্বর নাড়িতে; তিনি আসতে পারেন নি, ঘরে শুয়ে আছেন। ফাঁক বুঝে ক'জন আমরা সরে পড়লাম।

ঐ নির্দয় চা-সেবনের পরে লাঞ্চের আর তাগত নেই। ঘরে এসে সটান শুয়ে পড়েছি। রেডিও-য় রীলে করছে — শুয়ে শুয়ে অধিবেশনের বক্তৃতা ও হাততালি শুনছি। চোখ বুজেছি, দেখি, মেয়েটি এক সময় রেডিও-র জোর খুব কমিয়ে দিয়ে গেল। ঘুমিয়ে পড়েছি, বেহুঁশ হয়ে ঘুমুচ্ছি। সকলে ফিরে আসতে ঘুম ভাঙল। কত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম তবে বুঝুন।

হীরেন মুখুজ্জে মশায়কে ডাক্তার দেখে গেছে। নিউমোনিয়ার অবস্থা। পেনিসিলিন দিয়ে নার্স মোতায়েন করে গেছে। জোরজার করে আমাদের সান্ধ্য-ভোজে নিয়ে বসাল, হাত এড়ানো গেল না। রীতরক্ষার মতো হবে বাপু। আয়োজন তোমাদেরই বটে, কিন্তু পাকযন্ত্র নিজের। বিদেশ-বিভুঁয়ে যন্ত্রটা বিকল হতে দিচ্ছিনে। রাগ করলে নাচার।

খাওয়ার পরে আবার সেই অপেরা-হলে। কনসার্টের আসর। সারাদিন তা-বড় তা-বড় মানুষ ভারী ভারী অলোচনা করলেন, রাত্রির ফুরফুরে হাওয়ায় এখন সেখানে নাচ আর গান। একালের নাচগান তো আছেই — কিন্তু আজকের বিশেষ আয়োজন, বিদেশি অতিথিদের পুরানো কিছু দেখানো। পাহাড়ের উপত্যকায় আর মরুভূমির ওয়েসিসে নরনারী চিরকাল ধরে যে সব গান গায়, যে সমস্ত নাচ নাচে। এক বয়সে আমারও বাতিক ছিল — গাঁয়ে গাঁয়ে আসল বাংলাদেশকে খুঁজে ফিরেছি। কত পট-কাঁথা, কাঠের কাজ, ইঁটের কাজ, মাটির কাজ — কত কত লোক-নৃত্য ও সঙ্গীতের আসর! অমৃতে একদিন চুমুক

দিয়েছিলাম, অন্তরাত্মাকে হাজার পেষণেও মেরে ফেলতে পারেনি তাই। যাকগে যাকগে— নিজের কথা দশ কাহন করে বলছি, বেজার হচ্ছেন আপনারা।

পুরানো রীতির সাজ-পোশাক, সঙ্গতের মধ্যে শিঙা বাজাচ্ছে ঘন ঘন। একটা মেয়ে রুবাইয়াৎ গাইল— আহা মরি, কী মিষ্টি গলা! নানা চেহারার তারের বাজনা বাজাচ্ছে—পরশু রাতে বাকুর আসরে যেমন হয়েছিল। গানের পর করতালি আর থামে না। মধ্য-এশিয়ার নানান দেশে এই ক'দিন অনেক আসরে তো বসলাম। নাচগানের ব্যাপারে আধুনিকতার চেয়ে পুরানো ধারাই মানুষকে বেশি মাতোয়ারা করে; শ্রোতায় আর শিল্পীতে ফারাক থাকে না।

অনেক রাত্রি অবধি কনসার্ট চলল। পাঁচ-শ পুরুষ ও মেয়ে নামল কয়েকটা গানে নাচে— পাকা-দাড়ি বুড়ো মানুষ থেকে চঞ্চলা তরুণী কিশোরী। কেউ এরা পেশাদার নয়, জয়ন্তী-উৎসব ব্যাপারে নানান অঞ্চল থেকে এসেছে। আর এক দল ঝিকমিকে মেয়ে, লিখতে লিখতে, এই আমার চোখের সামনে ঘুরছে যেন। মাথায় লাল টুপি, দুটো করে লম্বা বিনুনি, সবুজ কাঁচুলি, সবুজ পায়জামা, সাদা সেমিজ— এই সাজে নাচগান করল একটি পালা— 'আপেল গাছে ফুল ধরেছে'। পালার শেষে বুকের উপর বাঁ-হাত রেখে তনুলতা বাঁকিয়ে অভিনন্দন গ্রহণ করে, নাচতে নাচতে তারপর আড়াল হয়ে যায়। ভারি মিষ্টি ভঙ্গিটা।

বিরাম-সময়ে বিরাট জলযোগ— আঙুর, বেদানা, আপেল গাদা গাদা দিচ্ছে। [কনসার্ট অন্তে ঘরে বসে নিশিরাত্রে সারাদিনের ব্যাপার এই টুকে রাখছি। আমার টেবিলেই বা কত ফুল! কলম ছুঁড়ে ফেলে এই হাত দিয়ে মধুরতর ক্রিয়া-সম্পাদনের লোভ হচ্ছে এক একবার।] শিল্পীরা স্টেজ থেকে নেমে এসে শেকহ্যাণ্ড করছে ভারতীয় অতিথিদের সঙ্গে। একজন শ্যামবর্ণের মানুষ— রঙে চেহারায় অবিকল ভারতীয়— প্রধান মন্ত্রী এখানকার। ময়লা রঙের মেয়েও অনেক দেখছি। ঘন কালো চুল— ভারতীয় বলে ভুল হয়ে যায়।

মফস্বলের মানুষ বিস্তর এসে জমেছে শহরে। বাস ভরতি হয়ে হয়ে আসছে, পথের মধ্যে অনেকবার দেখেছি। কনসার্ট-হলেও অনেকে তারা। তাজিক-দের পুরানো সাজে এসেছে কেউ কেউ— অনেকটা কাবুলিওয়ালার মতো। পাহাড়ের ঠিক ওপারে আফগানিস্তান। বিনা পাশপোর্টে এখনো কিছু যাতায়াত চলে। দু-জাতের মধ্যে বড্ড মিল সেইজন্য।

২৪ অক্টোবর, রবিবার। মজা বেশ জমেছে। ষোলজন আমরা এই বাড়িতে— একটা মাত্র পায়খানা। গোসলখানাও একটা। স্নান প্রক্রিয়াটা এরা বিলাসের সামিল মনে করে, মরু অঞ্চলে জলের অপব্যয় বরদাস্ত করে না—

একটা গোসলখানার অতএব মানে বোঝা যায়। কিন্তু প্রাতঃকালীন ভার-মুক্তিটাও বাহুল্য ব্যাপার এদের কাছে? আসল উৎসব আজকে। রকমারি মিছিল বেরুবে— বিস্তর দিন ধরে যার তোড়জোড় চলছে। সকাল সকাল গিয়ে অতএব জায়গা নেওয়ার দরকার, নয়তো মুশকিল হতে পারে— কাল থেকে এই সব শোনাচ্ছে। বাথরুমের সামনে লাইন দিয়েছে তাই শেষরাত্রি থেকে। ধীরেন সেন মশায়ের অসীম অধ্যবসায়— রাত তিনটেয় উঠে পড়েছেন; উঠে স্নানাদির কাজ সেরে আবার লেপমুড়ি দিলেন। আমাদেরও বুদ্ধি দিচ্ছেন: উঠে পড়ুন— অন্য কেউ টের না পেতে সেরে আসুন নিরিবিলি।

চোখ মেলে তাকাচ্ছি— ঘুম ছাড়ে না চোখের পাতা থেকে। বাড়িসুদ্ধ নিশুতি হয়ে যাবার পরেও অনেক রাত্রি অবধি লেখাপড়া করেছি। শুয়ে শুয়ে বলছি, কাল থেকে এক কাজ করুন না ডক্টর সেন— শোবার সময়টা যাবতীয় প্রাতঃক্রিয়া সেরেসুরে একেবারে লেপমুড়ি দেবেন, মাঝরাতে আর ওঠাউঠি করতে হবে না।

আরও খানিক এপাশ-ওপাশ করে গতিক বুঝে উঠে পড়লাম। অনেক রাত তখনো। অন্য ঘরেও সাড়া পড়ে গেছে ইতিমধ্যে— একে দুয়ে বেরুচ্ছেন। একছুটে রাও গিয়ে গোসলখানার দরজা এঁটে দিলেন আমার আগে। তারপরে আর সাড়াশব্দ নেই— ঘুমিয়ে পড়লেন নাকি ভদ্রলোক? তেল-টেল মেখে তৈরি হয়ে দাঁড়িয়ে আছি— পশমের পোশাক গায়ে রাখা চলে না এই অবস্থায়, হি-হি করে কাঁপছি। দরজায় টোকা দিলাম তো 'ইয়েস' বলে ভিতরে তেমনি চুপচাপ। কি করি, চেয়ার টেনে এনে গুটিসুটি হয়ে বসলাম। ভাগ্যবশে ঠিক পরের জায়গাটা পেয়েছি, ছেড়ে যাওয়া চলে না। কিউ দেখতে দেখতে বেশ লম্বা হয়ে দাঁড়াল। এ-ও ধীরেন সেন মশায়ের কীর্তি পরে শোনা গেল; রাতে ওঠার বুদ্ধিটা ডাইনে-বাঁয়ে তিনি অবাধ বিতরণ করেছেন। ফলে সবাই সকলকে মারবার তালে ব্যস্ত। রাতে শুয়েও সোয়াস্তি নেই, হায় ভগবান!

পরের দিন আরও সঙ্গিন অবস্থা। তিন প্রহর রাতে উঠেও দেখি, আমার আগে আট জন। যা হবার হোক, রেগে-মেগে আবার বিছানায় পড়লাম। ঘুম ভাঙল, তখন দিব্যি সকাল। বাথরুমে এসে দেখি, একেবারে ফাঁকা। আরাম করে দীর্ঘক্ষণ ধরে স্নান করা গেল। তাড়ায় পড়ে রাতের মধ্যে অন্য সবাই সারা করে গিয়েছেন।

যাকগে, আজকের কথায় আসি আবার। কোন রকমে হাঙ্গামা চুকিয়ে প্রাতরাশ সেরে বেরিয়ে পড়া গেল। লাইনবন্দি ছ-খানা গাড়ি আমাদের

নিয়ে চলেছে। একটা জিনিস লক্ষ্য করছি, আমাদের গাড়ি দেখলে শশব্যস্তে সকলে পথ ছেড়ে দেয়। রাস্তায় লাল আলো লহমার মধ্যে সবুজ হয়ে যায় আমরা দাঁড়াতে না দাঁড়াতে। পিছন থেকে একটু আওয়াজ দিলে আগের গাড়ি ত্রস্ত ভাবে পাশে চলে যায়। ব্যাপার কি গো? প্রশ্ন করে ঠিকমতো জবাব পাওয়া যায় না। বলে, শহরের মানুষ তোমাদের জেনে ফেলেছে; বিদেশি বলে খাতির।

সারা তাজিকিস্তান আজকে বুঝি পথে বেরিয়ে পড়েছে। বাচচারাও বাদ নেই। চলেছে ফুল নিয়ে আর নিশান উড়িয়ে। সে নিশান আয়তনে ছোট — লাল কাপড়ের উপর সোনালি বুনানি। দলছাড়া হয়ে পড়ছে কেউ কেউ, ছুটোছুটি করে দলে ভিড়ে যায় আবার। যত এগোচ্ছি, মিছিলের দল সামনে পড়ে মোটরের পথ আটকাচ্ছে। প্রতি দলের সঙ্গে নানা রকমেব লেখা — তুলোর দেশ বলে মোটা মোটা তুলোর হরপে লেখা বেশির ভাগ।

এক বিশাল মাঠের ধারে এসে নামলাম। এর নাম রেড-স্কোয়ার — মস্কোর দেখাদেখি। এইখানে জাতীয় উৎসব। খানিকটা সামনের জায়গা পাকা কনক্রিট, বাকি সব মাটি। বিস্তর দল জমায়েত হয়েছে, আরও সব জমছে। মাঠের সুদূর প্রান্তে মানুষে আব মোটর-ট্রাকে ভরে গেল। পিকিনের সেই অক্টোবর-উৎসব মনে পড়ে। ঢের ঢের বড় অবশ্য পিকিনের আয়োজন।

দেরি হলে জায়গা মিলবে না — নিতান্তই ভয়-দেখানো কথা, তাড়াতাড়ি যাতে সকলে বেরিয়ে পড়ি। পয়লা সারিটা পুরোপুরি খালি রেখে দিয়েছে আমাদের জন্য। শ্রীযুত দাগে হায়দরাবাদের মানুষ, পার্লামেন্টের মেম্বর। মাথায় বিরাট পাগড়ি বাঁধা শুরু করেছেন ক'দিন থেকে। সাধারণ লোকের একটা ঝাপসা মতন ধারণা, ভারত হল সন্ন্যাসী-ফকির ও রাজা-মহারাজার দেশ। পাগড়ির দরুন অতএব সমস্ত ক্যামেরার নজর তাঁর দিকে। আমরাও ডাকছি তাঁকে 'মহারাজ' বলে।

সারা মাঠে নানান দলে সৈন্য সাজানো। কম্যাণ্ডার চিৎকার করে উঠলেন। মাঠ জুড়ে সৈন্যদের মুখে মুখে তার প্রতিধ্বনি — ঠিক আছি, তৈরি আছি আমরা সকলে।

কাঁটায় কাঁটায় দশটা, নেতারা সেই সময় মঞ্চের উপর দাঁড়ালেন। মঞ্চটা সদ্য বানিয়েছে। দু-জন ঘোড়সওয়ার হুকুম নিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দূর প্রান্তে চলল। ব্যাণ্ড বেজে ওঠে। বিপুল উল্লাস সৈন্যদের মধ্যে।

জাতীয় সঙ্গীত। মাঠের যে যেখানে বসে ছিল, উঠে দাঁড়িয়েছে।

মার্চ শুরু। তার আগে বিদেশি প্রতিনিধিদের সম্বর্ধনা জানিয়ে চীফ-

কম্যাণ্ডার পঁচিশ বছরের কাহিনী শোনাচ্ছে। কেমন ছিল, আর কি পেয়েছে এখন। বন্দুকধারী এক দল বন্দুক উঁচিয়ে ঝড়ের বেগে ছুটে গেল; পিছনে ড্রামের দল। পাইলট ও প্যারাট্রুপ। বন্দুকধারী আবার এক দল। ট্যাঙ্ক। ঘোড়সওয়ার। মোটর-বাহিনী। বিমানধ্বংসী কামান। ট্যাঙ্কধ্বংসী কামান। দলের পর দল চলেছে, আওয়াজে আকাশ বিদীর্ণ হবার জোগাড়।

বেলুন উড়িয়ে দিল; জয়ন্তী-উৎসবের কথা লেখা বেলুনে। আকাশ-ভরা উড়ন্ত বেলুনই শুধু। ব্যাণ্ডের দল সাদা পোশাকে মিছিল করে বেরিয়ে গেল।

প্রধান মন্ত্রী ছোট্ট একটু বক্তৃতায় সৈন্যদের অভিনন্দন জানালেন।

আবার মিছিল। ট্রাইসাইকেলে করে বাচচারা যাচ্ছে—সাদা পোশাক, মাথায় তাজিকি টুপি; সাদা নিশান বাঁধা সাইকেলের মাথায়।

ট্রাক পর পর ষোলখানা। ষোলটা গণতন্ত্র নিয়ে সোবিয়েত দেশ, প্রত্যেকে আলাদা ট্রাক নিয়ে আসছে—আলাদা পোশাকের মানুষ, আলাদা নিশান। শিশুরা টপাটপ নেমে পড়ছে ট্রাক থেকে, ফুল ও নিশান নিয়ে একছুটে মঞ্চের উপর উঠে নেতাদের হাতে দিয়ে আসে।

এর পিছনে আরও ট্রাক আসছে। একটার উপর মেয়েরা কসরতের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে। স্বাস্থ্যে ফুটিফাটা হয়ে পড়বে, এমনি মালুম হয়। ঘোড়ায় চড়ে একদল মেয়ে নিশান দোলাতে দোলাতে গেল। এলো তারপর পুরুষ খেলোয়াড়রা। তলোয়ার খেলতে খেলতে এক দল চলে গেল।

মস্ত বড় জলের ট্যাঙ্ক বয়ে নিয়ে চলেছে ট্রাকে। সাঁতারুরা ঝাঁপ দিয়ে পড়ছে তার ভিতরে, জল ছিটকে আসছে। ডালপালায় ঢাকা মেটে রঙের গাড়ি চলল এক সারি—লড়াইয়ের সময় যে কায়দায় গাড়ি ও অস্ত্রশস্ত্র ঢেকেঢুকে নিয়ে বেড়ায়।

খেলোয়াড় মেয়েরা—লাল ও গোলাপি ইউনিফর্ম—কাগজের ফুল দোলাতে দোলাতে চলে গেল। কালো ও সবুজ ইউনিফর্মের এক দল। নেভিব্লু ও কালো ইউনিফর্মের আর এক দল। এর পরের দল আগাগোড়া সাদা ইউনিফর্মের।

মল্লযুদ্ধের মহড়া দিতে দিতে ছেলেরা যাচ্ছে। ভার-উত্তোলন দেখাচ্ছে। নানান কৃষিবস্তু হাতে নিয়ে যৌথখামারের ছেলেমেয়েরা চলেছে—রঙিন পোশাকের ভারি বাহার, হেন রঙ নেই যা অঙ্গে ধারণ করেনি। সাইকেলের দল চলেছে। কালো রঙের পোশাকে বিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রী, কারিগরি ইস্কুলের ছাত্রছাত্রী—প্রতি দলের সঙ্গে আলাদা ব্যাণ্ডপার্টি। অনাথ ছেলেমেয়েদের মিছিল—হাতে নিয়েছে নেতাদের ছবি আর নিশান। মিড়ল ইস্কুলের

ছেলে-মেয়েরা : ছেলেদের মাথা কামানো। ফুটফুটে পায়োনিয়ার-দল ফুল নিয়ে চলেছে—সত্যিকার ফুল আর কাগজের ফুল!

জাহাজ-এরোপ্লেন তৈরি হচ্ছে—তারই সব নমুনা ট্রাকের উপর। ছেলে-মেয়ে মিলিতভাবে কাস্তে-হাতুড়ি ধরে আছে। তুলা, গম ও ধানের শীষ তাদের অন্য হাতে।

মাঠের দূর-প্রান্তে লোকারণ্য। মিছিল ধরে এগিয়ে এসে দলের পর দল আমাদের সামনে দিয়ে চলে যাচ্ছে। এত যাচ্ছে, তবু কমে না পিছনেব জমায়েত। বরঞ্চ বেলার সঙ্গে সঙ্গে ফেঁপেফুলে উঠছে। চড়া রোদ, টেঁকা যায় না, অস্থির হয়ে উঠছি।

প্রাচীন তাজিকি সাজসজ্জায় একদল নাচতে নাচতে বাজাতে বাজাতে চলে গেল। অসম্ভব রকমের বড় কার্পাসফল বানিয়েছে—পুষ্পসজ্জিতা তরুণী মেযে সেই ফলের ভিতর থেকে মুখ বাড়িয়ে আছে। আরও একটা ফল—তার ভিতরে নিশান দোলাচ্ছে এক জোড়া বাচচা মেয়ে। লোকে কাঁধে বযে নিয়ে যাচ্ছে এই সব অতিকায় কার্পাসফল। খুব হাততালি পড়ছে। শিশুর দল শান্তির পায়রা নিয়ে—সকল দেশের মধ্যে সকল মানুষের মধ্যে শান্তি আসুক, গলা ফাটিয়ে বলতে বলতে যাচ্ছে; কাগজের শ্বেত পায়রা উঁচু করে তুলে ধবেছে। হঠাৎ জীবন্ত পায়রার ঝাঁক উড়িয়ে দিল, উড়তে উড়তে আকাশ-প্রান্তে মেলাল।

গ্রামাঞ্চল থেকে বিস্তর এসেছে, তারা মিছিলে নামল এইবার। চেহাবায় সাজসজ্জায় গ্রাম্যতা বোঝা যায়। কোলের বাচচা নিয়ে মায়েরা অবধি এসেছেন। গমের শীষ, কাঁচা-ধানের গুচ্ছ, ডাল-পাতা সমেত তুলো শিশুরা নিয়ে চলেছে। আর বিস্তর ফুল—আমাদের অপরাজিতা ফুলের মতন অমনি নীল দেখতে।

ভিনদেশি দলও এসেছে, দেখছি। চীন, পোল্যাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরি রকমারি পতাকা নিয়ে নিজ নিজ ভাষায় শ্লোগান দিচ্ছে—দুনিয়ার সব মানুষ আমরা এক। জর্জিয়াব নাচ—সানাই তম্বুরিন আব শিঙায় মিলে সঙ্গত করছে। থিয়েটারের নানান সজ্জায় সেজে চলেছে অভিনেতৃদল। সার্কাসের দল খেলা দেখাতে দেখাতে আসছে। সিংহ অবধি নিয়ে এসেছে ট্রাকের উপরে—সিংহের খাঁচায় ঢুকে হরেক খেলা খেলছে।

যৌথখামারের দল এর পরে। ফসলে বোঝাই ট্রাকের সারি—গোণাগুণতি নেই। এক লেনিন-কোলখোজই দেড়-শ গাড়ি এনে ফেলেছে। কারা কি রকম ফসল ফলাচ্ছে, তারই কিছু নমুনা। গাড়িতে গাড়িতে প্রতিজ্ঞাপত্র ঝোলানো—উৎপাদন আরও কত বাড়াবে, নেতা ও দেশের মানুষদের প্রতিশ্রুতি

দিয়ে যাচেছ। মঞ্চের নেতারা হাত নেড়ে অভিনন্দন জানাচেছন, তারাও পালটা হাত নাড়ছে।

যৌথখামারেরা গেল তো ফ্যাক্টরি। দুটো করে ট্রাক পাশাপাশি জুড়ে ফ্যাক্টরির মালপত্র দেখাচেছ। সিমেন্ট, মোটরের কলকব্জা, সিল্ক, সুতি-কাপড় আরও কত কি। তাদের পিছনে ফুলের গয়নায় সর্বাঙ্গ মুড়ে গাঁয়ের মেয়েরা রকমারি গ্রাম-নৃত্য দেখাচেছ।...

দুপুর গড়িয়ে গেছে। জনসমুদ্র উল্লাসে আছাড়ি পিছাড়ি খাচেছ যেন। যা গতিক, সমস্ত দিন ধরে চালাবে। সূর্য আগুন ছড়াচেছ মাথার উপরে।

দোভাষি যেন ঐশীপ্রেরিত হয়ে এসে বলল, ক্লান্ত হয়ে পড়েছ— উঠবে নাকি এবার ?

মিছিল সারা হতে প্রায় সন্ধ্যা। সন্ধ্যার পর খানাপিনা। নানান অঞ্চলে আমরা সব গিয়ে জুটেছি, আর এখানকার তা-বড় তা-বড় মাতব্বরেরা। তাড়িয়েতুড়িয়ে বিরাট এক হলের ভিতর নিয়ে সবাইকে পংক্তি-ভোজনে বসিয়ে দিল। হলটা সবে আগের বছর গেঁথে শেষ করেছে, এদিকে-ওদিকে আরও এখনো দালানকোঠা উঠছে, নাম দিয়েছে সংস্কৃতি-ভবন। ভোজের আসরে বেশ মতলব খাটিয়ে চারিয়ে বসিয়েছে। এই ধরুন— আমি ভারতীয়, আমার পাশে এক রুশপুঙ্গব, তার পাশে কাজাক, তার পাশে ইংরেজ, তার পাশে তাজিক, তার পাশে জর্মন— এমনিধারা চলল। আলাদা চেহারা— ভাষা পোশাক আদবকায়দা সমস্ত আলাদা— অথচ একটি ছাতের নিচে টেবিলের এক পাত্রের খাবার এপাশ দিয়ে ওপাশ দিয়ে কেটে নিয়ে দিব্যি মুখবিবরে চালান করছেন। এবং মনে মনে অনুভব করছেন, ভুবন নামক একটুকু ছোট্ট জায়গার বাসিন্দা আমরা সকলে।

এক প্রান্তে যথারীতি স্টেজ বানানো। হাতে ও মুখে ভোজ খাচেছন; আর নাচ-গান-বাজনা চলছে, তারও মজা নিচেছন চোখ দিয়ে কান দিয়ে। এক একখানা কসরত অন্তে শিল্পী নেমে আসছেন; ঘুরে ঘুরে খানিকটা আলাপ-পরিচয় করে হঠাৎ বসে পড়ছেন কোন এক ভাগ্যবানের পাশে। অপর এক দল ইতিমধ্যে লেগে গিয়েছে স্টেজের উপরে। এ-ও ঐ দিনমানের মিছিলের মতো, স্ফূর্তির আর শেষ হতে চায় না। গান দিয়ে শুরু— 'আমার দেশের মানুষ'। তিরিশটা মেয়ে এক সঙ্গে গাইছে আর বাজাচেছ। মাথায় মুকুট, হাতে তারের যন্ত্র 'রুবাব'।

আলবেনিয়ার লোকনৃত্য। তুলাচাষীদের গান ও নাচ; নাচছে তিনটি

মেয়ে — ভাল ঘরের মেয়ে, হাবেভাবে মালুম। হাসছে আর দাঁতের সোনা ঝিকমিক করছে।

ইউক্রেনের লোকনৃত্য: নাচের ভিতর মাঝে মাঝে হৈ-হৈ করে উঠছে। একটা গান গুঁজে দিল এর ফাঁকে — 'আমার দেশ, আমার মানুষ — হোক না যতই হীন — ভালবাসি, ভালবাসি'। তাজিকিস্তানের এক বুড়া কবি চারণের ঢঙে নিজের এক কবিতা পড়লেন। উঠলেন তারপর উজবেকিস্তানের কবি — তাঁর কবিতা হল 'তুলাচাষীদের প্রতি'। তাজিক নাচ এবারে—সুখের নৃত্য। নাচছে একটি মাত্র মেয়ে, বাজনা শুধুমাত্র তম্বুরিন। অবিকল ভারতীয় মুদ্রা দেখাচ্ছে হাতের ভঙ্গিতে। কিরঘিজ লোক-সঙ্গীত — বড় বগিথালার সাইজের গোলাকার মুখ নর্তকীর, চোখ আছে কিম্বা নেই, খাঁটি তিব্বতী চেহারা।

স্টেজে কিঞ্চিৎ বিরাম দিয়ে শ্রোতাদের তাক করেছে এবারে। দলের নেতা তেজা সিংকে রঙিন আলখেল্লা, চৌকো টুপি ও লাল স্কার্টে সাজাল। এবং সিংজীর নিজস্ব কাঁচা-পাকা দাড়ি, চুলের বিনুনি ও হাতের লোহা তো আছেই। অপরূপ দেখাচ্ছে। তারিফ করছি সকলে। কিন্তু বিপদ ঘনিয়ে আসছে আমাদের দিকেও, সেটা ঠাহর করিনি। ভারে ভারে নিয়ে আসছে ঐ সব বস্তু — সকলকে পরাবে। কেমন, হাসিমশকরা করুন এবার সিংজীর সজ্জা নিয়ে। আপাদমস্তক পোশাক পরিয়ে দুই হাতে জড়িয়ে ধরে দুই গালে দুর্দান্ত দুই চুমু। আওয়াজে ভাববেন, বোমা পড়ল বুঝি মুখে। তাজিকি উৎসবের জাতীয় পোশাক অতিথিদের আদর করে উপহার দিচ্ছে।

কাজাকিস্তানের এক মস্ত গুণী উঠলেন গান করতে। তাঁকেও ঐ পোশাক পরিয়ে দিয়েছে। লম্বা সাদা দাড়ি; এক হাতে রুবাব। বড় বড় মেডেল-গাঁথা মালা দুলছে গলায়।

নৃত্য নানা রকমের। মেয়েটার হাতে একগাদা চুড়ি — পায়ে ঘুঙুর নেই, হাতের ঐ চুড়ি বাজাচ্ছে নাচতে নাচতে। আর এক রকম নৃত্য হল — কাপাস বোনা, তুলো তোলা, চরকা কাটা, তাঁত বোনা। তাঁতে বুনে কাপড় বানাল — স্ফূর্তিতে নাচিয়েগুলো পাগল, ওড়াচ্ছে নতুন কাপড়, গায়ে জড়াচ্ছে ওড়নার মতো — কি করবে যেন ভেবে পায় না। নাচের সঙ্গে বাজনা বাজছে — ঠিক আমাদের ঢাকের বাজনা। যশোরের রাজঘাট গ্রামে এমনি ধরনের নাচ পেয়েছিলাম আমরা — তুলোর নাচ নয়, ধানের। ধান রোয়া, ধান কাটা, ধান ঝাড়া, ধান তোলা এবং ধান ভানা — নবান্নের আমোদ-স্ফূর্তি তার পরে। সঙ্গে ঢাক বাজে। গৃহস্থ-ঘরের মেয়ে-বউরা সেই নৃত্য করেন। নাচ বলেন না তাঁরা — ব্রত।

থাক তুলনার কথা। রুশীয় গান ধরেছে ঐ শুনুন। তারপরে একটা কাজাক গান — গানের নাম 'বুলবুল'। তানকর্তব ছেড়ে দিয়ে এক একবার কোকিল ডেকে উঠছে গানের মাঝখানে। তম্বুরা বাজনার খেলা দেখাচ্ছেন এক ব্যক্তি — আমাদের জলতরঙ্গের মতো অনেকটা।

পরদিন ঘুরতে বেরিয়েছি। কোলখোজ অর্থাৎ যৌথখামারে যাব। দুপুরেব খানাপিনা সেখানে — তার আগে শহরে একটা চক্কোর দিয়ে নিচ্ছি। কে বলবে, মাত্র পঁচিশটা বছর আগেও এখানে সাদামাঠা জনবিরল গ্রাম ছিল। মাটির কুড়েঘর — অজস্র নমুনা তার এখনো। পৌনে তিন-শ কিলোমিটার দূরে রেলস্টেশন, রাস্তাঘাট নেই। শহর বানানো ঠিক হয়ে গেল তো উট ঘোড়া গাধা খচচরের পিঠে অত দূর থেকে মালপত্র আসছে। সিমেন্ট নেই তো একটা পুবো ফ্যাক্টরি বসে গেল ঐ বাবদে। এখন সেটা মস্ত বড় ফ্যাক্টবি — তাজিকিস্তানের তাবৎ সিমেন্টের সরবরাহ ওখান থেকে। ইটের ফ্যাক্টরি — ইট পোড়াবার সময় ছিল না গোড়ার দিকে, কাঁচা ইটে একতলা গেঁথেছিল। সে সব বাড়ি ভেঙে দিচ্ছে এখন।

শহরের উত্তর ভাগে আমরা। দিউশাম্বে দরিয়া। এ-পারে ফাঁকা মাঠ অনেক। সোমবারে সোমবারে হাট বসত। ঘরবাড়ি বানিযে এখন মাঠ ভরতি করে ফেলছে, রাস্তা বের করছে, ট্রলি-বাসের লাইন বসাচ্ছে। শহব অতি-দ্রুত বেড়ে চলেছে। আর দরিয়ার ওপারে দেখুন, দিগ্‌ব্যাপ্ত সবুজ ক্ষেত পাহাড়ের কোল অবধি চলে গেছে। বরফে-ঢাকা পাহাড়-চূড়া — ক্ষেতখামার সেই অবধি ধাওয়া করেছে। রুক্ষ উলঙ্গ অনুর্বর পাহাড় গাছপালারা দখল করে ফেলছে। আপনাআপনি হচ্ছে না, নানান কায়দায় গাছ বসানো হচ্ছে পাথরের উপর। কত গবেষণা, কত অর্থব্যয়! এক লরি করে মাটি লেগেছে প্রতিটি গাছের গোড়ায়। তা সার্থক হয়েছে সকল চেষ্টা। জল দিয়ে দিয়ে আর গাছ বাঁচাতে হবে না, শিকড়ের জোরে নিজেরাই জল টেনে নেবে। আর কি! ক'বছরের মধ্যে কসাড় বন হয়ে যাবে ওখানে।

ইস্কুল কলেজ হাসপাতাল দেখতে দেখতে যাচ্ছি। মাঝে মাঝে শহরের ভিতরেই চষা ক্ষেত। টালির ঘর — আমাদের রানীগঞ্জের টালির মতো অবিকল। ঢেউ-টিনের ঘর। খোড়োঘর — মটকার উপর মাটি লেপা। এই সব ভেঙে ফেলে বড় বড় ইমারত বানানো হচ্ছে। গরিব লোকও দেখছি পথে — মাথায় ময়লা টুপি, ময়লা চেহারা, গাধার পিঠে যাচ্ছে। টেক্সটাইল-কর্মিকদের বসতিস্থান হবে এই তল্লাটে — নক্সা দেখাল। বড় বড় রাস্তা বেরুবে।

বিরাট কর্মকাণ্ড— ছোটখাট পরিকল্পনায় সুখ পায় না এরা যেন। তাজিক বিপ্লবীদের মনুমেন্ট — এখন এই জায়গায় আছে, সরিয়ে নিয়ে বড় পার্কে স্থাপনা হবে। সৌধ হবে সেই মনুমেন্ট ঘিরে।

নতুন পুলের উপর দিয়ে নদী পার হলাম। আগে এ সুবিধা ছিল না, বিস্তর ঝামেলা পারাপারে। সেকালের সেই সব ছবি দেখাল। পার হয়ে গিয়ে ক্রমশ উঁচুতে উঠছি। অরণ্য শুরু হল। ঐ যা বললাম — কষ্ট করে আর্জানো এই সব গাছ। ছোট ছোট গাছ — এখনো বড় হয়ে ওঠেনি তেমন।

মোড় ঘুরে গাড়িগুলো সারবন্দি দাঁড়িয়ে পড়ল হঠাৎ। খানিকটা নেমে গিয়ে লেক। লেনিনের বিশাল মূর্তি সামনে। স্ট্যালিনের মূর্তিও অদূরে। খাড়া উঁচু পাড় ধরে উঠে জলের ধারে গেলাম। কোলখোজের জোয়ান পুরুষরা স্বেচ্ছায় কোদালি ধরে এই লেক বানিয়েছে। তখন যন্ত্রপাতির বেশি যোগাড় ছিল না — যা কিছু ছিল, খাটছিল অন্যান্য জরুরি কাজে। গাছে সাজানো চারিধার। নদী থেকে জল নিয়ে এসে লেক ভরতি করে। সাঁতাবেব চমৎকার ব্যবস্থা। সাঁতারু জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ছে — ঘাটের উপরে সেই মূর্তি। পাশে পাশে খাল চলেছে — কলকল করে লেকের বাড়তি জল উপচে পড়ছে খালে। উঁচু পাড়ের উপব দিয়ে দেখছি, একদিকে ধূ-ধূ করছে পতিত জমি। অঞ্চল জুড়ে সর্বত্র পতিত ছিল এমনি। অনেক দূরে নদী-কূলে প্রাচীন এক গ্রামের চেহারা দেখা যাচ্ছে।

লেক ছেড়ে নদীব দিকে এলাম। কূলে কূলে চলেছি। কোলখোজ — যৌথখামারের এলাকা। দশে মিলে কী কাণ্ড করা যায় দেখুন একবার নয়ন মেলে। সরকারি প্রতিষ্ঠান নয় — চাষীদের নিজেদের ব্যাপার পুরোপুরি, সরকার পিছনে আছেন এই পর্যন্ত। জমি সরকারের — সেই বাবদ খাজনার চুক্তি আছে। যা ফসল উঠবে তার শতকরা তিন ভাগ। বেশি ফসল হলে বেশি দেবেন, কম হলে কম, না হলে শূন্য।

স্ট্যালিনের নামে খামার — স্ট্যালিন কালেকটিভ-ফারমস্। পাথুরে পাকা রাস্তা দিয়ে মোটরে যাচ্ছি — ভুল হয়ে যায়, জাহাজে চেপে যাচ্ছি যেন সবুজ রঙের সমুদ্রের উপর দিয়ে। যেদিকে তাকাই, কূল দেখি না। সবুজে ঢেউ দিয়েছে ঠিক সমুদ্র-তরঙ্গের মতো। গাড়ি থামাতে বলি, নেমে একটুখানি দাঁড়াব। লক্ষ্মীঠাকরুন ঝাঁপি উপুড় করে ঢেলেছেন — চারিদিকের সীমাহীন এই শস্যপ্রান্তর দু-চোখ ভরে একবার দেখে নেবো।

আগে ছিল পতিত জলা-জায়গা। আর উষর পাহাড়। এখন দেখুন সমতল অঞ্চল ছাড়িয়ে পাহাড়ের উপরেও থরে থরে সবুজ লেপে রয়েছে। সবুজও

নয়, এমন তেজের ফসল যে রং কালো হয়ে দাঁড়িয়েছে। ১৯২৯-এর আগে, যেমন এদেশে দেখে থাকেন, টুকরো টুকরো জমি চাষীদের — আ'ল-ঠেলাঠেলি, সীমানা-সরহদ্দ নিয়ে দাঙ্গাহাঙ্গামা মামলামোকদ্দমা, ফসল গিয়ে ওঠে জমিদার-মহাজনের গোলায়, চাষীর সম্বল চোখের পানি।

১৯২৯ অব্দে যৌথখামার হল। হ্যাঁ:, খামার না আরো কিছু — গুচ্চের মানুষের গুলতানি। বারোয়ারি কাজে গতর খাটায় নাকি কেউ? রাজবাড়ির সেই দুধপুকুর। প্রজাদের উপর হুকুম হয়েছে — এক ঘটি করে দুধ ঢেলে যাবে পুকুরে। সবাই ভাবছে আর সকলে দুধ দেবে — আমি এক ঘটি জল ঢেলে যাই চুপিচুপি। শেষটা দেখা গেল, জলের পুকুর — একটি ফোঁটাও দুধ পড়েনি। এ-ও হবে তাই। কেউ খাটবে না। এতদিন তবু আধপেটা চলছিল, পুরোপুরি উপোস এবার থেকে।

অনেক চেষ্টাচরিত্রের ফলে গোড়ায় মেম্বার হল একশ পঁচিশ ঘর। আজকে কত আন্দাজ করুন দিকি? সেই সওয়া-শ এখন আঠার-শ পরিবারে দাঁড়িয়েছে। গোড়ায় জমি ছিল পৌনে দু-শ হেক্টারের মতন (হেক্টার সাত বিঘের কিছু বেশি)। এখন ৫২১৪ হেক্টার জমিতে চাষ চলছে। আরও দশ হাজার হেক্টার দাগ দিয়ে রেখেছে, ভাল সেচের বন্দোবস্ত হয়ে ওঠেনি, বছর দুই-তিনের মধ্যে হয়ে যাবে — হলেই চাষে লেগে যাবে। তুলা, ডালকলাই ও আঙুর হবে সেই জমিতে। আপাতত কিছু তরমুজ হয়েছে। আর ঘাস — গোচারণের জন্য ঘাসের খুব দরকার।

ট্রাক্টরের চাষ। পাহাড়ের ঢালু জায়গায় ট্রাক্টর চলে না বলে সেই তল্লাটে শুধু লাঙল। ১৯৫২ অব্দে আয় হয়েছিল ৫৪ মিলিয়ন রুবল। ১৯৫৩ অব্দে নানা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে আয় কমে গিয়ে দাঁড়াল ৪৩ মিলিয়ন। এ বছরের প্রত্যাশা ৬০ মিলিয়ন অন্তত। আয়ের ষাট শতক চাষীদের মজুরি বাবদ যায়। বাকি চল্লিশের মধ্যে সরকারি খাজনা তিন শতক, সরকারি মেশিন বাবদ সাত শতক, ইনস্যুরেন্স ও সাংস্কৃতিক কাজকর্মের খরচ; এবং বাদ বাকি অবিভাজ্য ভাণ্ডার — খাল কাটা, ঘরবাড়ি তৈরি, জমির উন্নয়ন ইত্যাদির জন্য। রোগ-চিকিৎসা ও ছেলেপুলের পড়াশুনোর ব্যবস্থা সরকারের — কোলখোজের কোন দায় নেই এই ব্যাপারে।

কাজের ইউনিট ভাগ করা। যে যত ইউনিট খাটবে, তার তেমনি মজুরি। প্রতি ইউনিটের মজুরি মোটামুটি বাইশ রুবল। হিসাবে পাওয়া যাচ্ছে, জন হিসাবে বছরে তিনশ-সত্তর ইউনিটের মতো কাজ হয় (সর্বনিম্ন তিন শ' ইউনিট, সর্বোচ্চ সাত শ'; সাত শ' ইউনিট কাজের লোক খুবই কম)। মজুরি কতক

নগদ পয়সায়, কতক ফসলে। দুধ-মাখন এমনি দেবে না, দরকারমতো কিনে নেবে; কোলখোজ এগুলো মেম্বারদের কাছে বিনা মুনাফায় বিক্রি করে।

এক সঙ্গে ফসল ফলায়; তবু একটুকু নিজস্ব জমির উপর চাষীর বড় লোভ। তাই বুঝে এক ফালি করে জমি দিয়েছে বাড়ির লাগোয়া। সামান্য জায়গা, সওয়া বিঘের মতো — গায়ে খেটে চাষীরা সেখানে খুশিমতন তরিতরকারি আর্জায়। একেবারে নিজস্ব বস্তু, বাড়তি হলে বিক্রি করতে পারে। তা ছাড়া প্রতি পরিবারে একটা-দুটো গাইগরু ও কিছু ভেড়া-মুরগি পোষবার বিধি আছে।

একটা হাই-ইস্কুল ও বাইশটা প্রাথমিক ইস্কুল এই কোলখোজের এলাকায়। পড়ুয়া মেয়ের সংখ্যা বেশি। গোটা সোবিয়েত দেশ জুড়ে এই কাণ্ড। লড়াইয়ে ছেলেরা হাজারে হাজারে মরেছে; জন্মাচ্ছেও কম। এ ছাড়া ১৪৭টি ছেলে-মেয়ে কলেজে ও নানান কারিগরি ইস্কুলে পড়ে। কোলখোজের বাইরে দেশের নানা অঞ্চলে থেকে তারা পড়ে, মস্কোতেও থাকে। ইস্কুলের পড়াশুনো মাতৃভাষা তাজিকে। রুশ ভাষাটা শিখতে হবে দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে। শিখতেই হবে।

বারোটা দোকান কেনাকাটার জন্য। ছয়টা চিকিৎসাশালা, সাতটা টেলিফোন-কেন্দ্র; কোলখোজের যাবতীয় খবরাখবর সকলের কাছে পৌঁছে দেয় বেতারযোগে। সরকারি বেতারও রীলে করে শোনায়। ইলেকট্রিসিটি সর্বত্র; কোলখোজ সরকার থেকে জলবিদ্যুৎ কিনে সরবরাহ করে। কৃষক-বীর অর্থাৎ চাষের কাজে যাঁরা সর্বোচ্চ সম্মান পেয়েছেন, তাঁদের সংখ্যা বাইশ। এ ছাড়া ৩৭৬ জন নানান ছোটখাট সম্মান পেয়েছেন। একজন সুপ্রীম সোবিয়েতের মেম্বার; ৬৪ জন স্থানীয় সোবিয়েতের মেম্বার। নিরক্ষর শতকরা ১৩ জন — কারা বুঝতে পারলেন? যে সব বাচ্চার ইস্কুলে যাবার বয়স হয়নি; আর বুড়োথুথুড়ে কয়েকজন — লেখাপড়ার ঝামেলায় নেওয়া গেল না যাঁদের কোনরকমে। একটা মসজিদ আছে স্ট্যালিনাবাদের কোল ঘেঁসে — শুক্রবার বুড়োরা জমায়েত হয়ে নমাজ পড়েন। অন্যান্য দিন বাড়িতে পড়েন। সবাই মুসলমান এখানে — খ্রীষ্টান নেই, গির্জাও নেই।

খুচরো চাষী নেই আর এদিকে — কোন-না-কোন যৌথখামারে ভিড়ে পড়েছে। ভবিষ্যতের কাজ হল, ছোট ছোট কোলখোজ জুড়ে গেঁথে একত্র করা। তাতে কাজের সুবিধা, উৎপাদনও বাড়বে। কেউ জায়গা বদল করল কিম্বা কোন মেয়ে বিয়ে করল — সে অবস্থায় তার কোলখোজও বদল হয়ে যায়। ছোটখাট মেশিন. কোলখোজ কিনে ফেলে। যেমন এই স্ট্যালিন-কোলখোজ তুলো তোলার কল কিনেছে সাতাশটা। ভারী ভারী মেশিন প্রায়ই কেনে না। সরকারি ডিপোয়

আছে, সেখান থেকে ভাড়া নিয়ে কাজ চালায়। কম খরচ তাতে। সরকারেরও সুবিধা — এক মেশিন এখানে পাঁচদিন ওখানে দশ দিন ভাড়া খাটিয়ে বারো মাস চালু রাখতে পারে।

কোলখোজের হর্তাকর্তা হলেন বোর্ড। মেম্বাররা বোর্ড নির্বাচন করে। বোর্ডের মীমাংসা মনঃপূত না হলে সাধারণ সভা ডাকা যায়। তাতেও সুবিধা না হলে স্থানীয় সোবিয়েত আছে। স্ট্যালিন-কোলখোজ বোর্ডের চেয়ারম্যান মাইনে পান চার-শ রুবল এবং একশ-কুড়ি ইউনিট। ডেপুটি চেয়ারম্যানের মাইনে শতকরা দশভাগ কম চেয়ারম্যানের চেয়ে।

আহারাদির আগে অতি-দ্রুত একটা চক্কোর মেরে নিচ্ছি। একজিবিশন-হল — যাবতীয় উৎপন্ন-দ্রব্য সাজানো, দেয়ালে কৃষক-বীরদের ছবি, বিবিধ নক্সা ও সংখ্যাতত্ত্ব। কনসার্ট-হল — জৌলুশে ঝিকমিক করছে, উঁচু বেদি একদিকে, নানাবিধ বাজনার সরঞ্জাম, দেয়াল-ভরা দেয়ালচিত্র ও সোবিয়েত-নেতাদের ছবি। দোতলা ছোট্ট এক বাড়িতে লাইব্রেরি — উঁকিঝুঁকি দিয়ে দেখছি। তাজিকিস্তানের সব চেয়ে বড় লেখক সদরউদ্দিন আইনি — ছবিটাও তাঁর তেমনি বড়। চেকভের ছবিও প্রকাণ্ড। আর ছবি আছে ফেরদৌসি, ওমর খৈয়াম, রুদকি, গর্কি, পুশকিন ইত্যাদি অনেকের। লাইব্রেরিয়ানের মাইনে দৈনিক এক ইউনিট হিসাবে। লাইব্রেরি-বাড়ির পাশে টেনিস-লন। মাঠের ভিতরে পাকা-মেজের খুব লম্বা ঘরে ঘোড়ার আস্তাবল, গরুর গোয়াল। সাড়ে তিন হাজার রুবল এক একটা গরুর দাম — এমন জীবকে গরু না বলে হাতিও বলতে পারেন। শাকআলুর মতো এক রকম জিনিস মেশিনে কুচি-কুচি করে জলে ভিজিয়ে খোসা তুলে ফেলছে। গরুর খাবার। তুলো শুকোতে দিয়েছে খোলা মাঠে। গাধা বাঁধা রয়েছে ওদিকে কয়েকটা।

পথের পাশে একটা মেডিকেল ইউনিট। ঢুকে পড়লাম। জন দুই-তিন নার্স মিলে চালায় — ডাক্তার আসেন সপ্তাহে তিন বার। …খর রৌদ্র, সূর্য ঠিক মাথার উপরে। আর নয়, আর দেরি চলবে না — বিষম ডাকাডাকি লাগিয়েছে : টেবিল সাজিয়ে বসে আছি, খেতে আসুন।

নেমন্তন্নে বসেছি। তন্দুরায় সেঁকা বড় বড় টার্কি। কশাইর দোকানে ছাল-ছাড়ানো ছাগল দেখেন, তেমনি বস্তু পাত্রে পাত্রে সাজানো। সবই কোলখোজের — বাইরের কিছু নয়। ছুরি দিয়ে একটু-আধটু কেটে নিয়ে আমরা গালে ফেলছি। ঘুরে ঘুরে ওরা তদ্বির-তদারক করছিল — হাসতে লাগল হি-হি করে। অর্থাৎ কাণ্ড দেখ হে আনাড়িগুলোর! আমাদের সম্বন্ধে

একেবারে নিরাশ হয়ে শেষটা নিজেরাই লেগে পড়ল। সে কি ব্যাপার, না দেখলে প্রত্যয় পাবেন না। আমরা তো এক ইঞ্চি দেড় ইঞ্চির টুকরো কেটে কেটে নিচ্ছিলাম, ঐ মশায়েরা ঠ্যাং ধরে আস্ত এক টাকি মুখে তুলে কড়মড় করে হাড় চিবোচ্ছেন। স্তূপাকার আয়োজন লহমার মধ্যে যেন মন্ত্রবলে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ এর মধ্যে গান ধরে বসল একজন। মানে বুঝিয়ে দিল গানের, দেশপ্রেমের সঙ্গীত। কিন্তু আড়াল থেকে শুনলে মনে করতেন, ভর্ৎসনা করছে কে বুঝি কাকে। প্লেগ-বসন্তর মতো গানও সংক্রামক, দেখতে দেখতে সবগুলিকে গানে পেয়ে বসল। শেষটা শুধু গানে আর সামাল মানে না — নাচ। যেমন দৈত্যাকার চেহারা, নাচও ঠিক সেই ধাঁচের। রক্ষা এই, একতলার ঘর — পদদাপে ছাত ভেঙে পড়ার শঙ্কা নেই, বড় জোর মেজে বসে যেতে পারে দু-এক হাত। ক'টি মেয়ে পরিবেশন করছেন, বেটাছেলেদের এই হুল্লোড় কাণ্ড দেখছেন তাঁরা। লুব্ধ চোখে দেখছেন তাকিয়ে তাকিয়ে। থমকে দাঁড়াচ্ছেন কখনো বা আধ মিনিট, আবার পরিবেশন করছেন। তার পরে, ও হরি, পাত্রের বস্তু এর-ওর পাতে ঢেলে দিয়ে ঐ চামচে মাথার উপরে ধরেই নাচ শুরু করে দিলেন। উঃ, এমন কাণ্ড হতে পারে দুনিয়ার উপর! খাওয়া আর স্ফূর্তি — বাধাবন্ধন নেই। ঘরের প্রতিটি লোক ঠাট্টা-রসিকতা করছে। সকলের অলক্ষ্যে নিশ্বাস চেপে নিই আমি একটা। গ্রাম্য চাষীর এত খাওয়া, প্রাণখোলা এমন আনন্দ! ছোটবেলা থেকে চাষীর গাঁয়ে বড় হয়েছি — কেউ দাদা কেউ চাচা। বিশাল পামিরের পরপার থেকে আজকে রমজান মোল্লা নৈমদ্দি সরদার নকুল দাস — কত জনের কথা মনে আসছে। এমনি আহার আর আনন্দ চাই সকলের জন্য।

খাওয়ার পর মুখশুদ্ধির জন্য বড় সাইজের একটা করে ডালিম দিল। দাঁড়াতে দেয় না, পাড়ায় নিয়ে বের করে তখনই। হাই ইস্কুল। হেডমাস্টার ও অনেক হোমরাচোমরা রাস্তা অবধি এগিয়ে এসে অভ্যর্থনা করলেন। দশ বছরের কোর্স — পঞ্চম বর্ষ থেকে উঁচু ক্লাস, তখন ইংরেজি ফরাসি ইত্যাদি কোন একটা বাইরের ভাষা শিখতে হয়। গোড়ায় মাতৃভাষা তাজিকি, দ্বিতীয় বর্ষ থেকে অল্পস্বল্প রুশ ভাষার পাঠ। চোদ্দ জন শিক্ষক — দু-জন তাজিকি পড়ান, আর দু-জন রুশীয়। ক্লাস চলে বেলা ন'টা থেকে দু'টা, আবার আড়াইটা থেকে সাতটা। মাস্টার মশায়দের মাইনে হাজার থেকে ষোল-শ রুবল; খাটনি পাঁচ থেকে ছয় ঘন্টা। ছাত্রদের বয়স সাত থেকে সতের। লেনিনের ছবি মাস্টার মশায়দের বসবার ঘরে। হেড মাস্টার লাল কামিজের উপর বুকখোলা কোট চাপিয়েছেন। ছটফটে মানুষটি — ক্লাস দেখাতে সঙ্গে করে নিয়ে চললেন।

আমরা ক'জন দ্বিতীয় মানের বাচ্চাদের ঘরে ঢুকে পড়েছি। মোট বাইশটি — তার মধ্যে ছেলে মাত্র পাঁচ। একটির গায়ে ছেঁড়া জামা। ক্লাসে পড়াচ্ছেন একটি মেয়ে। পড়ানো আর কি — ছবি আঁকছেন হরেক রকম, ছবি নিয়ে বাচ্চাদের প্রশ্ন করছেন। কেমিস্ট্রি, ফিজিক্স আর বায়োলজির ল্যাবরেটারি এক দিককার কখানা ঘর জুড়ে। বাপরে বাপ! এই তো এক ইস্কুল, কিন্তু যন্ত্রপাতির কী সমারোহ!

দিগন্তব্যাপ্ত মাঠের ফসলের ভিতর চাষীদের দিব্যি গাঁ-ঘর। ছিমছাম বাড়িগুলো। বাড়ির মধ্যে ঢুকছি। আপেলগাছ দরজার ধারে, ফল ফলে আছে। উঠানের প্রান্তে আঙুরের মাচা। কাবুলে অপূর্ব গুপ্তর বাড়ি যেমন। গরু-ছাগল বাঁধা আছে ওদিকটায়। উঠানের অর্ধেকখানি নিয়ে আলুর ক্ষেত। রাক্ষুসে সাইজের আলু — কয়েকটা তুলে ওঁরা আমাদের দেখালেন।

বাড়ির কর্তার নাম রহমৎ। দাড়ি-গোঁফে মুখ ঢাকা। চার ছেলে, দুটো গাই, আট বকরি। অ্যাজবেস্টোজের চাল, গরম না লাগে সেজন্য চালের নিচে কাঠের পাটাতন। তার নিচে নক্সাদার চাঁদোয়া টাঙিয়ে বাহার করেছে। সামনের দিকে দুই কুঠুরি পাশাপাশি, পিছনে দরদালানের মতো টানা লম্বা ঘর। কয়েকটা বাড়িতে ঢুকলাম, সবই এক ধাঁচের। ঘরে ঘরে বিদ্যুতের বাতি, শীতের যময় ঘর গরম করবার বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম। রেডিও, গ্রামোফোন, আলনা, ছোট খাট। মেজেয় কার্পেট বিছানো। মনে রাখবেন, চাষীর বাড়ি ঢুকেছেন। আঙুরের থোলো ঝুলানো দেয়ালে। কয়েক রকম তারের বাজনা — রহমৎ বলছেন, বাজনা শুনুন না একটু। রঙিন আলখেল্লার মতন পোশাক মেয়েদের, মাথায় ওড়না, কাঁধে-কাঁধ দিয়ে দাঁড়ালেন এসে কয়েকটি — অর্থাৎ ইঙ্গিত পেলেই লেগে পড়েন গীতবাদ্যে। এবং বুড়ো রহমতের যা গতিক, উনিও বোধ হয় নৃত্য শুরু করে দেবেন নাতনীর বয়সি মেয়েগুলোর সঙ্গে। কিন্তু সময় কোথা বাজনা শুনবার? বেরিয়ে পড়ুন এখনই। বেশ খানিকটা দূরে লেনিন-কোলখোজ — সেইটে সেরে তবে বাসায় ফেরা।

রোদ পড়ে এসেছে, বেশ শীত ধরেছে এখন। ওধারে রান্নাঘর; তন্দুর সেঁকা-পোড়ার জন্যে। ঘুঁটে দিয়ে রেখেছে, বড় বড় লাল-লঙ্কা শুকোতে দিয়েছে। বাইরে বড় এক তক্তাপোশ — আমরা আসব জেনেই বের করে দিয়েছে বোধ হয়। আমাদের একজন কৃষিকর্মেও করিৎকর্মা। কোথায় নিজস্ব চাষবাস আছে নাকি তাঁর। গোটা কয়েক লঙ্কা চেয়ে নিলেন; বড় আকারের

টম্যাটো ফলে আছে—পাঁচটা-ছ'টায় সের দাঁড়াবে—তারও বীজ জোগাড় করলেন। মস্কোর বাজারেও ঘোরাঘুরি করেছেন তিনি বীজের জন্য। দেশে এসে এই সমস্ত ফলাবেন। বললাম, খাসা হবে। নাম দেবেন 'লেনিন-লঙ্কা' 'স্ট্যালিন-টম্যাটো'—ঝুড়ি ঝুড়ি কিনবে লোকে।

অনেক পথ ছুটে লেনিন-কোলখোজে পৌঁছলাম, তখন অন্ধকার হয়ে গেছে। কোলখোজের এই অফিস অঞ্চলে অন্ধকার বোঝবার জো নেই, আলোয় আলোয় দিনমান। লেনিন-স্ট্যালিনের অতিকায় সোনালি মূর্তি, যেমন সর্বত্র দেখা যায়। অপরূপ সাজানো বাগান। কোন ইন্দ্র-তুল্য ব্যক্তির প্রমোদশালায় এসে পড়েছি, মনে হয়। তাই বটে! হিসাব দিচ্ছে, কোন সনে কত মুনাফা পিটেছে। বেড়েই চলেছে। ১৯৫০ অব্দে আঠার মিলিয়ন, ১৯৫৪ অব্দে বত্রিশে উঠেছে। মেয়ে শ্রমিক-বীর একজনকে দেখলাম। নাম হালিমা। বারোটা মেডেল আর অর্ডার-অব-লেনিন পেয়েছেন তুলো-চাষের জন্য। সুপ্রীম সোবিয়েতের ডেপুটি। সগর্বে হালিমা আমাদের এটা-সেটা দেখিয়ে বেড়াচ্ছেন।

কিণ্ডারগার্টেন ইস্কুল। ছোট ছোট টেবিল নিয়ে বাচচারা খাচ্ছে। হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে আমাদের দিকে আহ্লাদ করে। কাবুলিওয়ালার ধরনে জোব্বা-পরা চাষীর দল—লম্বা দাড়ি, মাথা কামানো, পায়ে বুটজুতা। পাঠানের মতো দশাসই চেহারা। কোলখোজের নিজস্ব অনেক রকম মেশিন—এই রাত্রিবেলা মাঠের মধ্যে উজ্জ্বল আলো জ্বেলে সেই সমস্ত চালিয়ে দেখাচ্ছে। ভয়ানক আওয়াজ, কানে তালা লেগে যায়। টেনেটুনে তারপর খাওয়াতে নিয়ে চলল, না খাইয়ে ছাড়বে না। সহসা বিষম দুঃসংবাদ। রেডিও-য় ভারতীয় খবর দিচ্ছে—আমাদেরই জন্য দিল্লি-স্টেশন ধরেছে—রফি আহমেদ কিদোয়াই মারা গেছেন। আর একদিন, লিয়াকত আলির হত্যার খবর পেয়েছিলাম এমনি পথের উপর—কাশ্মীরের পথে বানিয়ান-গিরিসঙ্কটের ভিতর। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম ক্ষণকাল। কিছু ভাল লাগছে না।

পরের দিন। ওঁরা বেরুলেন, আমি ছুটি নিয়েছি এ বেলাটা। বিশাল এই বাগানবাড়িতে আছি—বাগানটা ঘুরে ঘুরে একটু দেখি। টাসের লোক এসে আমার অভিমত চাইল তাজিকিস্তান ও এই জয়ন্তী-উৎসব সম্পর্কে। সোবিয়েতের সংবাদ-প্রতিষ্ঠান টাসের নাম কে না জানেন? অতএব লিখতে হল দু-চার ছত্র। বিকালবেলা তাজিক-গণতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট চা খাওয়াবেন, ওখানেও কথাগুলো বললে মন্দ হয় না। এক ঢিলে দুই পাখি—যা লিখেছি, ঐ আসরে আগে পড়ে টাসের লোকের কাছে দিয়ে দেব।

প্রেসিডেন্টের আয়োজন হলের ভিতরে। সোবিয়েতে প্রথম আজ আমি শাল-পাঞ্জাবি চাপিয়ে বাঙালি পোশাকে হাজির হয়েছি। তাবৎ চীনদেশ এই পোশাকে ঘুরেছি, কিন্তু দারুণ ঠাণ্ডার ভয়ে এখানে এতদিন হয়ে ওঠে নি। গোড়ায় যেমনধারা হয়ে থাকে—নতুন ব্যবস্থার গুণকীর্তন করছেন ওঁরা। গণতন্ত্র চালু হবার আগে তাজিকিস্তানে ছিল সাকুল্যে চারটা ইস্কুল, ষোল জন মাস্টার—এখন মাস্টারই হলেন সতের হাজার। ডাক্তার রয়েছেন দু-শ। জারের আমলে ছ'টা সিল্ক-ফ্যাক্টরিতে মোটমাট যত সিল্ক হত, এখন যে কোন একটি ফ্যাক্টরির উৎপাদন তাই। ইচ্ছে করলেই সোবিয়েত-সমবায় থেকে আমরা আলাদা হয়ে যেতে পারি, কিন্তু এত সুখসম্পদ পাচ্ছি—আলাদা হতে যাব কেন? সব ক'টা গণতন্ত্র ঐক্যবদ্ধ হয়ে পরস্পরের সহযোগিতা করে—এমন অভাবিত অতি-দ্রুত উন্নতি সেই জন্য। কোন প্রতিবেশীর ক্ষতি করতে চাইনে আমরা। প্রয়োজন নেই। নিজেদের যা আছে, তাই তো ভোগ করবার লোক মেলে না।

এক কৌতূহল আমাদের মনে মনে। প্রেসিডেন্টকে কথাটা জিজ্ঞাসা করা হল। পঁচিশ-ত্রিশ বছর আগেও শুনতে পাই, মোল্লাদের দোর্দণ্ডপ্রতাপ—তাঁদের কড়া শাসনে বোরখা তুলে একটুকু বাইরে তাকাবার জো ছিল না মেয়েদের। পায়ে পায়ে বিধিনিষেধ। মোল্লারা ঠাণ্ডা হলেন কি করে?

প্রেসিডেন্ট বলেন, ঝগড়া-বিবাদ করতে যাই নি। আছেন তাঁরা এখনও—শুক্রবারে যে কোন মসজিদে যান; দেখতে পাবেন। কিন্তু রয়েছেন ঐ ধর্মীয় এলাকাটুকুর মধ্যেই। রাষ্ট্রের সঙ্গে কোন যোগাযোগ নেই এই ধর্মীয় মানুষদের; শিক্ষা ব্যাপারে পুরোপুরি সরকারি কর্তৃত্ব, জনহিতকর সকল কাজকর্ম সরকার নিজের কাঁধে নিয়েছেন। মোল্লারা এমনি ভাবে জনসাধারণ থেকে দূরবর্তী হয়ে পড়েছেন। সাধারণ মানুষ অত শত বোঝে না। যেখান থেকে উপকার পায়, সেইখানে তাদের গতায়াত—সেখানে ভালবাসা। ধর্ম একেবারে ব্যক্তিগত ব্যাপার এখন—তোমার যেমন খুশি ধর্মচর্চা করো, একেবারে না করলেও রক্তচক্ষুর শাসানি নেই।

কবি তুরসুন উচ্ছ্বসিত বক্তৃতা করলেন। ১৯৪৭ অব্দে আমি ভারতে গিয়েছিলাম। ভাগ্যবশে স্বচক্ষে ভারত দেখেছি। ভারত সম্পর্কে বিস্তর কবিতা আছে আমার। দুই রকমের কবিতা—ভারতের পুরানো গাথা নিয়ে; এবং আমার ভারত-ভ্রমণ সম্পর্কে। ভারতের প্রতি হৃদয়ভরা প্রীতি সেই থেকে। আকাশের তারার মতো উজ্জ্বল; পার্বত্য নদীধারার মতো প্রখর। একা আমি নই, তাজিক দেশের হাজার হাজার মানুষ ভারতকে চেনে রবীন্দ্রনাথ প্রেমচন্দ

প্রভৃতির লেখায় ; বিভিন্ন সাংস্কৃতিক দলে যাঁরা আসছেন তাঁদের নাচে-গানে। এমনি চেনা-জানার মধ্য দিয়ে আমাদের উভয় দেশ প্রীতির বাঁধনে বাঁধা পড়ুক। আমরা চাই সূর্য-চন্দ্রের আলোর মতো সুখসমৃদ্ধি লাভ করুক সমস্ত ভুবন— কোনখানে কেউ বাদ থাকবে না। আমাদের তাজিকিদের মধ্যে একটা চলতি উপমা — আমার ও প্রিয়তমার প্রীতি দুই চোখের মতো ; দুচোখ পরস্পরকে দেখে না, কিন্তু দু-চোখ মিলে জগৎ দেখে।

'প্রত্যাবর্তন' নামে নিজের এক কবিতা আবৃত্তি করলেন তুরসুন। নাম লিখে একটা করে কবিতার বই দিলেন প্রতিজনকে। আমি দু-চার কথা বললাম। হীরেন মুখুজ্জে মশায় আশ্চর্য এক বক্তৃতা করলেন — 'রাশিয়ার চিঠি'র জবান দিয়ে বক্তৃতা শুরু : এখানে না এলে এ জন্মের তীর্থভ্রমণ অপূর্ণ থেকে যেত।

সন্ধ্যা হয়ে আসে। উৎসবের শেষ, তাজিকিস্তান ছেড়ে যাচ্ছি কাল সকাল-বেলা। অনেকেই বাজার ঘুরতে বেরুলেন। আমি ছুটেছি ফেরদৌসি-লাই-ব্রেরিতে। লাইব্রেরিতে একটা পাক না দিয়ে গেলে পাঠকেরা যে আমায় জ্যান্ত পুঁতে ফেলবেন।

পুরো নাম তাজিক ন্যাশনাল ফেরদৌসি লাইব্রেরি। দশম-একাদশ শতকের খোরসান কবি আবুল কাসেম ফেরদৌসির নামে। খোরসান জায়গাটা এই তাজিক গণতন্ত্রের ভিতরে। লাইব্রেরির সামনে বাগান, অজস্র ফুল। প্রাচীন তাজিক পদ্ধতির বাড়ি—তাজিকি লেখক কবি শিল্পী ও জ্ঞানীগুণীদের মূর্তিতে সাজানো। স্ট্যালিন-লেলিনের মূর্তি তো থাকবেই।

লাইব্রেরির ডিরেক্টর মেয়ে। দশ লাখের মতো বই—খবরের কাগজ ইত্যাদি বাদ দিয়ে। আড়াই হাজার বইয়ের লেনদেন হয় প্রতিদিন ; বারো শো লোক পড়ে। প্রতিষ্ঠা ১৯৩৩ অব্দে।

প্রথমে একজিবিশন-হল। নানান পুঁথিপত্রে ঠাসা। আগে তাজিকিস্তানে একটা লাইব্রেরিও ছিল না। এখন ন-শ'র বেশি। এটি কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি।

আর একটা খুব বড় হল — তার অপরূপ অলঙ্করণ। 'মাতৃভমি' নামে দেয়াল-চিত্র — তাজিকিস্তানের নানা দৃশ্য দেয়ালে এঁকে রেখেছে। আঠারোর কম-বয়সি ছেলেমেয়েদের পড়বার ঘর এটা। পোস্ট-গ্রাজুয়েট ছাত্র-ছাত্রীরা থিসিস বানাচ্ছে এমনি আর একটা হলে। নিঃশব্দ — সূঁচ পড়ে গেলে তার শব্দ পাওয়া যাবে। সাধারণের পাঠাগার একটা — যারা কারখানার কর্মিক কিম্বা অফিসে কাজকর্ম করে, তারা এখানে এসে বসে। মোটমাট পাঁচটা পড়বার ঘর।

স্থানীয় ঐতিহাসিক বিভাগ। একটা বই দেখলাম — কিতাব মুদজান আল-

বুলদান। আরব পরিব্রাজক ইয়াকুত-আল-খামাডির রচনা। যত দেশ তাঁর জানা ছিল, সমস্ত বর্ণানুক্রমিক সাজিয়েছেন। কেতাব-আল-ইবের — আরবের নামজাদা ঐতিহাসিক (চোদ্দ শতক) ইবন খালদুনের রচনা, সময়ক্রম অনুসারে বিভিন্ন আরব-খালিফাদের যাবতীয় বৃত্তান্ত। পনের শতকের বই তাজকিরাত-উশ সুয়ারাও — শতাধিক কবির সম্পর্কে নানা বিবরণ। সাদীর বোস্তানের (সতের শতকের পাণ্ডুলিপি) ফোটোগ্রাফিক কাপি। হাজার বছর আগেকার রুদাকীর কবিতার পাণ্ডুলিপি ; ষোল শতকের শাহনামার পাণ্ডুলিপি। পুরানো তাজিকি ও উজবেকি পাণ্ডুলিপি — সমস্ত আরবি হরফে। এই আরবি হরফ তুলে দিয়ে এখন রুশীয় হরফ চালু হচ্ছে। বোম্বাইয়ে ছাপা বিস্তর ফারসি বই আছে। ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের অনেক বই দেখলাম। সাত তলা জুড়ে বই সাজানো। লেনিন-লাইব্রেরির মতোই নিচু ছাত বইয়ের ঘরগুলোয়।

স্ট্যালিনাবাদ এরোড্রোমে যাত্রীরা সব প্লেনের অপেক্ষায় আছে। দাড়ি-ওয়ালা গ্রাম্য চাষী—হাতে মোটা লাঠি। আবার এদের চেয়েও দীন পোশাকের লোক দেখছি। হরদম তবু আকাশে চলাচল। তুরস্থন বিদায়-বক্তৃতা করলেন। কবি লোক—ভাষা আবেগময়। বন্ধুরা, তোমাদের মহৎ দেশের সুন্দর মানুষদের জন্য আমাদের ভালবাসা নিয়ে যাও। প্লেনে চললে তোমরা মস্কোয়—মস্কো ছাড়িয়ে আরও কত কত দূরে। প্লেনের পাখায় লেখা, ঐ দেখ, শান্তি। শান্তিময় দেশের উপর পাখা বিস্তার করে উড়ে যাবে প্লেন, পাখার নিচে মানুষের শান্ত ঘরগৃহস্থালি। সারা জগতের সমস্ত মানুষের শান্তিব উপরে আমাদের স্থিরলক্ষ্য হোক…

শহর ছাড়িয়ে এলাম। জনালয় কমে আসছে। নদী—বাঁধে বন্দী স্রোত। দিগ্‌ব্যাপ্ত ফসলের ক্ষেত মাঝে মাঝে। তারপরে বালুভূমি। উঁচু পাহাড়ের চূড়ায় উঠছি—অনেক উঁচু। ভারি মজা—মনে হচ্ছে, পাহাড়ের গা বেয়ে গড়িয়ে গড়িযে উঠছি যেন। পাহাড়ের উপর জায়গায় জায়গায় রিস্তর গাছপালা। নির্জলা ভূমিতে ঐ যে বিশেষ ধরনের জঙ্গল বানায়—সেই সব গাছই হয়তো এই পাহাড়ে।

পাহাড় ছাড়িয়ে আরও কত দেশ পেরিয়ে বড় নদী নজরে এলো। শিরদরিয়া। তারই কিনারা ধরে প্লেন উড়ছে। শহর দেখা যায় ঐ। আর কি—তাসখন্দে এসে পড়েছি আবার। নতুন প্লেন এসে এইখান থেকে আমাদের মস্কোয নিয়ে যাবে। আজকের দিন এখানে স্থিতি। সে-ই হোটেলে নাকি? এক এক তলায় একটা কল ও এক পায়খানা। সে কথা মনে পড়ে আতঙ্ক লাগে। এয়ারপোর্টে সবগুলিই প্রায় চেনা মুখ, অভ্যর্থনার জন্য এঁরাই এসেছিলেন আগের বারে। আর এসেছে অতি-সুন্দর সেই দোভাষী তরুণী। হাসিয়ানা, হাসিয়ানা—নামটা সবাই ভেবে নিচ্ছি; হাসতে হাসতে সে সংশোধন করে দেয়, ঐ দেখুন, আবার ভুল করেন—আসল নাম হাসিয়াৎ। আর বংশটা হল দোস্ত মহম্মদ—অতএব দোস্ত মহম্মদ হাসিয়াৎ নাম দাঁড়াল পুরোপুরি।

কাল রাত্রে তেজা সিং গোলমালে পড়েছিলেন। সে গল্প শোনেননি বুঝি? ছুটোছুটিতে চোখে অন্ধকার দেখছি, ফাঁক কখন যে দু-দণ্ড জমিয়ে গল্পগুজব করব? সেই যে দলনেতা তেজা সিং, বুড়া মানুষ—শরীরটা তেমন ভাল যাচ্ছে না—সারাদিন ধরে অনেক রকম আত্মনিগ্রহের সঙ্কল্প করেন, কিন্তু খানা-টেবিলে বস্তুগুলার সামনে আর কোন হুঁশ থাকে না। ডিনারে বসে বিধৃত প্রমাণ কয়েকটা আমিষ-কাটলেট সেবনের পর জানা গেল নিরামিষ কাটলেটও উত্তম হয়েছে। তখন তার উপরে নিরামিষ কাটলেটও চাপান দিয়ে দিলেন। ফলে রাত দেড়টায় দম বন্ধ হবার জোগাড়। জ্ঞান মজুমদার ডাক্তার মশায়ের ডাক পড়েছে। কনকনে শীতে হি-হি করতে করতে মজুমদার মশায় রোগী দেখতে ছুটলেন। ব্যাপার গুরুতর বটে। উদরের ভার-মোচনের জন্য বার বার বাইরে বেরুনোর তাগিদ—কিন্তু বিপদ হয়েছে, ভোরবেলায় রওনা হবার তাড়ায় এখন থেকেই লোকে ধর্না দিয়ে আছে। বারম্বার দরজা ছেড়ে দিতে চায় না—নেতার খাতিরেও নয়। তেজা সিং অতএব বেডপ্যান চাইলেন—উল্টো বুঝে ওরা ঐ নিশিরাত্রে তুরতুর করে চা বানিয়ে আনল। ইত্যাদি, ইত্যাদি। এরোড্রোমে গিয়েও তাঁর রাগ পড়েনি—খোঁজ নিচ্ছিলেন, স্ট্যালিনাবাদ থেকে কাবুলে সোজা পাড়ি দেবার উপায় আছে কিনা। বেড়ানোয় বিতৃষ্ণা ধরে গেছে, দেশে ফিরতে পারলে বেঁচে যান। ভয়েরও ব্যাপার—আমরা সেইদিক দিয়ে ভাবছি। তাসখন্দে গিয়ে আবার যদি রাতের কাণ্ড শুরু করে দেন, এজমালি একটি শৌচখানা নিয়ে বিষম মুশকিল হবে। সেবারে পনের জন আমরা দিশা করতে পারি নি। এবারে যাচ্ছি তো পঁচিশ।

ছায়া-মোড়া পথ। সেবারে খানিকটা ঘোরাফেরা করে গেছি, চারিদিক চেনা লাগছে। গাড়ি চলল—কিন্তু সেই হোটেলের দিকে বোধ হয় নয়। রেলরাস্তার তলা দিয়ে যাচ্ছি, এ তল্লাটে এসেছি বলে মনে হয় না। তাই বটে। শহর ছাড়িয়ে বাইরে এলাম। রাস্তা আর পিচ-দেওয়া নয়—পাথুরে বটে কিন্তু উঁচু-নিচু। অনেক—অনেক দূর, এরোড্রোম থেকে মাইল পঁচিশেক হবে। গাড়ি তার পরে বাঁক নিল ধুলো-ভরা এক গ্রামপথে। বাংলা দেশেরই এক গ্রাম যেন। দিগ্‌ব্যাপ্ত মাঠ—কোথাও ফসল ফলেছে, ফসল কেটে নিয়েছে কোথাও। কুটির এদিকে-ওদিকে—হাঁস-মুরগি ঘুরছে, গরু-ছাগল চরে বেড়াচ্ছে। রাস্তার ধারের নয়ানজুলি দিয়ে জলধারা বয়ে যাচ্ছে কলকল বেগে। এক বাংলো-বাড়িতে নিয়ে তুলল। গোলাপ-বাগানে উঠান ভরে আছে। চারিদিকে গাছপালার সমারোহ।

গোটা তিনেক বাড়ি কম্পাউণ্ডের ভিতরে। আমাদের পরের প্লেনে কাকটার-

বেরির ডীন এসে পৌঁচেছেন। ছোট বাড়িটায় তাঁদের তুলল। বড় দোতলা বাড়িতে আমরা। দামি দামি আসবাবপত্রে পরিপাটি সাজানো-গোছানো। কোন নবাব-আমিরের বাগানবাড়ি যেন। উঠানে পা দিতে না দিতে বড় টেবিলে ডিনার সাজিয়ে ফেলেছে। উপরের ঘর নিচ্ছি না আমরা। সিঁড়ি ভেঙে মালপত্র নিজ হাতে তুলতে হবে, কুলি নেই। তা ছাড়া রাত্রি দুটোয় এখান থেকে রওনা, সমস্ত আবার নামিয়ে আনো সেই সময়। নিচের ঘরে থাকলে ঝামেলা কম হবে। ঘর উপরের হোক নিচের হোক, ফেলনা কোনটাই নয়। আর নেতা এবং ডেপুটি-নেতাকে যে দুটো ঘর দিল, কোন লাটসাহেব তা পান না। অন্তত পক্ষে পশ্চিম-বাংলার ঋষি-লাট হরেন্দ্রকুমার তো ভাবতেই পারতেন না ঐ রকম সাজসজ্জা। ঘরের লাগোয়া বসবার ঘর, সেখানে গিয়ে দাঁড়ালে চোখের মণি দুটো ছিটকে বেরিয়ে আসে। সমাজতান্ত্রিক দেশ হলেও সব মানুষের খাতির সমান নয়। নেতা ডেপুটি-নেতার সঙ্গে অপর দশজনের ফারাকটা বিষম দৃষ্টিকটু লাগে। কড়া আলোচনাও হত এই নিয়ে। খবর নিয়ে জানলাম, এটা হল কর্মিকসৌধ, এই কিছুদিন আগে বানিয়েছে। ট্রেড ইউনিয়নের চিঠি নিয়ে কর্মিকরা দিন কয়েক থাকে এসে এখানে, ফূর্তিফার্তি করে। তাদের মধ্যেও শ্রেণীগত রকমফের আছে, বুঝতে পারছেন। নইলে বাছা বাছা কয়েকটা ঘরের অত বাহার কেন?

ক্লান্তিতে লেপ মুড়ি দিয়েছি। ধড়মড় করে উঠে দেখি, বেলা পড়ে এসেছে। কোন দিকে কেউ নেই — কী মুশকিল, বাড়িতে আমি একলা একটি প্রাণী মনে হচ্ছে। না, একেবারে একা নই -- বেরিয়ে এসে রাও সাহেবকে পেলাম। মাদ্রাজের এডভোকেট — কানে খাটো বলে সব সময়ে ছিপির মতো যন্ত্র কানে দিয়ে বেড়ান। গেঁয়ো রাস্তায় বেরুলাম তাঁকে নিয়ে। পথ ছেড়ে মাঠে নেমেছি; মাঠের প্রান্তে চাষীদের ঘরবাড়ি—কোণাকুণি পাড়ি দিচ্ছি সেইমুখো। এক বাড়ির সামনে এলাম। কৌতূহলে পাড়াসুদ্ধ উঁকি-ঝুঁকি দিচ্ছে। এক মাঝবয়সি গিন্নি কোথায় ছিলেন -- তাড়াতাড়ি এগিয়ে অভ্যর্থনা করেন।

উজবেকি ভাষা এবং এ-তল্লাটের যাবতীয় ভাষার নিকট-সম্পর্ক ফারসির সঙ্গে। ফারসিতেও বিষম দিগ্‌গজ আমি, তবু কিন্তু দু-পাঁচটা কথা দিব্যি বুঝতে পারি। এবং কথা না বুঝলেও দু-চোখে যে আন্তরিক সমাদর ফুটে উঠেছে, সেটা বুঝতে আটকায় না। ছিমছাম ঘরবাড়ি, মেজেয় গালিচা পাতা। কয়েকটা বাচ্চা খেলা করছে। ধুলো-মাখা পোশাকে ড্যাবডেবে চোখ মেলে তারা এগিয়ে এলো। কাছে ডাকছি হাতের ইসারায়। হাত বাড়িয়ে দিল একটি, দিয়েই আবার সরিয়ে নেয় লজ্জায়। বড়টি গটমট করে বীরোচিত

ভাবে এসে দাঁড়ায়। দেখাদেখি ছোটটিও তখন এগোয়। হাত ধরে একটুকু হাত মলে দিলাম দুজনের, গালে আঙুল ছুঁইয়ে আদর করলাম। গিন্নি ওদিকে চায়ের জোগাড় করতে চান, ঠারেঠোরে বলছেন। না-না করে ঘাড় নেড়ে আমরা সরে পড়লাম। এদিক-ওদিক আরও খানিকটা চক্কোর মেরে বাড়ি ফিরে আসি।

এক বা দু-জন কেন হব, আরও তো আছেন বাড়িতে। হীরেন মুখুজ্জে ঘর থেকে বেরুলেন। বিষম বিরক্ত। গিয়েছে ওরা সকলে কনজারভেটরিতে। অর্থাৎ সঙ্গীতের কলেজে। তিনি এক চেয়ারে বসে আর এক চেয়ারে পা তুলে ক্লান্তিতে একটু চোখ বুজেছিলেন, তন্দ্রাও একটু এসেছিল বোধ হয়। কিন্তু যাবার সময় একবা রডেকে যাবে না, এ কেমন কথা?

গ্লোকোভকে পেয়ে গেলাম — আমাদেরই এক দোভাষি, মস্কো থেকে সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছে। শোন হে, আমরাও যেতে চাই কনজারভেটরিতে, গাড়ির জোগাড় দেখ। তেজা সিং নেমে আসছেন। সিঁড়ি থেকে বলছেন, এখন কোথায় যাবে গো? ওরা পাঁচটায় ফিরবে, আমায় বলে গেছে। যেতে যেতেই তো পাঁচটা বাজবে। মিছে কষ্টভোগ। তা হোক, আমরা মরীয়া। গাড়ি দু-তিনটা ঝিমিয়ে রয়েছে উঠানে — কষ্ট করে চড়ে বসা। এই কষ্টে নারাজ হলে বিদেশে আসা কেন? ঘরে বসে থেকেই বা কোন চতুর্বর্গ লাভ হবে? রাও মশায়ের খোঁজ নেওয়া হল। দাবায় বসে গেছেন তিনি টুপি-দাড়িওয়ালা প্রবীণ এক উজবেকির সঙ্গে। দাবাখেলায় কথা লাগে না। একে কানে কম শোনেন তায় চালের ভাবনায় একবারে বদ্ধকালা হয়ে গেছেন, কানের যন্ত্রে আপাতত কাজ হবে না। রাও মশায়কে নড়ানো গেল না।

বাড়ির অদূরে যেখান থেকে কাঁচা রাস্তা শুরু, মোড়ের উপর দুটো পুলিশ। কি হে গ্লোকোভ-ভায়া, পুলিশ পাহারায় রেখেছ কেন আমাদের? পাড়াগাঁ জায়গা — কেউ যদি কোন বদ্‌ মতলবে বাড়ির মধ্যে ঢোকে, সেজন্য এই বিশেষ বন্দোবস্ত। শহর হলে এ সব লাগত না। কনজারভেটরির সামনে লোকজন ঘিরে দাঁড়াল। উঁহু, আলাপ-পরিচয় পরে, গান-কনসার্ট শুনে আসিগে, হয়তো বা সারা হয়ে গেল এতক্ষণে।

মাত্র সেদিন — ১৯৩৫-এ কনজারভেটরির প্রতিষ্ঠা। উজবেকিস্তানের গাঁয়ে গাঁয়ে লোক-সঙ্গীত, কিন্তু রাগসঙ্গীত নিয়ে বেশি কিছু শোনা যায় না। এঁদের কাজ, লোক-সঙ্গীতের গবেষণা, বৈজ্ঞানিক স্বরলিপি-রচনা এবং লোক-সঙ্গীতের ভিত্তিভূমির উপর রাগসঙ্গীতের স্থাপনা। একটি মেয়ে গান শোনাল — গানের মধ্যে অনেক বার 'আল্লাহ্‌' কথা পেলাম। পুরানো গান — ঈশ্বরের

ভজন। গাইল নতুন গবেষণার উন্নত তানকর্তবে। ঈশ্বর নিয়ে যদিচ তেমন মাথাব্যথা নেই, পুরানো কোন-কিছু বাতিল করা চলবে না। টাকমাথা শক্তসমর্থ এক ভদ্রলোক এখানকার ডিরেক্টর — তাঁরই বিশেষ অধ্যবসায় এ সমস্ত ব্যাপারে; নিজের মাথার নানা রকম উদ্ভাবনা। এই রকম আল্লাহ্‌র গান গেয়ে গেয়েই দু-দুবার তিনি স্ট্যালিন-পুরস্কার পেয়েছেন।

এক বড় হলে নিয়ে ঢোকালেন। ছবিতে ছবিতে এলাহি ব্যাপার — ঘর-বারাণ্ডার দেয়ালে বড় ফাঁক নেই। নামজাদা গীতকার সুরযন্ত্রী ওঁরা সব। প্লাটফরমের উপর পঁয়ত্রিশ জন তৈরি হয়ে আছেন, কনসার্ট শোনাবেন। মেয়ে আছেন, পুরুষ আছেন — হাতে রকমারি বাঁশি ও তারযন্ত্র; একজনের কাছে জলতরঙ্গের সরঞ্জাম। বাজনার স্বরলিপি সকলের চোখের সামনে। সাবেকি লোকযন্ত্র — একটু-আধটু সংস্কার করে নতুন কায়দায় বানানো হয়েছে। ডিরেক্টর একটা একটা করে পরিচয় দিচ্ছেন, যন্ত্রীরা উঁচু করে তুলে দেখাচ্ছেন হাতের যন্ত্র। আমি লোকটি নিতান্ত আনাড়ি — তবু শানাই নাগারা দিলরুবা এই নামগুলো না জানার কথা নয়। বাঁশের বাঁশি আছে, আবার বিলাতি ঘোরপ্যাঁচের বাঁশিও আছে কয়েকটা। অনেকগুলো সুর শোনাল — অতি প্রাচীন সুর একটা, নাম হল কাসগারচা। বলে, বাংলা সুর শুনবেন নাকি? সুর একটু এগোলেই বোঝা গেল, অতুলপ্রসাদের 'রুমুঝুমু নুপুর পায়…'। ভারতের রেডিও ধরে তাই থেকে তুলে নিয়েছেন। আমাদের রেডিও ওঁরা খুব শোনেন, বিস্তর ভাল ভাল সুর পাওয়া যায় নাকি। রবিশঙ্করের একটা বাজনা নিয়ে নিয়েছেন। ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে শেকহ্যাণ্ড সেরে চটাপট হাততালির মধ্যে বিষম দেমাকে আমরা তারপর রাস্তায় নেমে পড়লাম।

হাতে সময় আছে, কি করা যায়? দোকানে হামলা দেওয়া যাক না একটু। জিনিসপত্র দেখি, দর শুনি। বিশেষত একটি মেয়ে আছেন, দেহের রং মেরামতে সর্বদা ব্যস্ত— তাঁর বটুয়ার রসদ ফুরিয়েছে। এদেশের মেয়েরা কি মাখে-টাখে, খোঁজখবর নিয়ে দেখবেন তিনি। গাড়ির সারি চলল স্টোরের দিকে। সমস্ত সরকারি দোকান; জিনিসপত্র সরকারের ফ্যাক্টরিতে বানানো। রাস্তাঘাটে অতএব কোন বিজ্ঞাপন দেখবেন না। দরকারের জিনিস পেয়ে যাবেন কোন না কোন স্টোরে। মাঝারি, ভালো, আরো-ভালো — সব রকমের আছে। দরও বাঁধা। প্রতিযোগিতা নেই, রংদার বিজ্ঞাপনে খদ্দের ভুলোবার চেষ্টাও নেই সেইজন্য।

আরে মশায়, জিনিস দেখব কি — আমাদেরই দেখবার জন্য মানুষ পাগল। সিংজির পাগড়ি, দাড়ি এবং ফারের ধার-বুনানি বিচিত্র ওভারকোট। মেয়েদের রকমারি শাড়ি। আমি তবু ধুতি-চাদর পরিনি, চীনে যেমনটা পরে বেড়াতাম

—তবে তো রক্ষে ছিল না আর। তিনটে দল হয়ে পড়লাম—ভিড়টা তিন ভাগ হোক। একত্র থাকলে স্টোরের কাজকর্ম অচল হবে।

জিনিসপত্র দু-চারটে কেনাকাটা হল। বেশি কে কিনবে, দর শুনে ছিটকে পড়তে হয়। ট্রাভেলারস-চেকে অনেকেই অনেক টাকা বয়ে নিয়ে গিয়েছিলাম, পুরোপুরি টাকা ফিরিয়ে আনতে হল। এদেশের রোজগারের টাকায় ওদেশের মাল কেনা যায় না। এত ভিড়ের হেতুটা ক্রমশ মালুম হচ্ছে। সেই আর একদিনের মতন ব্যাপার—এই তাসখন্দেই। 'কিচলু' কথাটা কানে গেল। ডক্টর কিচলু মাঝে মাঝে সোবিয়েতে আসেন, তাঁর নাম ওদেশে খুব চালু শান্তি-আন্দোলন সম্পর্কে। মীরা বলল, তোমাকেই কিচলু ঠাউরেছে—সেইটে বলাবলি করছে। জনতা ইংরেজি জানে না, ঘাড় নেড়ে হাবেভাবে বোঝাতে চাই, কিচলু মস্কোয় রয়েছেন—আমি বাজে লোক, ইণ্ডিস্কি পিশাতিয়েল। ভারতের এক লেখক আমি। তাতে রেহাই নেই—দলে দলে এগিয়ে এসে হাত বাড়াচ্ছে শেকহ্যাণ্ডের জন্য—নানান বয়সি—পাকাচুলের প্রবীণ থেকে ইস্কুল-কলেজের ছেলেমেয়ে। মোটরে উঠছি, রাস্তাতেও লোকারণ্য। সে এমন যে দৌড়তে দৌড়তে ট্রাফিক-পুলিশ এসে পড়ল। সিনেমার দল এসে এমন কাণ্ড করে গেছেন যে আমাদের সামান্য মানুষের পথ চলা দায়। কমবয়সি মেয়ে বিমলা বাঙ্গালোর থেকে এসেছেন, পোশাকের বাহার খুব—ভিড়টা তাঁকে ঘিরে জমজমাট। সিনেমা-স্টার বলে ধরে নিয়েছে। এবং আশপাশের এই অধমেরা কমিক অথবা দূত-সৈনিকের পার্ট করি, এমনি কিছু ভেবে থাকবে।

বাসায় ফিরে দেখছি অন্ধকার—তারই মধ্যে দাবা খেলে চলেছেন রাও মশায়েরা। বৃত্তান্ত কি? ইলেকট্রিক বিগড়েছে। ওদিকে খানা সাজানো হয়ে গেছে, রাত দুপুরে বেরুনো—সকাল সকাল খেয়ে নিতে হবে। আলোর সুরাহা হয় না কিছুতে। শেষটা করল কি—গোটা দুই মোটরগাড়ি নিয়ে এসে ডায়নামো থেকে তার টেনে ঘরের ভিতর একটা আলো জ্বালিয়ে দিল। কেরোসিনের আলোও এসে পড়ল কয়েকটা। বিদ্যুৎ ঠিক হয়ে গেল এমনি সময়, বাড়িময় আলো। উল্লাসে সকলে হৈ-হৈ করে ওঠে।

টেবিলের সামনে বসে দিনের বৃত্তান্ত একটু নোট করে নেওয়ার তালে আছি। হেনকালে আলেকজেণ্ড্রোভ এসে হাজির। সঙ্গে হীরেন মুখুজ্জে মশায়। হীরেন মুখুজ্জে বললেন, তাসখন্দ-রেডিও কিছু বলতে বলছে আমাদের। চলে আসুন। এক্ষুণি।

সে কি — না ভেবে-চিন্তে? তা ছাড়া ইংরেজিতে বলা, একটু লিখে-টিখে না নিলে সাহস পাইনে।

ওদের দোষ নেই। ডেলিগেশন-সেক্রেটারিকে বলেছিল ওরা বিকালে, সে কিছু করেনি। যাই হোক, বলতেই তো হবে কিছু।

খাওয়ার পরে সবাই ড্রইংরুমে গিয়ে বসেছেন। ডকুমেন্টারি ছবি দেখানো হবে, তার তোড়জোড় হচ্ছে। ছ-জনে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। বাঙালি যে চার জন আছি, সকলেই। আর আছেন অধ্যাপক প্রকাশ গুপ্ত ও অধ্যাপক শকসেনা। রেডিও-র স্টুডিও অবধি যেতে হল না। ছোট বাড়িটায় আলেক-জেণ্ড্রাভের ঘরে যন্ত্রপাতি নিয়ে এসেছে। ঐখানে বসিয়ে রেকর্ড করে নিল; পরে একদিন শোনাবে। আমি সাংস্কৃতিক-বিনিময় নিয়ে বললাম কিছু, ভারতের সাহিত্যিক হিসাবে ওদের নমস্কার দিলাম। মন্দ হয়নি বোধ হয় বলাটা, সকলে তো তারিপ করলেন।

বক্তৃতা সেরে শুয়ে পড়েছি। ঘুম হচ্ছে না, বিছানায় এপাশ-ওপাশ করছি। ছেঁড়া-ছেঁড়া নানান স্বপ্ন। রাত দেড়টায় ধীরেন সেন ঢুকে পড়লেন ও-ঘর থেকে। আর কি, উঠে পড়ুন এবারে। তিনি তৈরি। সুবিধা হয়েছে — তাড়াহুড়োর মধ্যে কামানোর ক্ষুর ইত্যাদি স্ট্যালিনগ্রাদে ফেলে এসেছেন। অতএব ঐ ঝকমারির দায় থেকে বেঁচে গিয়ে তাড়াতাড়ি কাজ সমাধা হয়েছে।

সবাই উঠে পড়ল। প্রকাণ্ড বাক্সটা গলদ্‌ঘর্ম হয়ে বাইরের বারাণ্ডায় এনে ফেলি। ঐ রাত্রে একটু চায়েরও জোগাড় হয়েছে। ভয়ানক শীত, পশমি কাপড়ে আপাদমস্তক ঢাকা, বাইরে এসে তবু ঠকঠক করে কাঁপছি। কর্তাদের দু-এক জন এসেছেন বিদায় দিতে। আর দেখি হাসিয়াৎ মেয়েটা উঠে পড়ে এর ঘরে তার ঘরে তদ্বির-তদারক করে বেড়াচ্ছে। খানদানি ঘরের রূপসী যুবতী মেয়ে — রাত্রিবেলা বাড়ি যায় নি, গ্রামের মধ্যে বিদেশিদের খিদমতে পড়ে আছে। জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার বাড়ির লোক এতে কিছু বলবে না? ঘনপক্ষ্ম চোখ দুটি তুলে সে অবাক হয়ে তাকাল: কি বলবে? এটা যে কোন আলোচনার বিষয়, এ যুগের মেয়েরা ভাবতে পারে না। অথচ এই তাসখন্দের ব্যাপারই তো —.ছেলে হারাবার ভয়ে মা বোরখা খুলে পথে ছুটেছেন সেই দোষে পাথর ছুঁড়ে তাঁকে মেরে ফেলল।

উজবেকিস্তানের গ্রাম পেরিয়ে শহরের কিনারা ধরে মোটরের কাফেলা চলল। চারিদিক নিশুতি, আকাশে তারা জ্বলছে আর রাস্তার ধারে আলো। হঠাৎ — কলকাতার শহরে নয়, ভারতের ভিতরেও নয় — আরও দূরে পাকিস্তানের চিরকালের গ্রামে মন উড়ে চলে গেল, যেখানে ঘুমুচ্ছে আমার চিরকালের

প্রতিবেশীরা। সে আকাশে ঠিক এমনিতরো তারকা? তা কি করে হবে? অনেক ফারাক সেই জায়গা ও এখানকার সময়ে। সন্ধ্যাতারা সেখানে হয়তো উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে বাঁশবনের আড়ালে।

ঘুমে চোখ ভেঙে আসছে। প্লেনে উঠে পড়ে বাঁচা গেল। আর ঝামেলা নেই, সারারাত চলবে, রোদটোদ উঠলে কোনখানে নামিয়ে ব্রেকফাস্ট খাইয়ে নেবে। শীতও নেই এখন, চলবার সময় প্লেনের ভিতরটা গরম করে রাখে। কম্বল টেনে চোখ বুঁজে পড়া গেল। প্লেন ঘরবাড়ি হয়ে উঠেছে আমাদের। সেদিন হিসাব হচ্ছিল, যা প্রোগ্রাম আছে, পুরোপুরি সমাধা হয়ে গেলে হাজার পঁচিশেক মাইল অর্থাৎ পৃথিবীটা একবার বেড় দেওয়া হয়ে যাবে।

সেই প্লেন — কাবুল থেকে যেটায় হিন্দুকুশ পার হয়েছিলাম। অক্সিজেনের নল রয়েছে, যদিচ অক্সিজেনের গরজ নেই এই মেঠো অঞ্চলে। হোস্টেসও সেই মেয়ে — দেহ কিছু ভারিক্কি এবং দাঁতগুলোও। শুয়ে পড়লাম চেয়ারটা নিচু করে কম্বল টেনে গায়ের উপর চাপিয়ে। পাইলট যথারীতি গোড়ায় একটু বক্তৃতা ছেড়েছেঃ রাতের মধ্যে কোন ঝামেলা নেই — প্রাতরাশ কোন এক শহরের কিনারে ; বেলা হবে সেই শহরে নামতে। শ্রীমতী হোস্টেস চা-কফি স্যাণ্ড-উইচের জোগান দিয়ে যেতে পারবেন তো — হোকগে বেলা, কী আর করা যাবে! দিব্যি লাগছে, আরামে ঘুম এসে গেল। মিষ্টি স্বপ্ন দেখছি। চারিদিকে শুধু অনন্ত অবাধ প্রীতি — মানুষের সকল দুঃখ-অশান্তি বিলীন হয়ে গেছে। কী ভাল যে লাগে!

স্বপ্ন ভেঙে ভেঙে জেগে উঠছি। সবাই ঘুমে অচেতন। আলো নিবিয়ে দিয়েছে, হোস্টেসের ডান পাশে শুধু একটা কমজোরি আলো জোনাকির মতন। বই পড়ছে একমনে — ঘুমন্ত নভোলোকের একটি মাত্র পাহারাদার ঐ মেয়েটি। আর জেগে আছে পাইলট ও অফিসারেরা। ককপিটের মধ্যে তারা, দেখতে পাচ্ছিনে। মেশিন চালিয়ে দিয়ে তারাও ঢুলছে কিম্বা কি করছে, কেবা জানে!

তার পরে এক সময় আর কিছু জানিনে। অনেক নিচে মাটির দেশে কত পাহাড় মাথা তুলে উঁকি দিচ্ছে, কত শহর দীপ উঁচু করে দেখছে, কত নদী ছুটছে পাল্লা দিয়ে তরঙ্গে তরঙ্গে — কিছু জানি নে একেবারে। অনেকক্ষণ কেটেছে, আবার একটু যেন সাড় হল। স্বপ্ন দেখছি, বয়সে ছোট হয়ে গিয়ে এবারে নাগরদোলায় দুলছি। নীলপূজার মেলায় হরিহরের তীরে বাঁশতলা সাফসাফাই করে নাগরদোলা বসিয়েছে, মোক্ষম পাক খাচ্ছি নাগরদোলায় চড়ে যেন। ঘুম ভেঙে চোখ মেললাম। সত্যি তো, কী বিষম দোলানি! হু-হু করে প্লেন নামছে। জানলা দিয়ে দেখবার চেষ্টা করি। কুয়াশায় আকাশ-ভুবন মুছে গেছে। বেলাটেলা হলে তো নামবার কথা। ঘড়ি দেখলাম, পৌনে

চারটা। তবে? যা ভেবেছিলাম, হয়তো বা তাই — ঘুমের ঘোরে পাইলট এটা টিপতে ওটা টিপে বসেছে। কী করা যায়, ডেকে তুলব নাকি সকলকে? ও মশায়রা, আরামসে নাসাগর্জন করছেন, প্রলয় কাণ্ড উপস্থিত এদিকে। পাকা আমের মতো প্লেন ভূঁয়ে পড়ে যাচ্ছে। পরমায়ু মিনিটখানেক বড় জোর — তারপর হাড়ে-মাসে সবসুদ্ধ তালগোল হয়ে আছি।

চেঁচাবার ইচ্ছে — কিন্তু ঘুম জড়িয়ে আছে, গলা খোলে না। ঘস্‌স্‌ করে আওয়াজ হেনকালে, ভূমির গায়ে প্লেন লাগবার সময় যেমনটি হয়। প্লেন অতএব পড়ে যায় নি, ধীরে-সুস্থে নামিয়ে এনেছে। জানলা দিয়ে প্রাণপণে নজর হানি। যতদূর ঠাহর হয়, দিক্‌হীন তেপান্তরের মাঠ। সারবন্দি আলো দেখা যায় মাঠের প্রান্তে। এ কোথায় নিয়ে এলো, কথা ছিল না এমন তো! থমথমে রাত্রিবেলা প্লেন দৌড়তে দৌড়তে আলোর সারির ভিতর এসে পড়ল। দৌড়চ্ছে — আর দেখলাম, যে-আলো পার হয়েছি সেগুলো নিবছে সঙ্গে সঙ্গে; সামনের দিকে নতুন আলোর সারি জ্বলে উঠছে।

থামল প্লেন। থেমে দাঁড়িয়ে গর্জাচ্ছে। দরজা খুলে দিল: নেমে পড়ুন। মালপত্র যেমন আছে থাক, মানুষগুলি নেমে যান শুধু।

লণ্ঠন ধরে এয়ার-অফিসার কয়েকজন। হ্যারিকেন নয়, ঐ জাতীয় অন্য ধরনের কেরোসিনের বাতি। প্লেন থামতে চক্ষের পলকে মাঠের সমস্ত আলো নিবিয়ে দিল, অনেক দূরে শুধু কয়েকটা টিমটিমে আলো। সিঁড়ি দিয়ে নেমে দাঁড়াতে সর্বশরীরে কাঁপুনি ধরে গেল। কী শীত, কী শীত! কনকনে হাওয়া বইছে। প্যাচপেচে কাদা, বরফ গলে জল জমে আছে এখানে-ওখানে। তারই মধ্যে জুতো ডুবিয়ে ডুবিয়ে চলেছি। মোজা ভিজে গেছে। শীত ঐ ভিজে মোজা দিয়ে পা বেয়ে পিঠের শিরদাঁড়া বেয়ে কনকনিয়ে ব্রহ্মতালু অবধি গিয়ে পৌঁছুচ্ছে। যাচ্ছি কোথায় গো, কেনই বা নিয়ে যাচ্ছে?

পৌঁছান গেল অবশেষে আলোর ধারে। এয়ার-অফিস। বৃত্তান্ত জানা যাচ্ছে এবার। কাজাকিস্তানে স্তেপ-অঞ্চলের মধ্যে নেমে পড়েছি, জায়গাটার নাম জুশালি! এ জায়গা ম্যাপে খুঁজে পাওয়া দুর্ঘট। এয়ারফিল্ডও তেমনি — দিগ্‌ব্যাপ্ত পোড়ো মাঠের মধ্যে গোটা চার-পাঁচ বাড়ি বানিয়ে রেখেছে। এক লহমা ঐ যে আলোর সারি দেখলেন — ডিজেলে চালিত বিদ্যুৎ-বানানোর কল আছে। প্লেন আসছে খবর হলে আলো জালিয়ে দিয়ে পথ দেখায়; নেমে পড়লে নিবিয়ে দেয় তাড়াতাড়ি। এখনকার এ আলোগুলো কেরোসিনের। হিসাবি গৃহস্থের মতো, তিলেকের অপব্যয় ধাতে সয় না। লড়াইয়ের সময়টা হাস-পাতাল বানিয়েছিল এখানে, প্লেন ওঠানামার ব্যবস্থা করেছিল কাজ চালানো

গোছের। হাসপাতাল চালু নেই— এয়ারফিল্ড রেখেছে দায়ে-বেদায়ে যদি কাজে আসে। যেমন এই আজকে। ঘোরতর কুয়াশা— তার মধ্যে উড়তে সাহস করল না। বিষম সাবধানি এরা— বিপদের ভয় থাকলে প্লেন ভুঁয়ে নামিয়ে ফেলবে (জরুরি অবস্থায় অবশ্য আলাদা কথা)। সেজন্যে, দেখুন, আকাশক্ষেত্রে প্লেনের মহা-মহোৎসব— কিন্তু দুর্ঘটনা প্রায় নেই। কুয়াশা দেখে ওরা শ-দেড়েক মাইল উল্টো এসে বিচার-বিবেচনা করে এইখানে এনে নামাল।

রাত তিনটেয় রওনা হয়েছি। পাকা তিন ঘন্টা চলে এসে এয়ার-অফিসের ঘড়িতে দেখছি চারটা। অঙ্কটা বুঝলেন তো— তিন আর তিনে চার। অতএব ঘন্টা আড়াই রাত এখনো বাকি। নেমে যখন পড়া গেছে, প্রাতরাশ এখানে। রওনা হতে অতএব সেই আটটা।

ছোট্ট অফিস-ঘর। ঘর বেশ গরম করে রেখেছে। শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে আপাতত ষোলজন আমরা হাজির এই ঘরটুকুর ভিতর। ঘেঁসাঘেঁসি দাঁড়াবার ঠাঁই হয়েছে। কী মতলব, ওরে বাবা! দাঁড়িয়েই থাকতে হবে নাকি চার-চার ঘন্টা?

মীরা বলল, ঘুমিয়ে থাকতে হবে। স্প্রীংয়ের খাট ও গদি-তোশকের উপরে লেপ-কম্বল মুড়ি দিয়ে। নয়তো এত জায়গা থাকতে এইখানে এসে পড়লাম কেন?

বলো কি হে! তেপান্তরের মাঠে এতগুলো খাট-বিছানা জুটিয়েছ?

আমাদের এই ক-জনের শুধু নয়— পিছনের প্লেনে যাঁরা আসছেন, তাঁদের জন্যেও।

চায়ের পিপাসা পেয়ে গেল কোন এক বাবুর। চাইলেই যখন এসে যায়, পিপাসার দোষ কি? কিন্তু এই রাত্রে এ-সময়টা সুবিধা হল না। এমনি তো প্লেনের চলাচল নেই— খানাপিনার ব্যবস্থা সকালের আগে হয়ে উঠবে না। দাঁতে দাঁত চেপে রাতটুকু কোন গতিকে পিপাসা সামলে থাকুন, উপায় কি তা ছাড়া?

পিছনের প্লেন এসে পড়ল। মাঠে নেমে আবার চলেছি শোওয়ার বাড়ির দিকে। আগে-পিছে লন্ঠন ধরে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সেই বাড়ি— যেখানটা মিলিটারি-হাসপাতাল ছিল। রোগি নেই, কিন্তু খাটবিছানাগুলো আছে। খান ষাটেক— অর্থাৎ প্রতিজনে আমরা এক খাটে মাথা এক খাটে পা রাখলেও কতকগুলো বাড়তি থেকে যাবে।

স্প্রীংয়ের খাট, ধবধবে তোশক-বালিশ, পরিচ্ছন্ন মোলায়েম কম্বল—

জুতোজামা খোলার সবুর সয় না, গড়িয়ে পড়ে আরামে চক্ষু বুঁজেছি। ঘরটা চার জনের — বিদেশ-বিভূঁয়ে মাঠের মধ্যে একা এক ঘরে থাকা ঠিক নয়। আলোটা চোখে লাগছে, হাত বাড়িয়ে আলোর জোর কমিয়ে নিবু-নিবু করে দিলাম।

ঘুমও এঁটে আসছে। হেন কালে দরজায় টোকা। আস্তে, খুব আস্তে। চোখ মেলেছি, কিন্তু সাড়া দিই না। ভেজানো দরজা একটুখানি খুলে গেল। করিডরের আলোর একফালি এসে পড়েছে। সেই আলোর উপরে লঘু পা ফেলে এক তরুণী সন্তর্পণে ঘরে ঢুকল। এদিক-ওদিক তাকায়, আমার মুখের উপর গভীর দৃষ্টি মেলে চেয়ে আছে। শীতের মধ্যেও গা ঘেমে উঠেছে। তারপর আমাকে ছেড়ে আর একজনের দিকে তাকাচ্ছে ঐ রকম। সেখানে সাড় মিলল না তো সরে গেল পরের জনের দিকে। সর্বনাশ, রাত্রিশেষে পুরুষমানুষদের ঘরে কি মতলবে ঢুকেছে ফুটফুটে মেয়েটা ?

আন্দাজ করুন তো কেন ? ক্ষণপরে গ্লোকোভ ঢুকে পড়ে আলো বাড়িয়ে দিল। আঙুল দিয়ে দেখায় প্রিন্সিপ্যাল দোণ্ডের খাটের দিকে। তখন মালুম হল। যা ভেবেছিলাম, সে-সব কিছু নয় — মেয়েটা হল ডাক্তার। প্রিন্সিপ্যালের গলায় বিচি উঠেছে, ঠাণ্ডা লেগে টনসিলে ব্যথা হয়েছে। কিছু খানটান নি সন্ধ্যা থেকে। রওনা হবার মুখে ওরা টের পেয়েছে। তখন সময় ছিল না, বাগে পেয়ে এবারে ডাক্তার নিয়ে হাজির। রাতটুকুও পোহাতে দিল না।

কত রকমে দেখল প্রিন্সিপ্যালের গলা — দেখেশুনে চলে যায়। বাঁচা গেল রে বাবা! তাই কি অত সহজে ছাড়বে ? অষুধ ও যন্ত্রপাতি নিয়ে পুনশ্চ এসেছে। স্টেপটোমাইসিন ও পেনিসিলিন জাতীয় কি কি খেতে দিল, শুঁকতে দিল। ডিস্পেনসারি এই বাড়িতেই -- সাধ মিটিয়ে ডাক্তারি করার বাধা নেই। জোরালো আলোয় ঘুম ভেঙে গিয়ে উসখুস করছি সকলে। ভালমানুষ প্রিন্সিপ্যালের লজ্জার অবধি নেই। বারম্বার বলেন, আপনাদের কষ্ট হচ্ছে -- কিন্তু আমার কোন হাত নেই। সামান্য একটু ব্যাপার — তা এরা মহা-মহোৎসব জমিয়ে তুলল, আমি তার কি করব ?

তাই দেখা গেল, রোগী না থাক, মাঠের মধ্যে ডাক্তার-নার্সেরা আছে কিন্তু। এরোড্রোমের নিয়ম এটা। যে তল্লাটে যখন নামুন, অফিসে ঢোকবার মুখে দেখতে পাবেন একটা-দুটো মেয়ে সতৃষ্ণ চোখে দেখছে আপনার দিকে। আপনার রূপমাধুরী দেখছে না -- আঘাত আছে কি না অঙ্গে, নিশ্বাস ঘন হচ্ছে কি না, বমিটমি করে কাহিল হয়েছেন কিনা — এই সমস্ত দেখছে ঠাহর করে। তা আমরাও স্বদেশের তেলে-জলে পুষ্ট এক-একখানা ইস্পাতের শরীর নিয়ে গেছি। মেয়েগুলো নিশ্বাস ফেলে নিষ্কর্মা হয়ে আবার নিজ নিজ টেবিলে বসে পড়ে।

অখ্যাত অজ্ঞাত জুসালির মাঠের রোদ কাচের জানলা দিয়ে আমার বিছানায় পড়েছে, তখন ঘুম ভাঙল। আর দেরি নয়, রওনা এবারে। মুখ-ধোওয়ার জল পাওয়া গেল বটে, কিন্তু অন্যান্য ব্যাপার? একজনে সন্ধান দিলেন -- পিছন দিকে মাঠের মধ্যে কয়েকটা বালখিল্য ঘর দেখা যাচ্ছে, বাকি প্রাতঃ-কৃত্যের ব্যবস্থা ঐদিকে হওয়া সম্ভব। তাই বটে। কিন্তু নজর করা গেল, ঘরের সঙ্কীর্ণতায় স্থানীয় লোকের মন ওঠে না -- পিছনের বিমুক্ত মাঠের উপর নানা পরিচয়-চিহ্ন। দিনের আলোয় ভাল করে দেখছি — এদিকে তেপান্তর মরুভূমি, ওদিকটায় ফসল ফলাতে শুরু করেছে। মরু-বিজয় করতে করতে এগুচ্ছে — তারই অগ্রকেতন যত্ন-লালিত ক্যাকটাস ও রকমারি কাঁটাগাছ।

গরম কোকো ও উৎকৃষ্ট বিস্কুটের ব্যবস্থা করেছে। শীতার্ত সকালে আহা-মরি লাগল। প্লেন কেমন সহজে ওঠায় নামায় এরা, এয়ারফিল্ডে এক হাত পরিমাণ কংক্রিটও নেই। মরুপ্রায় ভূমির খানিকটা বালি সাফসাফাই করে নিয়েছে। ওরই উপর দিয়ে ছুটতে ছুটতে দিব্যি উপরে উঠে গেলাম। যাচ্ছি আস্কবিনস্কে -- বড় বিমানঘাঁটি, দুপুরের লাঞ্চ সেখানে।

আরল-হ্রদের পূর্বতীর দিয়ে যাচ্ছি। অনেকক্ষণ ধরে চলল। আস্কবিনস্ক আর একবার দেখেছেন আপনারা। আজকে দেখি, আলাদা চেহারা। জল জমে চতুর্দিকে পায়ের পাতা ডুবে যাওয়ার মতন কাদা হয়েছে। ভুঁয়ে নেমে সেই কাদাজল ছিটকাতে ছিটকাতে প্লেন চলল। গরুর গাড়ির চেয়ে প্লেনের যে বেশি আভিজাত্য, এমন মনে হয় না। সেদিন এখানে এসেছিলাম, তখন ঝিরঝিরে বৃষ্টি। আজ প্রসন্ন রোদ। ওভারকোট প্লেনে রেখে নেমে পড়েছি। ঘরে যাব কি -- নানান গাছে ভরা উঠানে ঘুরে ঘুরে রোদ পোহাচ্ছি সকলে। রেলস্টেশন কাছাকাছি কোথাও, ইঞ্জিনের আওয়াজ আসে।

ঘন্টা দেড়েক পরে পুনশ্চ রওনা হবার মুখে শোনা গেল, আমাদের প্লেন আগে এসেছে বটে কিন্তু ছাড়বে পিছনে। কি বৃত্তান্ত? না, দোণ্ডেকে নিয়ে পড়েছে আবার — নামবার সঙ্গে সঙ্গে এরোড্রোমের হাসপাতালে নিয়ে পুরেছে ; বিছানায় শুইয়ে আলো ফেলে নানান কায়দায় পরীক্ষা করছে। পেনিসিলিন ফোঁড়াফুড়ি করছে মনের সুখে। ওঁরই জন্যে আটকা পড়ে গেলাম আমরা। দোণ্ডে মশায়ের লজ্জার অবধি নেই। কাতর হয়ে বলছেন, কী ঝকমারি বলুন তো! এটুকু ব্যাপারে আমাদের দেশে ডাক্তাররা তাকিয়েই দেখত না। এত যত্ন অসহ্য লাগে।

প্লেন উড়ল আবার মস্কোমুখো। মধ্য-এশিয়ায় ঘোরাঘুরি এত দিনে সারা। বলল, পাঁচ ঘন্টা লাগবে আবহাওয়া যদি ভাল থাকে। মস্কোর পথ সেদিন

কুয়াসায় আচ্ছন্ন ছিল; আজ রোদে হাসছে। বিস্তীর্ণ জলধারার উপর এসে হোস্টেস দেখিয়ে দেয় — ভলগা, ভলগা! ক্ষুদে ক্ষুদে হলেও জাহাজ বেশ বুঝতে পারছি। তারপরে যত এগোই, আকাশ অন্ধকার হয়ে আসে। পুরোপুরি কুয়াসার মধ্যে এবার। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ধোঁয়ায় নিশ্চিহ্ন, তার মধ্যে বাতাসে ভাসছি ক'টি প্রাণী আমরা। প্লেন বড্ড দুলছে। আমার এ পুঁথির বেশির ভাগ খসড়া প্লেনে বসে বসে। তখন কাজকর্ম থাকে না, ছুটোছুটি নেই, অচ্ছিন্ন অবসরে ছড়ানো মনকে গুটিয়ে নিয়ে আসা যায়। কিন্তু নাগরদোলার মতো এমন দুলতে লাগলে লেখা যাবে কেমন করে? এই হুহু করে নিচে নামছে, আবার সাঁ করে উঠে যাচ্ছে উপরে — খেলাচ্ছে মানুষগুলো নিয়ে। দিক্‌চিহ্ন-হীন কুয়াশার উত্তাল সমুদ্রে অসহায় মনে হচ্ছে আজ নিজেদের।

হোটেল মেট্রোপোলের সেই আগের কামরাই দখল করেছি। আজ সকালে তলস্তয়-মিউজিয়াম। সেখান থেকে তারপর তলস্তয়ের বাড়ি। শীত কমে গেছে হঠাৎ, আবহাওয়া উষ্ণ হয়ে উঠেছে। ওঁরা অবাক হয়ে গেছেন — কী আশ্চর্য, অন্য বছর বরফ পড়ে এ সময়! দেমাক করে বলি, এবারে পড়বে না ; ভালবাসার উষ্ণতা নিয়ে এসেছি আমরা ভারত থেকে। তোমাদের দেশ ছেড়ে চলে যাবার পর তখন বরফ পড়বে।

যেখানে আছি, শহরের কেন্দ্রদেশ এটা। বড় বড় বাড়ি, প্রশস্ত রাস্তা, বিশাল স্কোয়ার। কিন্তু আগে টের পাইনি, খুব কাছাকাছি পুরানো শহরও আছে এই সব বড়-রাস্তা পিছন করে। সেই পাড়ার মধ্যে ঢুকে পড়লাম। একটা ছোট পুরানো ধাঁচের বাড়ির সামনে গাড়ি থামল। ঘরগুলো ছোট ছোট। প্রতি ঘরের ছাত ভিতর থেকে কতকটা গম্বুজের মতো। তাতে বিচিত্র কারুকর্ম। ১৮৭০ অব্দের বাড়ি।

ঢুকেই সকলের আগে ব্রোঞ্জে-গড়া তলস্তয়ের আধা-মূর্তি। মূর্তি আদবেই বলা চলে না, খানিকটা আদল। কতকগুলো রেখা ছড়িয়ে রয়েছে এবড়োথেবড়ো একতাল ধাতুর উপর। গত বছর উৎসবের সময় এই বস্তু বসানো হয়েছে — অ্যানিসিমভ চীনে আমাদের যে উৎসবের নিমন্ত্রণের আশ্বাস দিয়েছিলেন। পৃথিবীর সর্ব ভাষায় তলস্তয়ের বইয়ের অনুবাদ হয়েছে, একটা ঘরে সেই সমস্ত সাজানো। সংগ্রহে বাংলা বই একখানা মাত্র — আনা কারেনিনা। কিন্তু আমারই জানা তো বিস্তর অনুবাদ — কুড়ির কাছাকাছি হবে। আধা-বয়সি মেয়েটা ঘুরে ঘুরে দেখাচ্ছিলেন — তিনি বললেন, আর কেউ তো পাঠান নি কোন বই, পাঠালে আমরা সংগ্রহে যত্ন করে রেখে দেব। ভরসা দিয়ে এলাম, দেশে ফিরে বলব পাঠিয়ে দেবার জন্য (এবং যথারীতি ভুলে গেলাম পরক্ষণে)।

বিপ্লবের পরে নতুন আমলে এই মিউজিয়ামের প্রতিষ্ঠা। লেনিন বলেছিলেন,

তলস্তয় হলেন রুশ-বিপ্লবের মুকুর। তলস্তয় সম্বন্ধে লেনিনের হাতে-লেখা মূল পাণ্ডুলিপি কিছু কিছু রয়েছে কাচের ডেস্কে। তলস্তয় সম্পর্কে লেনিনের বইয়ের সংগ্রহও আছে।

এক ঘরে তলস্তয়ের ঠাকুরদাদা ও দাদামশায়ের, এবং তাঁর পৈতৃক বাড়ির ছবি। সেই পৈতৃক বাড়ির চিহ্ন নেই, বিক্রি করেছিলেন সেবাস্টোপোল গল্পের বই প্রকাশের প্রয়োজনে। তলস্তয়ের বাপ সেনাদলে ঢুকে নেপোলিয়নের আক্র-মণের বিরুদ্ধে লড়েছিলেন। তলস্তয়ের মা'র ছবি পাওয়া যায় না -- কুমারী বয়সের একটা সিলোট-ছবি মাত্র জোগাড় হয়েছে। কতকগুলো পুরানো কৌটা -- তাতে তাঁর পূর্বপুরুষদের ছবি। কাজান-বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তেন, তখনকার ছবি। এক অজ্ঞাত সহপাঠি সেই সময়ে তাঁর ছবি এঁকেছিল, সেটা জোগাড় করে রেখেছে। ছোট বয়সে একখানা ক্ষুদে-তলোয়ার ইস্কুলের পারিতোষিক পেয়েছিলেন ; ছাত্র অবস্থায়ও লিখতেন, নিজের হাতের সেই সব পাণ্ডুলিপি, পাণ্ডুলিপির উপরে ছবিও আঁকতেন আবার ; একটা ছোট পত্রিকায় প্রথম যে গল্প বেরিয়েছিল; সাজিয়ে-গুছিয়ে সমস্ত রেখে দিয়েছে।

সিবাস্টেটাপোল-লড়াইয়ের পর সেন্টপিটার্সবার্গে গেলেন তিনি। সাহিত্য-কর্ম শুরু করলেন। নানান জায়গা থেকে অজস্র উৎসাহ আসছে। যে কাগজগুলোয় লেখা বেরুত, তাদের সম্পাদকবর্গের মিলিত ছবি। তলস্তয় দেশ ছেড়ে বেরুলেন, তার পাশপোর্ট।

ফিরে এসে চাষীদের ইস্কুল বসালেন -- সেই ইস্কুলের ছবি। তাদের গণিত শেখাতেন কতকগুলো কাঠের ঘুঁটি লোহার তারে গেঁথে। এই চাষীদের নিয়ে কবিতা লিখেছিলেন। শিক্ষা নিয়েও বিস্তর লেখেন এই সময়। সমস্ত পাণ্ডুলিপি রয়েছে।

ককেশাস অঞ্চলে গেলেন। সেখানকার ছবি। তাঁর স্ত্রী সোফিয়ার নয়নাভিরাম এক ছবি। 'ওয়ার এণ্ড পীস' যেখান থেকে লেখা হয়, সেই তল্লাটের ছবি। এ ঘরে আরও বিস্তর ছবি রয়েছে নামজাদা আর্টিস্টদের আঁকা। নেপোলিয়নের আক্রমণের সময়কার -- মানুষ দলে দলে মস্কো ছেড়ে পালাচ্ছে, পথের উপরে তাদের বিপন্ন অবস্থা। উপন্যাসে অনেক সত্যি মানুষের নাম দেওয়া হয়েছিল -- তাদেরও অনেক ছবি।

পাণ্ডুলিপি দেখতে মজা লাগে -- কী কাটাকুটি রে বাবা! আমাদের কাপি দেখে ছাপাখানার বন্ধুরা বেজার হন, তলস্তয়ের হলে কি করতেন বলুন দিকি আপনারা ? 'ওয়ার অ্যাণ্ড পীস' উপন্যাসের রসদ নিজচোখে দেখে সংগ্রহ করবার মানসে একবার ফ্রন্টে চলে গিয়েছিলেন ; তার ছবি। প্রুফে বিস্তর কাটকুট করতেন,

সোবিয়েতে প্রথম আজ শাল-পাঞ্জাবি চাপিয়ে বাঙালি পোশাকে হাজির হয়েছি (পৃ. ১৫৪)

চাষীদের গাঁ-ঘর। উঠানের প্রান্তে আঙুরের মাচা (পৃ. ১৫২)

কম্পোজ-করা পাতার পর পাতা বাতিল করে দিতেন — সেই সমস্ত কাটা-প্রুফের গাদা। মাসিক পত্রে ধারাবাহিক ভাবে 'রিসারেকশন' বেরিয়েছিল, সেই মাসিকের সংখ্যাগুলো। আশি বছর বয়সে এক আর্টিস্ট বন্ধুর আঁকা প্রতিকৃতি। তলস্তয়ের মৃত্যুশয্যা, ও মৃত্যুর পরের ছবি। মৃত্যুর পর মুখের যে ছাঁচ তুলে নিয়েছিল। যে সব বন্ধু হামেশাই যাতায়াত করতেন, তাঁদের সকলের ছবি। যেখানে মারা যান, সেই বাড়ির পুরো মডেল।

চারিদিকে কুয়াশা, আকাশে মেঘ। কনকনে হাওয়া দিয়েছে, পশমের মোটা জামা ও দেহচর্ম ভেদ করে হাড়ের মধ্যে কাঁপুনি ধরে যায়। তা হোক — হাতে সময় কম, ক'টা দিন মস্কোয় থেকে লেনিনগ্রাডমুখো বেরিয়ে পড়ছি। তাড়াতাড়ি যত কিছু দেখে যাওয়া যায়।

তলস্তয় মিউজিয়াম থেকে তখনই ছুটলাম তলস্তয়ের বাড়ি। পল্লীবাস নয়, মস্কো শহরে যে বাড়িটায় থাকতেন। কী যত্নে রেখেছে — দেবমন্দিরও লোকে অমন করে রাখে না।

জুতোয় যে পথের ধুলো নিয়ে ঢুকবেন, সে হবে না। এদেশ হলে জুতো খুলতে বলত। ওখানে শীতের দেশ ও সাহেবি পোশাক বলে জুতো খোলা চলে না — কাপড়ের জুতো দিচ্ছে, আপনার জুতোর উপরে সেইটা পরে ফিতে এঁটে ঢুকুন। অর্থাৎ জুতোর ময়লা ঐ কাপড়ের জুতোর ভিতরেই থেকে যাচ্ছে।

এক বৃদ্ধা ঘুরে ঘুরে আমাদের দেখাচ্ছেন। আশি বছরের উপর বয়স — ধবধবে চুল, গায়ের রং পরনের কাপড়চোপড় সাদা ধবধবে। পুণ্য পবিত্র। তাঁকে ধকল দিতে চাইনে — অন্য লোক যারা আছে, তারা আসুক। তিনি এই বয়সে এঘর-ওঘর উপর-নিচে করবেন কেন আমাদের সঙ্গে সঙ্গে? কিন্তু মানা শুনবেন না তিনি। তলস্তয়ের জীবন-কাল থেকে আছেন, কত ব্যাপার স্বচক্ষে দেখা! বিদেশের মানুষগুলোকে দেখিয়ে বুঝিয়ে আনন্দ পাচ্ছেন।

ছোট ছেলে মারা গিয়েছিল, বাচ্চার সেই খেলনাগুলো অবধি সাজানো আছে। তলস্তয়ের দু-ফোঁটা চোখের জলও জমে আছে নাকি পরিপাটি রূপে এই খেলনা সাজানোর মধ্যে?

ভীষণ হাঁটতে পারতেন তলস্তয়। গ্রামের বাড়ি পায়ে হেঁটে চলে যেতেন এখান থেকে। বৃদ্ধা সেকালের সেই ছবিটা দিচ্ছেন — হাঁটবার সময় সামনের দিকে ঝুঁকে তীরবেগে ছুটতেন তিনি। গোর্কি আসতেন এই বাড়িতে — এসে চুপচাপ কথা শুনতেন ঐ জায়গাটায় বসে।

বড় পুরানো বাড়ি, ১৮০৮ অব্দে তৈরি। ১৮৮২ অব্দে তলস্তয় এখানে

এসে উঠলেন। বাড়িটা সেই সময় আগাগোড়া মেরামত হয়। দোতলার ঘরগুলো ছোট ছোট আর বড্ড নিচু -- দেয়াল ভেঙে ঘর বড় করলেন, ছাত ভেঙে উঁচু করে তুললেন। খুব সরল সাধারণ জীবন যাপন করতেন তিনি — বড়ঘরের লোক তা বুঝবার জো ছিল না। সকালবেলা উঠে নিজ হাতে ঘরবাড়ি সাফ করতেন, সন্ধ্যাবেলা কাপড়চোপড় গুছিয়ে রাখতেন। লেখাপড়া করতেন বেলা ন'টা থেকে বিকাল চারটা অবধি। সাতটা থেকে বন্ধুবান্ধব ও অনুরাগীদের আনাগোনা চলত। লিখবার ঘরে নিচু চেয়ার, দু-পাশে বাতিদান, দোয়াত-কলম, যে জুতোজোড়া পরতেন ঘরের মধ্যে। এ সব তো ভালই — মুশকিল ছিল গিন্নিকে নিয়ে। বড়ঘরের ঘরণী তিনি, আদর্শবাদ ইত্যাদি বেশি আমল দিতে চাইতেন না। তাঁর ঘর দেখলাম -- ঘর দেখেই কর্তা-গিন্নির মনের ফারাক বুঝতে পারা যায়। বড় দুই ছেলের ঘর দেখছি -- কেরোসিনের আলো, খাট-চেয়ার, রকমারি খেলার সরঞ্জাম। শীত আর বসন্তকালটা তলস্তয় এই বাড়ি থাকতেন। ছেলেদের ছুটি হয়ে গেলে গাঁয়ে চলে যেতেন।

১৯০১ অব্দে ছেড়ে যান এই বাড়ি। তারপরে ১৯০৯ অব্দে মাত্র দুই রাত্রি থেকে গিয়েছিলেন। বলতেন, মস্কোয় লোকে যে কী করে থাকে বুঝতে পারিনে। সেই অশীতিপর বৃদ্ধা বলছেন আমাদের -- তাঁর সঙ্গেও তলস্তয়ের কত কথাবার্তা! বলছেন, আর পুরানো স্মৃতিতে কোটরগত চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে উঠছে।

বললেন, আপনারা কিছু লিখে দিয়ে যান -- বিশেষ করে আপনি পিশাতিয়েল যখন, তলস্তয়ের স্বগোত্র। ভিজিট বুকে দেশবিদেশের অনেকে লিখে গেছেন। আমি বাংলায় লিখলাম। অনেক দূরের তীর্থযাত্রায় এসে বিনত শ্রদ্ধাঞ্জলি দিচ্ছি -- এমনি গোছের কিছু। পাশে ইংরেজি করে দিলাম বাইরের লোকে যাতে বোঝে।

ডিনারের পরে দেখি, 'আওয়ারা' পালা হচ্ছে হোটেলের টেলিভিশনে। আওয়ারা নিয়ে বিষম মাতামাতি — অন্য সমস্ত প্রোগ্রাম বাতিল করে এই পালা দেখানো হয়। অনেক লোকে তিন-চার বার দেখেছে (যেমন, আমাদের দো-ভাষিণী ইরা), তার পরেও আবার টেলিভিশনে দেখতে চায়। গুটি পাঁচেক বাচচা এসে জুটেছে - হোটেলেরই কোন কোন ঘরের তারা -- টেলিভিশন দেখবে কি, আমাদেরই মুখ দেখে দেখে সাধ মেটে না যেন। বড়রাও তাকান অমনি -- তাঁরা রেখেঢেকে শিষ্টাচারসম্মত পদ্ধতিতে। বাচচারা অত শত বোঝে না, ফ্যালফ্যাল করে সোজাসুজি তাকিয়ে সুন্দর মানুষ দেখে। আজ্ঞে

হ্যাঁ, বললে বিশ্বাস করবেন না — আমরা অতি সুন্দর এখানকার চোখে। কন্দর্পকে রূপে ছাড়িয়ে যাই। দেহবর্ণ নিয়ে হেনস্থা নেই। বরঞ্চ কালোরই কদর। তার উপর ভারতীয় হওয়ায় সোনায় সোহাগা হয়েছে। ভারতীয়দের সাত খুন মাপ। বিনয়ের স্ত্রী জয়া দেবী বললেন, শাড়ি পরে বেড়ানোয় আমাদের বড় সুবিধা — ট্রামে-বাসে পথে-বাজারে সর্বত্র খাতির। পাড়াগাঁয়ের গৃহস্থবাড়ির একটা চেহারা পেলাম জয়া দেবীর মুখে। জারিতসিন গাঁয়ে ওঁদের এক বন্ধু আছে — এক রবিবার গিয়েছিলেন সেখানে। বুড়ি মা, ছেলে, ছেলের বউ আর গোটা দুই বাচ্চা। ছেলে আর ছেলের বউ চাকরিবাকরি করে, বাচ্চা দুটো ঠাকুরমা-র ন্যাওটা। বউ-ছেলে কম্যুনিস্ট — নতুন কালের ধরন-ধারণ তাদের। বুড়ি ওদিকে ছোট এক ঘরে আইকন রেখেছেন, পুজোআচ্চা করেন। বন্ধুটি প্রীতি ও প্রশ্রয়ের হাসি হেসে বলে, মা'র পুজোর ঘর— অনাচারী আমরা ওদিকে যাব না। যে-বস্তু এদেশের নব্যদের বাড়িতেও হামেশাই দেখে থাকেন — টেবিলে মুর্গি খেয়ে সেই কাপড়চোপড়ে মায়ের ঠাকুরঘরে যাইনে যেমন আমরা। তাই দেখি, সাধারণ মানুষের জীবন-ধারা মোটামুটি এক — শিক্ষা ও নতুন ব্যবস্থা পরিবর্তনটা কিছু ক্ষিপ্র করে, এই মাত্র। বহু লোকই ওদেশে রাজনীতির ধার ধারে না — কম্যুনিস্ট সকলকে হতে হবে, তার কোন মানে নেই।

বাচ্চাদের এক ইস্কুল। ঠিক শহরে নয় — মস্কোর বাইরে শহরতলীতে। ১৯২৭ অব্দে প্রতিষ্ঠা। বাড়িটা আরও পুরানো — প্রাক-বিপ্লব আমলের। আগে শুধুই ছেলেরা পড়ত; এই সেপ্টেম্বর অর্থাৎ মাস দুই আগে থেকে মেয়েদেরও নিচ্ছে। হাই-ইস্কুল, দশম শ্রেণী অবধি। শিক্ষক পঞ্চান্ন জন; ছাত্রছাত্রী হাজারের বেশি। পুরুষ শিক্ষক এগারো জন, বাদ বাকি মেয়ে। সবাই ট্রেনিং নিয়ে এসেছেন। চল্লিশ বছর ধরে পড়াচ্ছেন এমন শিক্ষক আছেন; আবার এমনও আছেন যাঁদের অভিজ্ঞতা মাত্র দু-মাসের।

ডিরেক্টর মশায় ভারিক্কি মানুষ — পাকা চুল, পাকা গোঁফ, বুকের উপর মেডেল ঝুলছে। পথ দেখিয়ে তিনি নিয়ে চললেন। সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে লম্বা করিডর পার হয়ে যাচ্ছি। দেয়ালের মাথা জুড়ে শিক্ষানেতাদের ছবি। সিঁড়ির মুখে যথারীতি আবক্ষ লেনিন ও স্ট্যালিন।

শিক্ষক কয়েকজনের সঙ্গে কথাবার্তা হল। যৌথ-চেষ্টায় বিশ্বাসী তাঁরা — ছেলেপুলে মিলেমিশে কাজ করবে, সেই শিক্ষা সকলের আগে। ভাল ল্যাবরেটারি আছে; সিনেমা-ছবি দেখানোর যন্ত্র এবং শিক্ষা ব্যাপারে প্রয়োজনীয় আরও নানা রকমের যন্ত্রপাতি। ড্রইং শেখানোর এন্তার ব্যবস্থা। গানের ক্লাসও আছে। প্রত্যেক বিভাগের আলাদা লাইব্রেরি — ভূগোল-বিভাগে দু-হাজার বই; ইতিহাসে তিন হাজারের বেশি। অথচ মনে রাখবেন, এমন কিছু নামজাদা প্রতিষ্ঠান নয় — শহরতলীর ছোটখাট এক ইস্কুল।

পয়লা সেপ্টেম্বর থেকে ঢেলে-সাজা হয়েছে। নতুন পদ্ধতিতে শ্রমের দিকটায় জোর দেওয়া হচ্ছে — প্রথম থেকে দশম শ্রেণী অবধি কারিগরি পাঠ দেওয়া হয়। প্রথম শ্রেণীর ছেলেমেয়েরা কাগজ, কাদা ও প্লাস্টিসিন দিয়ে নানা জিনিস বানায়। দ্বিতীয় শ্রেণীতে কাঠের কাজ, তৃতীয় শ্রেণীতে ধাতুর কাজ। চতুর্থ শ্রেণীতে উঠে এই তিন শ্রেণীর যাবতীয় উপকরণ মিলিয়ে কাজ করবে। এমনি ধাপে ধাপে চলল। ট্রাক্টর রেল-ইঞ্জিন চালানো অবধি। দশম শ্রেণীতে
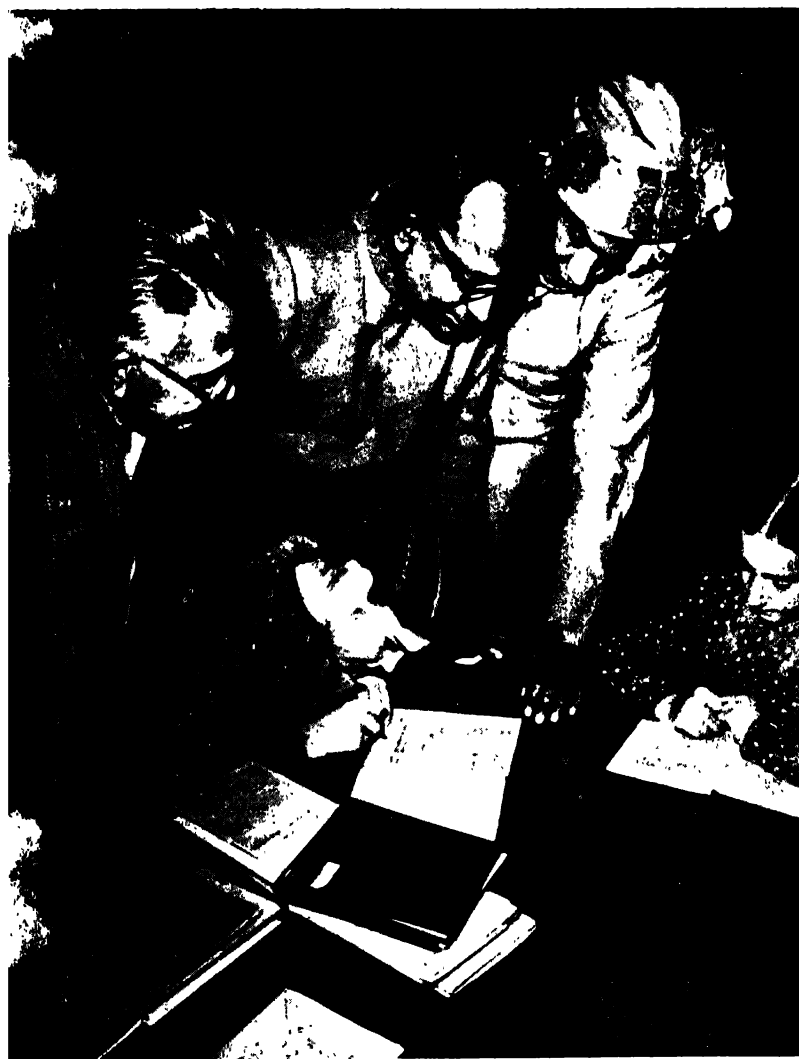
বাচ্চাদের এক ইস্কুল (পৃ. ১৭৬)

একটা কুকুর — লাল জিভ একবার মেলছে, মুখের ভিতর জিভ নিচ্ছে আবার (পৃ. ১৯৮)

ইলেকট্রিসিটি সম্পর্কে শেখায়। বিজ্ঞান ও কারিগরি সম্বন্ধে যা-কিছু ছেলেমেয়েরা বইয়ে পায়, সমস্ত হাতে-কলমে শেখানোর ব্যবস্থা আছে ইস্কুলে।

সেপ্টেম্বর থেকে মে অবধি শিক্ষার মরশুম। শীতের ছুটি ৩১ ডিসেম্বর থেকে ১৩ জানুয়ারি। বসন্তের ছুটি ২৫ মার্চ থেকে ৫ এপ্রিল। প্রথম-দ্বিতীয়-তৃতীয় শ্রেণীতে পরীক্ষার বালাই নেই, বাচচারা এমনি প্রোমোশন পায়। পরীক্ষা জুনের শেষাশেষি — এক মাস আগে প্রোগ্রাম দেওয়া হয়। দু-রকমের পরীক্ষা — লেখায় আর মুখে। পাঠ্য-বই সর্বত্র এক রকম। বিভিন্ন ভাষায় পাঠ্য-বইয়ের অনুবাদ হয় — যে গণতন্ত্রে যেটা মাতৃভাষা, সেখানে সেই ভাষার বই পড়ানো হয়। প্রোগ্রাম সর্বত্র এক, পরীক্ষা ঠিক একই সময়ে হয়। প্রত্যেক গণতন্ত্রে শিক্ষা-দপ্তর আছে, শিক্ষা-কমিশন আছে ; তাঁরা সেই গণতন্ত্রের শিক্ষা-নীতির নিয়ামক। প্রোমোশনের পর তিন মাস লম্বা ছুটি। ছাত্রদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কর্তারা ভারি সজাগ। প্রত্যেক ইস্কুলে আলাদা চিকিৎসা-কেন্দ্র, ডাক্তার, নার্স, শিশুদের জন্য বিশেষ হাসপাতাল। স্বাস্থ্যের কারণে যে ছেলের বাইরে যাবার দরকার, এই ছুটির মধ্যে তার ব্যবস্থা করা হয়। ইস্কুল থেকেও দল বেঁধে পাঠানো হয় শিক্ষা-অভিযানে।

লেনিন বলেছিলেন, শিক্ষকরাই দেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রতিষ্ঠা পাবেন। বিস্তর আইন হয়েছে শিক্ষকদের সুখ-সুবিধার জন্য। একটা আইন ১৯৪৮ অব্দের — দ্বিতীয়-বিশ্বযুদ্ধের পর যখন পুনর্বাসনের হিড়িক পড়ে গেছে। এই আইনে ইঞ্জিনিয়ারের সমান মাইনে পাবেন শিক্ষকরা। সর্বনিম্ন মাইনে আট-শ রুবল। এই যে ডিরেক্টর মশায় আমাদের ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছেন, ইনি পান ২৯00 রুবল। ডিরেক্টর আবার অঙ্কের মাস্টারও বটে। বারো ঘন্টা কাজ সপ্তাহে। এমনও আছেন — এ-ইস্কুলে দু-ঘন্টা ও-ইস্কুলে দু-ঘন্টা পড়ান ; মাইনে ৩৫00 রুবল। প্রথম থেকে চতুর্থ শ্রেণী যাঁরা পড়ান, তাঁদের খাটনি চার ঘন্টা দিনে ; পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণী যাঁরা পড়ান, তাঁদের তিন ঘন্টা। পাঁচ বছর কাজ হলে মাইনের উপর দশ পারসেন্ট বেশি পাবেন ; দশ বছর হলে কুড়ি পারসেন্ট। পঁচিশ বছরের বেশি কাজ হলে ত্রিশ পারসেন্ট বেশি মাইনে, তা ছাড়া পেনসন চল্লিশ পারসেন্ট পরিমাণ। পেনসনের টাকা কাজ করলে পাবেন, না করলেও পাবেন। পরীক্ষার খাতা দেখার জন্য বাড়তি পাওনা। যাঁরা ক্লাস-টিচার, তাঁরা ঐ বাবদ মাইনের উপর সাড়ে বারো পারসেন্ট অতিরিক্ত পান। কোন দিন যদি নিয়মিত তিন-চার ঘন্টার বেশি পড়াতে হয়, তার জন্যও টাকা পাবেন। মফস্বল হলে বিনা খরচে বাসস্থান, কয়লা ইত্যাদি। কোন শিক্ষক নিজ সংসারের জন্য যদি জমি চাষ করতে চান, সরকার জমির ট্যাক্স মাপ করে দেবে। প্রাইভেট

ট্যুইশানি করবার আইনত বাধা নেই, যদিও ছাত্রদের কদাচিৎ তার প্রয়োজন ঘটে। পাঁচ বছর অন্তর শিক্ষা-দপ্তরে কাজের রিপোর্ট যায়; দশ বছর ভাল কাজ হলে শিক্ষক সরকারি মেডেল পান। ত্রিশ বছরে অর্ডার-অব-লেনিন। আমাদের এই ডিরেক্টর মশায়ের তেতাল্লিশ বছর কাজ হয়েছে, অর্ডার-অব-লেনিন পেয়েছেন তিনি, সগর্বে সেই নিদর্শন জামায় সেঁটে রেখেছেন। এছাড়া গুণ বুঝে গণতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট প্রতি বছরের উৎসবে শিক্ষকদের উপাধি দান করেন।

রবিবারে ছুটি। মে দিবস (১ মে) ও বিপ্লব দিবসেও (৭ নবেম্বর) ইস্কুল বন্ধ থাকে। বড়দিনের ছুটি নেই। লেনিন-স্ট্যালিনের জন্ম ও মৃত্যুদিন আমরা স্মরণ করি, কিন্তু ইস্কুলের ছুটি নয়। পঁয়তাল্লিশ মিনিটে পিরিয়ড—নিচু তিন ক্লাসে চার পিরিয়ড করে হয় রোজ। চতুর্থ শ্রেণীর সপ্তাহে আরও দুটো পিরিয়ড বেশি। ছেলেমেয়ের একই রকম পাঠ্যসূচি। পরীক্ষা নেবার জন্য ডিরেক্টর মশায়ের তত্ত্বাবধানে কমিশন বসানো হয়, শিক্ষকরা তার মধ্যে থাকেন।

প্রথম শ্রেণীর ঘরে ঢুকলাম। সাত বছরের ফুটফুটে বাচচারা ধবধবে পোশাক পরে লেখাপড়া করছে। বেঞ্চিতে বসেছে দু-জন করে। বই নেড়েচেড়ে দেখি—ছবিই কেবল, লেখা যৎসামান্য। আমাদের একজন দেশ থেকে কিছু ছবি এনেছেন—ছেলেমেয়েদের দিয়ে দিলেন। তারাও পালটা ছবি দিল ভারতের অদেখা বাচচা-বন্ধুদের নাম করে।

ভূগোলের ঘর। ছবিতে ঠাসা—পাহাড়, অরণ্য, আমুদরিয়া নদী; বালুতে পাহাড় ক্ষয়ে গেছে—তার ছবি। এর মধ্যে স্ট্যালিন-লেনিনের ছবিও আছে। বড় বড় ম্যাপ টাঙানো, নানা রকমের গাছ টবে। সামুদ্রিক গাছপালা। সমুদ্রের তলদেশ—ছেলেরা বানিয়ে রেখেছে। তিন রকমের ফিল্ম প্রোজেক্টার। বিশাল ব্ল্যাকবোর্ডের পাশে পর্দা গোটানো থাকে, ফিল্ম দেখানোর সময় মেলে দেয়। আমাদেরও দেখাবে একটু। কালো পর্দায় চক্ষের পলকে জানলাগুলো ঢেকে দিল, সাদা পর্দায় ব্ল্যাকবোর্ড। নানান দেশের ছবি দেখছি। ভারতেরও। দুর্গম গিরিসঙ্কট, নানা প্রাকৃতিক দৃশ্য, জলসেচের হরেক ব্যবস্থা।

জীবতত্ত্বের ঘর। কঙ্কাল; কতরকমের মডেল। প্রাগৈতিহাসিক যুগের মডেল। পোকামাকড়; কত বিচিত্র ধরনের পাতা। পাশেই জীবন্ত প্রাণীর ঘর। রকমারি পাখি, খরগোস, মুরগি, রঙিন মাছ। সামান্য একটা ইস্কুলের জন্য কী বিপুল বিচিত্র আয়োজন।

এই একটা জায়গায় নয়, সারা সোবিয়েত দেশ জুড়ে এমনি ব্যাপার। শিক্ষার ব্যাপকতা দেখে তাজ্জব হতে হয়। পিছিয়ে-পড়া দেশগুলো সদ্য ঘুরে আসছি

— পঁচিশ-ত্রিশ বছর আগেও যেখানে শতকরা দেড়-জন দু-জনের মাত্র অক্ষর-পরিচয় ছিল। তা-ও সুর করে কোরানের সুরা পড়ত মাত্র। আর এখন যে তল্লাটেই গিয়েছি, নিরক্ষরতা একেবারে নেই। শিক্ষার প্রথম পর্বে মাতৃভাষা ছাড়া অন্য কিছু শিখতে হয় না। মাতৃভাষা যত দরিদ্রই হোক, রাষ্ট্রের কাছে তার সর্বোচ্চ সম্মান ; মাতৃভাষাকে তুলে ধরবার জন্য প্রত্যেকটি গণতন্ত্র এবং সোবিয়েত রাষ্ট্র সকল চেষ্টা করছে। কয়েকটি ভাষার লিপি পর্যন্ত ছিল না, সেখানে লিপির ব্যবস্থা হয়েছে। ভাষা দুর্বল বলে বিলুপ্তি ঘটানোর চেষ্টা হয় নি।

শিক্ষা মানে কয়েকটা পাশ করা নয় — শিক্ষার উদ্দেশ্য, ওরা বোঝে, জীবনকে পরিপূর্ণ করে গড়ে তোলা। আঁটোসাটো ক্লাসের ঘরে খানকয়েক বইয়ের মধ্যে নিমগ্ন থাকাই নয়। তিন স্তরের শিক্ষা। তিন বছর অবধি নার্সারি। তিন থেকে সাত কিণ্ডারগার্টেন। সাত থেকে সতের ইস্কুল। আজকে যার একটা দেখে এলাম।

লাখ লাখ ছেলেমেয়ে নার্সারিতে পড়ে। দুনিয়ার ছয় ভাগের এক হল সোবিয়েত দেশ — এই বিশাল দেশের সকল অঞ্চলে নার্সারি ছড়ানো। নার্সারির মধ্যে শিশু-কোরক ফুল হয়ে ওঠে। মা কাজকর্মে যাচ্ছে, নার্সারিতে বাচ্চা রেখে যায়। নার্সারি তা হলে হল দ্বিতীয়-মা। এই দ্বিতীয়-মা দিনের বেলা কাজের সময়ের ; আসল মা রাত্রে ঘুমানোর। দ্বিতীয়-মা দেখে, যাতে শরীর গড়ে ওঠে শিশুর, সে হাসিস্ফূর্তিতে থাকে। যা স্বভাবক্রমে শেখা যায়, তাই শুধু শেখায় নার্সারিতে। এখানেই শেষ নয় — নার্সারির কর্মীরা বাড়ি গিয়ে দেখে, বাচ্চা কেমন অবস্থায় থাকে। স্বাস্থ্য সম্বন্ধে উপদেশ দেয়, যথাযথ ব্যবস্থা করে আসে। এদেশের মা-জননীরা শিউরে উঠবেন — কনকনে হিম, বরফগুঁড়ি পড়ছে, তারই মধ্যে খোলা জায়গায় বাচ্চাদের রেখে দিয়েছে। একটু বড়রা — গোলাপফুলের মতো লাল — দেখতে পাবেন, মাটির উপর জাপটে বসে খেলাধুলায় মেতে আছে।

রঙের খেলা নার্সারিতে। ঘরের দেয়ালে নানা রং ; খেলনায় বিচিত্র রঙের বাহার। রং দেখতে দেখতে জীবনও রঙিন হয়ে ওঠে নাকি। যাকে আমরা বলি পড়ানো — নার্সারি-কর্মীরা সে বস্তু করে না কখনো। কথা বলে তারা শিশুদের সঙ্গে— গল্প করে, হাসায়। দু-একটা শিশু গম্ভীর মনমরা ছিল, দু-পাঁচ দিনে তারা হাসিস্ফূর্তি ছুটোছুটিতে মেতে ওঠে। গ্রীষ্মের সময়টা নার্সারিগুলো গাঁয়ে সরিয়ে নিয়ে যায়। জায়গা-বদলের ফলে বাচ্চারা স্বাস্থ্যে ভরে ওঠে।

তারপরে কিণ্ডারগার্টেন। সবাইকে এক ছাঁচে ফেলে শিক্ষাদান নয়। বয়স, মনের গঠন, স্বাভাবিক প্রবণতা — সকল দিক লক্ষ্য রাখা হয় প্রতিটি শিশুর। মানুষ তারা, এক প্যাটার্নের পুতুল নয়, স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব আছে তাদের — এই হল শিক্ষাপদ্ধতির গোড়ার কথা। পড়া হয়, এই স্তরে, দিনের মধ্যে কুড়ি থেকে চল্লিশ মিনিট। চল্লিশের বেশি কখনো নয়। গ্রীষ্মের সময় শিশুদের গ্রামে নিয়ে যায়। সেখানে মাটি গাছপালা পাখি ও জীবজন্তুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়। প্রত্যেক নার্সারি ও কিণ্ডারগার্টেন-প্রতিষ্ঠানে অভিভাবকের কমিটি আছে — তাঁরা এসে দেখাশুনা করেন, উপদেশাদি দেন।

এর পরে ইস্কুল। ইস্কুলের নাম নেই, শুধু নম্বর দিয়ে পরিচয়। অর্থাৎ সবই এক ধাঁচের। আমি বেশি মাইনে দেব, আমার ছেলেপেলে ভাল শিক্ষা পাবে -- এ রকম ব্যবস্থা হতে পারবে না। জায়গা হিসাব করে ইস্কুল — এই চৌহাদ্দির ভিতরের সব ছেলেমেয়ে অমুক নম্বর ইস্কুলে পড়বে। অভিভাবকের পদ-প্রতিষ্ঠা যে রকমই হোক, শিশুদের মধ্যে বাছবিচার নেই। চাকরানির ছেলে আর অধ্যাপিকার ছেলে এক সঙ্গে একই শিক্ষা পাচ্ছে। মাস্টার মশায়রা প্রতি বছর হিসাব নিয়ে দেখবেন, তাঁদের এলাকায় সাত বছরের উপর সব ছেলেমেয়ে ইস্কুলে আসছে কিনা। প্রতিটি শিশু ইস্কুলে আসবে — যদি না আসে, তার জন্য দায়ী হবেন শুধু অভি-ভাবক নয়, সেই এলাকার ইস্কুল-কর্তৃপক্ষও। সমস্ত সরকারি ইস্কুল, খরচপত্র সরকারের। ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্য অভিভাবকের এক পয়সা ব্যয় নেই। শিক্ষকেরা সকলেই ট্রেনিং-পাওয়া ; তার জন্য বিরাট ব্যবস্থা, বিপুল অর্থব্যয়। ধরে নেওয়া হয়েছে -- সাধারণ প্রত্যেকটি ছেলেমেয়ে মেধাসম্পন্ন। যাদের মেধা নেই, তাদের অসুস্থ বলে ধরা হয়। তাদের শিক্ষার জন্য পৃথক আয়োজন। কোন ছাত্র পিছিয়ে পড়লে তার দায়িত্ব ছাত্রের সঙ্গে শিক্ষকের উপরও পড়বে। অভিভাবকও দায়ী হবেন, কেন তিনি শিশু-মনে শিক্ষার আগ্রহ সঞ্চার করতে পারেন নি।

বিভিন্ন গণতন্ত্রের জীবনরীতির মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে ফারাক। এই সমস্ত বিচারবিবেচনা করে শিক্ষানীতি ঠিক করা হয়। বৈচিত্র্য স্বীকার করে নিয়েও সমগ্র সোবিয়েতে শিক্ষার কাঠামো এক — একই পদ্ধতির খানিকটা রকমফের। আঞ্চলিক ভাষায় পড়াশুনোর আরম্ভ -- চতুর্থ শ্রেণীতে উঠে রুশ-ভাষাটা শিখতে হবে। তার পরের বছর বিদেশি ভাষা শিখতে হবে একটা — ইংরেজি, ফরাসি বা জর্মন। পঞ্চম শ্রেণী থেকে শুরু করে ছাত্রদের বছরে তিরিশ ঘন্টা দিতে হবে বরফ-পরিষ্কার, পুরানো পাঠ্য-বই মেরামত, ইস্কুলের ইলেকট্রিক কাজকর্ম

ইত্যাদি হাতের খাটনির ব্যাপারে। পয়সা বাঁচানোর জন্য নয়, ছাত্র যাতে কোন কাজ হীন মনে না করে। ইস্কুলের মধ্যেই ছাত্র মানসিক শ্রমের সঙ্গে দৈহিক শ্রম করবে, নিজের কাজ যথাসম্ভব নিজে করবে -- এই অভিপ্রায়। রোমাঞ্চকর অপরাধমূলক বই ছেলেমেয়েদের পড়তে দেওয়া হয় না, সাধারণ সিনেমা-হাউসে ঢুকতে দেওয়া হয় না — ছোটদের জন্য বিস্তর সিনেমা-থিয়েটার আছে, দলে দলে তারা যায় সেখানে।

ইস্কুলের মধ্যেই বিভিন্ন বিশেষ শিক্ষণ-কেন্দ্র আছে, ছাত্রেরা তার কোন এক-টিতে যোগ দেয়। সাহিত্য, ভূগোল, ইতিহাস, অঙ্ক, প্রকৃতি-বিজ্ঞান, কারিগরি, নাটক, সঙ্গীত, ললিত-কলা, খেলাধুলা, দেহচর্চা ইত্যাদি। এমনি ব্যবস্থার ফলে সতের বছর বয়সে মাধ্যমিক শিক্ষা-সমাপ্তির সময় ছাত্র কোন এক বৃত্তি সম্পর্কে মন ঠিক করে ফেলেছে। এবং দশ বছরের চর্চার ফলে ঐ সম্পর্কে শিখেছেও অনেক কিছু।

রাত্রে সার্কাস দেখতে গিয়েছি। সোবিয়েতের ভুবনখ্যাত সার্কাস — যার কিছু নমুনা এই সেদিন এদেশে দেখিয়ে গেল। সার্কাসের ফাঁকে ফাঁকে ক্লাউনরা এসে দেশপ্রেম ও শান্তির কথা বলে যাচ্ছে। আমেরিকা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করছে খুব। নিজেদেরও ছাড়ে না। ক'টি ক্লাউন এলো একবার। একজনে বিস্তর রুবল জমিয়েছে — তাড়া তাড়া নোট বের করে বন্ধুদের দেখাচ্ছে। মোটর কিনবে। বন্ধুরা পিঠ চাপড়ে সাবাস দিল। খানিক পরে পুনশ্চ এই ক্লাউন-দলের আবির্ভাব। মোটর কেনবার মানুষটার গলায় নম্বর ঝোলানো — লাখের উপরের এক সংখ্যা। বন্ধুরা অভিনন্দন করছে, কিনে ফেলেছ তবে — এই বুঝি তোমার মোটরের নম্বর ? উঁহু, এটা হল কিউয়ের নম্বর। অর্থাৎ এর আগে আরও লক্ষাধিক লোক মোটরের জন্য নাম রেজেস্ট্রি করে বসে আছে। তাদের হয়ে গেলে তবে এই লোকের পালা। চাহিদা অনুযায়ী জিনিষ সরবরাহ হচ্ছে না, তাই নিয়ে ব্যঙ্গবিদ্রূপ।

পরদিন বিপ্লব-মিউজিয়ামে গেলাম। অপর নাম লেনিন-মিউজিয়াম — ১৯৩২ অব্দে প্রতিষ্ঠা। লেনিন-জীবনের আশ্চর্য নিদর্শনগুলো অধ্যায়ে অধ্যায়ে সাজিয়ে দিয়েছে। ভল্গাতীরের গাঁয়ে শিশুর জন্ম — সেই বাড়ির ছবি ও মডেল। বাবা মা পরিজনদের ছবি। বাড়িসুদ্ধ বিপ্লবী — বড় ভাইয়ের ফাঁসি হল জারের হত্যাচেষ্টার জন্য, তাঁর ছবি রয়েছে। ইস্কুলের পাঠ্য-বইগুলো ; সোনার মেডেল পেলেন ভাল পড়াশুনোর জন্য। কাজান য়ুনিভার্সিটিতে পড়বাব সময় স্ট্যালিনের সঙ্গে পরিচয় — সেখানে বিপ্লবচেষ্টা ও জেল। তারপরে নির্বাসন। ফেদাসিয়েভ প্রতিষ্ঠিত মার্কস-সোসাইটিতে যোগদান। পড়াশুনোয় বড় ভাল — টপাটপ পাশ করে যাচ্ছেন। পেট্রোগ্রাডে গুপ্ত মার্কস-সমিতির প্রতিষ্ঠা। সমিতিতে যে সব বই পড়া হত, তার পরিপূর্ণ সংগ্রহ। নিজে সেই সময় অনেক মার্কসীর বইয়ের তর্জমা করেছিলেন, তা-ও রয়েছে।

পিটার্সবার্গে কম্যুনিস্ট-দল গড়লেন তিনি, কর্মিকদের ইউনিয়নগুলো সম্মিলিত করলেন। তখনকার সহকর্মীদের ছবি।

পিটার্সবার্গ জেলে ১৯৩ নম্বরের কামরায় চোদ্দ মাস আটক রইলেন। এই কামরায় বসে তাঁর অনেক রচনা। দুধ দিয়ে লিখতেন আইনের বইয়ের লাইনের ফাঁকে ফাঁকে। আগুনে ধরে সেই লেখা পড়া হত। তার পরে তিন বছর সাইবেরিয়ার এক কুঁড়েঘরে নির্বাসন। রেল-লাইন আড়াই-শ মাইল সেখান থেকে। সেখানেও বিস্তর লিখলেন। যে টেবিল-চেয়ারে বসে লেখাপড়া করতেন, সাদামাঠা ভারী সেই আসবাবগুলো এনে রেখেছে।

প্রথম মার্কসীয় কাগজ বের করলেন—স্পার্কস। লেখায় লেখায় আগুন বেরুবে—সেজন্য এই নামকরণ। কাগজকে কেন্দ্র করে পার্টির কাজকর্ম চলল। লেনিনের বইও ছাপা হয়ে বেরুতে লাগল। বিপ্লবী লেনিনের নাম দেশবিদেশে ছড়িয়ে গেল।

পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসের যাবতীয় কাগজপত্র ও পাণ্ডুলিপি। দাবাখেলার টেবিল—তার তলায় চোরাগোপ্তা খোপ বানিয়ে সেখানে এই কাগজপত্র রাখা হত। পুলিশ অনেকবার এসে তন্নতন্ন করে খুঁজেছে। লেলিন তো দাবাখেলায় মগ্ন; সেই টেবিলের মধ্যে এমন বস্তু, বুঝবে তারা কেমন করে?

১৯০৫ অব্দ। বুভুক্ষু নরনারীর রক্তে জারের অঙ্গন একদিন রাঙা হয়ে গেল। সেই ভয়াবহ ছবি দেখুন মিউজিয়ামের দেয়ালে। বিপ্লব সারা দেশে ছড়িয়ে গেল। জারতন্ত্র উৎসন্নে যাক, জমিদারি ধ্বংস হোক—সর্বত্র এই বুলি। পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেস হল এই বছরের এপ্রিলে। একটা বাড়ির মডেল বানিয়ে রেখেছে—নেতারা নিরীহ ভালমানুষ হয়ে সেখানে বসবাস করেন; মাটির নিচে ছাপাখানা, দড়ি দিয়ে উঠানামা করতে হয়। আড়াই বছর একাদি-ক্রমে ছাপাখানার কাজকর্ম চলেছে, তারপরে পুলিশ ধরে ফেলে। ১৯০৩ অব্দে লেনিন যে বাক্স ব্যবহার করতেন, সেটা রয়েছে।

নানা জায়গায় সশস্ত্র অভ্যুত্থান। ব্যারিকেড দিয়ে পথ ঘিরেছে, তার ছবি কয়েকটা। দলাদলি; মেনশেভিকরা বিশ্বাসঘাতকতা করল। আয়োজন ব্যর্থ। অনেককে ধরে ফেলল। দু-জন কর্মীর সঙ্গে লেনিন ফিনল্যাণ্ডে পালিয়ে গেলেন। একটুও দমেন নি তিনি; বললেন, বৃহতের প্রস্তুতি।

১৯১২ অব্দে লেনিন প্রাগে তৃতীয় কংগ্রেস ডাকলেন। বিদ্রোহ—লেনা নদীর তীরে কর্মিকদের উপর গুলি করা হচ্ছে, তার ছবি। প্রাভদা কাগজ বেরুল কর্মিকদের টাকায়। অনেক নির্যাতন হয়েছে কাগজের উপর,

অনেকবার নাম পালটাতে হয়েছে। পোল্যাণ্ড থেকে লেনিন এই কাগজে লিখতেন। কর্মিকরা মহোৎসাহে প্রাভদা পড়ছে, তার ছবি।

প্রথম-মহাযুদ্ধ (১৯১৪) বাধল। লেনিন যুদ্ধের বিপক্ষে লিখতেন, বিপ্লবের স্বপক্ষে। লিখলেন, মরক্কো যদি ফ্রান্সের বিরুদ্ধে আর ভারত যদি ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়ে, আমরা তাদের সমর্থন করব।

১৯১৭। কৃষক-কর্মিক এক হয়েছে। এপ্রিল মাসে লেনিন পেট্রোগ্রাড ফিরলেন। রিপোর্ট দিলেন (এপ্রিল থিসিস)—স্বহস্তে লেখা তার কাপি। রেলস্টেশনে লেনিন বক্তৃতা করছেন (মে, ১৯১৭), সেই বিরাট ছবি। লেনিনের ওভারকোট, লাঠি; টিনের যে মগটা তিনি ব্যবহার করতেন। নানা রকম ছদ্মবেশ ধরতেন বহুরূপীর মতন, সেই সমস্ত ছবি। বিপ্লবে প্রধান নেতৃত্ব লেনিনের। বিজয়ের পর শান্তি-ঘোষণা —লাঙল যার, জমি তার—জমাজমির ষোল আনা মালিক চাষী। যে কলমে ঘোষণা লিখলেন, সেটা সযত্নে রেখেছে।

একতলা সেরে এবারে মিউজিয়ামের দোতলায় উঠছি। সমাজতান্ত্রিক নবরাষ্ট্রকে চারদিক থেকে পিষে মারতে চায়। দেশরক্ষার মহানেতা লেনিন। লেনিনের হত্যার ষড়যন্ত্র। মস্কোর কর্মিকদের মধ্যে বক্তৃতা করছেন, একটা মেয়ে চার বার গুলি করল। দুটো বিঁধল তার মধ্যে। কোট ফুটো হয়ে ঢুকেছিল, সেই কোট রাখা আছে। সর্বপ্রান্ত থেকে উদ্বেগ জানিয়ে হাজার হাজার চিঠি আর টেলিগ্রাম আসছে। তিন সপ্তাহ পরে লেনিন বিছানা ছেড়ে উঠলেন। ডাক্তারের সার্টিফিকেট—ভাল হয়ে গেছেন তিনি।

ক্রেমলিনে লেনিনের পড়ার ঘরের ছবি। বই আর বই। দেয়াল-জোড়া ম্যাপ। দুটো টেলিফোন। বাতিদান ও বাতি—বিদ্যুতের সরবরাহ তখন অত্যন্ত কম। বাইরের লোক এসে বসবে গদি-আঁটা চেয়ারে; নিজের জন্য বেতের চেয়ার। ধূমপান নিষেধ—লেনিন ধূমপান করতেন না। লেনিনের গায়ের শীতের কোট, পায়ের বুটজুতা, নানা পোষাক। অজস্র পাণ্ডুলিপি।

রোগশয্যায় লেনিন বিশ্রাম নিচ্ছেন, সেই ছবি।

অবশেষে আমাদের হলঘরে নিয়ে বসাল। ডকুমেণ্টারি-ছবি দেখাবে। মাত্র কুড়ি মিনিটের ছবি। ১৯১৮ থেকে ১৯২২ চার বছরে একটু-আধটু তুলে রেখেছিল। নানা অনুষ্ঠানে লেনিন এখানে-ওখানে যাচ্ছেন। ১৯২২ অব্দে তাঁর সর্বশেষ বক্তৃতা। জীবন্ত লেনিনকে ছবিতে দেখলাম, তাঁর কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম।

সন্ধ্যায় আবার আজ বলশই-থিয়েটারে। নৃত্যনাট্য আজকে—ঘুমন্ত রূপসী (Sleeping Beauty)। রাজকন্যার জন্ম হল, রাজবাড়িতে আনন্দোৎসব।

নানান ধরনের নাচগান। ডাইনি এলো—ডাইনির গাড়ি টেনে নিয়ে আসছে ভয়ঙ্কর রকমের মুখোস-পরা কয়েকটা আজব জানোয়ার। আর সঙ্গী হয়ে আসছে কালো কালো লেজওয়ালা এক দঙ্গল জীব। রাজকন্যা মারা যাবে সুঁচ বিঁধে—ডাইনি খবরটা জানিয়ে উদ্দাম নৃত্য নাচতে নাচতে চলে গেল। রাজপুরী স্তম্ভিত। এলো দয়াবতী পরী। সে বলে, মৃত্যু নয়—সুঁচ বিঁধে রাজকন্যা এক-শ বছর পড়ে পড়ে ঘুমুবে। আসবে তারপরে রাজপুত্র—চুম্বন দেবে কন্যার কপোলে। ঘুম ভেঙে পুরীসুদ্ধ জাগ্রত হবে। রাজা হুকুম দিলেন, রাজবাড়িতে সুঁচ নিয়ে আসবে না কেউ কখনো।

নাট্যের এই হল প্রথম অঙ্ক। রূপকথা ধাপে ধাপে এগিয়ে চলে। নৃত্যে আর আলোয় আলোয় গল্প বুনে যাচ্ছে। তিন চার-শ একত্র এসে নাচছে এক এক সময়। কী খেলা আলোর! ছিল মনোরম ফুল-বাগান, রং-বেরঙের ফুল হাসছিল—ডাইনি আসার সঙ্গে সঙ্গে লাল মেঘে আকাশ ঢেকে গেল, চারিদিকে উৎকট বীভৎসতা, যেন দম বন্ধ হয়ে আসে এত বড় প্রেক্ষাগৃহের।

ভারতীয় দূতাবাসটা পয়লা নম্বরের, কাজকর্ম বিস্তর। অনেকটা জায়গার উপরে গোটা তিনেক বাড়ি ভাড়া নেওয়া হয়েছে। ভাড়ার অঙ্কটা সঠিক বলতে পারছি না—শুনেছিলাম সেই সময়, রীতিমত ওজনদার। কর্মচারীদের নিয়মমাফিক যা মাইনে দেওয়া হয়, রাশিয়ার ঐ বিষম মাগ্‌গি বাজারে তা ফুঁয়ে উড়ে যাবার কথা। ভারত সরকার সেজন্য কম দরে ওঁদের রুবল সরবরাহের ব্যবস্থা করেছেন। পাউণ্ডে ৩০ রুবল পান ওঁরা; বাজার-দর যেখানে দশ-এগারো। তা ছাড়া ভুবন চুঁড়ে বাজার করেন—যেখানে যেটি ভাল ও সস্তা। হরে-দরে এমনি ভাবে পুষিয়ে যায়।

দূতাবাসে তিনজন বাঙালি। দাশগুপ্তের কথা শুনেছেন, তিনি দেশে চলে গেলেন তো সেই জায়গায় ধর এসেছেন এখন। আছেন রবি ভাদুড়ি—তিন বছর হয়ে গেল, পথ তাকাচ্ছেন কবে চলে যাওয়ার হুকুম আসে। আর একটি তরুণ—সুধীন্দ্রনাথ বসু, বর্ধমান রায়না অঞ্চলে বাড়ি। একলা মানুষ—ওঁরই মতো ক-জনে মিলে মেস করে আছেন। বিদেশে বঙ্গভাষায় আলাপনের মওকা পেয়েছি—তিন বাঙালির সঙ্গে বড্ড জমে গেছে। ভাদুড়ি-জায়াও ভারি খুশি। পুরুষরা কাজে-কর্মে থাকেন—মেয়েদের অসুবিধা, কথাবার্তার মানুষ পান না।

তা সুযোগ পেয়েছি, আমরাই বা ছেড়ে দেব কেন? ভাদুড়ি-জায়াকে ধরে বসলাম, নেমন্তন্ন খাওয়াতে হবে আমাদের।

বেশ তো, বেশ তো —

ভাদুড়ি বিনয় করে বলেন, বড় বড় জায়গায় খাওয়াচ্ছে। আমাদের সামান্য ডাল-ভাত —

ধরে পড়লাম: ডাল-ভাতই কিন্তু খাওয়াতে হবে আমাদের। ভাত — এবং মুসুরির ডাল যদি যোগাড় করতে পারেন।

ভাত-ডালের নামে প্রাণ লালায়িত হয়ে উঠেছে। কত দিন ঐ বস্তু মুখে ওঠে নি! ভাদুড়ি-জায়া হেসে বললেন, তাই হবে, মুসুরির ডালই খাওয়াব। আর বেগুন-ভাজা সর্ষের তেলে।

এই গঙ্গাহীন দেশে মুসুরির ডাল এবং তদুপরি সর্ষের তেলের সংগ্রহ শুধু মাত্র অ্যাম্বাসির লোকের পক্ষেই সম্ভব। ঐ যে বললাম — ভুবন-জোড়া বাজার — হল্যাণ্ড থেকে মাখন, অস্ট্রেলিয়া থেকে মাংস, ইন্দোনেশিয়া থেকে চাল। নিখিল ভুবন কাস্টমসের জালে ঘেরা — সেই জালের আওতার বাইরে এঁরা।

আজ রাত্রে লেনিনগ্রাড রওনা হব, তার আগে সাধের নিমন্ত্রণটা সেরে যাই। রবি ভাদুড়ি খবর দিয়ে গেছেন, দুপুরবেলা ব্যবস্থা হয়েছে। সকালের দিকটা তাই বেশি ঝামেলা রাখি নি। শহরের মলোটোভ অঞ্চলে বাইশ নম্বরের শিশুসদনটা দেখা হবে, দেখেই দূতাবাসে চলে যাব।

লড়াইয়ে যেসব শিশুর বাপ-মা মরেছে, তাদেরই জন্য এমনি সব সদন গড়ে উঠল। পলের সঙ্গে সেই এক দিন কথা হচ্ছিল — দেশে পুরুষের সংখ্যা অত্যন্ত কম, সব মেয়ের বিয়ে হবার কোন উপায় নেই, অতএব কুমারী মেয়ের উপর ট্যাক্স কেন? পল বলেছিল, এই ট্যাক্সে আমরা আপত্তি করি না; যুদ্ধের জন্য হাজার হাজার বাচচা অনাথ হয়ে গেল, ট্যাক্সের পুরো টাকাটা তাদের জন্য খরচ হয়। দেশসুদ্ধ মানুষের অপার মমতা ঐ শিশুদের সম্পর্কে। রেখেছেও তাদের রাজার হালে — মা-বাপ নেই, কোন সময় সে অভাব বুঝতে না পারে।

মীরা আগে আগে গিয়ে বোতাম টিপল। দরজা খুলে গেল। আগে খবর দেওয়া হয় নি, একসঙ্গে এতগুলো বিদেশিকে দেখে তারা হকচকিয়ে গেছে। কর্ত্রী তরতর করে নেমে এলেন উপর থেকে। বাচচারা ছুটোছুটি করছিল, বড় বড় চোখ মেলে চুপচাপ দাঁড়িয়ে গেল।

১৯৪৩ অব্দে এই সদনের প্রতিষ্ঠা। তিরানব্বুইটা মেয়ে থাকে এখানে। সাত থেকে সতের বছর বয়স। শুধু মাত্র মেয়ে। ছেলে-মেয়ে এক প্রতিষ্ঠানে রাখতে যে মানা আছে, তা নয়। অনেক সদনেই আছে এমন। এখানে স্থানাভাবের জন্য আলাদা ব্যবস্থা। পড়াশুনো বাইরের ইস্কুলে করতে যায়।

সাতটার সময় উঠে ব্যায়াম, প্রাতঃকৃত্য। সাড়ে-সাতটা থেকে আটটা প্রাত-র্ভোজন দুই দলে ভাগ হয়ে। এক দল তার পরে ইস্কুলে চলে যায়, অন্য দল বেড়ায়। ন'টা থেকে এগারোটা অবধি ঘরের কাজ করে এই দ্বিতীয় দল। বেলা দুইটায় দ্বিতীয় দল ইস্কুলে যায়। প্রথম দল ইতিমধ্যে ফিরে এসে খেয়েদেয়ে বিশ্রাম করে; পোশাক তৈয়ারি এবং নানা রকম হাতের কাজ করে। নাচ-গান ও আবৃত্তির অনুষ্ঠান হয়। সপ্তাহে একবার করে সিনেমা দেখানো হয় এই বাড়িতে। বাইরের থিয়েটারে নিয়ে যায় মাসে একবার। মস্কো থেকে পঁচিশ মাইল দূরে অতি চমৎকার এদের পায়োনিয়র-ক্যাম্প। সেখানে যেতে হয় মাঝে মাঝে। আরও নানাস্থানে নিয়ে যায় — তলস্তয়ের গ্রামের বাড়ি, স্ট্যালিনের জন্মভূমি গোরি, লেনিনগ্রাড, স্ট্যালিনগ্রাড — ইতিহাসের স্মৃতিমণ্ডিত এমনি সব জায়গায়। এবারে ইউক্রেনে গিয়েছিল। ছ-জন আছেন খবরদারির জন্য। তা ছাড়া আছেন ডাক্তার নার্স ও পায়োনিয়র দলনেতা। মাসে প্রায় হাজার রুবল খরচ প্রত্যেকের জন্য।

মা-বাপ না থাকলেই যে সদনে নিয়ে আসবে, এমন কথা নেই। পোষ্যপুত্র করে নিতে পারে কেউ, অথবা আত্মীয়স্বজন এসে ভার নিতে পারে। লড়াইয়ে যারা অনাথ হয়েছে, গোড়ায় শুধু তারাই স্থান পেত এমনি সব প্রতিষ্ঠানে। সেই সব ছেলে-মেয়ে বড় হয়ে প্রায় সবাই বেরিয়ে গেছে। বাপ কিম্বা মা রোগাক্রান্ত — শিশুর লালনপালন করতে পারে না — সেই সব শিশুও সদনে নিয়ে আসে। আর আছে সেই সব, জারজ বলে যাদের দিকে আমরা নিচু চোখে তাকাই। বাপে-মায়ে বিয়ে হোক চাই না হোক, সন্তানমাত্রেই এদেশে ষোলআনা আইন-সম্মত ও আদরণীয়।

বড় বড় সদন আছে — শ তিনেকের থাকবার মতো। কিন্তু এই রকম মাঝারি সদনই বেশি — শয়ের কাছাকাছি যেখানে থাকে। অনেক ছেলেমেয়ে পড়াশুনোয় সুবিধা করতে পারে না, চোদ্দ বছর বয়স হতেই তাদের কারিগরি কাজকর্মে লাগিয়ে দেওয়া হয়। যেমন রেল-বিভাগের পরীক্ষায় পাশ করে সেই কাজে চলে গিয়েছে অনেকে। হাতের কাজেরও অনেক ব্যবস্থা; সেলাইয়ের কল বিস্তর দেখছি। অনেকে য়্যুনিভার্সিটির পড়াশুনো করে আঠারো বছরে এখান থেকে বেরিয়ে যাবার পর। যাবার সময় অর্থ-সাহায্যও পায়।

শোবার ঘরে ঢুকে দেখছি। পঞ্চম-ষষ্ঠ শ্রেণীর মেয়েরা থাকে এ ঘরে। আঠারটি খাট, ধবধবে বিছানা। পাট-ভাঙা তোয়ালে প্রতি জনের। খাসা খাসা শিশুমূর্তি এদিকে সেদিকে, দেখে মন প্রসন্ন হয়। জ্ঞানীগুণী-বিদ্বানের ছবি বাড়িময়। একটি মেয়ের সঙ্গে ভাব জমানো গেল — ভ্যালেণ্টাইন নাম।

আর একটির নাম লিউবা—পায়োনিয়র দলের কেষ্টবিষ্টু একজন। রান্নাঘরে গ্যাসস্টোভ—হাসপাতালের মতন অ্যাপ্রন পরে ওদিকে চলাফেরা করতে হয়। খানাঘরে গোল-টেবিলের চারিধারে চারটে করে চেয়ার। পরিচ্ছন্ন কাপড় টেবিলের উপর। ষাট জন বসতে পারে একসঙ্গে। একটি মেয়ে- নাতেলা—ইংরেজি শেখে; গুড-মর্নিং বলে আহ্বান করল আমাদের। লিউবা তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা শুরু করে দিল—ভারতীয় শিশুদের ভালবাসা জানিও। যেন তারা চিঠিপত্র লেখে আমাদের। একবার এসে দেখে যায়…

ক্লারাকে কোলে তুলে দাঁড়িয়েছি। ক্লিক করে ক্যামেরায় ছবি তুলে নিল।

সদন থেকে সোজা অ্যাম্বাসি। নিমন্ত্রণটা জুটিয়েছি আমি। গোড়ায় অনেকে দোষারোপ করলেন, বিদেশ-বিভূঁয়ে সুবিধা-অসুবিধা আছে—গায়ে পড়ে নিমন্ত্রণ চাওয়াটা ঠিক হয়নি। খাওয়াদাওয়ার পরে তাঁরা পরিতৃপ্তির উদ্‌গার তুলছেন এখন। বাঙালি গৃহস্থ-বাড়ির রান্না—অনেক দিন পরে সত্যিকার তৃপ্তি পাওয়া গেল। ডেলিগেটদের মধ্যে বাঙালি ক-জনেরই নিমন্ত্রণ—কিন্তু বাইরের একজনকে টেনেটুনে সঙ্গে আনা হল, প্রাদেশিকতার বদনাম না আসে। সে ভদ্রলোকের মুশকিল—অষুধ গেলার মতো করে খাচ্ছেন। গৃহকর্ত্রীও কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হচ্ছেন গতিক দেখে।

আমাদেরই শুধু নয়, অ্যাম্বাসিতে যাঁরা বাঙালি আছেন—পুরুষ মেয়ে ও বাচ্চা, সকলের নিমন্ত্রণ। মস্কো শহরে বাঙালি যজ্ঞিবাড়ির হুল্লোড়। দেদার বাংলা ভাষা—রেখেঢেকে সেরে সামলে গ্রামার বিবেচনা করে কথা বলবার দরকার হচ্ছে না। শ্রীমতী ভাদুড়ির তিন বছর হয়ে গেল এখানে। গৃহস্থ পাড়াপড়শির সঙ্গে আলাপ-সালাপ হয়েছে কিছু কিছু। এক ভদ্রলোকের কাছে রুশভাষা শেখেন সপ্তাহে এক ঘন্টা করে—মাসে মোট চারদিন। তার বাবদে এক-শ রুবল করে দিতে হয়। দূতাবাসের আরো অনেকে তাঁর কাছে শেখে। সুধীন্দ্র বসুরা মেসে রান্নার জন্য এক মেয়েলোক রেখেছেন। সকাল আটটায় আসে, একবেলা খাইয়ে দিয়ে এবং অন্য বেলার রান্না ঢাকা দিয়ে রেখে আড়াইটে নাগাত চলে যায়। আপ-খোরাকি—এক-আধবার চা খায় শুধু এখানে। পাঁচজন লোকের রান্না ও বাসন-মাজা—মাইনে হল আট-শ রুবল অর্থাৎ ন-শ টাকার মতো। বুঝুন। একদিন ওঁরা দোকান থেকে দুধ এনে দেবার জন্য বলেছিলেন, ইউনিয়নে অমনি চিঠি চলে গেল। ইউনিয়ন হুমকি দিয়ে ওঠে: ভেবেছ কি হে, কুল্যে আট-শ রুবল মাইনে—তাতে আবার দুধও এনে দেবে? রফা হল,

আরও চার-শ রুবল দেবে—তন্মূল্যে বাজার-করা দুধ-আনা ও কাপড়-কাচা এই তিনটে কাজ অতিরিক্ত করবে।

কালো রঙের কদর খুব। রাস্তায় বেরুলে কালো আমাদের ঈর্ষার চোখে চেয়ে চেয়ে দেখে। শ্রীমতী ভাদুড়ি বিকালের দিকে হয়তো বা পার্কে গিয়ে বসলেন। রুশ-মেয়েরা আসে। শ্রীমতীর হাতখানা পরম আদরে টেনে নেয় তারা হাতের মধ্যে; বলাবলি করে, আহা কী সুন্দর কালো রে! তবু তো শ্রীমতী কালো নন, রীতিমতো গৌরাঙ্গী। তাতেই এমনি—আর নিকষ-কালো পেলে উল্লাসে ওরা যে কী করত, ভেবে পাইনে।

বাচচা ছেলেপুলে বড্ড ভালবাসে ওখানকার মেয়েরা। আজব কিছু নয়, সব দেশেরই এক স্বভাব। ভাদুড়ির ছেলের নাম বুদ্ধদেব। অত হাঙ্গামার নাম জিভে জড়িয়ে যাবে, শ্রীমতী তাই সোজা করে বলে দিয়েছিলেন খোকা। পার্কে ছেলে নিয়ে গেলে চারিদিক থেকে 'কোকা' 'কোকা' করে অস্থির। নিজের বাচচার উপরেও রুষ-মায়ের অত্যধিক যত্ন। লেপের আচ্ছা-রকম প্যাকিং করে শুধুমাত্র নাক এবং একটু চোখ বের করে ছেলেপুলে হিমের মধ্যে নিয়ে বসে। এমনি করে ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় পোক্ত করে তোলে বাচচাদের। শীতকালে ঘন্টা-খানেক অন্তত বেরুবেই পথে—এটা আবশ্যিক কর্ম, শখ নয়—মুক্ত বায়ুর জন্য।

খাওয়াটা অতিশয় গুরুতর হল। নড়াচড়া মুসকিল। খুব একচোট গল্প-গুজবে সময়ক্ষেপ করে নিই। হোটেলে ফিরতে অপরাহ্ন। শুধু একটু চা মুখে ঠেকিয়ে টহল দিতে বেরুব এবার। মেট্রনের কাছে ঘরের চাবি চাইতে গেছি—এই যে, এসেছ এতক্ষণে। দু-জনে তোমার কাছে এসেছে। সেই কখন থেকে এসে বসে আছে।

তাজ্জব লাগে। নেতা কিম্বা উপনেতার ঝামেলায় নই, আমার কাছে আসতে যাবে কোন হতভাগা! কোথায় তারা? কি চায়?

একটা গোল-টেবিল ঘিরে আগন্তুকরা বসে। তার ভিতরে সেই দু-জন। বুঝতে পেরেছে, আসামি হাজির। উঠে দাঁড়াল। তরুণ ছেলে আর তরুণী মেয়ে। সুশ্রী উজ্জ্বল চেহারা। গুরুঠাকুর দেখলে বুড়ি বিধবারা যেমন হয়ে ওঠেন, মুখে-চোখে সেই প্রকার গদগদ ভাব।

ও-দেশের নতুন মানুষ পেলে যেমনধারা জিজ্ঞাসা করি, ইংরেজি বলবে তোমরা?

মেয়েটি পরিষ্কার বাংলায় বলল, আপনার সহিত বঙ্গভাষায় বাক্যালাপ করিয়া প্রীতিলাভ করিতে চাহি।

বটে হে। তা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কতটুকুই বা প্রীতি হবে? সঙ্গীদের বলি, আপনারা বেরিয়ে পড়ুন। জাঁকিয়ে বসে প্রীতিদানে লেগে যাই আমি। ফরমাস করলাম: চা-কফি কেক-বিস্কুট ফলটল ঘরে পাঠিয়ে দাও—দরাজ হাতে পাঠিও, তিন জনের মতো।

মেয়েটি আলেকসেয়েবা; ছেলেটি গ্লাতুক ডানিয়েলচুক। আমার খাতায় বাংলা হরপে নাম-সই আছে তাদের। মানুষের যতরকম পেশা হতে পারে, তত ইউনিয়ন সোবিয়েত দেশে। ইউনিয়নগুলো অসীম শক্তিশালী—রাজ্য চালায় আসলে এরাই। লেখকরাও ওখানে ইউনিয়ন গড়ে বসে আছেন—সোবিয়েত রাইটার্স ইউনিয়ন (Soviet Writers' Union)। কী বাড়ি মশায়, দু-দিন গিয়েছিলাম সেখানে। কাউণ্ট রুস্তভ একদা থাকতেন ঐ বাড়িতেই, তলস্তয়ের ওয়ার এণ্ড পীসে যাঁর উল্লেখ আছে। ঝকঝকে মোটর চড়ে লেখক মশায়রা তথায় আনাগোনা করেন। লনের পাশে গাড়ি রাখবার সুবিস্তীর্ণ জায়গা—অত জায়গা ভরে যায় এক এক সময়, গাড়ি তখন রাস্তায় রাখতে হয়। ইউনিয়নের বিস্তর কর্মচারী, নানান বিভাগ। বিদেশি দপ্তর আছে—সেই দপ্তরে বাংলা বিভাগের লোক এরা দুটি। কেমন করে জেনেছে, বাঙালি পিশাতিয়েল এসে জুটছে একটি; খবরাখবর নিতে এসেছে।

ঘরের এক দিকে নিচু টেবিল ঘিরে আরাম করে বসেছি। আলেকসেয়েবা উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে: এ তাবৎ বঙ্গভাষার বহু পুস্তক পাঠ করিয়াছি—অহো কি সৌভাগ্য, সেই ভাষার একজন লেখককে চর্মচক্ষে দেখিবার সৌভাগ্য লাভ করিলাম।

বলতে বলতে—হাসি দেখেছে আমার—চুপ করে যায়। লজ্জায় মুখ নিচু করে।

হেসে তো চৌচির হবার কথা। কিন্তু ওদের দিকে চেয়ে প্রাণপণে সামলে নিই। শ্রদ্ধা জ্বলজ্বল করছে দু-জনের মুখে। বাংলা পড়াশুনো করে, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উপর কী গভীর ভালবাসা!

বঙ্কিমচন্দ্রের কোন বই পড়েছ?

হাঁ, কপালকুণ্ডলা পড়িয়াছি।

কেমন লাগল?

অতীব চিত্তাকর্ষক।

শরৎ বাবুর কিছু?

বিরাজ বৌ—

কেমন?

অতীব চিত্তাকর্ষক।

আমার দুটো বই দিলাম দু-জনকে। আলেকসেয়েবা আর আসেনি, অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। গ্লাতুক আসত ; আমার ভাই হয়ে গিয়েছিল, আমি তার দাদা। একদিন জিজ্ঞাসা করলাম, পড়েছ আমার বইটা ?

সম্পূর্ণ পড়িয়াছি। অতীব চিত্তাকর্ষক।

চালাক ছেলে। মনে মনে হাসছি, ধরতে পেরেছে। বলে, সাধুভাষার পুস্তক পাঠ করিয়া আমাদের যাহা-কিছু শিক্ষা। বড়ই দুঃখের বিষয়, চলিত-ভাষায় আমরা কথা বলিতে পারি না।

বললাম, কলকাতায় চলো ভাই। আমার বাড়ি থাকবে, গেঞ্জি গায়ে বেড়াবে, গামছা পরে তেল মাখবে চানের আগে। ছ-মাসের মধ্যে চলিত-বাংলায় এমন লায়েক করে দেব যে আমরাই তখন তোমার কথা বুঝে উঠতে পারব না।

চলিত-বাংলায় না হোক — এই এক তাজ্জব, ঘন্টার পর ঘন্টা উৎকৃষ্ট সাধুভাষায় চালিয়ে যাচ্ছে, ভারী ভারী বিষয়ের আলোচনা করছে, বাধে না। সে পরিচয় আপনারাও অনেকে পেয়েছেন। গ্লাতুক ভারতে এসেছিল ; আগ্রায় নিখিল-ভারত বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনে বাংলায় বক্তৃতা কবেছিল। আমি যাই নি, আপনাদের কেউ কেউ শুনেছেন হয়তো।

প্রথম রাত্রেই তাই দেখছি। সাহিত্যের কথা শুনতে এসেছিল, কিন্তু আমাদের একজন নানা রাজনীতিক তর্ক জুড়ে দিলেন। ঘন্টার পর ঘন্টা চলল। ডিনারের সময় পার হয়ে যায়, এক দল খেয়ে উদ্‌গার তুলতে তুলতে শব্দসাড়া করে ও-ঘরে ঢুকলেন। রাত্রি বারোটায় লেলিনগ্রাড রওনা হব আজকেই। তখন অনিচ্ছার সঙ্গে তারা উঠে পড়ল। দরজা অবধি গিয়ে ওভারকোট চড়াচ্ছে, তখনও সাহিত্য-প্রসঙ্গ। করিডরে অনেক-দূর সঙ্গে সঙ্গে গেলাম, তখনও।

মস্কোয় ফিরিয়া আসিলে যেন সংবাদ পাই। আমরাই সংবাদ লইব। আপনি বিরক্ত হইবেন না তো ?

সে কি কথা! এসো ভাই, নিশ্চয় আসবে আবার। কত জনের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হল, কিন্তু তোমাদের এই দুটির মতো এমন স্বজন আজও এখানে পাইনি।

ঘুম ভাঙল ট্রেনের মধ্যে। রাত দুপুরে উঠেছিলাম। কী অপরূপ কামরা, রাজা-মহারাজার ঘরের মতো। কার্পেট বিছানো মেজে; ঝকমকে কারুমণ্ডিত আলো। সারা দেয়ালেও কাজকর্ম। দু-কামরার একটি গোসলখানা। সেটা এমনি কায়দার, এদিকটা খুললে ওদিক আপনি বন্ধ হয়ে যাবে। শৌচাগার কামরার লাগোয়া নয়, একেবারে দূর প্রান্তে। এই এক অসুবিধা — চোদ্দ-পনের জনের এক শৌচাগার। শৌচ সম্পর্কে, দেখা যাচ্ছে, বিষম কঞ্জুষপনা এদের।

গাড়ি দুলকি চালে চলেছে। এই নিয়ম এখানে, মানুষ-বওয়া গাড়ি অত্যন্ত সামাল হয়ে চালায়। সকলের বাড়া ধন-দৌলত নাকি মানুষের জীবন। আমাদের শুনে হাসি পায় — কি বলেন? রুশিয়ার গ্রাম দেখতে দেখতে চলেছি জানলায় বসে। পৌনে ন'টা বাজে — এখনও রোদ ওঠে নি, ঊষাকালের মতন আকাশ। ধোঁয়া ভেসে বেড়াচ্ছে চতুর্দিকে, ছেঁড়া ছেঁড়া কুয়াশা। রাতে কিছু বরফ পড়েছিল, এখানে-ওখানে চিহ্ন আছে। দাবানলের পর গাছের গুঁড়ির যেমন কালো কালো অবশেষ থাকে, বনের সেই চেহারা। বরফ পড়ে পড়ে এই দশা হয়েছে। বনরাজ্যের ভিতর দিয়ে যাচ্ছি — দু-ধারে সীমাহীন বার্চ-পাইনের বন। ক্ষেত-খামার মাঝে মাঝে। ফসল ঝেড়ে নিয়ে আঁটি স্তূপাকার করে রেখেছে, আমাদের গাঁয়ের উঠানে যেমন পোয়ালগাদা দেখতে পাই। জলা জায়গা — আমাদেরই বিল-বাঁওড়ের মতন। কাঁচা রাস্তা — গাড়ির চাকার দাগ পড়ে গেছে। দু-দশটা সবুজ গাছও এবার দেখতে পাচ্ছি — বরফ আর শীত আমলে না এনে হাসছে পাতা ঝিলমিল করে। জঙ্গল কেটে ফেলেছে অনেক জায়গায়, গাছের গোড়াগুলো শুধু আছে। চাষবাস করবে। খরস্রোতা নদী — নদী পার হয়ে গ্রাম এলো এবার। কাঠের বাড়ি, ছাত-দেয়াল সমস্ত কাঠের। কিন্তু লোকজন একটা দেখি না কোন দিকে। শীতে ঘুম ভাঙেনি এখনো গাঁয়ের। ঘর-কানাচের সবজিক্ষেতে কয়েকটা সাদা মুরগি খুঁটে খুঁটে

খেয়ে বেড়াচ্ছে শুধু। একটা মাঠে গরুর পাল। পুষ্ট চেহারা, সাদায় কালোয় মেশানো রং। কিন্তু চরে বেড়াচ্ছে না, নড়াচড়া নেই, ঋষিতপস্বীর মতো একটা জায়গায় ধ্যাননিমগ্ন যেন। জীব না অতিকায় পুতুল, সন্দেহ হয়।

এর পরে পুরোপুরি সবুজ অঞ্চল। অজস্র পাইন ও ফার। আপেল-বাগিচাও অনেক। গ্রামের পর গ্রাম পার হচ্ছি। রাস্তাঘাট ভাল নয়, বরফ-গলা জল জমে আছে এখানে-ওখানে। প্যাচপেচে কাদা। এক-ঘোড়ায় টানা গাড়ি যাচ্ছে কাদা ছিটকাতে ছিটকাতে। দুটো একটা মানুষ দেখা যাচ্ছে এখন -- মাথায় টুপি ও গায়ে ওভারকোট এঁটে কাদা বাঁচিয়ে সামাল হয়ে যাচ্ছে। বর্ষাকালে আমাদের পাড়াগাঁয়ের পথে অবিকল এমনিধারা দেখি। কচি ছেলের হাত ধরে বাপ ঐ কেমন কাদা পার হচ্ছে, দেখুন দেখুন।

কামরায় কামরায় রেডিও বাজছে। আমাদেরও আছে। বন্ধ করে রেখেছি, নয়তো অসুবিধা হয় লেখার। কাচ-আঁটা কামরা -- এ কাচ নামানো যায় না। ভিতরে গরম করে রেখেছে। কাচের খাঁচা থেকে বাইরেব জগতে তাকিয়ে আছি, তার সঙ্গে কোন রকম যোগাযোগ নেই। মৃত্যুর পরে বায়ুভূত হয়ে ভুবন-ব্রহ্মাণ্ডের উপরে ভেসে চলেছি যেন।

এবারে এক মস্তবড় গ্রাম। অগণ্য কাঠের বাড়ি। হাঁস-মুরগি চরছে। নিষ্পত্র বার্চ গাছ এবং সবুজ পত্রময় ফার-পাইন। এই সব গাছপালা ও ঘরবাড়ি দেশের সঙ্গে একেবারে মেলে না। সারা পথে দেখে আসছি পতিত জমি বিস্তর। তাই এরা মানুষ চাচ্ছে, অগুন্তি মানুষ। মাঠের শেষে দূরে দূরে ফ্যাক্টরির চোঙা থেকে ধোঁয়া উঠছে। বড় কারখানা গ্রামপ্রান্তে — নীল কাচের বেড়ায় ঘেরা। লোক-চলাচল এবারে প্রচুর। আর দেরি নেই, পথ শেষ হয়ে এসেছে।

বড় স্টেশন। কিন্তু এমন নিচু জলা-জায়গা যে প্লাটফরম আগাগোড়া কাঠের পাটাতনের উপর করতে হয়েছে। কাঠেরও অপ্রতুল নেই। ক্ষেতের পর ক্ষেত -- বড় বড় বাঁধাকপি ফলে আছে। হাইড্রো-ইলেকট্রিক কারখানা অনতিদূরে। লেনিনগ্রাড।

জায়গাটা কি মশায় এখানে? ভুবনের প্রায় ঐ মাথায়; উত্তর মেরুর কাছা-কাছি এগিয়ে এসেছি। নেভা নদী ফিনল্যাণ্ড-উপসাগরে পড়ল — মোহানার উপর খাল-বিল-জঙ্গলে ভরা ব-দ্বীপ, সেইখানটায় শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ইন্দ্রপুরী বানিয়ে তুলল। পৃথিবীর এক সেরা শহর। নজরটা যদি ছড়িয়ে রাখেন আর কিঞ্চিৎ যদি কল্পনার দৌড় থাকে, শহরে ঢুকবার মুখে জায়গাটার আদি-অবস্থার আঁচ পেতে পারবেন।

নিয়ে তুলল একেবারে সকলের সেরা হোটেল আস্তোরিয়ায়। মেজাজ সঙ্গে সঙ্গে কী যে চড়ে উঠল, কি আর বলি! এতই দহরম-মহরম আপনাদের সঙ্গে -- কিন্তু দেখা করবার মনন নিয়ে যদি ঐ হোটেলের লাউঞ্জে গিয়ে বসতেন, সঙ্গে সঙ্গেই যে চিনে ফেলতাম এমন কথা হলফ করে বলতে পারিনে।

আস্তোরিয়া জানেন তো? ঘাড় নাড়লে শুনিনে, জানেন নিশ্চয়। লড়াইয়ের সময় জেনেছিলেন, শান্তির সময় এখন ভুলে বসে আছেন। লেনিনগ্রাড ঘিরে ফেলে হিটলার ধরে নিলেন, নির্ঘাৎ এইবারে কেল্লা ফতে। হিসাবপত্র করে ফেললেন, কদ্দিন লাগবে শহর লেনিনগ্রাড পদতলে আছড়ে পড়তে। সেই হিসাব অনুযায়ী আস্তোরিয়ার ম্যানেজারকে চিঠি পাঠালেন, বড়দিনের ফূর্তিফার্তি এবারে তোমার হোটেলে। অমুক দিন সদলবলে পৌঁছব। পাঁচশ লোকের মতো উত্তম খাদ্য ও মদ্যের জোগাড় রেখো। চিঠির নিচে সই খুদ হিটলার মশায়ের। কিন্তু হিসাবে গড়বড় হল। বড়দিন মাটি হয়ে গেল, তাঁরা এসে পৌছলেন না; ন'শ দিন সদলবলে শহর ঘিরে থেকে শেষটা পিছাতে লাগলেন। ঘরের ছেলে ঘরে -- ঘরের একেবারে অন্দরদেশে। তিন-শ হাতবোমা মেরেছে একাই একটা মেয়ে, সেই মেয়ের সঙ্গে একদিন আলাপ হল ঐ হোটেলে। এখন বয়স চব্বিশ; তখন কি বয়স ছিল হিসাব করে দেখুন। আর একটা ছেলে দেখলাম, পঞ্চাশ-ষাটটা বোমা মেরেছে। এমন কত। সমস্ত ইতিহাসের কথা -- আমার পাঠকেরা মহাপণ্ডিত -- মায়ের কাছে কোন মাসীর গল্প শোনাতে যাব? সেই তখন আস্তোরিয়ার নাম পেয়েছিলেন খবরের কাগজে। তত্র আমরা গিয়ে আছি। বুঝুন। হিটলার পেরে উঠলেন না, আর আমরা গাড়ি থেকে নেমে মচমচ করে জুতো বাজিয়ে উঠে পড়লাম। সেই কথা বললাম হোটেলের ম্যানেজারকে: দেখলেন তো মশায়, হিটলারের চেয়ে অধিক শক্তি ধরি আমরা। বিপুল আয়োজন করেও শেষ অবধি তাঁর আসা ঘটে উঠল না, আব আমবা এই চলে এসেছি -- কই রুখতে পারলেন না তো!

ম্যানেজার ঘাড় নেড়ে মেনে নিলেন। বটেই তো! আপনারা হলেন শান্তির দূত, প্রীতি আর সৌহার্দ্য বয়ে নিয়ে এসেছেন -- আপনাদের শক্তি কত! হাতিয়ারের জোরে হিটলার ঢুকতে চাচ্ছিল, সেই লোকের তুলনা আপনাদের সঙ্গে।

•

বাইরে কনকনে শীত, হাড়-কাঁপানো মেরু-বাতাস -- ঘরের ভিতরটা বিদ্যুতের তাপে নাতিশীতোষ্ণ। কাচ এঁটে বাইরের জানলা পাকাপোক্ত রকমে বন্ধ

করা — উত্তাপ বেরিয়ে যেতে না পারে। পর্দা রয়েছে — আলো বন্ধ করতে চান তো পর্দা টেনে কাচ ঢেকে দিয়ে বসুন। জানলা দিয়ে আরামে বাইরেটা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি। ঠিক সামনেই পার্ক — ভোরোভিস্কি স্কোয়ার — সম্রাট প্রথম-নিকোলাসের মূর্তি পার্কের ভিতর। ঘোড়া পিছনের দু-পায়ে দাঁড়িয়ে আছে, তারই উপরে সম্রাট — মূর্তির এই বিশেষত্ব। শহরের বড় এক কেন্দ্রস্থল — তিন-চারটে বড় রাস্তা বেরিয়েছে পার্কের এদিক-ওদিক থেকে। ডাইনে বিখ্যাত আইজ্যাক ক্যাথিড্রাল — সেন্ট আইজ্যাকের নামে উৎসর্গ-করা। চূড়া সোনায় মোড়া — শোনা গেল, বহু পরিমাণ সোনা লেগেছিল সোনালি প্রলেপ দিতে। ভিতরটায় দামি পাথর বসানো, অজস্র আশ্চর্য শিল্পকর্ম। জার আর জাঁদরেল ব্যক্তিবর্গ ওখানে ঈশ্বর-ভজনায় আসতেন। এখন আর ভজন হয় না গির্জায়। মিউজিয়াম বানানো হয়েছিল, কৌতূহলী মানুষ ঘুরে ঘুরে সেকালের ধর্মীয় চিত্রাবলী দেখত। চূড়ায় উঠে শহর দেখত, দূরের ফিনল্যাণ্ড-উপসাগর অবধি নজর চলে এখান থেকে। এখন দেখতে পাচ্ছি, চারিদিকে ভারা বেঁধে গির্জার সংস্কার হচ্ছে। ১৮১৮ থেকে ১৮৫৮ চল্লিশ বছর ধরে বানানো। ইদানীং নজর পড়ল, ইমারত মাটির তলে বসে যাচ্ছে ক্রমশ। আর বসলে ফেটে চৌচির হবে। সেটা বন্ধ করবার জন্য ইঞ্জিনিয়াররা উঠে পড়ে লেগেছেন। আষ্টেপৃষ্টে তাই ভারা বেঁধেছে।

ক্যাথিড্রালের উল্টো দিকে আর একটা স্কোয়ার। ১৮২৫-এর ডিসেম্বরে বিদ্রোহ হয়েছিল প্রথম-নিকোলাসের বিরুদ্ধে। বিদ্রোহ দমন করা হয়। সেই স্মৃতিতে জায়গাটার নাম দেওয়া হল ডিসেম্ব্রিস্ট স্কোয়ার। পিটার-দ্য-গ্রেটের বিশাল বলদৃপ্ত মূর্তি এই স্কোয়ারের প্রান্তে — শহরের অন্যতম দ্রষ্টব্য বস্তু। বিপ্লবের আমলে ক্ষিপ্ত জনতা অনেক জারের মূর্তি গুঁড়ো গুঁড়ো করে দিয়েছে, কিন্তু পিটার-দ্য-গ্রেটের দিকে রোষদৃষ্টিতে তাকায় নি কেউ কোন দিন। দ্বিতীয়-মহাযুদ্ধের সময় মূর্তিটা সন্তর্পণে ঢেকে দিয়েছিল, বোমা তাক করতে না পারে ওর উপর। পাথর কাটা হয়েছে সমুদ্রের মতন তরঙ্গিত করে, এটা রাশিয়ার প্রতীক। সেই পাথরের উপর অশ্বারূঢ় পিটার। পায়ের নিচে দীর্ঘ এক সাপ পেঁচিয়ে আছে; শত্রুকুল বিমর্দিত, সাপ দিয়ে ইঙ্গিত করেছে।

আর একটু এগিয়ে তরঙ্গিণী নেভা। বিশাল নদী — শহরকে শতেক পাকে ঘুরছে। পূর্ব-বাংলার খরস্রোতা নদীগুলোর সঙ্গে ভারি মিল। ফিনল্যাণ্ড-উপসাগরের মুখে দুর্গম জঙ্গল ও জলা-জায়গা ছিল সুইডেনের অধীন। প্রথম-পিটার জায়গাটা রাশিয়ার দখলে নিয়ে এসে শহরের পত্তন করলেন। সারা রাশিয়ার সব অঞ্চল থেকে এবং বাইরে থেকেও অগণিত স্থপতি এনে জোটানো

হল। পাথরের অজস্র অট্টালিকা উঠল দেখতে দেখতে। শুধু এই সেন্টপিটার্স-বার্গ ছাড়া রাশিয়ার কোনখানে কেউ পাথরের ইমারত বানাতে পারবে না, এই হুকুম দেওয়া হল। নেভা ফিন-উপসাগরে পড়েছে, সেই মোহানার উপর একশ'টা দ্বীপ নিয়ে শহর। কিন্তু দ্বীপ বলে আজকে চিনতে পারছেন না -- তিনশ-ষাটটা পুলে এপারে-ওপারে এমনি ভাবে বেঁধে দিয়েছে। নেভা ছাড়াও আটাশটা খাল শহরের নানা দিকে। খাল এবং নেভার দুই তীরে জলের কোল ছুঁয়ে নিটোল পিচের রাস্তা ; কোথাও বা জলের মধ্যেই নেমে গিয়েছে রাস্তার কিনারা। উল্টো দিকে সারবন্দি অট্টালিকা। আপনার মনে হবে, শোভা বাড়ানোর জন্যেই বুঝি রাস্তার পাশে পাশে মানান করে খাল কেটে জল নিয়ে এসেছে। একটা পুলের নাম হল চুম্বনের সাঁকো (Bridge of Kisses)। একটেরে নিরিবিলি জায়গা, আমাদের বাপ-ঠাকুরদা'র আমলের প্রণয়ীরাও ঐ পুলেব উপর এবং আশেপাশে গাছপালার নিচে ঘোরাঘুরি করে গেছেন। অতি-বড় ভাবিক্কি মানুষেরও এখানে এসে মন চনমনিয়ে ওঠে।

জারের শীত-প্রাসাদের উল্টো পারে নেভার কূলে অরোবা ক্রুজার নোঙর করা রয়েছে। জাহাজের কামানগুলো শীতের সন্ধ্যায় আগাগোড়া কাপড় মুড়ি দিয়ে একটু মুখ বাড়িয়ে চেয়ে দেখছে আমাদের। নিশ্বাস নেবার মতো যৎসামান্য হিসহিস আওয়াজ ; অল্পসল্প পাতলা রকমের ধোঁয়াও উড়ছে একটা পাইপের মুখে। অত বড় প্রাণীটা আলস্যে বসে বসে চুরুট টানছে, এমনি এক ছবি মনে আসে। ব্যাপাব সত্যি তাই। এখন কাজকর্ম নেই ক্রুজারের -- অনেক খাটনি ও বিস্তর যশোলাভের পরে বুড়া বয়সে নদীকূলে বসে বসে অবসর ভোগ করে। একটা ইস্কুল অদূরে নেভার উপরেই -- সেখানকার ছেলেরা মাঝে মাঝে এসে কলকব্জা টিপে দেখে, জাহাজি ব্যাপারের আন্দাজ দেবার জন্য অল্পসল্প যন্ত্র চালানো হয়। বাচ্চাদের সঙ্গে মহামান্য প্রবীণের যৎকিঞ্চিৎ কৌতুক করার মতো। ১৯০৩ অব্দে তৈরি--১৯০৪ অব্দের রুশ-জাপান যুদ্ধে খুব খেটেছিল এই ক্রুজার। ইজ্জত কিন্তু সেজন্যে নয়। ১৯১৭ অব্দে অরোরা ক্রুজার বিপ্লবীদের সঙ্গে মিলে নেভা নদীর উপর থেকে জারের উইন্টারপ্যালেসের দিকে সর্বপ্রথম গোলা ছুঁড়েছিল। সেদিনের বিপ্লবীদের দেশজোড়া যেমন খাতির, এই ক্রুজারেরও তেমনি।

একটা পার্ক — নাম বলল 'পার্ক অব মার্স' (Park of Mars)। অদূরে নানান রঙের গম্বুজওয়ালা বাড়ি। 'রক্তের উপর মন্দির' (Temple on Blood) বাড়িটার নাম। জার প্রথম-নিকোলাসকে হত্যা করেছিল, সেই হত্যাভূমির উপর বানানো। নেভার তীরবর্তী বহুবিস্তীর্ণ বাগান, বার্চ ও আপেলগাছ অজস্র।

পাতা নেই অনেক গাছের, অনেকের পাতা লাল হয়ে গেছে। সেই বাগানের ভিতর ছবির মতন টালি-ছাওয়া ছোট্ট এক বাড়ি। বাড়ির পিছন দিকে নেভা থেকে বেরিয়ে-আসা খাল বয়ে যাচ্ছে। বাড়িটা হল পিটার-দ্য-গ্রেটের গ্রীষ্মপ্রাসাদ।

শহরের কয়েকটা পাড়ার উপর দিয়ে দৌড়াদৌড়ি করে এসে গাড়ি একটা গলির মাথায় মিনিট খানেক ধরে হাঁপাল। স্মোলনি-গৃহাবলী—ঐতিহাসিক জায়গা, বিপ্লবের প্রধান অফিস ছিল এখানে। ঐ বাড়ির একটা খোপে লেনিন তখন থাকতেন। সন্ধ্যা হয়ে গেছে, পরে এক সময় ভাল করে দেখা যাবে। ওখান থেকে এসে নামলাম পায়োনিয়র কেন্দ্র-ভবনে।

ডিরেক্টর মানুষটি ভারি রসিক। কথায় কথায় হাসি-রহস্য। শিশু ও কিশোরদের মধ্যে থেকে থেকে নিজের বয়স ভুলে বসে আছেন। এই ১৯৫৪ অব্দে আঠার বছর পুরল ওঁদের পায়োনিয়র-প্যালেসের। যুদ্ধের সময় লেনিনগ্রাড ন'শ দিন আটক ছিল—অর্থাৎ তিন বছরের কাছাকাছি। চারিদিক দিয়ে ঘিরে ফেলেছিল—একটি মাছি-মশার সেঁধোবার জো ছিল না। প্লেনে করে শহরের রসদ আসত। সেই অতি-বড় দুর্যোগের ভিতরেও একদিনের তরে এখানকার কাজকর্ম বন্ধ থাকেনি। এটা হল মূল-কেন্দ্র—শুধু এই শহরেই কুড়িটা শাখা। লেনিনগ্রাডে ছাত্র আছে চার লক্ষ—তারা মেম্বার হতে পারে। হয়েছেও প্রায় সবাই। দু-পাঁচটি মাত্র বাদ। এই কেন্দ্রভবনে এ বছর খরচ হবে সাড়ে সাত মিলিয়ন রুবল। শিক্ষা-মন্ত্রীর দপ্তর টাকা দিচ্ছেন। চলে আসুন, ঘুরে ফিরে দেখে যান একটু।

বাড়ি ঢুকবার মুখে এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখি। উঠানে সারের গাদা। ছেলেমেয়েরা কোদালি দিয়ে সার কেটে কেটে নিয়ে যাচ্ছে। নতুন বাগান হবে কোনদিকে, গাছপালা আর্জাবে। ঘিরে দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা করল ঐ ছেলেমেয়েরা।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে, বাইরের খেলাধূলা নেই। নিয়ে গেল দাবা-খেলার ঘরে। ছকের পাশে স্টপ-ওয়াচ। এক একটা চালে কত সময় নেয়, রেকর্ড হয়ে যাচ্ছে। ঘরে ঘরে এমনি নানান খেলা—বুদ্ধির খেলা, ধৈর্যের খেলা, কৌতুকের খেলা। চিনামাটির রঙিন অতিকায় ব্যাং। আর একটা ঘরে রকমারি গাছপালা; ঘরের ছাতে মেঘ-ভরা আকাশ আঁকা। ছাতের দিকে তাকিয়ে হাঁটুন একটু—কি আশ্চর্য, আকাশে মেঘ ভেসে যাচ্ছে আপনি পরিষ্কার দেখবেন। কাচে তৈরি বড় একটা জারের মতো। এমনি কিছুই দেখছেন না—ঘোরাতে লাগুন, ভিতরে দেখবেন পুতুল, শেওলা ইত্যাদি।

ফুটবল খেলা হচ্ছে পুতুলদের। সুপারির মতো ছোট্ট বল — নিচের দিক থেকে সরিয়ে ঘুরিয়ে মারতে হবে। ডিরেক্টর মশায়ের সঙ্গে আমরাও বসে গেলাম খেলতে। আর একটা খেলা — বিড়াল-পুতুলের লেজে দূর থেকে আংটি পরানো। এমনি অনেক খেলা।

নানা দেশ থেকে উপহার গেছে, একটা ঘরে সেই সমস্ত সাজানো। ভারত থেকে গেছে ছবির এলবাম ও নানা ধরনের পুতুল। বাচ্চাদের আঁকা ছবি এক ঘরে। আর এক ঘরে লাইব্রেরি — বইয়ের লেনদেন চলে।

রাজপ্রাসাদ ছিল এটা — জার-পরিবারের একজন থাকতেন। প্রতিটি ঘরের কারুকার্য দেখে অবাক হবেন। নৃত্যশালা। কবি পুশকিনের নামে তাবৎ রাশিয়া মেতে যায় — তিনি কবে নেচেছিলেন নাকি এই নাচের ঘরে। দেয়ালের ধার দিয়ে সেই আমলের চেয়ারগুলো সাজানো, সাদা কাপড়ের ওয়াড়-দেওয়া। বাচ্চারা জিজ্ঞাসা করে, ঠিক কোন জায়গাটায় নেচেছিলেন পুশকিন, কোন চেয়ারে তিনি বসেছিলেন? চেয়ারটা সঠিক মালুম না হওয়ায় সবগুলো চেয়ারেই তারা একটু একটু বসে নেয়।

একটা ঘরে নানারকম পাথর ও ধাতু। ছেলেমেয়েদের নিয়ে দেশের নানা অঞ্চলে অভিযানে বেরোয় — সেই সময়ে তারা এমনি সব বস্তু কুড়িয়ে নিয়ে আসে। ঘরময় বিপুল সংগ্রহ। কাচের আলমারিতে থরে থরে সাজিয়ে রেখেছে — মাটির নিচে পাহাড়ের রন্ধ্রে রন্ধ্রে তাদের দেশের কী অপরিমিত সম্পদ!

রূপকথার ঘরগুলোয় চলুন এবার। বড় বড় ঘর — দেয়াল-ছাত ও আসবাবপত্রে চোখ-ধাঁধানো ছবির মেলা। পুশকিনের লেখা একটা পরীকাহিনী আঁকানো। রাশিয়ার গালার কাজের খুব নাম — এক গোটা অঞ্চল নিয়ে লাক্ষা-শিল্পীরা থাকে। সেখান থেকে তারা এসে লাক্ষা-চিত্রণে ঘর ভরে দিয়ে গেছে। এই নিয়েই বা শিশুদের কত জিজ্ঞাসা! কত ডিম লেগেছিল আঁকতে? ডিরেক্টর মশায়েরও তেমনি জবাব: বাইশ হাজার। পুশকিনের ঘরের পাশে গোর্কির ঘর। গোর্কির লেখা একটা রূপকথার পরিচিত্রণ সেখানে।

ছেলেরা নিজ হাতে ছোট্ট ক্রেন বানিয়েছে, বিদ্যুতে চলে। নাগরদোলা — প্লাগ লাগিয়ে দিতে পুতুলেরা নাগরদোলায় খুব উঠানামা করতে লাগল। এ সমস্ত শিশুরাই মাথা থেকে বের করেছে। রেলপথ বানিয়েছে — দুর্গম পাহাড় দিয়ে পথ, টানেল, পুল — সুইচ টিপে দিতে গড়গড় করে ট্রেন চলল। একটা কুকুর — লাল জিভ একবার মেলছে, মুখের ভিতরে জিভ নিয়ে নিচ্ছে আবার।

গেলাম ওদের কারখানা-ঘরে — যে জায়গায় ওরা এমনি সব বস্তু বানায়। ছুতোরখানা। কাঠ কেটে রেঁদা ঘষে ঘষে ছোট্ট ছেলেমেয়েরা নানান জিনিস

গড়ছে। হাতে-কলমে জিনিস গড়ে স্ফূর্তি কত তাদের। আরও ক্রেন তৈরি হচ্ছে, দেখলাম, লোহার টুকরা জুড়ে জুড়ে। বয়স কত হে তোমার? ন-বছর। ইঞ্জিনিয়ার হবে তুমি? উঁহু, নাবিক হব। তবে এসব বানাচ্ছ কেন? বাঃ রে, ক্রেন না হলে জাহাজের মালপত্র উঠানো-নামানো হবে কি করে? তাই বটে, আমারই ভুল! মালপত্রের জন্য আরও কয়েকটা ক্রেন আগে বানিয়ে তাকের উপর তুলে রেখে দিয়েছে।

গেলাম কনসার্টের ঘরে। ছেলে-মেয়ে মিলে দিব্যি বাজনার দল হয়েছে। পরিচালক একটা ছেলে -- বছর ষোল বয়স। চট করে একখানা গৎ শুনিয়ে দিল।

কনসার্টের পর নাচের ঘরে। মেয়েরা নাচল, এক শিক্ষিকা পিয়ানো বাজালেন। পুতুলের ঘরে -- প্রতিটি পুতুল এরা নিজ হাতে গড়ে। ফি বছর রূপকথার এক একটি পালা ভেবে তদনুযায়ী পুতুল বানায়। পুতুলের মানুষ শুধু নয়, কুকুর খরগোস সজারু ব্যাং। পুতুল-ঘরের মাতব্বর একটা ছেলে -- দিব্যি সে বুড়োমানুষের ঢঙে বক্তৃতা করে তাদের কাজকর্ম কিছু কিছু বুঝিয়ে দিল। পুতুল নাচিয়ে দেখাবে এবার -- যান, পুতুলের থিয়েটারে গিয়ে বসে পড়ুন। সময় নেই, কিন্তু হাত এড়ানো গেল না। তাড়াতাড়ি যা-হোক একটু দাও দেখিয়ে। মেয়ে পুরুষে পলকা-নৃত্য। কুকুর-বিড়ালে প্রথমটা ঝগড়া, তারপরে যুগল-নৃত্য। ইউক্রেনের একটি লোকনৃত্য। একটা হাসি-হুল্লোড়ের নাচ।

যে ছেলে-মেয়েরা পর্দার আড়ালে থেকে নাচাচ্ছিল, তারা বেরিয়ে এলো হাতে পুতুল নিয়ে। ভারতের ছেলেমেয়েদের ভালবাসা জানাল। শিক্ষকরাও প্রীতি জানালেন ভারতে যাঁরা শিশুশিক্ষার ভার নিয়েছেন তাঁদের উদ্দেশে।

মহাত্মা গান্ধীর মূর্তি-আঁকা তিনটে মেডেল এবং অশোকচক্র-আঁকা একটা মেডেল কেন্দ্রভবনে দেওয়া হল -- ভারতের প্রীতির উপহার।

আস্তোরিয়া হোটেলের এক একটা পুরো ঘর দখল করে প্রতি জনে বাদশাহি করছি। উঁহু, মাঝখানটা দেয়াল-ঘেরা না হলেও ঘর দুটো বলতে হবে। একটায় শোওয়া, অপরটা দামী আসবাবপত্রে সাজানো বৈঠকখানা। আট-দশটা বন্ধু নিয়ে আরামসে এই বৈঠকখানায় ওঠাবসা করতে পারেন। হায়রে কপাল, একলা আমাকেই একটা মিনিট স্থির হয়ে বসতে দেয় না, তায় আবার বন্ধুবান্ধব সহ গুলতানি! খাটের উপর সওয়া হাত উঁচু গদি — সে এমন বস্তু, বপুখানি তদুপরি নিক্ষেপ মাত্রেই গদিতে বিলীন হয়ে যায়। দুপুরের ভোজন শেষে শীতের মধ্যে দু-দণ্ড যে সেখানে গড়াগড়ি করব, কিছুতে তা হতে দেবে না হতভাগারা। ঠাসা প্রোগ্রাম।

সেকেলে বদ্ অভ্যাস আমার — সকাল সকাল উঠি। পাঁচটায় উঠে পড়ে মুখ-হাত ধুয়ে জানলার পর্দা সরিয়েছি — আরে সর্বনাশ, লেনিনগ্রাডে রাত দুপুর যে এখন। শুয়ে পড়ো, শুয়ে পড়ো। শেষটা আর পেরে উঠিনে, পৌনে-ছ'টায় উঠে মরীয়া হয়ে টেবিলে গিয়ে বসলাম। প্রাণের সাড়া নেই কোন দিকে কোথাও। ভিজে রাস্তা — বৃষ্টি হয়ে গেছে রাত্রে, অথবা কুয়াশা থেকে জল জমেছে। রাস্তায় সারবন্দি উজ্জ্বল আলো অবাক হয়ে তাকাচ্ছেঃ কোন নিশাচর হে, ছ'টার সময় উঠে টেবিলে কাজ করে!

সাতটা হল, আটটা হল। রাত পোহাবার লক্ষণ নেই। ভয় ধরে যাচ্ছে এবার, বিধাতার রবি-যন্ত্রটা বিগড়ে গেল না কি? ন'টা বাজলে তখন দেখি, ভোরের আলো ফুটি-ফুটি করছে। লোক-চলাচল হচ্ছে দু-পাঁচটি; ট্রলি-বাস ও মোটরবাস চলছে। পার্কের মাঝখান দিয়ে মানুষ আড়াআড়ি পথ ভাঙছে। কিন্তু জমে ওঠেনি এখনো। নিতান্ত যাদের কাজের গরজ, তারাই বেরিয়েছে; গোটা শহর জাগতে দেরি আছে। তবু এ পুরো শীতকাল নয়, সবে অক্টোবরের তেসরা।

গ্রীষ্মের সময় আবার ঠিক উল্টো। দিনমান কিছুতে নড়তে চায় না।

আলো-ভরা রাত দশটায় দলবল সহ টহল দিয়ে বেড়াবেন। 'সাদা রাত' ওরা নাম দিয়েছে।

হারমিটেজ — এলাহি ব্যাপার, রাশিয়ার সব চেয়ে বড় মিউজিয়াম। লণ্ডনের ব্রিটিশ-মিউজিয়াম ও প্যারির লুভরে — তাদেরই কাছাকাছি। নেভার কূলে বিশাল প্রাসাদাবলী — আগে বলত উইন্টারপ্যালেস, শীতপ্রাসাদ। আঠারো শতকের মাঝামাঝি তৈরি (১৭৫৫-১৭৬২)। এখনকার নাম হয়েছে প্যালেস অব আর্ট, শিল্পপ্রাসাদ। এই প্রাসাদের লাগোয়া আরও সব প্রাসাদ গড়ে উঠেছে পরবর্তী কালে। হারমিটেজ এইখানে। এক হল থেকে আর এক হলে যাচ্ছি — নেভা চোখের সামনে আসছে বারম্বার। আর এক পাশে খাল — নেভা থেকে বেরিয়ে আঁকাবাঁকা পথে শহরের মধ্যে হারিয়ে গেছে। খাসা জায়গা।

একতলা দোতলা তিনতলা জুড়ে হলের পরে হল, আর গ্যালারি। গুণতিতে তিন-শ। হলগুলো ভূঁয়ে নামিয়ে যদি পাশাপাশি বসানো যায়, হিসাব করে দেখা হয়েছে, লম্বায় আড়াই মাইল যাবে। সোনালি কাজকর্ম। থামগুলো পুরো এক এক পাথর কেটে তৈরি। নগ্ন নারী ও পুরুষ মূর্তি — সেকালের বনেদি ধাঁচের গৃহ-সজ্জা। ঘরে ঘরে শিল্পবস্তু ভরতি — মোটামুটি দুই মিলিয়ন গুণতিতে।

প্রথম পিটারের স্বর্ণখচিত গাড়ি। অতিকায় আলো। রাজকীয় সমারোহের নানা ছবি। সম্রাটের বিশাল ছবি। ফরাসি, ইতালীয়, ডাচ ও স্প্যানিস ছবি। আঠারো শতকের রুশীয় সংস্কৃতির নানা নিদর্শন।

বিপুলায়তন এক একটা ঘর শেষ করে করিডরে এসে পড়বেন। অপরূপ সাজানো। নেভা ঝিকমিক করছে ঐ। বসে একটু বিশ্রাম নিন, ধকল তো কম নয়।

রকমারি ঘড়ি — নানা যুগের, নানা প্যাটার্নের। গাছের ডালে মণিমাণিক্যের ময়ূর — ময়ূর কেমন পেখম দোলায় ঐ দেখুন। মোজেয়িকে বানানো ছবি — ছোট-বড় বিস্তর।

দোতলায় বাগান। ছাতের উপর সাত ফুট মাটি ফেলে তার উপর রকমারি ফুল ও ফল লাগিয়েছে, ফোয়ারায় জল ঝরছে। নেভা নদী দেখুন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই স্বপ্নময় পরিবেশে।

সবুজ পাথরের বৃহৎ সেকেলে পাত্র। এই পাথর উরল পর্বত থেকে নিয়ে এসেছে। তের-চোদ্দ শতকের ইতালীয় শিল্পকর্ম, আসবাবপত্র, অগ্নি-আধার, বাক্স, দরজা। ফ্লোরেন্সের কাজ। চিনামাটির হরেক মূর্তি।

বাইবেলের নানা ঘটনার ছবি। ইতালীয় শিল্পীর আঁকা যীশুর অনেক ছবি, যীশুর মৃত্যুর পর শোকদৃশ্য। লিওনার্ডো দা-ভিঞ্চির মূল ছবি দু-খানা। ভ্যাটিকানের যাবতীয় ছবির নকল — কাপড়ে আঁকা। রামায়ণের ছবির নকল। সম্রাজ্ঞী দ্বিতীয়-ক্যাথারিন এই সমস্ত আঁকিয়েছিলেন। রাফায়েলের মূল ছবি — যোসেফ মেরী ও ছেলে; ডলফিন ও ঘুমন্ত ছেলে। মাইকেল এঞ্জেলোর মূর্তি। টিসিয়ানের ছবি — জীবন্ত, যেন কথা বলছে···

ভাগ্যে ছবিগুলো সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল লড়াইয়ের সময়। নয়তো কিছুই থাকত না। গ্যালারির উপরটা কাচে ঢাকা, ছবির উপর যাতে ঠিক মতো আলো এসে পড়ে। বোমা পড়ে উপরের কাচ চুরমার হয়ে আগুন ধরে গিয়েছিল। আবার সব ঠিক হয়েছে, বুঝতেই পারবেন না এখন।

এথেন্সের শিল্পীদের গড়া মূর্তি ও ছবি। পাথর কুঁদে কী সব অপূর্ব মূর্তি বের করেছে! সতের শতকের ফ্লেমিশ শিল্প। ভ্যানডাইকের আঁকা ছবি, ভ্যানডাইকের নিজের ছবি। রোঁদার ছবি। একটা ছবি — মুমূর্ষু বন্দী বাপকে মেয়ে বুকের দুধ খাওয়াচ্ছে। কী সুন্দর!

রেমব্রান্টের পুরো একটা ঘর। তাঁর স্ত্রীর ছবি। যীশুর দেহ ক্রুশ থেকে ঝুলছে। ম্যাডোনা। শিশু যীশু অঘোর ঘুম ঘুমাচ্ছে। বাইবেলের সেই ছবি — বেহিসাবি ছেলে ফিরে আসছে। রেনোয়ার আঁকা ছবি। একটা ছবি সামনে দিয়ে দেখলে একেবারে ঝাপসা — কুয়াসায় আচ্ছন্ন। বেশ খানিকটা দূরে গিয়ে তাকালে কুয়াশার আড়াল থেকে সেতু দেখা দেবে। সকল দেশের ছবি আছে, কেবল রুশীয় ছবি নেই — সে আছে পৃথক মিউজিয়ামে। ছবির অন্ত নেই — যত নাম-করা জিনিস জড়ো করেছে। মূল-ছবি না মিলল তো চেষ্টাচরিত্র করে নকল নিয়ে এসেছে।

নাইটদের বর্ম। একটার ওজন পঞ্চাশ পাউণ্ড — এই বস্তু গায়ে চড়িয়ে লড়াই করত। চাষী ও নাগরিকরা বিভিন্ন যুগে যে সব অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করেছে, তার অনেকগুলো। কচ্ছপের খোলার টেবিল। রূপার রকমারি মদ্যপাত্র। সিল্কের উপর সোনার তারে বাঁধা ছবি। ভলতেয়ারের মূর্তি — অবিকল বাঙালি টুলো-পণ্ডিতের মতো।

ভারতের শিল্পকর্ম একটা ঘরে। নানা রকমের কাপড়। আঠার শতকের অস্ত্রশস্ত্রের সংগ্রহ। এক ব্রিটিশ-মিউজিয়াম ছাড়া এ সব অন্য কোথাও নেই।

রূপার কাজকর্ম-করা কফিন এক সেনাপতির স্মৃতিতে; তিন হাজার পাউণ্ড রূপা লেগেছিল। আঠারো শতকের ছাপাখানা। দরবার-ঘর — প্রথম-পিটারের সিংহাসন। পুরানো পতাকা; সে আমলের সৈন্যদের পোশাক।

অভ্যর্থনা-ঘর -- এই ঘরে শুধুমাত্র জার বসবেন, আর কেউ বসতে পাবে না ; ছাত আর মেজে অবিকল এক রঙের। পাথরের টুকরোয় এক ম্যাপ বানিয়েছে এই সেদিন -- ১৯৩৭ অব্দে। নানা রঙের পঁয়তাল্লিশ হাজার টুকরো পাথর লাগল এই কাজে।

মণিমাণিক্যের ঘর। তিন হাজার বছর আগেকার গয়না ককেশাস অঞ্চলে কবর খুঁড়ে পাওয়া। সোনার বল্গা-হরিণ ও ঘোড়া -- একটা নদীর পাড় ভাঙছিল, সেইখানে সমস্ত পেয়েছে। সাইবেরিয়া অঞ্চলের প্রাচীন অনেক গয়না -- ক্রিমিয়ায় পাওয়া গেছে। হীরা-বাঁধানো ছড়ি, আংটি।

রুশ জাতটা ধরেই থিয়েটার-পাগলা। মস্কো শহরে চুয়াল্লিশটা থিয়েটার -- সে তো শুনেছেন। শহর যত ছোট হোক, থিয়েটার দুটো-চারটে থাকবেই। যে জায়গায় যাচ্ছি, নিতান্ত সময়ের অকুলান না পড়লে থিয়েটার-হল এক-নজর দেখাবেই।

এই দেশেরই লেবেদিয়েভ (গেরাসিম স্তেপানোভিচ লেবেদিয়েভ) বাংলা থিয়েটার করলেন কলকাতায় গিয়ে। সে কি আজকের কথা -- দেড়-শ বছরের উপর হয়ে গেছে। ২৭ নভেম্বর, ১৭৯৫। তারিখটা সোনার অক্ষরে লিখে রেখে দিন। তার আগে বাংলা নাটকের অভিনয় হয় নি। অন্তত পক্ষে পুথিপত্রে কোন রকম নিশানা পাইনে।

লেবেদিয়েভ বিস্তর কষ্ট করে বাংলা শিখলেন। বাংলা ভাষার একটা ব্যাকরণই লিখে ফেললেন -- বাংলা শিখতে তাঁর মতন এত কষ্ট আর কারো যেন করতে না হয়। লণ্ডন শহরে যে রুশ-রাষ্ট্রদূত ছিল, তার কাছে চিঠি লিখছেন : অনেক যত্নে আমি বাংলা ভাষা ও সাহিত্য কিছু কিছু শিখেছি। আমার এই সাধনার ফল স্বদেশে প্রচার করতে চাই। হিংসুটে ইংরেজ কিছুতে তা হতে দেবে না। যেমন করে পার, আমায় দেশে ফিরবার বন্দোবস্ত করে দাও।

ইংরেজের রাজত্ব -- রাশিয়ার সঙ্গে রাজনীতিক সামাজিক কোন রকম সম্পর্ক ভারতের নেই। তবু ভালবেসে শিখে নিলেন তিনি বাংলা ভাষা। নাটকের সঙ্গে ভারতচন্দ্রের কাব্যের আবৃত্তি করতেন সুর-লয় যোগে। রুশ ভাষায় ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের তর্জমা করলেন। ইউরোপীয় ভাষায় বাংলা বইয়ের সেই সর্বপ্রথম তর্জমা। বাংলা অভিধান ও কথোপকথনের বই, বীজগণিত এবং বাংলা পঞ্জিকার কিছু কিছু তর্জমা হল। সংস্কৃত, বাংলা ও মিশ্র হিন্দির সুভাষিতাবলীও অনেক তিনি সংগ্রহ করলেন।

যে বাংলা নাটক অভিনয় হয় সেটা ডিসগাইজ (Disguise) নামক ইংরেজি কমেডির তর্জমা। লেবেদিয়েভ নিজে তর্জমা করেন। দুই রাত্রি অভিনয় হল — চার-শ লোকের মতন জায়গা, সেখানে তিলধারণের ঠাঁই নেই। বাঙালি অভিনেতা দিয়ে অভিনয় হল; পালার মধ্যে একটিও ইংরেজি কথা থাকতে দেওয়া হয়নি।

এই দেখুন, থিয়েটারের কথায় কথায় কতদূর এসে পড়লাম। আজ বিকালে নিয়ে চলেছে কিন্তু থিয়েটার-হলে নয়, যাঁরা সব একদা থিয়েটার করতেন তাঁদের বাড়িতে।

জায়গার ইংরেজি নাম — হাউস ফর ভেটারন থিয়েট্রিক্যাল আর্টিস্টস। কড়া বাংলায় ব্যাখ্যা করলে দাঁড়াচ্ছে — অবসরপ্রাপ্ত নাট্যশিল্পীদের আশ্রয়সদন। নেভার পুল পার হলাম। তারপর খালের পর খাল পার হয়ে শহরতলী-মুখো যাচ্ছি। খালধারে বিস্তর কাঠের গোলা। কলকাতার নিমতলা অঞ্চলে যেমন দেখতে পান। কাঠ সাজিয়ে পাহাড় বানিয়েছে। খালের জলে গাছের গুঁড়ি ভাসছে বিস্তর — জল থেকে এখনো ডাঙায় তোলা হয় নি। অনেক দূরের জঙ্গল থেকে গাছ কেটে নদী-খালে ভাসিয়ে ভাসিয়ে নিয়ে আসে।

বিস্তর অলিগলি ঘুরে পুনশ্চ এক খাল পেয়ে গেলাম। খালের পাশে পাশে চলেছি। সূর্য আজ সারা দিন মুখ দেখান নি, দিনভর টিপটিপে বৃষ্টি। হঠাৎ চেপে এলো বৃষ্টিটা — মুষলধারে ঢালছে। তারই মধ্যে সেই খাল-ধারে আমাদের গাড়িগুলো থেমে দাঁড়াল। জন কয়েক বুড়োথুথ্‌ড়ে মানুষ — তার মধ্যে মহিলাও আছেন — অবিরল ধারার মধ্যে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ভিজছেন। গাড়ি থামতে অদূরের বাড়ি থেকে আরও বিস্তর বেরিয়ে এলেন। হাত ধরে ধরে পরম সমাদরে সকলকে নামাচ্ছেন — শ্বশুরবাড়ি নতুন জামাইরা এসে পৌঁছল যেন।

দোতলার হল-ঘরে নিয়ে বসাল। ওখানকার যত বাসিন্দা, কারো আসতে আর বাকি নেই। সবাই বুড়োবুড়ি, পলিতকেশ সকলের। ঘর বোঝাই সোফা-চেয়ার — তবু কম পড়ে যাচ্ছে। আমরা ওঁরা দু-তরফে মিলে গুণতিতে অনেক। তা দেখলাম, বুড়ো হলে কি হবে — গায়ে দস্তরমতো তাগত আছে, এঘর ওঘর ছুটোছুটি করে সবাই চেয়ার টেনে নিয়ে আসছেন। খুনখুনে এক বুড়ো আবলুস কাঠের যে গন্ধমাদন অবলীলাক্রমে মাথায় বয়ে নিয়ে এলেন — হলপ করে বলছি, মুখে বলিরেখা, কোটরের ভিতরের চোখ, শনের মতন চুল — সমস্ত ছদ্মবেশ ওঁদের। থিয়েটারে যে কায়দায় পঁচিশ বছরের ছোঁড়া পঁচাশি বছরের বুড়ো সেজে আসেন।

নাট্যশিল্পীদের আশ্রয়-সদন।—শুনছি এখানকার ব্যাপার (পৃ. ২০৫)

নেভানদীর তীরে। নেভার জোলো হাওয়া গা কেটে কেটে যেন
হাড়ের ভিতর অবধি শীত বসিয়ে দিচ্ছে (পৃ. ২১১)

জমিয়ে তো বসা গেল। শুনছি এখানকার ব্যাপার। থিয়েটারের তিন গোত্র — অপেরা, ব্যালে ও ড্রামা। তারই কোন এক গোত্রের মানুষ হওয়া চাই, তবে এখানে ঠাঁই মিলবে। এবং হবেন বুড়োমানুষ — মেয়ে হলে নেহাত পক্ষে পঞ্চাশ, পুরুষ হলে পঞ্চান্ন। তার আগে ঢোকবার এক্তিয়ার নেই। আমাদের দেশে নাক সিঁটকান — ঐ লোকটা থিয়েটার করত এক সময়, আজকে তার অবস্থা দেখ। এ দেশে ঠিক উল্টো রেওয়াজ — তাদের এক রকম মাথায় তুলে নাচায়। আহা, আমাদের কত সন্ধ্যা আনন্দে ভরে দিয়েছ, কত রসের জোগানদার! আজকে বয়স হয়ে অশক্ত হয়ে পড়েছ বলেই কি ভুলে যাব তোমাদের? জাত ধরেই কৃতজ্ঞ, সরকার মোটা পেনশন দেয়। এ কিন্তু আজকের সাম্যবাদী রাশিয়া বলে নয় — অনেক আগে জারের আমল থেকেই। যে হাউসে এসেছি, এর প্রতিষ্ঠা ১৮৯৮ অব্দে। এই থেকে বুঝতে পারছেন।

আত্মীয়জন তেমন যদি না থাকে, নাট্যশিল্পীরা এখানে এসে ওঠেন। ছেলেপুলের ঝামেলা না থাকলে অনেক স্বামী চলে আসেন স্ত্রীকে ফাউস্বরূপ সঙ্গে নিয়ে। স্ত্রীরাও তেমনি আবার এসে ওঠেন নিজ নিজ স্বামী-পুঁটলি সহ। বেড়ে মজায় রয়েছেন — সেকালের সেই থিয়েটারি জীবনের মতোই। পায়ের উপর পা চাপিয়ে দিবারাত্রি বিশ্রাম-সুখ নিচ্ছেন, এমত বিবেচনা করবেন না। কেউ কেউ আত্মজীবনী লিখছেন — এই মোটা হিজিবিজি খাতা দেখিয়ে দিলেন। ওর মধ্যে নানান খবর থিয়েটার-জগতের — বিস্তর গুহ্যকথা ও তত্ত্বকথা। চলতি থিয়েটারের সঙ্গেও যোগাযোগ আছে কারো কারো — অভিনয় করেন না, নতুন আমলের অভিনেতাদের অভিনয় শেখান, বিবিধ উপদেশ ছাড়েন। প্রাপ্তি কিছুই নয় — বিনি-মাইনে আপ-খোরাকি।

হাউস চালানোর সমস্ত রকম দায় এঁদের। সরকার শুধুমাত্র টাকা দিয়ে খালাস। অশন আর বসন হলেই হবে না — এতে মানুষ বাঁচে না, বিশেষ এই সব শিল্পীমানুষ। বিরাট লাইব্রেরি আছে, চুপচাপ পড়াশুনো করো বসে বসে। আছে রকমারি বাদ্যযন্ত্র, সোরগোল করে যত খুশি বাজাও — অনেকখানি জায়গা নিয়ে কম্পাউণ্ড, পাড়ার লোকের তেড়ে এসে পড়বার শঙ্কা নেই। দেয়াল ছবিতে ছবিতে ঠাসা। মেঝের উপর এঁরা সব জমিয়ে বসেন — আর দেয়ালে এঁদের মাথার কাছে আগের অভিনেতা-অভিনেত্রী এবং সুরকারেরা, আজকে যাঁরা জীবন্ত নেই।

পুরানো প্রতিষ্ঠান — আগেই শুনিয়ে দিয়েছি। সৈবনা (Saibna) নামে এক অভিনেত্রী সারা জীবনের সঞ্চয় দিয়ে এই আশ্রয়-সদনের পত্তন করেন। বুড়ো হলে নটনটীর আর কদর থাকে না, কষ্টে পড়ে যায়। বুড়ো-

থুথ্‌থুড়েকে কে স্টেজের উপর দেখতে চায়? গলাও থাকে না তখন। তার জন্য এক সমিতি গড়া হল—নটনটীর অধিকার-রক্ষা সমিতি। শিল্পীরা বুড়ো বয়সে যাতে নিশ্চিন্ত আরামে থাকতে পারে, সেই হল সমিতির কাজ। এই কাজে জনসাধারণ দু-হাতে টাকা দিলেন। বিপ্লবের পরে আর কোন ঝামেলা রইল না, কাউকে এখন টাকা দিতে হয় না। স্টেট সমস্ত ভার বইছে। স্টেট বলতে পুলিশে-ঘেরা বিশেষ কয়েকটা অট্টালিকার জন কয়েক ঝানু ব্যক্তি নয়—স্টেট মানে জনসাধারণ। জনসাধারণ তাদের স্টেটের মারফতে এই সদন চালাচ্ছে। চালাচ্ছে রাজসূয় প্রণালীতে। প্রতি লোকের জন্য মাসিক তেরো-শ থেকে চোদ্দ-শ রুবল খরচ—আমাদের টাকায় পনের-শ ষোল-শ'র মতন। বুঝুন এবারে। লেলিনগ্রাডের এই হাউসে এখন এক-শ পঁচাত্তর জন আছেন, তন্মধ্যে এক-শ'র উপর মেয়ে। প্রায় প্রমীলা-রাজ্য বানিয়ে ফেলেছে। তবে লোলচর্মা ন্যুব্জদেহা প্রমীলারা—এইটে বড় চোখে লাগে।

থিয়েটার-শিল্পীর আশ্রয়-সদন এই একটি মাত্র নয়, মস্কোতেও আছে। আর থিয়েটারের মানুষ বলে নয়—বুড়োমানুষের আশ্রয়-সদন সোবিয়েত দেশময় ছড়ানো। কতক আছে পেশা হিসাবে আলাদা করা—এই একটায় যেমন এসেছি। আবার সাধারণ সদনও বিস্তর আছে—যে কোন বুড়োবুড়ি গিয়ে উঠতে পারেন। এতে কুলায় না—নতুন নতুন সদন দিনকে দিন বাড়ানো হচ্ছে।

সেকালের নাম-করা ব্যালেরিনা নাম-করা গায়ক কত জনের সঙ্গে আলাপ হল। লাখ লাখ মানুষ একদা পাগল হত তাঁদের নামে। আজকে নির্জন অন্তহীন অবসর—পাদপ্রদীপের আলো জ্বলে না, নামই জানে না নতুন কালের মানুষ যারা থিয়েটারে যায়। টুংটাং পিয়ানো বাজিয়ে সেকালের এক-আধ কলি হঠাৎ গেয়ে ওঠেন কখনোসখনো—দেয়ালে ছাতে একটুকু রণিত হয়ে মিলিয়ে যায়।

এক ভদ্রলোক একেবারে নতুন এসেছেন। দস্তুরমতো সচ্ছল অবস্থা—এখানে আসবার মতন নয়। ছিলেনও এতদিন বাড়িতে। কিন্তু বিষম একঘেয়ে লাগছিল, টিকতে পারলেন না, সমস্ত ছেড়েছুড়ে দলের মাঝখানে চলে এসেছেন। বললেন, দিনরাত স্বপ্নের মধ্যে রয়েছি যেন মশায়। আমোদ-উৎসব রোজই কিছু না কিছু আছে। মরার কথা আর মনে আসে না। কিন্তু আমার মতো লোককে এখানে কায়েমি হয়ে থাকতে দেবে না, দু-দশ দিন পরে বিদায় করে দেবে। ঐ একটা ভাবনায় বড় মুসড়ে আছি, অন্য কিছু মনে আসে না।

কত দূর থেকে গিয়েছি আমরা, কত কি দেখাবার আছে। তাই নিয়ে দুঃখ

করছেন। বৃষ্টি আর দিন পেলো না, আজই চেপে পড়েছে। আপনাদের এর মধ্যে কেমন করে বের করি বলুন তো ?

তবু ছাড়লেন না শেষ পর্যন্ত। ওই আদি-বাড়ির পাশে অনেকটা জায়গা নিয়ে নতুন বাড়ি। জল ছপছপ করে সেখানে পাকড়াও করে নিয়ে চললেন।

নতুন বাড়ি ঢুকে চোখে আর পলক পড়ে না। রাজ-অট্টালিকা। পার্ক লেক ফুলবাগান -- যত রকমে সাজানো যায়, খুঁত রাখে নি। চেয়ারে চেয়ারে সোনালি কাজকর্ম। দেয়ালের কুলুঙ্গিতে ভাস্করের পাকা হাতের নানা মূর্তি। এ-ব্লক ও-ব্লক ঘিরে টানা-বারাণ্ডা চলে গেছে। বারাণ্ডার লাগোয়া ঘর। উঁকি-ঝুঁকি দিয়ে দেখতে পাচ্ছি -- ঘরে ঘরে রেডিও, খাটপালঙ্ক, ছবিতে ছবিতে ছয়লাপ। যারা পঙ্গু ও ব্যাধিগ্রস্ত, তাদের জন্য আলাদা জায়গা এই নতুন বাড়িতে ; সকলের সঙ্গে একত্র থাকতে দেয় না। নিচের তলায় ডাক্তারখানা, হাসপাতাল। চিকিৎসা বাবদে এক পা বাইরে যেতে হয় না। এক বাড়ির ভিতরে সমস্ত।

চা-টা খেয়ে যাবেন কিন্তু আপনারা। উঁহু, ঘাড় নাড়লে ছাড়ছিনে। আপনাদের ভারতের কত কথা শুনেছি! ছবিও দেখেছি। গাছপালায় সবুজ শান্তস্নিগ্ধ এক আশ্চর্য রোমান্টিক দেশ। আমাদের কত পালার মধ্যে ভারতের নাম এসেছে কতবার। এক মহিলা বললেন, যৌবন বয়স থেকে আমার বড় সাধ রহস্যময় বিচিত্র ভারতবর্ষ দেখে আসব। সে তো হবে না আর জীবনে -- আপনাদের কাছে বসে গল্পগুজব করে সেই সাধ মেটাই আজ খানিকটা। পালাতে দেব না।

কি বলবেন আর এর পরে ? এরই মধ্যে ঐ আদি-বাড়ির খানাঘরে টেবিল সাজানো হয়ে গেছে। রাক্ষুসে আয়োজন -- দেখে আঁৎকে উঠতে হয়। ধরে ধরে নিয়ে বসিয়ে দিল। কতই তো নিমন্ত্রণ খেয়েছি, কিন্তু মৃত্যুর দরজায়-দাঁড়ানো রূপশিল্পীদের এই সমাদর অন্য কোথায় পাব ? ভারতীয় সিনেমা-দল — যাঁদের দেখা আগে পেয়েছেন -- এই লেনিনগ্রাডেও তাঁরা ইতিমধ্যে ঘুরে গেছেন। সেই গল্প উঠল। ভারতের ছবির প্রদর্শনী হয়েছিল, এঁদের অনেকে দেখে এসেছেন গিয়ে। সৌরকরোজ্জ্বল ভারতের রূপ দেখে এলেন ছবির ভিতরে। ভারতের সুখসৌভাগ্য কামনা করে ভারতের বন্ধুত্ব স্মরণ করে পাত্রের পর পাত্র চলল। ও রসে বঞ্চিত আমরা ক'টি গোবিন্দদাস — ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছি।

খাওয়া অন্তে হুল্লোড় লেগে গেল। এ বলে, এদিকে আসুন ; ও বলে,

ওদিকে চলুন। যে যার ঘরে নিয়ে গিয়ে দেখাবে। চুরাশি বছরের এক বুড়া ক-জনকে নিয়ে বসিয়ে বাক্স খুলে অতিকায় এলবাম বের করলেন। কিশোর বয়স থেকে কত পালায় কত রকম অভিনয় করে এসেছেন, সেই সব ছবি। আর এক বুড়ি — বয়স সত্তরের নিচে হবে না, গাল ও চোখের নিচে চামড়া ঝুলে পড়েছে -- হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে ঘরে নিয়ে দেয়ালে-টাঙানো মহিমান্বিত এক সম্রাজ্ঞীর ছবি দেখাচ্ছেন আমায়। দেখ, চিনতে পারছ? আমি — আমিই সাজতাম চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বছর আগে। স্তম্ভিত হয়ে যাই। ঢলঢল পরিপূর্ণ-যৌবনা কোন অপরূপার আশ্চর্য ছবি। ছবির মুখোমুখি বীভৎসদর্শন এই বৃদ্ধা। শঙ্করাচার্যের মোহমুদ্গর সামনাসামনি যেন তুলনা করে দেখানো। একবার ছবির দিকে আর একবার ঐ স্থবিরার মুখে মিলিয়ে মিলিয়ে দেখছি।

রাত্রিবেলা ডিনার সেরে নৃত্যনাট্য দেখতে গিয়েছি। পালা হল লাল-পপি। ব্যালে ও প্যাণ্টোমাইম একসঙ্গে -- অর্থাৎ নাচ আর মূক-অভিনয়। দৃশ্যপটের ভারি জাঁকজমক -- নাচ দেখবেন কি, সিন দেখেই থ বনে যাবেন। ঘুরন্ত-মঞ্চ নয় -- কিন্তু আলো আর পর্দা খেলিয়ে আশ্চর্য গতিবেগ আনে, মায়ারহস্য ঘনিয়ে তোলে।

আমেরিকা থেকে মালের জাহাজ এসেছে চীনের বন্দরে। কুলিরা মাল নামাচ্ছে, বড় কষ্ট তাদের। নানান দায়-দরকারে বিস্তর লোক জাহাজঘাটায় আনাগোনা করছে। ঘাটের এক দিকে ফলের দোকান। রিক্সা চেপে মালিক দেখা দিল। রিক্সাওয়ালা বকশিস চাইল তো লাথি। অন্ধকার হল স্টেজ, জালের এক পর্দা পড়ল। আলো জ্বললে দেখি, খুব নাচ ও আমোদস্ফূর্তি। আর পিছনে জালের ফাঁক দিয়ে দেখা যায়, ক্লান্ত কুলিরা জাহাজের মাল নামাচ্ছে। ছুটোছুটি, বিষম ব্যস্ততা সেদিকে।

নায়িকা সব চেয়ে ভাল নাচে। মালিক নাচের ভিতরেই হাত ধরে টেনে নিয়ে তাকে পাশে বসাল। জাহাজঘাটে বিষম গণ্ডগোল হঠাৎ। নাচের মেয়ে ছুটল সেদিকে। অন্ধকার।

জালের পর্দা নেই এবার, স্পষ্টাস্পষ্টি জাহাজঘাট। কুলি-সর্দার রুখে দাঁড়িয়েছে (সর্দার হল মাও-সে-তুঙের প্রতীক — চীনা দালাল মালিকের হয়ে ছুটো-ছুটি করছে, সে হল চিয়াং কাইশেক)। সৈন্যদল ছুটে এলো, কিন্তু জনতার রোষের সামনে উদ্যত বন্দুক সরিয়ে নেয়। নায়িকা চলে এসেছে এই কুলিদের মধ্যে। নেচে নেচে তাদের মনে আগুন ধরিয়ে দেয়। ফুল দিল

মেয়েটাকে—লাল রঙের পপিফুল। জাহাজের লোকেরাও নাচে এসে যোগ দেয়।

ক্লাসিক্যালের সঙ্গে আধুনিক নাচ মিলিয়ে দিয়েছে। পালা শেষ হলেও লোকে ছাড়বে না—উঠে দাঁড়িয়ে কেবলই হাততালি। পাগল হয়ে সম্বর্ধনা জানাচ্ছে—পর্দা সরিয়ে শিল্পীদের বারম্বার বেরিয়ে আসতে হয়।

জালিয়ানওয়ালাবাগে এক সন্ধ্যায় মগ্ন হয়ে বসে ছিলাম। বুলেটের ক্ষত দেয়ালে দেয়ালে, গাছের গুঁড়িতে—সেগুলো যত্ন করে রেখেছে। আর সেই কূয়া -- যার মধ্যে আতঙ্কিত শত শত মানুষ ঝাঁপিয়ে পড়ে। তবু বাঁচে নি।

জারের প্রাসাদ-অঙ্গনে ঘুরতে ঘুরতে জালিয়ানওয়ালাবাগের কথা মনে এসে যায়। ১৯০৫-এর রক্তাক্ত রবিবার। জারের কাছে দরখাস্ত নিয়ে এলো বিপুল জনতা। জারের দলেরই কেষ্টবিষ্টু একজন বুদ্ধি দিয়েছেন : সোজাসুজি চলে যাও, সুবিধে হবে। চলেছে তারা -- হাতে আইকন, জারের ছবি। দয়ার প্রার্থী, অস্ত্রহীন, অসহায় -- তাদের উপর রাইফেলের আগুন। জার-তন্ত্রের সমাধি রচিত হল সেই রবিবার। একটা মেয়ে কারেলিনা চেঁচাচ্ছে -- স্ত্রীরা-মায়েরা নিষেধ কোরো না তোমাদের স্বামী-ছেলেদের। জীবন দিক তারা মহৎ কাজে। কেঁদো না, গিয়েই থাকে যদি কারও জীবন। সবাই একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল, আছি -- এই যে আছি আমরা। এক হাজারের বেশি মানুষ ঐ উঠানে পড়ে গেল। কত বাচ্চা, কত মেয়েলোক তার ভিতরে।

ঘুরতে ঘুরতে অনেক বেলা হয়ে গেল। হোক -- বেলা না হলে য়্যুনিভার্সিটি খোলে না। গলির মোড়ে এক ভিখারি দেখলাম। এদিক-ওদিক তাকায় আর ভিক্ষা চায়। ভিক্ষাবৃত্তি কিন্তু আইনে মানা, পুলিশে দেখলে ধরে নিয়ে যাবে। সোবিয়েত রাজ্যে মোটমাট দেড় জন ভিখারি চোখে পড়েছে আমার। এই একটি, আর মস্কোর রাস্তায় ময়লা ছেঁড়া-কাপড়ে হঠাৎ একজন সামনে এসে চক্ষের পলকে আবার উধাও হয়ে গেল। সেই লোকের সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কেউ বললেন, ভিখারিই বটে, পুলিশের আঁচ পেয়ে ভেগে পড়ল। মতান্তরে, সেকেলে বুড়ো মানুষ — বিদেশিদের দেখে কৌতূহল ভরে একটুকু দেখে নিল। অ্যাম্বাসিতে গল্পে গল্পে একদিন তুলেছিলাম কথাটা। তোমরা কি বলো ?-- হতে পারে ভিখারি। ভিখারি কেন, পকেটমারও আছে।

মেয়েদের হাতের ব্যাগ ছিনিয়ে নেয় — এমনও ধরা পড়েছে। আইন থাকলে কি হবে, আইন ফাঁকি দেবার মানুষ-ও থাকে। বয়স হয়ে গিয়ে পেনশন পাচ্ছে, আয় কম হয়ে গেছে — আর মদ খাওয়াটা বড্ড চালু এদেশে, হয়তো বা পেনশনের টাকা ফুঁকে দিয়ে অন্ধকার দেখছে এখন। তখন আর কাণ্ডজ্ঞান থাকে না।

লেনিনগ্রাড য়্যুনিভার্সিটি আমার বড় আপন মনে হল। বিশেষ করে প্রাচ্যবিদ্যা-অনুশীলনের যে বিভাগ আছে। কোথায় আমার বাংলাদেশ, আর কোথায় এই ফিনল্যাণ্ড-উপসাগরের উপান্তে প্রাচীন বিদ্যামন্দির। টিপটিপ বৃষ্টি পড়ছে, নেভার জোলো হাওয়া গা কেটে কেটে যেন হাড়ের ভিতর অবধি শীত বসিয়ে দিচ্ছে। কোন কিছুতে কাতর নই। বড় বড় হল আর করিডরের ভিতর ঘুরে ঘুরে দেখে বেড়াচ্ছি।

এই ১৯৫৪ অব্দে প্রাচ্য-বিদ্যা বিভাগের নিরানব্বুই বছর বয়স পুরল। আগামী বছর শতবার্ষিক উৎসব। ভারতের আধুনিক ভাষার মধ্যে বাংলা হিন্দি উর্দু মারাঠি ও পাঞ্জাবি — পাঁচটা ভাষা পড়ানো হয়। প্রাচীন ভাষার মধ্যে পালি প্রাকৃত ও সংস্কৃত। ভারতের বাইরের চীন আরব তুর্ক ইরান কোরিয়া জাপান প্রভৃতি স্থানের ভাষা।

ভারতীয় ভাষার মধ্যে, যতদূর খবর পাই, সকলের আগে এবং সব চেয়ে দরদের সঙ্গে শিখতে শুরু করে বাংলা। বাংলার সে প্রভাব নেই এখন, মিইয়ে আসছে। হিন্দি-উর্দুর উপরে জোর। শিরে রাষ্ট্রভাষার পাগড়ি — হবেই তো! এই য়্যুনিভার্সিটির ডক্টর বরন্নিকভ মহাভারত ও তুলসীদাসের রামায়ণের রুশীয় অনুবাদ করেছেন। আরও বিস্তর সাহিত্যকীর্তি আছে তাঁর। বৃদ্ধ অধ্যাপক গত হয়েছেন, ছেলে বরন্নিকভ ইদানীং উর্দু-হিন্দির অধ্যাপক।

প্রাচ্য ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপিকা ভেরা নভিকভা — মোটাসোটা গোলগাল চেহারা, আর দশটা রুশ-মেয়ের মতো সাজসজ্জায় একেবারে উদাসীন। বাংলা শেখানোর ভার তাঁর উপরে। দশটি ছাত্র-ছাত্রী বাংলা ক্লাসে। আর নিতে পারছেন না, একা ক-জনকে সামলাবেন? বাংলা ছাড়া পাঞ্জাবির ভারও তাঁর উপর। এবং আরও কি কি — সঠিক এখন মনে পড়ছে না। পাঁচ বছরের কোর্স — তারপরে ডিগ্রি দেওয়া হয়। ডিগ্রি নিয়ে কাজকর্মে চলে যায় — শত শত মিউজিয়াম আছে, তাদের প্রাচ্য বিভাগে; প্রাচ্যের নানা দূতাবাসে; বিভিন্ন লাইব্রেরিতে; একাডেমি অব সায়ান্সের কাজে। সরকারের প্রাচ্য-পুস্তক প্রকাশন বিভাগ আছে, তার জন্যেও বহু লোকের দরকার। পাশ-টাশ

করে প্রাচ্য ব্যাপারের গবেষণা করে অনেকে; নানা সাময়িক পত্রে সেসব ছাপা হয়।

সাতটি ছেলেমেয়ে এবারের পঞ্চম শ্রেণীতে। তারা পাশ করে যাচ্ছে, আগামী বছর মাস্টার হতে পারবে তাদের গুটিকয়েক। বাংলার ক্লাস তখন আর-কিছু বড় করা চলবে।

নভিকভা নিজে দশ বছর ধরে বাংলা শিখেছেন। শিক্ষক দাউদ আলি দত্ত, অথবা প্রমথনাথ দত্ত — যাঁর কথা আগে কিছু পেয়েছেন। কলকাতার এক দুঃসাহসিক ছেলে ১৯০৫ অব্দে বেরিয়ে পড়েন — বিদেশি শক্তির সঙ্গে যোগসাজস করে যদি ইংরেজ তাড়ানো যায়। কত দেশে ঘুরলেন, তুর্কি-রেজিমেন্টে ঢুকলেন মুসলমানি নাম দাউদ আলি নিয়ে। ফ্রান্স ও ইউরোপের আরও নানা তল্লাট ঘুরে অবশেষে রাশিয়ায়। রাজনীতি ছেড়ে শেষটা মহত্তর কাজে নামলেন — বাংলা শেখানো, মস্কো য়ুনিভার্সিটিতে বাংলার অধ্যাপক হলেন। রুশ মেয়ে বিয়ে করলেন — তিনি হলেন বীণা দত্ত কিম্বা নুরজাহান দত্ত, স্বামীকে যেমন যেমন প্রমথ অথবা দাউদ আলি বলবেন। দাউদ আলি এই সেদিন (১৯৫৩) দেহ রেখেছেন; মহিলা আছেন মস্কোয়। চোদ্দ-পনেরো বছরের ছেলে একটি; পড়াশুনো করছে। ভারত বিশেষ করে বাংলা দেশের সম্বন্ধে বীণা দেবীর ভারি আগ্রহ। কিন্তু মুশকিল হয়েছে ভারতীয় ভাষা একটিও জানেন না।

যাকগে, কি কথায় কদ্দুর এসে পড়লাম। এই প্রমথনাথের শিষ্যা নভিকভা। গুরুর নামে শ্রদ্ধায় মুখ জ্বলজ্বল করে উঠল। পুরানো কথা বলতে লাগলেন। আমার পোয়া-বারো। বাংলার শিক্ষিকা, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য ওঁর জীবন-সাধনা — আর আমি হলাম বাংলার পিশাতিয়েল, তদুপরি গুরুর জাতভাই বাঙালি। দৈবাৎ তাঁর মুঠোর মধ্যে এক কোহিনুর ছিটকে এসে পড়েছে, এমনি গতিক। কি ভাবে সমাদর দেখাবেন ভেবে পান না। আর যাঁরা এসেছেন, তাঁরা সবাই ছড়িয়ে গেলেন অন্য লোকের তাঁবে; নভিকভা আমায় ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছেন, যত কথাবার্তা আমারই সঙ্গে। লেনিন এই য়ুনিভার্সিটির ছাত্র; এইখানটায় বসে কাজ করতেন — এমনি সব স্মরণীয় জায়গা দেখে দেখে বেড়াচ্ছি।

আমার ছ-খানা বই নিয়ে এসেছি, মওকা বুঝে হাতে দিলাম। প্রাচ্য গ্রন্থাগারে থাকবে অন্যান্য বাংলা বইয়ের সঙ্গে। কতবার কত রকমে যে নাড়া-চাড়া করলেন। এত বই — তবু বইয়ের কাঙাল এঁরা।

ইতিহাসের ছাত্র হীরেন মুখুজ্জে মশায়। কথা তুললেন, ভারতের ইতিহাস কি ভাবে পড়ানো হয় সোবিয়েতে — কি রকম ভাষ্য হয়েছে ঐ দেশে

ভারত-ইতিহাসের ? ইতিহাস নিয়ে বড্ড ঝোঁক পড়েছে ইদানীং -- সম্প্রতি প্রাচ্য ইতিহাস ছাপা হয়ে গেছে। মুখে কি জবাব দেবেন, সেই বইয়ে সব পাওয়া যাবে।

অধ্যাপক ডক্টর কালিনিয়ভ এসে পড়লেন, ইতিহাসের আলোচনা আর এগুতে পারল না। সংস্কৃতে সম্ভাষণ করলেন আমাদের সকলকে; ঝরঝর করে সংস্কৃত বলে যাচ্ছেন। ভারতের মানুষ -- অতএব দেবভাষাটা বিশেষ ভাবে রপ্ত, এইটে ধরে নিয়েছেন অধ্যাপক। আমাদের ঘাম দেখা দিয়েছে, সংস্কৃতে জবাব দিতে হলে তো গেছি একেবারে! মাথায় অল্প টাক, সদাপ্রসন্ন রসিক সুপুরুষ -- গোটা রামায়ণখানার তর্জমা করেছেন সংস্কৃত থেকে রুশ ভাষায়। এমন দিক্‌পাল পণ্ডিত -- চালচলনে বুঝবার জো নেই। সাহেব হলে কি হবে, সংস্কৃত পড়ে পড়ে টুলো-পণ্ডিত বনে গেছেন। ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টো-পাধ্যায়ের সঙ্গে খুব ভাবসাব হয়েছে কেম্‌ব্রিজের এক ভাষাতাত্ত্বিক সমাবেশে। সুনীতিকুমারের কাছে কালিনিয়ভ শ্লোক লিখে দিয়েছিলেন -- ভারত-সোবিয়েত-মৈত্রী এবং বিশ্বশান্তির নামে এক পান-প্রস্তাব:

মৈত্রায় ভারতবর্ষ-সোবিয়েৎ ভূম্যোরনন্যায়।
পাত্রমুত্থাপয়াম্যহং শান্ত্যর্থং সর্বভুবনে ॥

সুনীতিকুমারই বা কম কিসে? তিনি পালটা শ্লোক ছাড়লেন:

শ্রীকল্যাণ-বিবর্ধনং শ্রেয়সঃ সাধনং তথা।
যদৈব কাময়ে হ্যহং রুষীয়াণাং শ্রবশ্চ বৈ ॥

['কল্যাণ' কথাটার সাধারণ অর্থ তো আছেই; আবার কালিনিয়ভ কল্যাণ হয়ে দাঁড়িয়েছেন। 'শ্রবঃ' হল গৌরব; এবং শ্লাভজাতি ও। 'শ্লাভার' অর্থ হল গৌরবময় জাত।]

শ্লোক দুটো আমার কাছে ছিল। শোনালাম। কালিনিয়ভ বললেন, শ্লোকের উৎস শুকিয়ে যায়নি আমার। দাও খাতা, তোমায় একটা বানিয়ে দিচ্ছি। আমার খাতায় নিজের হাতে দেবনাগরি হরফে লিখে দিলেন নতুন শ্লোক:

মৈত্রং চেদমবিভেদ্যং প্রজানামাবয়োর্মহৎ।
জীবতু জনতাভূত্যৈ জয়তু শাশ্বতী সমাঃ ॥

(কল্যানোভ, লেনিনগ্রাডে)

ভারতীয় ভাষায় লায়েক হওয়া চাট্টি কথা নয়। ঐ যে শুনলেন -- পুরো পাঁচ বছরের কোর্স। হিন্দি উর্দু ও বাংলা ভাষার ইতিহাস তো জানবেনই, ভারত সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞানও চাই মোটামুটি। ভারতের ইতিহাস শিখতে হবে -- প্রাচীন কাল থেকে এই হাল আমল। ব্যাকরণ শিখতে হবে। কোনটা

যে শিখবেন না, তা জানিনে। আচার্য বরন্নিকভ এই লম্বা-চওড়া সিলেবাস বানিয়ে গেছেন।

নভিকভা বলে যাচ্ছেন: ফার্স্ট ইয়ারে হল বক্তৃতা শোনা ও দরকার মতো নোট নেওয়া। ভারতবর্ষ দেশটা সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে যা-কিছু জ্ঞাতব্য সেই সম্বন্ধে, এবং ইতিহাস ও ভাষাতত্ত্ব নিয়ে বক্তৃতা হচ্ছে। সেকেণ্ড ইয়ার থেকে বই। বই দু-রকমের। এক হল, ওরা নিজেরাই নানা লেখার সঙ্কলন বের করেছে; আর হল, সেই সেই ভাষার মূল-বই। হিন্দিতে প্রেমচন্দ সুদর্শন এঁদের মূল-বই পড়ানো হয়; বাংলায় বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র। উর্দু ছাত্রেরা কিষানচন্দরের বইও পড়ে। এসব বলছি উনিশ-শ চুয়ান্নর খবর। এর পরে কি রদ-বদল হয়েছে জানিনে।

বললাম, বাংলা ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে মোলাকাত করব। চল।

নভিকভা চুকচুক করেন: তাই তো, খবরবাদ না দিয়ে এসে পড়লে। ক্লাস তিনটেয়। একটুকু খবর পেলে তারা সব ছুটে আসত। তিনটে অবধি থাকা চলে না তো তোমাদের!

তা কেমন করে? বাইরে দুর্যোগ—মেঘভরা আকাশ, টিপিটিপি বৃষ্টি, ঝোড়ো বাতাসে ঢেউ দিয়েছে নেভার জলে। দুপুরের খানাপিনা হয় নি। তা হলেও আমি থেকে যেতে রাজি। কিন্তু অন্য সবাই? বাংলা নিয়ে কী তাঁদের মাথাব্যথা বলুন।

য়ুনিভার্সিটি জায়গা—দুড়ুম-দাড়াম অবিরত বক্তৃতার বোমা ফাটে। কিছু খেল না দেখিয়ে আমাদেরও ছাড়ান নেই। বেলা হয়ে গেছে যে। তা হোক তা হোক, সংক্ষেপে দু-চার কথায় সারবেন। বক্তৃতা শুনে শুনে এরা যেন ক্ষেপে রয়েছে। যে আসে তাকে ধরবে, লাগাও বক্তৃতা। এবং কান উঁচিয়ে টপাটপ বসে পড়বে।

অগত্যা আমরাও ঠাঁই নিলাম সামনাসামনি। প্রথম হীরেন মুখুজ্জে মশায়। এ মানুষ দাঁড়ালে বুকের ছাতি ফুলে ওঠে। বক্তৃতা নয়, ঝিকমিকিয়ে কথার তারা কাটে যেন।

—হাল আমলের ভারতীয় লেখক বলতে আপনারা মুলুকরাজ আনন্দ, ভবানী ভট্টাচার্য, আব্বাস—এমনি ক'জনকে জেনে বসে আছেন। যে হেতু লেখেন এঁরা ইংরেজিতে। কিন্তু আসল সৃষ্টিই তো মূল-ভাষায়। সেই যথার্থ আধুনিক সাহিত্যের সঙ্গে আপনাদের যোগাযোগ নেই। ভারত-সোবিয়েত সংস্কৃতির মধুবন্ধনে বাঁধা পড়বে প্রধানত সাহিত্যের মারফতে। অতএব আপনারা একটুখানি তলিয়ে ভারতের সাহিত্য-মণিরত্নের সম্বাদ নিন।

একটু ভিন্ন কথা বলে নিতে হয় যে। হীরেন্দ্রনাথের বক্তৃতার গূঢ়তত্ত্ব বুঝবেন তা হলে। খেটেখুটে ওরা এক সঙ্কলন-বই বের করেছে — ভারত ও পাকিস্তানের গল্প। তাতে ওঁরাই সব জমিয়ে আছেন — ঐ মুলুকরাজ ইত্যাদি। কারো কারো গল্প চারটে পাঁচটা। বাংলা ছোট গল্প আজকে ভুবনের যে-কোন সাহিত্যের সামনে বুক ঠুকে দাঁড়াতে পারে। কিন্তু বাংলা গল্প একটিও নয়, বাঙালির লেখা গল্প সাকুল্যে একটি মাত্র স্থান পেয়েছে। ভবানী ভট্টাচার্যের গল্প। সেই কথা আমিও তুলেছিলাম মস্কোর সোবিয়েত লেখক-সমিতিতে। ওঁরাও সায় দেন : কি করা যায় বলুন। আমরা তো চাই ভাল ভাল লেখা — সঙ্কলনটা যাতে যথাযথ হয়। কিন্তু খবর জানিমে, অনুবাদের মাধ্যমে হালের কোন বাংলা লেখাই সামনে আসে না।

ব্যাপার তাই। বাংলায় লেখকরা আত্মতুষ্ট — বাইরে হৈ-চৈ করবার তাগত নেই। রুচিতেও বাধে হয়তো। নানান দেশ ঘুরে মোটের উপর বুঝে এলাম, রবীন্দ্রনাথের খুব প্রভাব — নিজে তিনি জগৎময় ঘুরেছেন, বিদেশির অনুরাগ তার ফলে আরও বেড়েছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পরে কি হচ্ছে, কেউ বড় জানে না। (শরৎচন্দ্রকেও প্রায় না জানার মতো)। বাংলা সাহিত্য নিজের ঘরে খিল এঁটে রইল, আজকের এই ছোট্ট দুনিয়ায় নড়ে চড়ে বেড়ায় না।

হীরেন মুখুজ্জের পর আমাদের ভিতরকার উর্দুওয়ালা একজন উঠলেন। দোভাষি উঠে উর্দু থেকে রুশীয় তর্জমা করে দিল। তারপর হিন্দিতে বললেন একজন। তাঁরও তর্জমা হল। এবারে পালা আমার। আমি লোকটা কম কিসে, স্বভাষা বাংলাতেই বলব। কিন্তু বাংলা দোভাষি নেই। তাই বুঝুন, কি রকম বেইজ্জতি আপনাদের বাংলার! অথচ ভারতীয় ভাষার মধ্যে ওদেশের মানুষ বাংলা শিখেছিল সকলের আগে, বাংলারই ছিল সকলের বড় খাতির। আজকের গতিক, সারা অঞ্চল চুঁড়ে একটি বাংলা দোভাষি মেলে না। নভিকভা বললেন, আস্তে আস্তে এবং খুব সহজ বাংলায় বলুন — দেখি আমি চেষ্টা করে।

সেই মনের ক্ষোভই আমি ব্যক্ত করছি : রবীন্দ্রনাথ অবধি মোটামুটি জানেন আপনারা। ১৯৩০ অব্দে তিনি এদেশে আসেন। আমরা, যারা সাহিত্য করি, তাঁরই মানস-সন্তান — এ যুগে তাঁর প্রভাব কাটিয়ে ওঠা সহজ নয়। রবীন্দ্রনাথের সেই ঘুরে যাবার পর তাঁর 'রাশিয়ার চিঠি' পড়ে কৌতূহল আরও উদগ্র হয়েছে আপনাদের সম্পর্কে; সাংস্কৃতিক সম্পর্ক গড়ে তোলবার লোভ বেড়েছে। ব্রিটিশ-আমলে হয়ে ওঠে নি, স্বাধীন গণতন্ত্রী ভারত এবারে সুযোগ-সুবিধা করে দিচ্ছে। দুনিয়ার সঙ্গে আজ আমাদের শান্তি ও সৌভ্রাত্রের সম্পর্ক।

এই জেনে রাখুন, রবীন্দ্রোত্তর বাংলা-সাহিত্য থেমে নেই। উজ্জ্বল ঐতিহ্যের অবমাননা হতে দিই নি আমরা। বলতে পারেন, কিঞ্চিৎ কূর্মবৃত্তি আমাদের — নিজের সাহিত্যবুদ্ধি ও সাহিত্যধর্মের মধ্যে মগ্ন হয়ে থাকতে ভালবাসি। শফরী সামান্য সম্বলে ভুবনময় ফরফরিয়ে বেড়ায়, তাতেই চোখ ঝলসে আছে আপনাদের, খাঁটি-সাহিত্যের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। আমরা যথাসাধ্য সাহায্য করব। খান কয়েক বই দিয়ে যাচ্ছি, আরও পাঠাব। আমার স্বদেশের সাহিত্যিক বন্ধুরাও এগিয়ে আসবেন। ভোকস আমাদের দাওয়াত দিয়ে এনেছেন — ভরসা করি, সাংস্কৃতিক সেতু-বন্ধনের ভার তাঁরাই নেবেন বিশেষ করে।

চটাপট হাততালি। ভিনদেশে এই এক সুবিধা — আগডম-বাগডম যা-ই বলি, হাততালিটা পাওয়া যায়। নভিকভা বই ক'খানা তুলে ধরেছেন। হাতে হাতে ঘুরছে। বাংলা জানেন না প্রায় কেউ, তবু উলটে-পালটে দেখেন। আমার লজ্জা লাগে সামান্য জিনিসে এমন হ্যাংলাপনা দেখে। নানান প্রশ্ন বইগুলো নিয়ে: বিষয়বস্তু কি? কভারের ছবির কোন অর্থ? নভিকভা বললেন, লিখে দিন — 'লেনিনগ্রাড প্রাচ্য-গ্রন্থালয়কে উপহার দিলাম।' বঙ্কিমচন্দ্রের নিজের হাতে লিখে-দেওয়া বই আছে। অনেক কাল পরে আবার এক বাংলা-লেখকের লিখে-দেওয়া বই গ্রন্থাগারে এলো।

লিখতে কিছু সময় লাগে, দলের অন্য সব্বাই ইত্যবসরে উঠে পড়েছেন। প্রাচ্য বিভাগে যাচ্ছি এবার। সে এক আলাদা বাড়ি। বিশাল করিডর পার হয়ে যাচ্ছি। নভিকভা গা ঘেঁসে মৃদুকণ্ঠে বাংলায় ইংরেজিতে আলাপ করতে করতে যাচ্ছেন। সত্যি, কতকালের পরমাত্মীয় আমরা যেন। এই প্রাচীন বিদ্যামন্দিরে কত কত মহামনীষী বৈজ্ঞানিক দেশনায়ক ছাত্রজীবনে পড়াশুনো করে গেছেন। দেয়ালের উপরে তাঁদের ছবি, দেয়ালে খোপ কেটে কেটে তাঁদের মূর্তি। আর, দেখুন, উচ্ছল আনন্দে কলহাস্যে একালের ছাত্রছাত্রী এঘরে-ওঘরে যাচ্ছে এই করিডরের ভিতর দিয়ে। একাল-সেকাল এক জায়গায় মিলেছি আমরা — মাথার উপরের ওঁরা নিঃশব্দ; নিচেকার এই এরা জীবনচঞ্চল। নতুন কালের ছেলেমেয়েদের উপর ওঁদের কৌতুক-প্রসন্ন আশীর্বাদ ঝরে পড়ছে উপর থেকে। ঠিক সামনে মস্ত বড় ছবি — পথ আটকে যায় আমাদের সেখানে। বুদ্ধিপ্রদীপ্ত এই কিশোর — মুখটা চেনা-চেনা লাগে। লেনিন। কিশোর বয়সে লেনিন এই য়ুনিভার্সিটিতে পড়ে এখান থেকে ডিপ্লোমা নিয়েছেন। তাই নিয়ে জাঁক করে এরা। জাঁক করবার মতোই বটে। এমন ছাত্র কোথায় মেলে — দেশের নতুন চেহারা এনে দিলেন যিনি, গোটা দুনিয়া নতুন আশায়

মাতিয়ে তুললেন? পাশের এক ঘরে নিয়ে গেলেন — এইখান থেকে লেনিন ডিপ্লোমা হাতে করে নিয়েছিলেন। এক-শ পঁয়ত্রিশ বছরের লাইব্রেরি, সাড়ে-তিন মিলিয়ন বই — সেই বইয়ের সমুদ্রের মধ্যে কিশোর লেনিন ডুবে থাকতেন অনেক সময়।

রাস্তায় পড়েছি এবার। ফুরফুর করে বরফের গুঁড়ি ঝরছে। জোর-পায়ে আর এক বাড়ি উঠে পড়লাম। য়ুনিভার্সিটিরই এক বিভাগ — প্রাচ্য বিদ্যাগার ও গ্রন্থালয়। একটি মেয়ে গ্রন্থাগার থেকে বাংলা স্বর্ণলতা নিয়ে বেরুচ্ছে। সঙ্গে আর একটি। আমাদের দেখে থমকে দাঁড়ায়। নভিকভা বললেন, এই যে—ফিফথ ইয়ারের দুটো মেয়ে এরা। বাংলা-ক্লাসের ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে পরিচয় করতে চাচ্ছিলে — এখন ক্লাস নেই, কপাল গুণে তবু এসে পড়েছে এরা। বয়স কী-ই বা, বিশ-বাইশ। উজ্জ্বল ঝলমলে চেহারা — একটির তো বিশেষ করে।

বাংলায় নাম লেখো আমার এই খাতায় —

লিখল, ইরা সেভতোভিদভা—। লিখতে লিখতে ফিক করে হেসে বলে, নামের শেষটা ভারি কঠিন — কি বলেন? শেষটুকু ইংরেজিতে লিখে দিল আগের লেখার নিচে — Svetovidova। আবার ঐ কটোমটো কথাটার বাংলা (বা সংস্কৃত) করে পুরো নাম বলল, ইরা শ্বেত-দর্শনা। অপর মেয়েটা ইরার চেয়ে ঢ্যাঙা — এমন ছটফটে নয়, স্থির-শান্ত, লাজুক ধরনের হাসি হাসে একটু-খানি মুখ নিচু করে। নাম লিখল — এলেনা স্মির্নোভা। কড়া যুক্তাক্ষরের বানান— এই কলম তুলে আমারও ভাবতে হল — এলেনা ঝড়াক করে লিখে দিল বাংলায়।

তারিফ করছিঃ বাঃ, খাসা হাতের লেখা তোমাদের। লেখক মানুষ আমি, দিনরাতই কলম পিষি, আমি কিন্তু এমন পারিনে।

লেখক — কি নাম?

নভিকভা নাম বলে দিলেন। ভ্রূ কুঁচকে মেয়ে দুটি ভাবছে। ভেবে মানিক হদিস পাবে না, তোমাদের জ্ঞানের চৌহদ্দির ভিতরে আমি নেই।

বললাম, খানকয়েক বাংলা বই দিয়ে যাচ্ছি তোমাদের। আরও সব ভারতে গিয়ে পাঠিয়ে দেব।

এলেনা বলে, আমাদের পত্র দিবেন, বঙ্গভাষায় লিখিবেন।

ঠিক দেবো। তোমরা জবাব দেবে তো?

নিশ্চয় দিব। বঙ্গভাষায় উত্তর দিব, দেখিতে পাইবেন।

কিন্তু সে দেখা হয়ে ওঠেনি। যেহেতু আমিই লিখিনি চিঠি। বিলকুল ভুলে মেরেছি। খাতায় নোট করে এনেছিলাম — খাতা উল্টাতে উল্টাতে

আজ মনে পড়ে গেল। এত দিন পরে এখন আর দেওয়া যায় না, কোথায় আছে কে জানে? বিয়ে-থাওয়া করে সংসারধর্ম করছে হয় তো।

প্রাচ্য গ্রন্থাগার। দেয়ালে রবীন্দ্রনাথের ছবি, মুখোমুখি প্রায় সমান মাপের প্রেমচন্দ। আর আছেন আচার্য বরন্নিকভ, ভারতের ভাষা-সাহিত্য নিয়ে যিনি জীবনপাত করলেন। ভারতের হরেক ভাষার বই আলমারির থাকে থাকে সাজানো। ভারতীয় নানা বইয়ের রুশীয় তর্জমা। অতিকায় রামায়ণ-মহাভারতের তর্জমা। কালিদাসের অনেক বই, রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি ও আরও একত্রিশখানা তর্জমা করে নিয়েছে। আরও অনেক, অনেক। গান্ধিজীর 'সত্যাগ্রহ সপ্তাহ' নামক চটি বই এবং 'রাজবিদ্রোহকা অভিযোগ'। বাংলা বই বড় কম। বঙ্কিমচন্দ্রের নিজ-হাতে উপহারের বড়াই করে—বইটা নেড়েচেড়ে দেখছি—বিষবৃক্ষ, পঞ্চম সংস্করণ, ১২৯১ অব্দে ছাপা। বঙ্কিম-চন্দ্র ইংরেজিতে লিখে উপহার দিয়েছেন, কিন্তু কাকে দেওয়া হল উল্লেখ নেই। মাইকেলের অনেক বই; তার মধ্যে দীননাথ সান্যাল সম্পাদিত সচিত্র মেঘনাদ বধ কাব্য। রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছ ও নৌকাডুবি।

সকলে ঘিরে এসে আলাপ করছে, ভাল ভাল কথা শোনাচ্ছে। ইরা-এলেনাও আছে, কিন্তু তারা ভিড়ের মধ্যে নেই। ঐ গোটা চারেক বাক্যেই চুকে গেল নাকি, লেখক সম্পর্কে যাবতীয় উৎসাহ উবে গেল? বিষম দমে গেছি। দুই সখী মাথায় মাথায় এক হয়ে শলাপরামর্শ করছে এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে, এক টুকরো কাগজ নিয়ে ইরা শশব্যস্তে কি-সব টুকে যাচ্ছে।

অবশেষে এগিয়ে এলো। ইরা বলে, সৌভাগ্যক্রমে আপনি এখানে শুভা-গমন করিয়াছেন। এই শব্দগুলির অর্থগ্রহণ করিতে পারি না, আপনার সাহায্য পাইলে আমরা পরম উপকৃত হইব।

কী কাণ্ড! কতগুলো কথার ফর্দ করেছে এতক্ষণ ধরে। এসে পড়েছি তো মাস্টারি করিয়ে নেবে। প্রথম কথাটা হল—'ভোটাভুটি'। বুঝিয়ে দিলাম—ভোট দেওয়া-দেয়ির ব্যাপার, ইংরেজিতে যাকে বলে ইলেকশন।

বিস্ময়ে ইরার চোখ বড় বড় হয়ে ওঠে: চমৎকার! ইংরেজি ভোট থেকে বাংলা কথা বানিয়ে নিয়েছেন?

হেঁ হেঁ মা-লক্ষ্মী, ক্ষমতা জান না তো আমাদের ভাষার। দুনিয়ার তাবৎ ভাষার উপর ছোঁ মেরে মেরে এমন বিস্তর কথা আমরা হজম করেছি।

তারপরের কথা—'পিটুনি'। কত রকমে চেষ্টা করছি, কিছুতে বুঝবে না। তবে তো ঘাড়টা নুইয়ে ধরে পিঠের উপর ভাল করে বুঝিয়ে দিতে হয়। শেষটা তাই করলাম—সত্যি সত্যি নয়, আকারে-ইঙ্গিতে থিয়েটারের অভিনয়ের

মতন করে। জন্মে পিটুনি খেলে না, বুঝবে কি করে আনন্দমতীরা? স্ফূর্তি করে দেশবিদেশের ভাষা শিখছ, যে দিকে তাকাও ঝলমল করছে দুশ্চিন্তাহীন উল্লসিত জীবন।

পরের কথাটা হল 'সাগরেদ'। আরও সব অনেক আছে। কী কষ্ট করে যে বাংলা শেখে! বাংলা শিখবেন তো ইংরেজিটা রপ্ত করে নেবেন আগে-ভাগে। বাংলা থেকে ইংরেজি দুটো অভিধান আছে—সুবল মিত্রের ও বেণীমাধব গাঙ্গুলির। বাংলা-শিক্ষার এই দুই হাতিয়ার। পড়তে পড়তে কোন কথা ঠেকে গেল তো অভিধান খুলে ইংরেজি প্রতিশব্দ দেখে নিন। তখনও না বোঝেন তো ইংরেজি-রুশ অভিধান খুলুন। হালফিল আমরা তো সব চলতি ভাষায় লিখছি—সে এমন, যে নিজের লেখা নিজেই কত সময় বুঝিনে। দু-খানি ভোঁতা হাতিয়ারের সম্বলে ঐ ব্যাসকূট ওরা ভেদ করবে কেমন করে? সামনে পেয়ে আমার তাই শরণ নিয়েছে।

কথার মাঝে হয়ে গেল তো উচ্চারণ। 'শ্যামা' 'ব্যথা' 'কৃষ্ণ'—বাংলায় ঠিক-ঠিক উচ্চারণ কি? সংস্কৃত কিম্বা হিন্দি উচ্চারণ নয়—বাংলা। এক একটা করে বলছি আমি, আর জিভের উপর ফেলে বার পাঁচ-সাত ঘুরিয়ে ফিরিয়ে মুখস্থ করে নেয়। তার পরে ধরে বসল, রবীন্দ্রনাথের কথা বলে যান কিছু, তাঁর জীবন-সায়াহ্নের কথা। 'শেষের কবিতা'র পর কি কি বই লিখেছেন?

জোঁকের মতন ধরেছে, ছেড়ে দেবে না। না-না করে উঠি: দুপুর গড়িয়ে গেল, দলের সবাই বেরিয়ে পড়েছেন, চলে যাব এবার।

হাসেন কেন? যথাধর্ম বলছি, বিদ্যে ধরা পড়ার আশঙ্কা নয়। দলের লোকেরা সত্যি ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। এই সব বিদেশ জায়গায় ভয়টা কিসের? রবীন্দ্রনাথের বঙ্গভাষার পিশাতিয়েল আমি যখন—সরলমতি তরুণী দুটোকে যা বলব, সেই তো বেদবাক্য। 'শেষের কবিতার' পর রবীন্দ্রনাথ 'বউঠাকুরাণীর হাটে' হাত দিলেন—যদিস্যাৎ এমন কথাই বলি, কার ঘাড়ে ক'টা মাথা যে আপত্তি করবে? হাত এড়ানো গেল না, বলতেই হল কিছু। আহা, কী তদ্‌গত হয়ে শুনছে! শ্রদ্ধা-বিনত দৃষ্টি। আমার সেই অপরূপ ভাষণ কেউ যে আপনারা শুনলেন না! খুন করে ফেললেও আর বলছিনে, সে নিষ্ঠা কোথায় আপনাদের যে বলব? হাসবেন, ভুল ধরবেন পদে পদে।

শহর ছেড়ে ছুটছি। পিচ-দেওয়া পথ—এমন মসৃণ, পায়ে হাঁটতে হলে পিছলে পড়ে যেতাম বোধ হয়। শহরতলী পার হয়েছি। গ্রাম, কত গ্রাম।

মাঠের পর মাঠ। কাঁকুরে পোড়োজমি। বড় জঙ্গল। পথ তবু ফুরোয় না। কত দূর রে বাপু? ঘন্টা দেড়েক হু-হু করে ছুটে—এইবারে বোধ হয় পৌঁছে গেলাম।

গাঁয়ের নাম কোলতুসি। পাভলভ-নগরও বলে। বৈজ্ঞানিক পাভলভের সাধনপীঠ পাভলভ-ইনস্টিট্যুট এখানে। সেই তীর্থে এসে পৌঁছলাম। বাড়ির সামনে পাভলভের বিশাল মূর্তি।

তাবৎ দুনিয়ার বিজ্ঞানীরা পাভলভকে জানেন। আনাড়ি মানুষ আমি কি বোঝাতে যাব? টুকেও আনি নি তেমন-কিছু। বিজ্ঞানে পাকাপোক্ত জন কয়েক আমাদের দলে—তাঁরা বলছেন, কিছু টুকতে হবে না মশায়, বাড়ি গিয়ে জলের মতন বুঝিয়ে দেব। অনেক খোশামোদ করেছি সেই মহাশয়দের, আজ দেব কাল দেব করে কাটিয়ে দিলেন।

বিপ্লবের উপর বিষম খাপ্পা ছিলেন পাভলভ। জারতন্ত্র খতম হলে রাগ করে তিনি ইংল্যাণ্ডে চলে গেলেন। গবেষণা সেখানে চলছে। এদিককার খানিকটা গুছিয়ে নিয়ে লেনিন তাঁকে আনবার জন্য লোক পাঠালেন। দেশের গৌরব অমন এক বৈজ্ঞানিক ভিন্ন জায়গায় পড়ে থাকবেন, ব্রিটিশ জাত তাঁর গবেষণার ফলভোগী হবে—এমন হতে দেওয়া যায় না। পাঠালেন খুদ গোর্কিকে। পাভলভ যাচ্ছেতাই গালিগালাজ করে ফিরিয়ে দিলেন তাঁকে। লেনিন দমলেন না। আবার লোক গেল: আপনি বিজ্ঞানের মানুষ—রাজনীতির ব্যাপার যাচ্ছেতাই হোকগে, আপনার তাতে কি? শহর থেকে দূরে নিরিবিলি গবেষণার সমস্ত রকম সুবিধা পাবেন। পছন্দ না হলে চলে আসবেন আবার।

এলেন পাভলভ। ব্যবস্থা দেখে খুশি হলেন। জীবন কাটিয়ে দিয়ে এখানেই তিনি দেহ রেখেছেন। ভারি মনোরম জায়গা। ল্যাবরেটারি বাড়িগুলোর পাশ দিয়ে উচ্ছল ঝরনা ঝরছে, উঁচু-নিচু জমি, ঘনশ্যাম গাছপালা—পাথুরে মানুষের মনেও কবিতা গুণগুণিয়ে ওঠে। এরই মধ্যে থেকে তপস্বী পাভলভ আজীবন বিজ্ঞান-সাধনা করে গেলেন।

দোতলায় উঠতে লেনিনের ছবি। ঘরে ঢুকে খুব বড় ছবি পাভলভের। অশীতিপর এক বৃদ্ধ—পাভলভের সাক্ষাৎ শিষ্য—এখানকার প্রধান। মোটা-মুটি একটু বোঝাচ্ছেন আমাদের—শরীর ও অভ্যাসতত্ত্ব সম্বন্ধে বলছেন। মীরা দোভাষিণী—তর্জমা ক্ষণে ক্ষণে বন্ধ করে হেসে ফেলছে। থই পাচ্ছে না, এক রকম বোঝাতে গিয়ে অন্যরকম মানে দাঁড়াচ্ছে। বড্ড গোলমেলে ব্যাপার—স্পষ্টাস্পষ্টি বললও সেই কথা। বুড়া বৈজ্ঞানিক কিন্তু

পাভলভ ইনস্টিটিউট (পৃ. ২২০)

দৈত্যাকার ঘন্টা (পৃঃ ২৫৬)

অবিচল — বলেই যাচ্ছেন তিনি। তাঁর কাছে জলের মতো তরল — অপরে কেন গুলিয়ে ফেলবে, তাঁর বোধ করি ধারণায় আসে না।

মুষলধারে বৃষ্টি নেমেছে। ভিজতে ভিজতে ল্যাবরেটারি-বাড়ি গেলাম। দুর্গন্ধে তিষ্ঠানো যায় না নিচের তলায়। বোকা-ছাগল ভেড়া ইঁদুর ইত্যাদি জন্তু জানোয়ার। এদের নিয়ে নানা রকমের গবেষণা চলে। ধুপধাপ সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠে বাঁচি। দু-একটা পরীক্ষা আমাদের দেখিয়ে দিচ্ছেন। একটা কাঠের ফ্রেমে গোলকধাঁধার মতো নানা পথ। তার মধ্যে ইঁদুর ছেড়ে দেওয়া হল। ইঁদুরের গতিবিধির ছায়া পড়ছে একটা কাচের উপরে — সমস্ত আমরা দেখতে পাচ্ছি। ঘন্টার ক্ষীণ আওয়াজ — সঙ্গে সঙ্গে দেখি মরীয়া হয়ে ইঁদুর ছুটল। কি কারণ? ইতিপূর্বে ইঁদুর দেখেছে, ঘন্টা বাজবার এক সেকেণ্ড পরে ঐ জায়গায় বিদ্যুতের শক লাগে। ঠেকে শিখেছে, অতএব শব্দ হতে না হতে সে পালাল। সোজা পথে ছুটছিল — এক জায়গায় হঠাৎ সোজা পথ ছেড়ে এক পাশের বাঁকা পথে মোড় নিল। কেন? আর কয়েক ইঞ্চি সোজা পথে এগিয়ে দেখেছে, বিদ্যুতের শক লাগে। অতএব সে বাঁক ঘুরল, এক তিল দ্বিধা না করে।

কিন্তু লাভটা কি হল এত খরচপত্রের ল্যাবরেটারিতে এমনিতরো পরীক্ষায়? সাধারণ লোক আমরা — মোট হিসাবটা বুঝিয়ে দিন। লাভ বিস্তর — মুরগি ডবল আণ্ডা পাড়ছে, গুঁটিপোকা অনেক বেশি রেশম বানাচ্ছে। মুরগির ব্যাপারটা শুনুন —

মুরগি একবার মাত্র ডিম পাড়ে রাত্রিবেলা। মোটামুটি বারো ঘন্টায় দিন, বারো ঘন্টায় রাত। ঘরের মধ্যে মুরগি রেখেছেন। ছ-ঘন্টা দিনের মতো আলো দিয়ে কৃত্রিম দিনমান করুন। তার পরের ছ-ঘন্টা অন্ধকার করে হোক কৃত্রিম রাত্রি। তার পরে আবার দিনমান, আবার রাত্রি। এক অহোরাত্রির মধ্যে দুটি রাত্রি বানানো হল — মুরগি বোকা বনে গিয়ে দু-বার ডিম পাড়ল। চলল এমনি। অভ্যাস শেষটা এমন পাকা হয়ে দাঁড়াল — আপনা হতেই দু-বার ডিম পাড়ে, আলোর ধাঁধা দেবার দরকার হয় না। ঐ মুরগির বংশের মধ্যেও দু-বার ডিম দেবার অভ্যাস বর্তে যাবে।

সন্ধ্যার পর শহরে ফিরে এলাম। সোজাসুজি হোটেলে নয়, অন্য এক জায়গা ঘুরে দেখে যাই। কিরোভ সংস্কৃতি-ভবন। মস্কোয় ফিরবার তাড়া — নবেম্বর-বিপ্লবের উৎসবের তিনটে দিন মাত্র বাকি। কাল রাত্রেই লেনিনগ্রাড ছাড়ছি, তার মধ্যে যতটা দেখে নেওয়া যায়। ছোটদের সংস্কৃতি-

ভবন আগে দেখে এসেছেন, এটা হল বিশেষ করে বড়দের। বাচচাদের ব্যবস্থাও কিছু আছে এখানে, তাদের হল শিশু-বিভাগ। যে কোন পেশা হোক আপনার, যে ট্রেড-ইউনিয়নের লোক হন আপনি (সব রকম পেশারই ট্রেড-ইউনিয়ন আছে) — এখানে অবারিতদ্বার। আসুন, আমোদ-আহ্লাদ করুন, পড়াশুনো গান-বাজনা কলাচর্চা খেলাধূলা -- যেমন অভিরুচি। রোজ হাজার পাঁচেক লোক আসে। ছুটির দিন হলে আট-ন'হাজার।

সাঁইত্রিশ বছর আগে বিপ্লবের স্ফুলিঙ্গ দেখা দিল এখানে -- এই লেনিনগ্রাডে। সে আগুন -- নজরে মালুম হোক আর নাই-হোক -- বিশ্বের কোনখানে ছড়াতে আজ বাকি নেই। কর্মিক মানুষ খাটবে ও রোজগার করবে, শুধুমাত্র এই নয় — আনন্দ করবে তারা, সাংস্কৃতিক জীবনের ষোল-আনা অধিকার তাদেরও। এমনি সব প্রতিষ্ঠান সেই জন্যে। লেনিনগ্রাডে কর্মিকদের জন্য সংস্কৃতি-ভবন ও ক্লাব আশিটা। সেই সব প্রতিষ্ঠানের লোকও আসেন -- এটা হল কর্মিক মাত্রেরই মেলামেশার জায়গা। ছাত্ররাও আসে। সাংস্কৃতিক কর্মীদের ট্রেড-ইউনিয়ন (Trade Union of Workers of Culture) নামে এক বিভাগ, -- ছাত্রেরা সেখানকার সভ্য। কুড়ি কোপেক, অথবা ছাত্র যে সরকারি বৃত্তি পায় তার এক শতক হল মাসিক চাঁদা। আর ঐ যে শিশু-বিভাগের কথা হল — শিশুদের কিছুই লাগে না, এমনি এসে জমে। বছরের খরচ বারো মিলিয়ান রুবল -- সরকার দেয় সমস্ত। তার মধ্যে এক মিলিয়ন রুবল বিশেষভাবে শিশুদের বাবদে। সবই খরচ করে ফেলতে হবে কিন্তু, রুবল বাঁচানো চলবে না।

কিরভ নামে এক কর্মিক-নেতা নিহত হয়েছিলেন উনিশ বছর আগে। তাঁর নামে প্রতিষ্ঠান। লেনিনগ্রাড-অবরোধের সময় এখানে হাসপাতাল হয়েছিল। হাসপাতালে বোমা মেরেছিল -- আগুনে-বোমা — রোগিদের সরিয়ে ফেলতে হয়। লড়াইয়ের পর আগাগোড়া মেরামত করা হয়েছে।

কর্মিক-মানুষ যখন, নাচবে তো গেঁয়ো-নাচ, গাইবে তো গাঁয়ের গান -- এমনি অবজ্ঞা পুষে রাখেন আপনারা। লোক-কলা অবহেলিত নয়, কিন্তু ক্লাসিকাল অভিজাত কলারও পুরোপুরি চর্চা। নাটক করে নিজেরা -- থিয়েটার-হলে তের-শ বসবার জায়গা। ভারি কদর থিয়েটারের। গোটা সোবিয়েত দেশ জুড়েই থিয়েটার-প্রীতি। টিকিট বিক্রি এজেন্টের মারফতে, সংস্কৃতি-ভবনে টিকিট কিনতে আসতে হবে না। কর্মিকদের ধারে দেওয়া হয় টিকিট। তিন মাস পরে শোধ করে। অপেরার দল আছে — দু-শ চল্লিশ জন অপেরার শিক্ষানবিশি করে; তার মধ্যে আঠারো থেকে ষাট বয়সের সর্বশ্রেণীর লোক। জুলাই-আগস্টে দলে নতুন লোক নেওয়া হয়। যারা সক্ষম, সমর্থ

এবং গলায় যাদের সুর আছে, তারা দরখাস্ত করে। গত বছরের অপেরার পালা — কোয়ায়েট ফ্লোজ দ্য ডন (Quiet Flows the Don)। এমন অনেকে আছে, গানের গ জানত না, — পেশাদারের মতো এখন গান শিখে নিয়েছে। শেখানো হয় একেবারে মুফতে। লোকে টিকিট কেটে অপেরা দেখে, তাই থেকে খরচটা উঠে আসে। লাভ করা হয় না এক পয়সাও।

ব্যালের দল আছে, দেড়-শ জনে দল। এর জন্যে টিকিট নেই। নাটুকে দল — একটা বড়দের, একটা বাচ্চাদের। পুরানো ক্লাসিক নাটক এবং হাল আমলের সোবিয়েত নাটক — সব রকম অভিনয় করে। সোবিয়েতের নানা অঞ্চলের লোকনৃত্যের চর্চা হয়। লোকযন্ত্রের অর্কেস্ট্রা এবং নতুন আমলের আধুনিক অর্কেস্ট্রা। তরুণ ছেলেমেয়েরা সোবিয়েতের ও দেশবিদেশের সঙ্গীত শেখে, তার জন্য দরাজ-ব্যবস্থা। ভারতীয় সিনেমা-ছবি আসছে কিছু-কিছু, সে ছবির বড় আদর। টিকিট সঙ্গে সঙ্গে বিক্রি হয়ে যায়। এক ছবি বিস্তর দিন ধরে চলে।

লেকচার-হল। রাজনীতি অর্থনীতি শিল্প সাহিত্য সঙ্গীত আন্তর্জাতিকতা — নানান বিষয়ে বক্তৃতা হয়। নামজাদা গুণী-জ্ঞানীরা এসে বলেন, লোকে ভিড় করে শোনে। খেলার বিভাগ — উঠোনে হুড়োহুড়ির খেলা, ভিতরে সময় কাটানোর খেলা। দাবার প্রতিযোগিতা হয় — সেটার খুব নাম। কলা-চর্চার রকমারি ব্যবস্থা—দেড় হাজার লোক নিখরচায় নিয়মিত শিখে যায়। তরুণ-তরুণীদের জন্য নানারকম পার্টি ও অভিযানের ব্যবস্থা।

লাইব্রেরিতে নিয়ে গেল। দশ হাজার মেম্বার, চাঁদা লাগে না। সব রকমের বই আছে। একটু বক্তৃতা হল: তিনটি ভারতীয় ডেলিগেশন এরই মধ্যে সম্বর্ধনা করেছি আমরা এই জায়গায়। ভারতকে আমরা ভালবাসি — ভারত শান্তি চায়, ভারতের সঙ্গে সম্পর্কটা সেই জন্য বেশি ঘনিষ্ঠ। এই সামান্য প্রচেষ্টা দেখে যাচ্ছ, বোলো এর কথা দেশে ফিরে গিয়ে। আমাদের বক্তৃতার বিষয়গুলির মধ্যে একটি হল — 'ভারতের শান্তি-প্রচেষ্টা'।

মস্ত বড় নৃত্যশালা, সাড়ে তিন-শ ফুট লম্বা। দু-শ মানুষ এক সঙ্গে নাচে। বলনাচ নাচছে ঐ দেখুন। ছেলেরা মেয়েরা তো বটেই, কিন্তু মেয়েয় মেয়েয় বেশি। এরা জুড়ি পায়নি, মেয়ের সংখ্যা অনেক বেশি — লড়াইয়ে বিস্তর ছেলে খতম হয়ে গেছে। ছেলেয় ছেলেয় নাচছে ওদিকে ক-জোড়া। আমরা ঢুকতেই বাজনা থামল। যে যেমন ছিল, নাচ থামিয়ে দাঁড়াল। অভ্যর্থনা হবে একটুকু, তার পরে আবার নাচ। নাচবেন? আসুন না — দু-পা নেচে যান। না রে মানিক —। মুহূর্তে আমরা কেটে পড়ি।

শখের ছবি আঁকা হচ্ছে একটা ঘরে। পটের মতো নিশ্চল একটি মেয়ে—তাকে দেখে দেখে ছোকরারা চতুর্দিকে ছবি আঁকছে। লোক-সঙ্গীতের ঘরে গেলাম। গান হচ্ছিল—বিপ্লবের আমলের এক লোক-গাথা। ছেলেমেয়েরা চেয়ার ছেড়ে দিল আমাদের জন্য। ইতালীয় লোক-সঙ্গীত চলল এর পরে। পুশকিনের গান গাইল এক ইঞ্জিনিয়ার-মেয়ে। এক বুড়ো কারিগর গান গাইলেন—মানে বুঝিনে, কিন্তু আমাদের দেশের মতোই কালোযাতি গান।

সকালে বেরুলাম ফিনল্যাণ্ড-উপসাগর যেদিকটায়। শহরতলী। জলা-জায়গা মাঝে মাঝে, সবুজ ক্ষেত, ফাঁকা ফাঁকা বাড়ি। দূর থেকে ঐ যেন পাহাড় বলে মালুম হচ্ছে। না, পাহাড় নয় — খেলাধূলার স্টেডিয়াম, এ বস্তুও কিরভের নামে বানিয়েছে। সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেলাম। চোখ জুড়িয়ে যায় — আহা-হা, সীমাহীন সমুদ্র! ফিনল্যাণ্ড-উপসাগর। সবুজ দ্বীপ একটা — দ্বীপটা এদের নয়, ফিনল্যাণ্ডের এলাকায়। বড় রকমের একটা লাফ দিলেই তবে তো ফিনল্যাণ্ড গিয়ে পড়া যায়। আমার বাঁ-হাতের দিকে অনেকটা দূরে জাহাজ গাদাগাদি হয়ে ভাসছে। বন্দর। খাসা বেড়াবার জায়গা — ঘুরে ঘুরে চতুর্দিক নিরীক্ষণ করছি। বসবার আসন থরে থরে নেমে গেছে ভিতর দিকে। সমতল কেন্দ্রভূমে খেলার জায়গা।

শহরে ফিরে মোটরগাড়ি ছেড়ে দিলাম। পায়ে না হাঁটলে মজা পাওয়া যায় না। এ-রাস্তায় ও-রাস্তায় ঘুরি, দোকানে ঢুকে এটা-ওটা সওদা করি। যেখানে ঢুকি, সাড়া পড়ে যায়। মুখে না বলুক, চাউনিতে ঠাহর পাই। খাবার কিনে খাচ্ছে বহু লোক পথে দাঁড়িয়ে — আমার দেশে হামেশাই যেমন দেখতে পান। তাই দেখে এলাম, মানুষ সকল জায়গায় এক। সেই একদিন মস্কোয় দেখেছিলাম, গাড়িঘোড়া অগ্রাহ্য করে রাস্তা পার হয়ে মানুষ উর্ধ্বশ্বাসে ছুটেছে। ব্যাপার কি — কোন সিনেমা-স্টার বেরিয়েছেন নাকি পথে। অতএব তুচ্ছ প্রাণ গাড়ির নিচে যাযই যদি, কী করা যাবে! শুধু আমার দেশের মানুষকে মিছামিছি দোষেন আপনারা।

কেনাকাটায় কোট-পান্টলুনের বিশাল উদরগুলো ভর্তি। এ-রাস্তা ও-গলি ঘুরে ঘুরে হোটেলে ফিরলাম, বেশ দেরি হয়ে গেছে। নাকে-মুখে লাঞ্চ গুঁজে তক্ষুণি আবার কেউ কেউ বেরুবেন এদেশের আদালতে কি ধরনের বিচারকর্ম হয় দেখবার জন্য।

কিছুদিন থেকে এক বিদেশি সাহেবকে দেখতে পাচ্ছি। মস্কোয় দেখেছি,

তাসখন্দেও দেখেছি একবার। হাজার লোকের ভিড়ের মধ্যেও নজরে পড়ে যাবে এমনি বেঢপ লম্বা। গুল্মরাজ্যে এক তালবৃক্ষ। সেই ভদ্রলোক আস্তোরিয়ায় এসে উঠেছেন। আমাদের দেশ এবং ব্রিটিশ-আমল হলে ভাবতাম পুলিশের স্পাই পিছু নিয়েছে। ভদ্রলোক আমাদের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকেন। তাকাতাকি এখন আর আমলের মধ্যে আনিনে। বিধাতাপুরুষ রূপ দিয়েছেন—কুচকুচে কালো রং, কালোবরন চুল—অভাগ্য বর্ণহীন সাদা-চামড়ার দল দেখবেই তো তাকিয়ে তাকিয়ে। দেখে হিংসায় ফেটে মরবে।

লাউঞ্জে বসে ভদ্রলোক। হঠাৎ আজ কথা বলে উঠলেন, মাপ করবেন, আপনাকে এর আগে দেখেছি।

দুঃখিত, কিছুই আমি মনে করতে পারছিনে।

থাকেন কোথায় আপনি? কলকাতায়? তবে কলকাতায় দেখে থাকব।

আমি জানি ভাঁওতা এটা। আলাপ জমানোর কায়দা। তর্ক না করে মেনে নিতে হয়। অযাচিতভাবে আত্ম-পরিচয় দিচ্ছে: ওয়াশিংটনে থাকি আমি। কারবার আছে। কংগ্রেসের মেম্বার। দেশবিদেশে ঘুরে বেড়ানো নেশা বিশেষ। আমায় মশায় কেউ নেমন্তন্ন করেনি, গাঁটের পয়সায় এসেছি, পয়সা খরচ করে ঘুরে বেড়াচ্ছি।

থাকবেন কতদিন?

থাকবার জো আছে? ছ'টা মাস এ-রাজ্যে থাকলে ফতুর হয়ে যাব, ব্যবসা লাটে উঠবে। পরের আতিথ্যে আছেন—টের পান না, কী সাংঘাতিক খরচ এদেশে। এক্সচেঞ্জের চড়া হার—এমনি কায়দা করে রেখেছে, বিদেশের কেউ যত টাকাপয়সা নিয়ে আসুক পলকে কর্পূর হয়ে উবে যাবে। মানেটা দাঁড়াচ্ছে, বিদেশিরা আসাযাওয়া করুক এরা সেটা চায় না।

আমরাও বুঝছি। অনেকেই আমরা ট্র্যাভেলারস-চেকে টাকা নিয়ে এসেছি এটা-ওটা কিনে নিয়ে যাব। দর শুনে আর কেনা যায় না। একজোড়া জুতো দেড় হাজার রুবল—হোন না আপনি রাজা রাজবল্লভ, ও-জুতোর একটা পাটিও তো পায়ে পরবার তাগত হবে না। অবশ্য রোজগার করলে পুষিয়ে যায়—রোজগারও হাজারের মাপের। একটা ছোটগল্পের হাজার রুবল দক্ষিণা। অত ঘোরাঘুরির মধ্যেও বক্তৃতাদির ব্যাপারে সহস্রাধিক রোজগার হয়েছিল, দরাজ হাতে সেই অর্থ ব্যয় করে এলাম। রূপকথায় সেই যে আছে, তোর বউ তোকে দিয়ে খাওয়ালাম এই আমার কলা!—সেই জিনিস আর কি!

কার্ল-মার্কস ফ্যাক্টরিতে গেলাম বিকাল বেলা। টিপটিপে বৃষ্টি—বছরের

এই সময়টা লেলিনগ্রাড মুখ পুড়িয়ে থাকে। জারের আমলের ফ্যাক্টরি—নামটা শুধু পালটেছে—পঞ্চাশ বছর হয়ে গেছে। অনেকখানি জায়গা, অসংখ্য যন্ত্রপাতি। আগে খালি সূতি কাপড় হত, এখন রেয়ন তৈরির বিরাট ব্যবস্থা করেছে। নতুন কয়েকটা যন্ত্র বানিয়েছেন এখানকার মিস্ত্রিরা—তার জন্য বিশেষ বৃত্তি দেওয়া হয় তাদের।

বিদায় লেনিনগ্রাড! বিপ্লবের শতেক স্মৃতি যার সর্বত্র ছড়ানো। নিপীড়িত জনগণ নতুন আত্মবিশ্বাসে ফেটে পড়ল যেখানে। নতুন সমাজ-ব্যবস্থার সর্বপ্রথম পত্তন। রাত ১১-৪০-এর ট্রেনে চেপে মস্কো ফিরছি। বিশেষ ট্রেন দিয়েছে। স্প্রিঙের দরাজ ব্যবস্থায় ঝাঁকুনি একেবারে নেই। ট্রেনে যাচ্ছেন না তো—মনে হবে, কোন নবাব-বাদশার খুশমহলে আরামে গদিয়ান হয়ে আছেন। কাচের আঁটা-জানলার বাইরে তাকিয়ে তখনই কেবল মালুম হবে, চলেছেন গাড়িতে। আমাদের ইতর সাধারণের জন্যে তো এই—পিতার উপরে আবার পিতামহ আছেন। দলের নেতা-উপনেতারা যে কামরায় যাচ্ছেন, সেখানে ঢুকে মনে হবে ইন্দ্রলোকের খানিকটা কেটে এনে ইঞ্জিনে জুড়ে দিয়েছে। একটা কথা সবিনয়ে নিবেদন করি। সাম্যবাদের দেশ বটে, কিন্তু নেতা ও সাধারণের মধ্যে এঁরা দস্তুরমতো ফারাক রেখে চলেন। রেলের কামরা, হোটেলের ঘর এমন কি পথে-ঘাটে সাময়িক ব্যবস্থার মধ্যেও তিলেকের তরে অবস্থাভেদ ভুলতে দেন না।

রেডিও শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। সকাল ঠিক আটটায় আবার রেডিও শুরু। কেমন করে থামানো যায়, রাতে কিছুতে ধরতে পারি নি। দিনমানে আধ-মিনিটের মধ্যে কায়দা পেয়ে গেলাম। নটা—দশটা। মস্কোয় পৌঁছতে আর পঞ্চাশ মিনিট। কুয়াশায় চারিদিক ভরে আছে। দিনমানে রোদ হয়, এবম্প্রকার ধারণা ভুলে গেছি ইদানীং। জলা জায়গা অনেক দূর ব্যাপ্ত। বড় জঙ্গল—অজস্র ফারগাছ। মাঠ আসছে মাঝে মাঝে—চষা ক্ষেত। ক্ষেতের ধারে গ্রাম। সাদা ফুল যেন মুঠি মুঠি ছড়িয়ে দিয়েছে ক্ষেতের উপর। ফুল নয়—বরফ পড়ে আছে। মুরগির দল খুঁটে খুঁটে কি খাচ্ছে। সবুজ তৃণভূমি আসে হঠাৎ। ঘোড়া চরে বেড়াচ্ছে। হুশ-হুশ করে এক একটা স্টেশন পার হয়ে যাচ্ছি। প্লাটফরম বেশির ভাগ কাঠের উঁচু পাটাতনের উপর। অত্যন্ত নাবাল অঞ্চল, মালুম পাওয়া যাচ্ছে।

সেই হোটেল মেট্রোপোল। ঘর পালটে গেছে অনেকের, কপাল ক্রমে

আমি পুরানো ঘর পেয়ে গেলাম। নিতান্ত নইলে নয় এমনি দু-চারটে জিনিস সঙ্গে নিয়ে বেরিয়েছিলাম, বেশির ভাগ গাঁটরি-বাঁধা এখানে। গাঁটরি খুলে ছড়িয়ে আবার গৃহস্থালী জমিয়ে বসা গেল। কাল ৭ নবেম্বর—সারা সোবিয়েত-দেশ জুড়ে নবেম্বর-বিপ্লবের বার্ষিক উৎসব। আজকের দিনটুকু তা বলে বৃথা কাটাচ্ছি না—বিকালবেলা সিনেমা, রাত্রে পুতুল-নাচ। উৎসবের জন্য চতুর্দিকে সাজ-সাজ পড়ে গেছে, যাতায়াতের মুখে সেই সমস্ত দেখা যাবে।

সপ্তাহে সপ্তাহে একরকম চটি বই বেরোয়—মস্কো শহরের চুয়াল্লিশটা থিয়েটার ও যাবতীয় সিনেমায় কবে কোন পালা হচ্ছে, ছাপা থাকে সেই বইয়ে। তাই থেকে বুঝে নেবেন ; যে পালা দেখবার ইচ্ছা, যথাসময়ে সেখানে হাজিরা দিতে পারবেন। আমাদের যেখানে হাজির করল, সে-বাড়ির একতলায় দোতলায় দুটো সিনেমা-হল। নিচেরটা ছোটদের। ছোটদের পালা সেই মাত্র শেষ হয়েছে; সেই হলের ভিতর দিয়ে চললাম। শিশুরা হাততালি দিয়ে ঘোরতর খাতির জানাচ্ছে।

সিনেমা-ছবি চলে বটে রাশিয়ায়, তোড়জোড়ও বেশ, জনপ্রিয়তা কিন্তু থিয়েটারের মতন নয়। ছায়ায় মন ভরে না, জীবন্ত মানুষদল দেখতে চায় মানুষে। আমার অন্তত এই ধারণা। ক্রাস (creche) আছে বাচচাদের জন্য। নানান রকম খেলনা, খেলাধূলায় ভুলিয়ে রাখবার জন্য নার্স মোতায়েন আছে। এইখানে বাচ্চা রেখে মায়েরা ছবি দেখতে গিয়ে বসেন। পালা ভেঙেছে, ঘরে যাবেন এইবার—কিন্তু মুশকিল খেলা ছেড়ে ছেলে কিছুতে উঠবে না। কত রকমে মা লোভ দেখাচ্ছেন—বাড়িতে গিয়ে হেনো দেব তেনো দেব—বাচ্ছা কানেও নেয় না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই মজা দেখি ক্ষণকাল।

পুতুল-নাচ। আমেরিকায় সিনেমা-ছবি তোলার ব্যাপার নিয়ে ঠাট্টাবিদ্রূপ। পুতুলের মুখে ভাববিকার নেই, কিন্তু তড়িঘড়ি অঙ্গ-চালনায় হুবহু জীবন্ত বানিয়ে তুলেছে। ডিরেক্টর ছবি তুলবেন ; সেই ছবি চালান হয়ে যাবে ইউরোপে। রেডিও শুনে বিষয়টা তাঁর মাথায় এসে গেল। টেলিফোনে তলব দিচ্ছেন সহকারীদের। সেক্রেটারি-মেয়েটা ঘুমুচ্ছিল—আলুথালু ভাবে ছুটে এসে টেলিফোন ধরল আধেক-বোজা চোখে। সেক্রেটারি খসখস করে নোট নিচ্ছে ডিরেক্টর যেমন যেমন বলছেন। মেয়েটার চোখের পাতা ঘন ঘন ওঠে পড়ে—ওটা মুদ্রাদোষ, অথবা ব্যাধি। এর পরে লোক-বাছাবাছি। নটনটীদের মাপজোপ হচ্ছে—ফিতে ধরে ডিরেক্টর পেট মাপছেন, বুক মাপছেন। নায়ক-নায়িকা বাছাই হয়ে গেল অবশেষে—নায়িকাকে খুদ প্রযোজক মশায় সঙ্গে নিয়ে

এসে সুপারিশ করলেন। আর এক কুৎসিত পুরুষ— ভিলেন সাজবে সে। এদিককার এক রকম হয়ে গেল। তিনটে মেয়ে একসঙ্গে খটাখট টাইপ করে যাচ্ছে— ডিরেক্টর বলে যাচ্ছেন। একজনকে বলছেন গল্প, একজনকে সংলাপ, আর একজনকে শট-ডিভিশনের নির্দেশ দিয়ে যাচ্ছেন। এক সঙ্গে সমস্ত। গল্পটার নাম 'কারমেন'— ক্রেমলিন কথাটা চ্যাপটা চৌরস করে এই নাম দাঁড়াল।

শুটিং শুরু এবারে। নায়ক নায়িকাকে চুম্বন করবে কিছু লম্বা সময় নিয়ে। গাছ থেকে টুপ করে ফুল ঝরে পড়বে, সেই সময়টা চুম্বনের ইতি। ফুল কখন পড়ে গেছে, ক্যামেরাম্যান ব্যস্ত হচ্ছে, এরা দু-জন কিছুতে মুখ ছাড়বে না। ডিরেক্টরের হুমকিতে শেষটা ছাড়াছাড়ি হল তো নায়িকা আয়নায় দেখে ক্ষেপে আগুন। মুখ ইনসিওর-করা, হাসির বিস্তর দাম, চুম্বন করতে গিয়ে দাঁত বসিয়েছে সেই মহা মূল্যবান মুখের উপর। ···নায়িকা গান গাইবে— কি পরিমাণ দূর থেকে হলে কত টাকা, আগেভাগে তারও রেট বেঁধে কন্ট্রাক্ট পাকা করা আছে। গরুর প্রয়োজন সিনের মধ্যে। হন্তদন্ত হয়ে খবর দিল, গরু পাওয়া যাচ্ছে না। তবে লাগাও মহিষ। প্রযোজক এসে পড়ল এমনি সময়ে— এসব কিচ্ছু হচ্ছে না, কম্যুনিস্টের নিন্দেমন্দ-গালিগালাজ আরও বেশি ঢোকাতে হবে গল্পের মধ্যে। কালেকটিভ-ফারমে চাষবাস হয় না, আসলে মিলিটারি ব্যাপার ··· এমনি সব। মালিক কাগজপত্র দলা পাকিয়ে ছুঁড়ে দিল। যতদূর ছবি তোলা হয়েছে, সমস্ত বাতিল। গল্প গোড়া থেকে আবার সাজাতে হবে।

পুতুল-নাচ শেষ হলে যারা সব নাচাচ্ছিল, বাইরে এসে দাঁড়াল। পুতুলগুলো নেড়েচেড়ে দেখছি।

৭ নবেম্বর। বিপ্লবের স্মৃতি-উৎসব। এই বস্তু দেখবার জন্য আমরা পর্বত-মরু পার হয়ে এত আকাশ উড়ে এসেছি। লাল পতাকা আর কাস্তে-হাতুড়ির ছবিতে চারিদিক ঢেকে দিয়েছে। রাস্তার পাশে দুটো হাত দেয়ালও আজকের দিনে বোধ করি খালি পাবেন না।

রেড-স্কোয়ারে অনুষ্ঠান। আমাদের হোটেল-মেট্রোপোল থেকে দু-পায়ের পথ। হামেশাই যাই ও-দিকটায়, ক্রেমলিনের সামনে দিয়ে চক্কোর মেরে আসি। আজকে সে পথ বন্ধ। শহরের যাবতীয় মানুষ ঐ জায়গায় জমায়েত হবে, বাইরে থেকেও বিস্তর এসেছেন — যত্রতত্র হাঁটবার হুকুম নেই। গাড়ি তো চলবেই না।

ব্রেকফাস্ট তাড়াতাড়ি সারা হল। দোভাষি সবগুলো এসে জমেছে। হাঁটিয়ে নিয়ে যাবে — কোন পথে কি ভাবে গিয়ে স্কোয়ারের কোন অংশে ঠাঁই নেবে, সেই সব ঠিকঠাক করছে নিজেদের মধ্যে। ধুতি-পাঞ্জাবি পরে যাব আমি; নিচে অবশ্য আঁটোসাটো গরম কাপড় থাকবে। চীনের উৎসব-দিনে পিকিনে যেমনধারা পরেছিলাম। দোভাষিদের মধ্যে মীরা সকলের মাতব্বর। সে আড় হয়ে পড়ল: না, কক্ষণো নয়। মস্কো কী জায়গা, জান না। এই হিমের মধ্যে ফাঁকা রাস্তায় তিন-চার ঘন্টা দাঁড়ালে নিউমোনিয়া সঙ্গে সঙ্গে। সে দায়িত্ব কে নিতে যাবে?

হাঁটছি মস্ত বড় দল হয়ে। যেদিকে রেড-স্কোয়ার, তার ঠিক উল্টোমুখে নিয়ে চলল। যাচ্ছি তো যাচ্ছিই। রাজপথ ছেড়ে শেষটা গলিতে ঢুকি। অনেকক্ষণ এমনি এ-গলি সে-গলি করে হঠাৎ এক সময় দেখি বেসিল-ক্যাথি-ড্রালের পিছন দিকে এসে পড়েছি। উৎসবের যাবতীয় মিছিল রেড-স্কোয়ার পার হয়ে এইখানে এসে ছড়িয়ে পড়বে।

লেনিন-মুসোলিয়ামের ডান দিকে ক্রেমলিনের দেয়াল ঘেঁসে গ্যালারি, সেইখানে আমাদের ঠাঁই। নানান দেশের বিস্তর মানুষ — রকমারি ভাষা ও বেশভূষা।

সারাক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখতে হবে। বসতে বাধা নেই, কিন্তু বসে পড়লে কিছুই নজরে আসে না। রেড-স্কোয়ারের ওপারে আমাদের ঠিক সামনাসামনি বিরাট অট্টালিকা — গুম, অর্থাৎ সর্ববস্তুর সরকারি দোকান। বেসিল-ক্যাথিড্রালের উপরে মোভি-ক্যামেরা বসিয়েছে — মিছিল ঐমুখো যাবে, ওখান থেকে ছবি উঠবে ভাল। সুপ্রাচীন মৃত্যুবেদী আজ ফুল ও পতাকায় সাজানো — ফুলশয্যার পালঙ্কের মতো ঝলমল করছে। লোকারণ্য। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার, শব্দসাড়া নেই। এই হাজার হাজার মানুষ ঠোঁটে যেন কুলুপ দিয়েছে। কয়েক দল সৈন্য গোর্কি রোডের দিক দিয়ে এসে বিপ্লব-মিউজিয়াম মুখো মার্চ করে চলে এল। তাদের পদ-দাপ ক্ষীণ হয়ে মিলিয়ে যায় ক্রমশ।

সময় হয়ে আসে। বসে ছিলাম, উদগ্র হয়ে সকলে উঠে দাঁড়াল। ক'টি বাচচা ছেলেমেয়ে এদিকে-ওদিকে — আপেল আর চকোলেট আমাদের হাতে গুঁজে গুঁজে দিচ্ছে। নানান দল ফোটো তুলছে; ফোটো নিয়ে তারপরে দর্শকদের জিজ্ঞাসা করে, কোন দেশের মানুষ গো তোমরা ? ক্রেমলিনের ঘড়িতে সাড়ে-নটা। স্তব্ধতা ভেঙে দিয়ে বাজনা ওঠে কোন দিকে। আর উল্লাস। নটা-পঞ্চান্ন। দূর প্রান্ত থেকে আওয়াজ ভেসে আসে — মানে বুঝি না, গম্ভীর তীব্র তীক্ষ্ম এক ধ্বনি। সেই আওয়াজ সারবন্দি সৈন্য-পুলিশের মুখে মুখে লম্বা হয়ে ছড়িয়ে গেল দূর-দূরান্তে।

ঠিক দশটা। কী আশ্চর্য, বাতাস উঠল এই সময়ে এক দমক, উপরে-নিচে দূরে-নিকটে পতপত করে নিশান উড়ল। লাখ লাখ লাল-পাখি পাখনা ঝেড়ে উঠেছে যেন। একটা জিনিস দেখছি। লেনিন-স্ট্যালিনের ছবি যত্রতত্র — মালেনকভ তো এখানকার কর্তা (মনে রাখবেন, ১৯৫৪ অব্দ এখন), তাঁর ছবি দেখা যায় না কেন ? অল্প কয়েকটা জায়গায় দিয়েছে — একলা নয়, ক্যাবিনেটের তাবৎ মন্ত্রী একসঙ্গে। তাই জিজ্ঞাসা করি দোভাষিকে : লেনিন-স্ট্যালিন থাকলেন তো জলজ্যান্ত মালেনকভ মানুষটার কি দোষ হল ?

লেনিন-স্ট্যালিনের বিপ্লবে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল। ওঁরা তাই জাতীয়-নেতা। ওঁদের পরে আর কেউ কখনো জাতীয়-নেতা হবে না।

সাড়ে-দশটা ক্রেমলিনের ঘড়িতে। ব্যাণ্ড বেজে ওঠে। মিছিলের শুরু। সজ্জিত দু-খানা মোটরে দু-জন সকলের আগে — মালেনকভ নেই ওর মধ্যে। একটি হলেন প্রতিরক্ষা-মন্ত্রী মার্শাল বুলগানিন; অপর জন মুস্কালিয়েস্কো, মস্কো বিভাগীয় সৈন্যদলের কম্যাণ্ডার-ইন-চীফ। দলের পর দল সৈন্য দাঁড়িয়ে আছে; গাড়ি ঘুরে ঘুরে যায় তাদের কাছে, গিয়ে অভিনন্দন জানায়। সৈন্যরাও আকাশ ফাটিয়ে পাল্টা জবাব দিচ্ছে।

নেতারা তারপর মুসোলিয়ামের ছাতে উঠে দাঁড়ালেন। বক্তৃতা হবে। সামনে দিয়ে মিছিল যাবে, সালাম নেবেন ওখান থেকে। এসে অবধি দেখছি, মুসোলিয়াম ঝাড়পোছ হচ্ছে, দেয়ালে নতুন করে রং ধরাচ্ছে। সমস্ত আজকের এই দিনটার জন্য। দুই দল ব্যাণ্ড মার্চ করে চলল রেড-স্কোয়ারের দু-পাশ দিয়ে। মচমচ মচমচ জুতো বাজিয়ে বিপ্লব-মিউজিয়ামের ওধারে গিয়ে তারা দাঁড়াল। সারা মাঠ নিস্তব্ধ ছিল, কলরোল ছাপিয়ে পড়ছে এখন।

অক্টোবর-বিপ্লবের সাঁইত্রিশ বছর পুরল। সালতামামি বক্তৃতা করছেন— কে উনি? মালেনকভ তো নয়। দেখা যাচ্ছে, প্রধান-মন্ত্রীকে এবার পাত্তা দিচ্ছে না। কৃষিকর্মীদের জয়-জয়কার। বিস্তর পতিত জায়গা উদ্ধার হয়েছে, ধারণাতীত ফসল। কাজাক-গণতন্ত্র সকলের সেরা ফসল ফলিয়েছে এবার। বৈজ্ঞানিকরাও খুব কাজ করছেন। জল ও স্থল-সৈন্য অনেক বাড়ানো হয়েছে। লড়াইয়ের সর্বাধুনিক যন্ত্রপাতি। দেশে দেশে সাংস্কৃতিক যোগাযোগ। গণতন্ত্রের শক্তি অনেক বেড়েছে এই এক বছরে। এশিয়া আফ্রিকা ও আমেরিকা থেকে অনেকজন এসেছেন; এদেশ থেকেও অনেক গিয়েছে বাইরে। বিদেশি ,অতিথিরা জেনেবুঝে গিয়েছেন, সত্যিকার শান্তি-কামী আমরা। কিন্তু দুষ্ট লোকে এখনো লড়াইয়ের পায়তারা ভাঁজছে, তাদের সামলাবার জন্য প্রতিরক্ষার কড়া ব্যবস্থা করেছি। দেশব্যাপ্ত এই শান্তির পরিবেশে যে আঘাত হানবে, তার রক্ষা নেই। সেজন্যে তৈরি আমরা।

বক্তৃতা থামতেই বজ্রনির্ঘোষ। এক সঙ্গে অনেক কামান গর্জে উঠল ক্রেমলিনের ভিতর দিকে। কামান দেগে বক্তার অভিনন্দন। রেড-স্কোয়ারের চতুর্দিকে বড় বড় বাড়ি— কামানের আওয়াজ ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় অন্ধকার।

প্যারেড এবারে। পদাতিক-বাহিনী গুমের ওদিককার জনতা আড়াল করে ফেলেছে। চলছে তো চলছেই। বাহিনী বিপ্লব-মিউজিয়ামের পিছনে জমায়েত হয়ে আছে— মানুষের মহাসমুদ্র, এতদূর আগে ধারণায় আসেনি। খালি-হাতের মিছিল। এদের পরে তলোয়ারধারীরা। তারপরে এক পল্টন এলো, বন্দুক কাঁধে ফেলে তারা চলেছে। পরের দলের বন্দুক আকাশমুখো তুলে ধরা। মেশিনগান উঁচিয়ে আসে এবার। যান্ত্রিক বাহিনী— বিচিত্র চেহারার রাক্ষুসে গাড়িগুলো গর্জন করে চলেছে; দুনিয়া নখে ছিঁড়বে যেন। বুকের মধ্যে গুরগুর করে, কানে তালা লাগে। প্যারাট্রুপ— প্যারাসুট নিয়ে চলেছে ট্রাকে। বিমানধ্বংসী কামানের বাহিনী— লরী

বোঝাই সৈন্য, সেই লরী পিছনে একটা করে কামান টেনে নিয়ে চলেছে। ভারী কামান ; হালকা কামান — রকমারি কামানের মিছিল। মাইন বয়ে নিয়ে যাচ্ছে লাইনবন্দি ট্রাকের উপর। ট্যাঙ্ক চলেছে — গণতিতে আসে না। ভীষণ আওয়াজ। — পাথরে বাঁধানো রেড-স্কোয়ার গুঁড়ো গুঁড়ো করবে নাকি?

ব্যাণ্ড-পার্টি মাঝে এক-একবার ঢুকে পড়ে বাজাতে বাজাতে বেরিয়ে যাচ্ছে। কালিয়া-কোপ্তার মাঝে চাটনিটা ঘুরিয়ে নেবার মতন।

পৌনে-এগারো। মিলিটারি প্যারেড চুকল এতক্ষণে। পতাকাবাহী দল আসে নীল পোশাকে। ষোল গণতন্ত্রের ষোলটা আলাদা পতাকা সার দিয়ে আসছে। নীল পোশাকে তরুণ-তরুণীরা — তাদের পতাকায় নেতাদের ছবি। সারা দেশ জুড়ে শত সহস্র উদ্যোগ — সেই সব দলের লোকও আসে ভিন্ন ভিন্ন পোশাকে। রামধনুর তো সাতটা রং — আজকের উৎসবে কত রঙের বাহার, তার কোন লেখাজোখা নেই।

জনসাধারণের মিছিল। মাথার উপরে পতাকা। একটু উপর থেকে দেখছি তো — যেদিকে তাকাই, ঝিলমিল পতাকা উড়ছে। আর ফুল। সত্যিকার ফুল নয়; সত্যি ফুল ক'টাই বা ফোটে হাড়-কাঁপানো শীতরাজ্যে! দেদার কাগজের ফুল। দল-ছাড়া কয়েকটা মেয়ে এদিকে এসে বিদেশি আমাদের অভিনন্দন দিয়ে যায়। আকাশ-ফাটানো উল্লাসধ্বনি। ফুল দিয়ে কাস্তে-হাতুড়ি বানিয়েছে, বানিয়েছে ক্রেমলিন-চূড়ার তারা। এই ফুলগুলো সত্যিকারের। কাগজের অতিকায় কলসি। মার্কস ও এঙ্গেলসের দু-তিন মানুষ আঁকারের ছবি। ছবি আর প্লাকার্ডের মিছিল — কত-কি লেখা তুলে ধরে চলেছে, মূর্খ মানুষ পড়তে পারিনে। আনন্দ-সমুদ্রে তুফান উঠেছে। কয়েকটা বাচ্চা বাপ-দাদার কাঁধে চেপে মিছিল বয়ে চলেছে। ফুলের মতো চেহারা, মুঠিভরা ফুল — মিষ্টি রিনরিনে গলায় জকার দিয়ে যাচ্ছে তারা।

পিছনে চলে যাই, আরও উঁচুতে উঠে সারা মিছিল ভাল করে দেখব। আনন্দোচ্ছল জনতরঙ্গ অবিরাম বয়ে যাচ্ছে — শেষ নেই, সীমা নেই। ফাঁকা রাস্তা বয়ে এসেছিলাম, পুলিশে আটকে রেখেছিল, মানুষ দেখে দেখে পথ করে দিচ্ছিল। তখন ছিল স্তব্ধ গাম্ভীর্য। লক্ষ ধারা উচ্ছ্বসিত হয়ে হঠাৎ বেরিয়ে পড়ল। লাল রঙের বিশাল বাড়ি বিপ্লব-মিউজিয়াম — তারই এদিক-সেদিক থেকে বেরিয়ে আসছে। কুসুমগুল্ম ও সবুজ ঘাসে ভরা একটুকু মাঠ ঐ। সারা সোবিয়েত দেশের সব চেয়ে মূল্যবান ভূমি। কত জনে নিদ্রাচ্ছন্ন এর নিচে — বিপ্লবের বলি, নাম জানা নেই, গুণতি করেও রাখেনি ক'জন ছিল

তারা। আর শুয়ে আছেন মুসোলিয়ামের পাতাল-কক্ষে কাচের আবরণের নিচে লেনিন ও স্ট্যালিন। শুনতে পাচ্ছেন তাঁরা বাইরের এই কলরোল?

ফিরে আসছি। রেডিও-র একজন পিছু নিয়েছেন: এই উৎসবের ব্যাপার রেডিও-য় আজ বলতে হবে আপনাকে। বাংলায় বলবেন, আপনার বাংলাদেশের মানুষ শুনবে।

ভাল রে ভাল! শহর জুড়ে দেওয়ালি, বাজিতে বাজিতে আকাশে আগুন ধরিয়ে দেবে, মস্কোর একটা মানুষ আজ সন্ধ্যায় ঘরে থাকবে না। আমি সেই সময়টা বুঝি বন্ধ ঘরের মধ্যে মাইকের সামনে ভ্যানর-ভ্যানর করব? ও:সব হবে না মশায়। তা ছাড়া লিখে নেবারই বা সময় কোথা?— কাল। ভোরে উঠে লিখে ফেলব; রেকর্ড করে আসব এক সময় গিয়ে।

মীরাও সায় দেয়: কালকের জন্য বন্দোবস্ত করুন। সন্ধ্যাবেলাটা আজ দেখে-শুনে বেড়াবেন। বলশই থিয়েটারে একটা ভাল পালা আছে—'ঝড়ের আলো'। টিকিট করা হয়েছে।

[বেতার-ভাষণ]

সাতই নবেম্বর—মানুষের ইতিহাসে পরম স্মরণীয় সোবিয়েত-বিপ্লবের এই দিনটি। কোটি কোটি নিষ্পিষ্ট মানুষ মাথা তুলে দাঁড়াল। নতুন জগৎ গড়ে তুলবে তারা—সুখের জগৎ, শান্তির জগৎ।

এদেশে পা দিয়ে অবধি দেখতে পাচ্ছি, এই মহা-মহোৎসবের জন্য সকলে দিন গুণছে। সোবিয়েত-রাষ্ট্রের নানান অঞ্চলে চক্কোর দিয়ে বেড়াচ্ছি— যেখানে যাই, আগামী উৎসবের তোড়জোড়। মানুষ হেসে নেচে তাদের সর্বোত্তম প্রাপ্তি দশের সামনে জাহির করবে, তারই সর্বব্যাপ্ত আয়োজন।

নতুন রঙ ধরাচ্ছে বাড়িতে বাড়িতে, আলো আর পতাকা দিয়ে সাজাচ্ছে। ৬ই রাত্রে সারা মস্কো জুড়ে আলোর প্লাবন। ঘুরে ঘুরে এপথ-ওপথ হয়ে বেড়াচ্ছি। আট-শ বছরের সুপ্রাচীন নগরীর বুকের উপর বড় বড় সড়ক, আকাশচুম্বী প্রাসাদ। প্রবীণ সংস্কৃতি আর নবীন জীবনোল্লাস গলাগলি হয়ে আছে এখানে। এই রাত্রে বিচিত্র আলোর মালা পরে ভুবনমোহন রূপ ধরেছে মস্কো।

৭ই সকালবেলা কনকনে শীতের মধ্যে বেরিয়ে পড়লাম আমরা ভারতীয় দল। রেড-স্কোয়ার আমাদের হোটেল মেট্রোপোলের অতি নিকটে। পায়চারি করতে করতে সকালবেলা অথবা সন্ধ্যার পর কতদিন লেনিন-স্ট্যালিনের সমাধি-ভবনের ধারে গিয়ে দাঁড়িয়েছি, আজকে কিন্তু চললাম একেবারে উল্টোদিকে। পথে মানুষজন সামান্য — কর্মব্যস্ত জনাকীর্ণ পথ খা-খা করছে আজ। পুলিশের

দল ব্যূহ রচনা করে আছে মাঝে মাঝে। এমনি অনেক ব্যূহ পার হয়ে হাজির হলাম ক্রেমলিনের সামনে সমাধি-ভবনের ডানদিকের গ্যালারিতে। আমাদের জায়গা এখানে, এখান থেকে উৎসব দেখব।

উৎসব দশটায় শুরু। ক্রেমলিনের বড়-ঘড়িতে সাড়ে-নটা — আধ ঘন্টা বাকি এখনো। চারিদিক তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছি। রেড-স্কোয়ারের এক প্রান্তে সুপ্রাচীন বেসিল-গির্জা, অন্য প্রান্তে ঐতিহাসিক মিউজিয়ামের লাল বাড়ি। আর সামনে স্কোয়ারের ওপারে গুম অর্থাৎ সর্বদ্রব্য-বিপণির সুবিশাল প্রাসাদ। বেসিল-গির্জার পাশে পুরানো গোলাকার বেদী -- সেকালে রাজাজ্ঞায় নৃশংস ভাবে হাত-পা-গলা কেটে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হত এর উপরে। সেই বেদী ঘিরে ফুল আর পতাকায় অপরূপ সাজিয়েছে। লাল পতাকা বাতাসে উড়ছে— অগ্নিশিখার মতো দেখাচ্ছে আমাদের এখান থেকে। গুমের গায়েও অমনি শত শত পতাকা। মোভি-ক্যামেরা সাজিয়েছে বেসিল-গির্জা গুম আর মিউ-জিয়ামের উপরে। তিন দিক দিয়ে আক্রমণ -- বিপুল এই উৎসব-সমারোহের যতখানি ধরে রাখা যায়।

গুমের লাগোয়া ওপারের ফুটপাথেও অগণ্য দর্শক। তাদের আড়াল করে সৈন্যবাহিনী ছবির মতো স্থির দাঁড়িয়ে আছে রেড-স্কোয়ারের প্রান্তে। ব্যাণ্ড-বাহিনীর সোনার বরন বাজনাগুলো ঝিকমিক করছে। একেবারে সামনের সারিতে দাঁড়িয়েছি, বাচ্ছা ছেলেমেয়েরা যেখানে। বিষম দানশীল হয়ে পড়েছে ছেলেমেয়েগুলো -- বাড়ির লোক আপেল-টফি-চকোলেট দিয়েছে খাওয়ার জন্যে, সমস্ত নিঃশেষে দিয়ে দিচ্ছে আমাদের। না নিলে শুনবে না -- রাগ করে, জবরদস্তি করে। অগত্যা হাত পেতে নিয়ে, আবার ফাঁকমতো তাদের পকেটে ফেলে দিচ্ছি। টের পেয়ে পকেট চেপে সামাল হয়ে গেল। তখন আবার নতুন কায়দা খুঁজি। এই লুকোচুরি খেলা চলছে আমাদের। ক্লিক-ক্লিক ফোটো তুলছে এদিক-ওদিকে। কামানের মতো দুটো বড় মোভিও আক্রমণ করতে ধেয়ে এসেছে এতদূর অবধি।

নটা-পঞ্চান্ন। ঐতিহাসিক মিউজিয়ামের দিক থেকে কী-এক শব্দ। সেই শব্দ সরলরেখার গতিতে সারবন্দি পুলিস ও সৈন্যদলের মুখে মুখে ছুটে বেসিল-গির্জা ছাড়িয়ে আরো দূর প্রান্তে মিলিয়ে গেল। প্রস্তুত সকলে। দশটা বাজল ক্রেমলিনের ঘড়িতে। নেতারা সমাধি-ভবনের অলিন্দে দাঁড়িয়েছেন। ব্যাণ্ড বেজে উঠল। প্রতিরক্ষা-মন্ত্রী মার্শাল বুলগানিন আর মস্কো-বিভাগের সেনাপতি মুস্কালিয়াস্কো দুই মোটরে সৈন্যবাহিনীর সামনে ঝড়ের বেগে অভি-নন্দন দিয়ে চলছেন। তারা প্রতি-অভিনন্দন জানাল। চারিদিক নিঃশব্দ

ছিল, আনন্দ উত্তাল হল এক মুহূর্তে। দুই দল ব্যাণ্ড এগিয়ে এল দু-দিক থেকে। বাজাচ্ছে তারা সমাধি-ভবনের সামনে দাঁড়িয়ে। বিপুল আনন্দ-কলরব— আকাশ ফেটে যায় বুঝি বা!

চুপ। বুলগানিন সম্ভাষণ করছেন সর্বজনকে। দেশজোড়া বিপুল শিল্প-প্রগতি ও কৃষি-সাফল্য — তার পরিচয় দিলেন। বিস্তর পতিত জমি উদ্ধার হয়েছে। রাশিয়া আর কাজাকিস্তান এই দুই গণতন্ত্র নির্ধারিত সময়ের আগেই লক্ষ্য ছাড়িয়ে গেছে। বৈজ্ঞানিকদের বিপুল কর্মিষ্ঠতা। স্থল, জল ও আকাশে সৈন্যদল আধুনিক যন্ত্রপাতিতে শক্তিমান। সোবিয়েত জনগণ অসীম পরিশ্রমে দেশের সর্বত্র ঐশ্বর্য ও আনন্দ বহন করে এনেছে। গণতন্ত্রের শক্তি বেড়েছে পৃথিবীতে। শান্তির প্রচেষ্টা বহু ব্যাপক হচ্ছে। সাংস্কৃতিক যোগাযোগ চলেছে দেশে দেশে। এশিয়া, আফ্রিকা ও আমেরিকার নানা ক্ষেত্রের জ্ঞানী-গুণীরা দলে দলে এসে সোবিয়েত দেশের পরিচয় নিয়ে যাচ্ছেন। এদেশের অনেকেই নিমন্ত্রিত হয়ে ভিন্ন দেশে যাচ্ছেন। বিদেশের প্রতিনিধিরা নিঃসংশয়ে বুঝে যাচ্ছেন, সোবিয়েতের মানুষ একান্তভাবে শান্তিকামী। কিন্তু লড়াইবাজও আছে দুনিয়ায়। তারা চক্রান্ত করছে ; তাই প্রতিরোধ ব্যবস্থা আমরা দৃঢ়তর করেছি। যাতে শান্তির পরিবেশ কেউ ক্ষুণ্ন করতে না পারে…

ভাষণ শেষ হলে ক্রেমলিন থেকে কামান-নির্ঘোষ। তার যেন শেষ নেই, সীমা নেই। প্রতি নির্ঘোষে জনতা প্রবল চিৎকারে উল্লাস জানাচ্ছে। ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল গির্জার ওদিকটা।

তার পরে সৈন্যবাহিনীর মিছিল — খালি-হাতের সৈন্য, তরোয়ালধারী, বন্দুক কাঁধে ঠেশান দেওয়া, আকাশমুখো বন্দুক, সামনের দিকে উদ্যত বন্দুক —। এমনি চলেছে দলে দলে।

যান্ত্রিকবাহিনী মোটরগাড়িতে। মেশিন-গান দিয়ে সজ্জিত মোটর, বিমান-ধ্বংসী কামান মোটরে টেনে নিয়ে চলেছে। সেল নিয়ে যাচ্ছে, মর্টার নিয়ে যাচ্ছে। ভারী কামান, ভারী বিমান-ধ্বংসী কামান, ক্যাটারপিলার বিমান-ধ্বংসী কামান, প্যারাশুট-বাহিনী — আওয়াজে কাঁপছে চারিদিক। দেখতে আনন্দ লাগে, আতঙ্ক লাগে, বিস্ময়ে হতবাক হতে হয়।

রণবাহিনীর মিছিল ক্রমশ বেসিল-গির্জা পার হয়ে চলে গেল। একটু স্তব্ধতা। বাতাস প্রবল হয়েছে ইতিমধ্যে। পতপত আওয়াজ করে পতাকা দুলছে গুমের শীর্ষে। বহু সহস্র নবীন প্রত্যাশা কেন্দ্রিত হয়ে যেন মর্মরিত উর্ধ্ব-আকাশে।

তারপর খেলোয়াড়ের দল। সামনে বড় বড় পতাকায় মার্কস-এঙ্গেলস লেনিন-

স্ট্যালিনের ছবি। তারপরে বিভিন্ন গণতন্ত্রের নায়কদের। মাও-সে-তুঙের ছবিও দেখছি। সবুজ, নীল, বেগুনি, খয়েরি — কত রঙের পোশাক। ঝলমল করছে চোখের সামনে, ঝিলিক দিয়ে চলে যাচ্ছে যেন সোবিয়েতের প্রস্ফুট যৌবন-শক্তি।

জনসাধারণের মিছিল তারপরে। সেই জন-সমুদ্রের তুলনা দেব, এমন ভাষা খুঁজে পাই না। পতাকার সমুদ্র। হাতে ফুল প্রায় সকলের — কাগজের ফুল, নানা রঙের। ফুল নেড়ে আমাদের সম্বর্ধনা জানাচ্ছে। কত দেশের মানুষ এক হয়ে মিশেছি আমরা। আমি ভারতের, ডানদিকে চীনা এক মেয়ে, পিছনে পোলিশ বৃদ্ধ।···নিষ্পলক বিমুগ্ধ চোখে অসংখ্য মানবের এই বিচিত্র আনন্দলীলা দেখছি। সমাধি-ভবনের অলিন্দে স্থিরমূর্তি নায়কেরা। আর ভিতরে অনন্ত নিদ্রায় নিষুপ্ত লেনিন ও স্ট্যালিন। ফুল দিয়ে বানিয়েছে প্রকাণ্ড কাস্তে-হাতুড়ি, ফুলের তৈরি ক্রেমলিনের তারা। বাচচা কাঁধে তুলে মিছিলে বয়ে চলেছে, বাচচাদের হাতেও ফুল। ফুলে ফুলে চারিদিক পরিব্যাপ্ত। এই হাজার হাজার মানুষ ফুল হয়ে ফুটে উঠেছে আর এক দিনের রক্ত-পরিপ্লাবিত আত্মদানের পুণ্যে ভাস্বর এই রেড-স্কোয়ারে।

জন-স্রোতের অন্ত নেই। সীমাহীন উল্লাস। একবার পিছনে গিয়ে উঁচু জায়গার উপর উঠে দেখলাম। অশ্রান্ত সমুদ্র বয়ে চলেছে — তারই মাথায় মাথায় জাহাজের চূড়ার মতো অসংখ্য পতাকা। আর দেখলাম, ব্যবস্থা বটে। একেবারে ফাঁকা রাস্তা দিয়েই তো এসে পেঁ ৌছেছি — দশটা বাজবার আগ পর্যন্ত এতটুকু শব্দ ছিল না কোনদিকে। কোন নিভৃত কন্দরে এত আনন্দ লুকিয়ে রেখেছিল — জীবন-কল্লোল সহসা নিষুপ্তি ভেঙে বিপুল প্রবাহে দশদিক ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে।

ফিরে চলেছি হোটেলে। এবারে ফাঁকা পথ নয়। রাস্তা-গলি ছাপিয়ে শতধারে ছুটেছে আনন্দ। হাতে ফুল গুঁজে দিয়ে যাচ্ছে, শেকহ্যাণ্ড করে [illegible] কত ছেলেবুড়ো পুরুষ-মেয়ে, কত চীনা কোরীয় আরবি জর্মন মানুষ। উপহার-পাওয়া ফুলে দু-হাত ভরতি। আমরা যাকে পাচ্ছি, সেই ফুল বিলোতে বিলোতে চলেছি। গান গেয়ে চলেছে দলে দলে, কাছে এসে আলাপ জমানোর চেষ্টা করছে। নতুন নতুন মিছিলের দল এখনও চলেছে বড় রাস্তা দিয়ে। অপরাহ্ণ গড়িয়ে আসে, উল্লাস-প্রবাহ চলেছে তবু অবিরাম।

চব্বিশ বছর আগে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ এদেশে এসে বলেছিলেন, 'না এলে এ জন্মের তীর্থদর্শন অপূর্ণ থাকত।' বহু মানবের আনন্দের পবিত্র তীর্থসলিলে অবগাহন করে আজকে বাংলা দেশের সাহিত্যিক আমি পরিতৃপ্ত হলাম।

এখন আর লেখা হচ্ছে না নিয়ম মতো। বিরক্তি লাগে। লেখক মানুষ—সাধ ছিল, এখানে যাঁরা লেখেন তাঁদের সঙ্গে কয়েকটা দিন মিলেমিশে হৈ-হৈ করব। কিন্তু এত দিনের মধ্যে যোগাযোগ হল না। হতাশ হয়ে পড়ছি। যে দলের মধ্যে এসেছি, জন দুই-তিন ছাড়া সাহিত্যের কোন তোয়াক্কা রাখেন না কেউ। বাংলা সাহিত্যের তো নয়-ই। পিকিনে আনিসিমভের সঙ্গে খাতির জমেছিল—এখানে এসে শুনি, ভদ্রলোক গর্কি ইনস্টিট্যুট অব ওয়ার্লড লিটারেচার নামক মস্তবড় প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টর, রীতিমত ওজনদার মানুষ। মস্কোয় এত ঘোরাফেরা করছি, একই জায়গায় থেকে তবু কিন্তু দেখা হল না একটি বার। কত জনকে বললাম; বটেই তো,—বটেই তো বলে প্রবল ঘাড় নাড়ে, দু-কদম যেতে না যেতে ভুলে মেরে দেয়।

দেশে ফিরবার সময় হয়ে এলো। খুব বেশি তো আর এক হপ্তা। সত্যি তো ঘরবাড়ি বিকিয়ে দিয়ে আসি নি। ক'জনের দস্তুরমতো গৃহপীড়া দেখা দিয়েছে—শয়নে, স্বপনে, বিচরণে বাড়ির কথা। চিঠি লেখা বিষম বেড়েছে; ভোকসের লোক নাজেহাল হচ্ছে খাম-টিকিটের জোগান দিতে দিতে।

ঘোরাঘুরি চলছে ঠিক নিয়ম মতো। আজ সকালে নিয়ে চলল মিলিটারি একজিবিশনে—যার আসল নাম সোবিয়েত মিউজিয়াম অব আর্মস। ১৯.. অব্দে স্থাপনা।

লেনিন ও স্ট্যালিনের প্রতিমূর্তি—যেমন সর্বক্ষেত্রে দেখে থাকেন। ১৯১৭ অব্দে বিপ্লব হল—সেই বিপ্লব-সৈনিকদের টুপি, ব্যাজ ও পিস্তল। ভারি সম্মানের বস্তু এগুলো। আর দেখুন পতাকা। কাচের আড়ালে সাঁটা রয়েছে—বিবর্ণ নিশ্চল, একদিন এই পতাকা উড়িয়ে তারা জারের শীত প্রাসাদ আক্রমণ করেছিল। সেই আক্রমণের ছবি—ফোটো তুলে রাখেনি কেউ, শিল্পী রঙ তুলি আর কল্পনায় এঁকেছে। দ্বিতীয়-কংগ্রেসে লেনিন সর্বহারার গবর্নমেন্ট ঘোষণা করলেন, তখনকার ফোটো ও কাগজপত্র। অর্ডার অব দি রেড

[illegible]নার — লাল পতাকার নামযুক্ত সৈনিকের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান — তার নমুনা [illegible]য়েছে এখানে।

১৯১৮ অব্দে চারিদিক দিয়ে শত্রুরাষ্ট্র ঘিরে ফেলেছিল — তখনকার নানা পোস্টার ও ছবি। ব্রিটিশ-আমেরিকা-জর্মনি সীমান্তে সেনা মোতায়েন করল, বিষম অত্যাচার, দেশের ভিতরেও গণ্ডগোল ফাঁপিয়ে তুলেছে শত্রুরা, ঘরে-বাইরে লড়াই। তার হরেক ছবি ও কাগজপত্র। ব্রিটিশ আমেরিকা জর্মনি জাপান ও ফ্রান্সের বন্দুক মেশিনগান টুপি হেমলেট ইত্যাদি কেড়েকুড়ে নিয়েছিল সেই সময়, তার কিছু কিছু রয়েছে। আবার এই তরফের কামান, মাইন, গেরিলা-বাহিনীর অস্ত্রশস্ত্র, বোমা ফেলার যন্ত্র, হাতে-তৈরি পেটাই মেশিনগান। সেকালের হাতলওয়ালা বর্শা। জাপানি টুপি কেড়ে নিয়ে মাথায় চাপিয়ে জাপানি সেজেছে গেরিলারা ; বিদেশির হামলা রুখেছে ঐ বেশে। সেই সব টুপি দেখতে পাচ্ছি।

এক লাল সৈন্যের হাতের চামড়া তুলে নিল যেহেতু সে দলের কথা ফাঁস করে না। সেই সৈন্যের নামধাম ও যাবতীয় কাহিনী। কশাক টুপি, হাতবোমা, তলোয়ার, তলোয়ারের খাপ। শহীদজনের মূর্তি অনেকগুলি। একটা ব্রিটিশ সাবমেরিন এরা ডুবিয়ে দিয়েছিল, তার মডেল রেখে দিয়েছে। জলতল থেকে পরে ঐ সাবমেরিন তুলে তার মধ্যে ষড়যন্ত্রের দলিলপত্র পাওয়া যায়।

১৯১৯ অব্দের তোলা সোবিয়েত বীর-সেনাদের ছবি। তাদের বিভিন্ন অস্ত্রসজ্জা। প্রোপাগাণ্ডার ট্রেন ও জাহাজ বেরুল দেশের আনাচে কানাচে সর্বত্র।—গণমানুষদের রাজনীতির পাঠ দিতে হবে। গণ্যমান্য নেতারা বেরিয়ে পড়লেন গাঁয়ে গাঁয়ে। সেই সব ট্রেন ও জাহাজের মডেল।

লড়াই ছেড়ে সংগঠন এবারে। পর পর তিনটে পঞ্চবার্ষিকী কল্পনার রূপদান হল। কত খাল কেটেছে, বাঁধ বেঁধেছে, জলধারা বইয়ে দিয়েছে উষর মরুতে, তেল-ইস্পাতের গোপন ভাণ্ডার পাতাল খুঁড়ে বের করে ফেলেছে। ছবিতে ছবিতে তাকিয়ে দেখুন কী কাণ্ড করেছে তামাম দেশটা জুড়ে। লড়াইয়ের সরঞ্জামও বানাচ্ছে ফাঁকে ফাঁকে। দুটো পঞ্চবার্ষিকীর মধ্যে বানিয়ে ফেলল চার-শ রণতরী, নানান রকমের বন্দুক মেশিনগান হাউইটজার।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। নাৎসি ফ্যাসি ও জাপান হামলা দিয়েছে রাশিয়ার উপর। অসংখ্য পোস্টার সে আমলের। এক দুর্গে সৈন্যরা আটকা পড়েছে, আঁকাবাঁকা অক্ষরে এক-একজন লিখে গেছে দেয়ালের উপর : আত্মদান করলাম, কিন্তু দুর্গ ছাড়িনি ; তারিখ — ২০ জুলাই, ১৯৪১। একটুকরা টিন ছিল এক পাশে — গুলিতে গুলিতে শতছিদ্র সেটিও।

দেড় মাসে রাশিয়া খতম— এই ,ওদের হিসাব। হিসাব উল্টে গেল— জর্মনিই হটছে। স্ট্যালিন কম্যাণ্ডার-ইন-চীফ।

গাইড বলে যাচ্ছে ইংরেজিতে। ছবি ও জিনিসপত্রে ঘটনার পর ঘটনা দেখিয়ে যাচ্ছে। রোমাঞ্চক রূপকথার মতো শুনছি। জর্মনদের হাতিয়ার-পত্র কেড়ে নিয়ে তাড়া করেছে তাদের। নীপার নদী পার হচ্ছে সৈন্যদল — তার এক বিরাট মডেল। নিরীহ লাঠির ভিতরে বন্দুক-রিভলভার ; ছুরির মধ্যে মাইক ; পিস্তল পেন্সিলের মধ্যে। গুপ্তচরেরা এই সমস্ত নিয়ে দেশের মধ্যে ঘুরত।

১৯৪৫ অব্দে পুরোপুরি জয়। জর্মনির প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা ভেঙেচুরে পালাচ্ছে বার্লিন মুখো — তার সুবৃহৎ মডেল।

রাইখস্টাগের চূড়ায় যে পতাকা এরা উড়িয়ে দিয়েছিল, সেটা পরম যত্নে এনে রেখেছে। সমস্ত শহর জ্বলছে, তার ছবি। রাইখস্টাগের মডেল। নানা অঞ্চলের সৈন্যরা রাইখের এখানে-ওখানে যা খুশি লিখেছিল, তার ছাপ রেখে দিয়েছে। জাপানেরও হার হল, গাদা গাদা অস্ত্র কেড়ে নিয়ে এসেছে সেখান থেকে।

সোবিয়েত-দুনিয়া শান্তি চায়। দেয়াল-জোড়া ম্যাপের উপর আলো বসানো — বিশাল দেশের যাবতীয় সম্পদের পরিচয় এই ম্যাপে। দেশের মানুষ সকলে মিলে সুখে-শান্তিতে এই বিপুল সম্পদ ভোগ করবে। রণজয়ের পর নানান দেশ থেকে উপহারের পাহাড় জমেছে! স্তূপীকৃত পতাকা — যা-সমস্ত জয় করে এনেছে, আর নিজেদের যা ছিল।

কত লোক মিউজিয়াম দেখতে এসেছে— মেয়েপুরুষ বাচ্চাবুড়ো আর ইউনিফর্ম-আঁটা সৈন্য। গাইডেরা বকবক করে বুঝিয়ে চলেছে— এদের এই মহা-ইতিহাস ছবির মতন ভাসছে আপনার চোখের উপর। কত সংগ্রাম, কত বীরত্ব, কত আত্মত্যাগ! বেদনার উদ্বেল সমুদ্র পার হয়ে অবশেষে রৌদ্রোজ্জ্বল কূল পেয়েছে।

বিজয়োৎসব। পরাজিত পতাকাগুলো এদেশ-সেদেশ থেকে বয়ে এনে প্রথমটা মুসোলিয়ামের সামনে রেখে দিল। লেনিন যার ভিতর শান্ত ভাবে ঘুমিয়ে আছেন। দেশের সমস্ত উল্লাস ঐ স্মৃতিমন্দিরের পাদপীঠে এসে স্থির হয়ে দাঁড়ায়। তার পরে এই মিউজিয়ামের সংগ্রহে রেখেছে। সমস্ত সাজানো-গোছানো। সর্বশেষে দেখি, খুদ হিটলারের বিশাল পতাকা আর ব্যাজ মেঝেয় গড়াগড়ি যাচ্ছে। তাকের উপর কিম্বা দেয়ালের গায়ে জায়গা হয়নি। গাইডের কণ্ঠ সহসা কঠিন হয়ে উঠল, কথায় আগুনের জ্বালা : আমরা

শান্তি চাই। কেউ যদি পিছনে লাগতে আসে, তার মাথা ঠিক এমনি করেই ধূলায় লুটিয়ে দেবো।

চেকোভস্কি সুরকার। জ্ঞানীগুণীরা খুব জানেন, সাধারণের কথা বলতে পারব না। রাশিয়ায় এই নামে সিনি পড়ে। মস্কো শহরের বুকে মস্ত বড় মূর্তি, ঐ নামে পার্ক। মনোরম এক হল বানিয়েছে—চেকোভস্কি কনসার্ট-হল। সন্ধ্যার পর সেখানে গিয়ে বসলাম। নাচের আসর; অত বড় হল মানুষের ভিড়ে গমগম করছে।

রাশিয়ার রকমারি লোকনৃত্য। চোখে না দেখে নাচের কি মজা পাবেন? আহা-ওহো করেও লাভ নেই। কি আর হবে—নাম ক'টা নিয়ে নিন শুধু।

বার্চ-নাচ—গ্রাম্য পোশাকে একগাদা মেয়ে নাচছে। ডান হাতে নীল রুমাল, বাঁ হাতে বার্চ-শাখা। লাল গাউনে দুটো পা ঢেকে গেছে, ঢেকে অনেকখানি স্টেজের উপর ছড়িয়ে আছে। হলদে রুমাল মাথায়। ধীরে ধীরে চলল। ঘুরছে, পা দেখা যায় তো—মনে হল স্টেজই পাক দিচ্ছে মেয়েগুলোকে ঘিরে। নাচ নয়—কাঠের ঐ স্টেজের উপরে যেন ভেসে ভেসে বেড়ানো। যত সব ধুন্দুমার নাচ দেখায় পশ্চিমে—আজকের এই নাচ বড্ড মোলায়েম। গানের সুরগুলোও ভারি স্নিগ্ধ।

নাচের পর নাচ চলছে। ফিতে নাচ। তিন ঘোড়ার নাচ —ঘোড়ার ভঙ্গিতে নাচে তিনটে করে ছেলে; উত্তর-রাশিয়ার অতি প্রাচীন এক লোক-নৃত্য। চৌকো নৃত্য—চারটে করে মেয়ে একসঙ্গে নাচে। মস্কো অঞ্চলের এক পুরানো নাচের সুর। ভল্গা গাঙের উপর মাঝির নাচ। এক গ্রামকন্যার প্রণয়গাথা ও নাচ। কসাক মেয়েদের নাচ—নাচে তাবৎ দর্শকদের সম্বর্ধনা জানাচ্ছে, বাজনাদারদের অবধি। নাগরদোলার নাচ। হাসিহল্লার নাচ। নাচের এক পালা, নাম হল 'আমরা রাজহংসী'—কালো পাথরের বড় আংটি আঙুলে পরে হাত বাঁকিয়ে মেয়েগুলো দাঁড়িয়ে আছে, ঠিক যেন রাজহংসী। কালো পাথর হল হাঁসের চোখ; আহা, সরোবরে ভেসে বেড়ায় ঐ দেখ হংসীর দল। রঙের খেলা—নাচে আর সাজপোশাকে রঙের ঢেউ খেলে যাচ্ছে; বারম্বার হাততালি পড়ে, ঘুরে ফিরে নাচতে হয়। রাশিয়ার পুরানো বাজনা—কত রকম তারের যন্ত্র, লেখাজোখা নেই। লোকনৃত্যের বাজনা। সোবিয়েত যুবনৃত্য ও গান—একবার দু-বার দেখে মানুষের তৃপ্তি হয় না। এক জিনিস বারম্বার করে দেখায়।

পরদিন, ১ নভেম্বর। রেড-স্কোয়ার দিয়ে যত বার যাই, লোলুপ চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি মুসোলিয়ামের দিকে। ভিতরে গিয়ে দেখব, লেনিনের কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়াব। এত দিন যেতে দিত না, উৎসব ব্যাপারে রঙচঙ করা হচ্ছিল। উৎসব অন্তে আজ দোর খুলে দিয়েছে। চলেছি সেখানে, পায়ে হেঁটে যাচ্ছি। প্রকাণ্ড আয়তনের শ্বেত কুসুমস্তবক নিয়ে চলেছি।

রেড-স্কোয়ার আর রেভল্যুশান-স্কোয়ারের মাঝখানটায় ঐতিহাসিক মিউজিয়ামের লাল বাড়ি। লাইন দিয়ে দাঁড়িয়েছে অগুন্তি মানুষ। মুসোলিয়ামের সামনে থেকে লাইনের শুরু—রেড-স্কোয়ার শেষ হয়ে ঐতিহাসিক মিউজিয়াম ছাড়িয়ে রেভল্যুশান-স্কোয়ারের বহুদূর অবধি চলে গেছে। বাচ্চা-বুড়ো মেয়ে-পুরুষ সব রকম তার মধ্যে। বারো মাস তিরিশ দিন এই ব্যাপার। বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত ঢুকতে দেয়, কিউয়ের লেজ একটুকু খাটো হয় না তার ভিতর। মাথার দিক দিয়ে লাইনবন্দি ঢুকে যাচ্ছে, পিছন দিকে নতুন নতুন মানুষ জুটছে এসে। আমরাও আসছি রেভল্যুশান-স্কোয়ার হয়ে ঐ পিছন দিকে। আরে সর্বনাশ! আগে যারা দাঁড়িয়ে গেছে তাদের শেষ হতেই আজকের পাঁচটায় কুলাবে না।

না, বিশেষ অতিথি বলে আলাদা বন্দোবস্ত আমাদের জন্য। উর্দি-পরা কয়েকটা সৈন্য আমাদের এগিয়ে নিয়ে চলল কিউয়ের পাশ দিয়ে মুসোলিয়ামের দরজার দিকে। কুসুমস্তবক জন আষ্টেক মিলে কাঁধে বয়ে চলেছেন।

দুয়ারের অদূরে এসে থমকে দাঁড়াতে হল। ঠিক বারোটা—পাহারা বদল হচ্ছে। ঘন্টায় ঘন্টায় পাহারা বদল। চারজন করে সৈন্য বন্দুক হাতে দাঁড়িয়ে থাকে। দিন-রাত্রি শীত-গ্রীষ্ম-বরফ সর্বক্ষণ আছে তারা। এতটুকু নড়াচড়া নেই—অবিচল, পাথরে-খোদা মূর্তির মতো। তিনজন বন্দুকধারী ক্রেমলিনের ভিতর দিক থেকে আসছে রেড-স্কোয়ারের পাথরের উপর খটখট জুতোর আওয়াজ তুলে। তারা এসে দাঁড়াল এক মুহূর্ত। দু-জন উঠল গিয়ে দরজার উপর; আগের চারজনের দু-জন নেমে এসে আবার তিন জন হল। মার্চ করে তিন জনে ক্রেমলিনে ঢুকে গেল।

ফুল ভিতরে নিতে দেয় না, দরজার কাছে রাখে। ভিতরে ঢুকলাম। লাল মার্বেলে গড়া চৌকো ধরনের বাড়ি—বাইরে থেকে ছোট মনে হয়। পয়লা দিনটা খুব খারাপ লাগছিল, এমনি এক সামান্য জায়গায় লেনিন-স্ট্যালিনকে রেখেছে। আজকে ভিতরে এসে দেখছি, ছোট বস্তু নয়। বিরাট ক্রেমলিনের পাশে বলেই এমন দেখাচ্ছে। চমৎকার পালিশ করা, হাত ঠেকালে পিছলে যায়। মাটির অনেক তল অবধি ঘর। সিঁড়ি দিয়ে নেমে নেমে ক্রমশ

গর্ভগৃহে ঢুকে পড়লাম। সৈন্যের পাহারা ভিতরেও। সন্তর্পণে সবাই পা ফেলে ফেলে যাচ্ছি—এতটুকু জুতোর শব্দ না হয়। শান্ত ধ্যান-সমাহিত পরিবেশ। অবশেষে এসে পৌছলাম সমাধিগৃহে।

লেনিন ও স্ট্যালিন ঘুমুচ্ছেন পাশাপাশি। কাচে-ঘেরা জায়গাটুকু। কে বলবে মৃত্যু, কঠিন সংঘর্ষ ও কর্মের ক্লান্তিতে বিভোর হয়ে ওঁরা ঘুমিয়ে পড়েছেন। লেনিনের বামদিকে স্ট্যালিন। লেনিনের গায়ে কালো রঙের কোট; স্ট্যালিনের পুরাদস্তুর মিলিটারি পোশাক। ছবিতে যা দেখেন, অবিকল সেই চেহারা। অদৃশ্য কোথা থেকে একটুকু আলো পড়েছে মুখের উপর—যেমন ধারা জ্যোতি ঘেরা থাকে মহাপুরুষের মুখমণ্ডলের ছবিতে। ছোটখাট মানুষটি লেনিন—হাত একটু যেন বিবর্ণ হয়েছে এই তিরিশ বছরে। স্ট্যালিনের কাঁচায় পাকায় মেশানো গোঁফ-চুল। বারম্বার মুখে তাকাচ্ছি—ঘুমন্ত মানুষ ছাড়া অন্য কিছু মনে হয় না। দুই দেহের তিন দিক প্রদক্ষিণ করে আবার উঁচুতে উঠে একটু বাঁক ঘুরে চলেছি। পা টিপে টিপে চলা—পাছে ঘুম ভেঙে যায়। গভীর শান্তিতে ঘুমোতে লাগলেন ওঁরা-নিঃশব্দে ভিন্ন দরজায় বেরিয়ে এলাম।

শেষ নয়। আরও আছে, আর কিছু এগিয়ে যাব। বাঁয়ে ঘুরলাম। উপরে উঠে যাচ্ছি ক্রমশ, ক্রেমলিনের দেয়ালের দিকে। ছোট একটু বাগান। তার পরে শহীদের কবরভূমি। বিপ্লবের বলি। পাইকারি কবর—নামধাম জানা নেই। কবর-ভূমি এমনি দুটো—লম্বালম্বি অনেকটা জায়গা নিয়ে—মাঝে একটুখানি ফাঁক। মস্কো শহরের সব চেয়ে পবিত্র জায়গা—মরবার পর এখানে ঠাঁই পাবার জন্য সকলের ভারি লোভ। টেন ডেজ দ্যাট শুক দ্য ওয়ার্লড (Ten Days that Shook the World) বইয়ের মার্কিন লেখক রীডেরও কবর এখানে। আরও পাঁচ জন বড় বড় নেতার—তাঁদের আবক্ষ মূর্তি কবরের উপরে।

জায়গা নেই, একটুও জায়গা নেই আর ওখানে। অনেকে বলে গেলেন, মৃত্যুর পরে দেহ দাহ করে সেই ছাই খানিকটা ঐখানে ক্রেমলিনের দেয়ালের ভিতর ঢুকিয়ে রেখো। অনেক আছে এমন—দেয়ালের উপর পাথরের ফলকে তাঁদের নাম লেখা। মাক্সিম গর্কিরও ছাই এখানে।

মস্কোর ভারতীয় অ্যাম্বাসি দাওয়াত পাঠিয়েছেন আমাদের সকলকে। দেশে তো ফিরছেন, তার আগে স্ফূর্তি করে খাওয়া যাক এক সঙ্গে। সুধীন্দ্রনাথকে আসতে বলে দিয়েছি। দু-জনে বেরুব। মোটরগাড়িতে নয়—পায়ে হাঁটব

যত্র-তত্র। ট্রামে চড়ে বেড়াব, মেট্রোয় চড়ব। মস্কো শহর চষে বেড়াব। তারপর যথাসময়ে অ্যাম্বাসিতে জুটে খানাপিনা করে সকলের সঙ্গে বাসায় ফিরে আসব। সুধীন্দ্রনাথ অনেক দিন আছে মস্কোয়, তার সঙ্গে পথ হারাবার ভয় নেই। অ্যাম্বাসির লোক—আমাদেরই পুরোপুরি আপন লোক সে।

এই যে শুনি, দু-চারটে মাত্র জায়গা দেখতে দেয় ওদের খুশি মতো? বিদেশির দিকে কড়া নজর—চলাচলের ব্যাপারে একটু হেরফের হলে কঁ্যাক করে টুঁটি টিপে ধরে?

সুধীন্দ্রনাথ একগাল হেসে বলে, তাই দেখুন। সারা বিকেল তো চক্কোর দিচ্ছি। নজর তুলে দেখল না একটিবার কেউ।

ঘন্টা তিন-চার ঘোরাঘুরি হয়েছে। ট্রামে চেপে যাচ্ছি—কোন তল্লাট দিয়ে কোথায় চলেছি, সুধীন্দ্রনাথ বলতে বলতে যাচ্ছে। সহসা মালুম হল, নজর আছে বই কি! সবগুলো নজরই বোধ হয় আমাদের দিকে। যাদের মুখোমুখি বসেছি, তারা সোজা তাকাচ্ছে। চোখে চোখ পড়লে নজর নামিয়ে নেয়, ক্ষণ পরে আবার তাকায়। উল্টো দিকে যাদের মুখ, ঘাড় বাঁকিয়ে লুকিয়ে-চুরিয়ে দেখে তারা। এ তো বড় মুশকিল! সামনের দিকে এই ব্যাপার—পিঠের উপরটাও দৃষ্টির শূলে খোঁচাখুঁচি করছে, অনুমানে বুঝতে পারি।

সুধীন্দ্রনাথ বলে, রূপ দেখছে আমাদের। কালো দেখতে পায় না বড়-একটা—দেখছে, আর হিংসেয় জ্বলছে মনে মনে।

শান্তি-আন্দোলনের সঙ্গে— কেষ্টবিষ্টু কেউ নই— কিঞ্চিৎ যোগাযোগ আছে আমার। পিকিনের শান্তি-সম্মেলনে একদা খানিকটা তড়পে এসেছিলাম। মস্কোর শান্তি-অফিসে এই সুবাদে ঢুঁ মেরে এলে কেমন হয়? ইচ্ছা মাত্রেই গাড়িতে পুরে পলকের মধ্যে তথায় হাজির করে দিল। সঙ্গে কৃষ্ণস্বামী— সিনেমার মানুষ, আমার পিকিনের সহযাত্রী। খাতির করে বসালেন ওঁরা। প্রশ্ন: শান্তির কাজকর্ম কেমন চলছে ভারতে? এবং উত্তর নিজেরাই দিচ্ছেন: নেহরুর দেশ, বিশ্বশান্তির আদর্শ তোমাদের— আন্দোলন খুব জোরদার নিশ্চয়। আমরা জোরে জোরে ঘাড় নাড়ি: হাঁ হাঁ— অত্র সন্দেহ নাস্তি।

পলিতকেশা এক বৃদ্ধা ঠাহর করে করে দেখছেন। ক্ষীণ দৃষ্টি নিয়ে লোকে যেমন পুঁথি পড়ে। হঠাৎ উঠে গিয়ে তাকের উপর থেকে লম্বা-চওড়া এক বই নামিয়ে ফসফস করে অনেকগুলো পাতা উল্টালেন। তার পরে মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি বাসু—

ব্যাপার জানি। বইটার চেহারায় মালুম হয়েছে— পিকিন শান্তি-সম্মেলনের বুলেটিন। চার ভাষার আছে— ওটা হল রুশ। আমার কাছে আছে ইংরেজি। আর বানিয়েছে চীনা ও স্পানিশে। ঐ যে বললাম, অধমকেও তুলে দিয়েছিল সেই আসরে। ছবি নিয়েছিল বক্তৃতার সময়— কেতাবে ছবি সহ বক্তৃতাটুকু ছাপা হয়ে আছে। ছবি তো সব বক্তারই রয়েছে— হুঁশ দেখুন তা হলে বুড়োমানুষের। আহা-মরি প্রাণকান্ত চেহারা নয় যে এক নজর ছবি দেখে অমনি চিত্তে দাগ কেটে রয়েছে। অথচ বই খুঁজে খুঁজে ছবির সঙ্গে মিলিয়ে নাম বাতলে তবে ছাড়লেন।

শরীর বেজুত লাগছে, দুপুর থেকে শুয়ে পড়ে আছি। হীরেন মুখুজ্জে মশায় বললেন, সে হয় না— সাহিত্য নিয়ে যাদের নাড়াচাড়া, নিশ্চয় যেতে হবে তাদের। হিন্দির ব্যাপার যখন, যে ক'জন বাঙালি আছি সকলেরই যাওয়া উচিত।

ব্যাপার হল, অধ্যাপক প্রকাশ গুপ্ত হিন্দি সাহিত্যের গতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে বলবেন। ভোকসের ডাকে এসেছি—ভারত-সোবিয়েতের জানাশোনা ও ভালবাসা আরও ঘনিষ্ঠ হবে এই আশায় ডেকে এনে এত খাতিরযত্ন ও খরচপত্র করছেন। এসেছি যখন যার যেটুকু বিদ্যে, জাহির করে যেতে হবে। আমাদের আছে কাল, বাংলা-সাহিত্য সম্বন্ধে—আমার ও হীরেন মুখুজ্জে মশায়ের। এবং শ্রীমতী মদন বলবেন পাঞ্জাবি রূপকথা নিয়ে। প্রকাশ গুপ্ত হলেন এলাহাবাদ য়্যুনিভার্সিটির অধ্যাপক। মাস্টার মানুষ, বলার অভ্যাস তো থাকবেই—কিন্তু পরমাশ্চর্য ব্যাপার, ডিগ্রি এবং চাকরি-প্রাপ্তির পরেও ভদ্রলোক পড়াশুনা রীতিমতো বজায় রেখেছেন।

তা গিয়ে লাভ হল অনেক, সত্যি বলছি। অনেক কিছু শিখে নিলাম ঘন্টাখানেকের মধ্যে। রুশ শ্রোতারাও শতকণ্ঠে তারিপ করলেন। ভারতীয় দল নিয়ে প্রথম এই গুণী-জ্ঞানীর আসর। শ্রীগুপ্ত দলের ষোল আনা মান রেখেছেন।

পরের সকালে রেডিও-অফিসে আমাদের ক-জনকে ডেকেছে। সোবিয়েতে এত দিন ঘোরাঘুরি হল, কেমন লাগল বলে যান এইবার। মুখের কথা রেকর্ড করে নিচ্ছে, সময় মতো পরে শোনাবে। প্রশ্ন করছেন বিনয়, আমরা জবাব দিচ্ছি। তার পরে কিছু আলোচনা হল সকলে মিলে। আমার আবার আলাদা একটু কাজ—গল্প রেকর্ড করা। বিনয় চারটে গল্প পছন্দ করে দিয়েছেন, সেগুলো পড়তে হবে। আজকে যদ্দূর হয় হোক—যা বাকি থাকে, কাল-পরশু দেখা যাবে।

বাইশ-চব্বিশ বছরের এক তরুণীকে দেখছি, কাজে নিমগ্ন। আড়চোখে চায় এক-একবার, মিটিমিটি হাসে। বিনয় পরিচয় করিয়ে দেন: ভাল্যা ইসোরবোভা—রেডিও বাংলা-বিভাগের মেয়ে, খাসা বাংলা শিখেছে।

ভাল্যা রাঙা হয়ে ওঠে লজ্জায়: না না, বাংলা আমি কিছু জানি না।

লাজুক ভাব খাসা লাগে ওদেশের মেয়ের মুখে। খুনসুটি করি; নানা কথা জিজ্ঞাসা করি বাংলায়—কেমন জবাব দেয় দেখি। ঘাড় নিচু করে দুটো-একটা কথা বলে, আরে হাসে। আর বলে, বাংলা আমি একেবারে জানি না।

বরিস কার্‌পুস্কিন—সুশ্রী এক যুবা রেডিও-র ঐ বাংলা-বিভাগে অনুবাদের কাজ করে। ভাল্যা বাংলা হরফে নাম লিখল আমার খাতায়, বরিসও লিখল। গল্পে গল্পে আমাদের থিয়েটার-জগতের 'মহর্ষি' মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের কথা উঠল। মস্কোয় গিয়েছিলেন তিনি। সেই সময় এক সাহেব ছেলে হঠাৎ এসে

তাঁকে বলল, আপনাকে দাদু ডাকিতে ইচ্ছা করি। মহর্ষি হকচকিয়ে গেলেন। বিনয়কে শুধাই, কে ছেলেটি খবর রাখেন কিছু? আছে সে এখন মস্কোয়?

বরিস বলে, আমি তো সেই।

আবিষ্কার রীতিমতো। দেশে গিয়ে বলা যাবে, মহর্ষির নাতিকে খুঁজে পেয়েছি।

ভাল্যাকে বললাম, আমার বাংলাদেশের পাড়াগাঁয়ে লাজুক মেয়ে দেখি— অবিকল তোমারই মতো।

ভাল্যা চুপি চুপি বলে, আপনি দাদা, আমি বোন আপনার।

ভাই পেয়েছি গ্লাত্যুককে, বোনও এই পেয়ে গেলাম। দেশে ফেরবার ঠিক একটা দিন আগে। আমার শিষ্টশান্ত লক্ষ্মী বোনই বটে। এক দিনের তরে— ঐ এক সকালবেলা দেখে এলাম, আলাপ-পরিচয় হল। মস্কোয় তাকে আর পাই নি। আর কোনদিন দেখব না জীবনে। কিন্তু সুদূরবাসিনী তার লজ্জানত হাসি-ভরা মুখ নিয়ে চিরকাল আমার আপন জন হয়ে রইল।

ভগ্নদূত এসে উপস্থিত। মস্কোর রাজপথে হু-হু করে গাড়ি ছুটিয়ে এসেছে। গাড়ি ছুটানো চোখে দেখিনি বটে, কিন্তু দুটো-তিনটে সিঁড়ি ধুপধাপ একসঙ্গে টপকানো দেখে স্বচ্ছন্দে অনুমান করা চলে। এসে অবধি চেষ্টা করছি, নিজ গোষ্ঠীর ভিতর বসে দুটো সুখ-দুঃখের কথা কইব, সেই সুদিন অত্র সমাগত। ইউনিয়ন অব রাইটার্স নামে জোরালো সমিতি— মস্কোর লেখককুল ঐখানে মোলাকাতের জন্য বসে আছেন। চলুন, চলুন—

কী মুশকিল, আগে একটু খবরবাদ দেয়। ওঠ ছুঁড়ি তোর বিয়ে, এ কেমন কথা?

আগে থেকেই নাকি ব্যবস্থা, গত কাল খবর দেবার কথা। কিন্তু যার উপরে ভার—ইত্যাদি ইত্যাদি।

একতলা বাড়ি, মস্তবড় কম্পাউণ্ড। লেখক মশায়রা গাড়ি চেপে আসছেন, গাড়িতে বেরুচ্ছেন। পঁচিশ-ত্রিশটা গাড়ি সর্বক্ষণ উঠানে। সমিতির কতগুলো ঘর আর কত রকমের বিভাগ, গণে পারবেন না।

এক ঘরে নিয়ে গেল। লম্বা টেবিল ঘিরে বসেছি— আমাদের তরফের এবং ঐ তরফের। অশীতিপর একজন রবীন্দ্রনাথের কথা তুললেন। রবীন্দ্রনাথ রাশিয়ায় গেলেন, বিপ্লবের ধকল তখনো কাটেনি। নানান অভাব-অসুবিধা, খাবারদাবার পাওয়া যায় না। কিন্তু দুর্যোগ কাটিয়ে উঠবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা চলেছে। রবীন্দ্রনাথকে রাখা হয়েছে শহরতলীর এক বাড়িতে। লোকজনের ঝামেলা কম, নিরিবিলি আছেন।

বৃদ্ধ লেখক মশায় বলতে লাগলেন, বিপ্লবের আগেও তাঁর কবিতার তর্জমা হয়েছিল এদেশে; আমরা তাঁর নাম জানতাম, লেখা পড়েছি। একদিনের কথা মনে পড়ে। পনের জন লেখক মোটমাট বসেছি একসঙ্গে। টেগোর প্রান্ত-দেশে। বারম্বার দেখছি তাঁকে, দেখে দেখে আশ মেটে না। মনে হল প্রফেট। তাঁর মুখ-চোখ দাড়ি-পোশাক সব মিলিয়ে অপরূপ মনে হচ্ছিল। মৃদুস্বরে কথা বলছেন। সব চেয়ে আশ্চর্য সঙ্গীতের মতো সেই কণ্ঠ। দু-ঘন্টা ধরে চলল। আমাদের ভয় হচ্ছে, ক্লান্ত হয়ে পড়বেন তিনি। কিছু না। মস্কো তখন প্রায় এক বড়-গ্রামের মতো। এত বড় বৃহৎ দেশের রাজধানী এই—তিনি কিন্তু হতাশ হননি। মস্কোর লোকের খুব প্রশংসা করতেন। লেনিনগ্রাডে যাবার কথা, কিন্তু শরীরের জন্য শেষ অবধি ঘটে উঠল না।

ভারি এক মজা হল সেই সময়। বৃদ্ধ বলতে বলতে হেসে উঠলেন: কেমন করে রটে গেছে, গির্জার এক পাদরিকে লুকিয়ে রেখেছি আমরা ঐ বাড়িতে। টেগোরের দাড়ি ও লম্বা পোশাক দেখে ভেবেছে তিনি পাদরি। বিপ্লবের জের আছে তখনো, পাদরি-পুরুতের উপর লোকের রাগ। বড়লোকদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে পুরানো ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনার চেষ্টায় ছিল তারা। জনতা একদিন হামলা দিয়ে পড়ল। আমরা বলি, মস্তবড় কবি—ভারত থেকে এসেছেন, মহামান্য অতিথি। তখন বলে, দেখতে দাও আমাদের ভাল করে। টেগোর উপরের বারাণ্ডায় এলেন। সকালবেলা, রোদে চারিদিক ভরে গেছে, তার মধ্যে ঐ সুঠাম সৌম্য দীর্ঘ-দেহ এসে দাঁড়ালেন। মুগ্ধ জনতার জয়ধ্বনি উঠল। তখন আবার নতুন উপসর্গ—রোজ এসে ভিড় করে: টেগোরকে দেখব। কবি বারাণ্ডায় বেরিয়ে আসেন, দেখে পরিতৃপ্ত হয়ে লোকে ফিরে যায়।

'রাশিয়ায় চিঠির' কথা তুললাম আমি। কবিগুরুর রাশিয়ায় আসা সার্থক হয়েছিল। কী আশ্চর্য সুন্দর ভাবে কত সংক্ষেপে এই দেশ ও আপনাদের কথা লিখে গেছেন। বইটার ইংরেজি হয়েছিল, কিন্তু শুনতে পাই বিলাতে প্রচার বন্ধ। আপনাদের রুশ-অনুবাদ নেই?

তাঁরা প্রায় আকাশ থেকে পড়েন: না—নেই তো সে বইয়ের অনুবাদ। পড়ি নি আমরা।

আমার কাছে আছে এক কপি। আমার নিজের কয়েকটা বই আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি, সেই সঙ্গে ওটাও দিয়ে যাব।

নিশ্চয় দেবেন, ভুলবেন না। আমরা তর্জমা করে ফেলব।

কাগজে দেখছি, 'রাশিয়ার চিঠির' রুশ-অনুবাদ হয়েছে। আমার সেই কপি থেকেই হয়েছে কি না, বলতে পারিনে।

এইবারে সেই লেখকের নিজের কথা: ১৯২০ অব্দে কাবুল গিয়েছিলাম কূটনৈতিক কাজে। ভারতীয় কাগজ পড়তাম। ব্রিটিশের সঙ্গে লড়ছিলে তখন তোমরা। সেই সময়টা পেশোয়ার যাবার খুব চেষ্টা করেছিলাম। আমি ফরাসি বলতাম। আমায় জবাব দিল, ভাইসরয়ের অফিস যতদিন সিমলায় আছে, তোমাদের কখনো অত দূর যেতে দেব না। আমি বলেছিলাম, অফিস আর কদ্দিন থাকে, তাই দেখ; তোমরা চলে গেলে তার পরে যাব। হয়েছেও তাই— তারা চলে গেছে। কিন্তু আমি যে বড্ড বুড়ো হয়ে গেছি, কোথাও যাবার ক্ষমতা নেই। মনে মনে ভারত ঘুরি এখন। ভারতকে খুঁজে বেড়াই নানা বইয়ের মধ্যে। ভাষার অসুবিধা। ভারতের অনেক— অনেক বইয়ের তর্জমা হওয়া দরকার।

সদ্য একটা বই বেরিয়েছে—ভারত ও পাকিস্তানের গল্প। এর কথা আগে শুনেছেন। একজনকে বলি, সূচিটা পড় দিকি, কার কার গল্প নিয়েছে। যশপালের আছে গোটা চার-পাঁচ, কৃষাণচাঁদ, মুলুকরাজ— ওঁদের সব আছে। অজানা নামও অনেক। বাঙালি শুধু একজন—ভবানী ভট্টাচার্য। তিনি বাংলায় লেখেন না, থাকেনও না বাংলা দেশে।

কী মশায়রা, বাংলার উপরে বিতৃষ্ণা কেন? বাংলা ছোট-গল্প ভুবনের যে-কোন দেশের সঙ্গে টক্কর দিতে পারে। তার একটারও ঠাঁই হল না?

আমাদের আর যাঁরা ছিলেন, তাঁরাও হাঁ-হাঁ করে সায় দেন।

ওঁরা লজ্জা পেলেন। বলেন, জানতে পারিনে—খবরবাদ পাইনে তেমন-কিছু। আপনাদের তরফ থেকেও তো সাহায্য পাইনি। বরঞ্চ মনে হয়েছে, টেগোর তিরোধান করেছেন—বাংলা-সাহিত্যও গেছে সেই সঙ্গে।

বাঙালি লেখকদের কিঞ্চিৎ উদ্যোগী হতে বলি। আমাদের প্রচার নেই। দুনিয়া ছোট হয়ে গেছে। আপনার সাধনার ধন শুধু স্বদেশের ক'টা মানুষের মধ্যে আটক থাকবে কেন? বাইরে ছড়িয়ে দিন। বম্বে ও দিল্লির দিকে নজর তুলে দেখুন না একটু। সামান্য সম্বল নিয়ে কত জনে কী ঢাকই না বাজাচ্ছেন।

আপনি যত জাঁদরেল মানুষ হোন, সোবিয়েত দেশ থোড়াই কেয়ার করবে যতক্ষণ না কোন কর্মিক-সংঘ পিছন থেকে আপনাকে ঠেলে দিচ্ছে। একলার খাতির নেই—এক-গলায় অনেকের কথা বলুন, তবে শুনবে। যত রকম পেশা থাকতে পারে, সব পেশার লোক এক এক ইউনিয়ন গড়ে বসে আছে। তারাই

আসল। ইউনিয়নগুলোকে হাত করে নিন, সারা সোবিয়েত দেশ তবে আপনার মুঠোর ভিতর।

ইউনিয়নের বড়-অফিসে চলেছি দুপুরের খানাপিনার পর। মস্কো শহরের সীমানা ঘেঁসে নতুন য়্যুনিভার্সিটি-পাড়ায়, লেনিন-পাহাড়ের দিকে। সেন্ট্রাল কাউন্সিল অব ট্রেড়-ইউনিয়নস। উঠানে পা দিয়েই চোখের মণি গর্ত থেকে ঠিকরে বেরবার জোগাড়। সশব্দে একজনে বলেও উঠলেন, ওরে বাবা, এই হল ট্রেড-ইউনিয়নের বাড়ি—রাষ্ট্রপতি-ভবন নয়? ইউনিয়ন-অফিস বলতে আমরা বুঝি, নিচু-ছাত ঘুটঘুটে অন্ধকারে ভাপসা গন্ধ-ওঠা ঘরের মধ্যে হাতল-ভাঙা খান দুই চেয়ার ও নড়বড়ে টেবিল। চেয়ার ও মেজের উপরে কয়েকটি মানুষ এবং দেয়াল-ভর্তি আরশুলা। আর এখানে কী কাণ্ড!

চারতলায় উঠে গেলাম লিফটে। নানান বিভাগ—অসংখ্য ঘর। ঝকঝক তকতক করছে। আসবাবপত্র একেবারে হাল ফ্যাশানের। বসে বসে কাজ করার মধ্যে যতখানি সুখ নিতে পারা যায়, সকল ব্যবস্থা করে রেখেছে।

সোবিয়েত ট্রেড-ইউনিয়ন জনসাধারণের সংস্থা। বেকার নেই, সক্ষম মানুষ মাত্রেই কাজ পেয়েছে। যে-কেউ মেম্বার হতে পারে—কারখানার কর্মিক, অফিসের কেরানি, কারিগরি ও উঁচু ক্লাসের ছাত্র—সবাই। জাতি-বৃত্তির বাছবিচার নেই। ইস্কুলের মাস্টার, খনির শ্রমিক, বইয়ের লেখক, গাড়ির ড্রাইভার—সকলের আলাদা আলাদা ইউনিয়ন; ইচ্ছে করলে যে কেউ মেম্বার হতে পারেন নিজ ইউনিয়নের।

সমস্ত ইউনিয়ন থেকে মেম্বার বাছাই করে নিয়ে আবার এক সংস্থা গড়ে, তার নাম সুপ্রীম ট্রেড-ইউনিয়ন। ওদের ভিতরে ভোট নিয়ে হয় সেন্ট্রাল-কাউন্সিল। সকলের বেশি ক্ষমতা এই কাউন্সিলের—তাবৎ ট্রেড-ইউনিয়নের মধ্যে যোগাযোগ-সাধন হল এদের প্রধান কাজ।

সরকারি ও আধা-সরকারি যাবতীয় ইলেকশনে ট্রেড-ইউনিয়নগুলোর বিস্তর প্রভাব। অগুন্তি মেম্বার। কর্মিকদের ভাতডালের ব্যবস্থা করেই দায়খালাস নয়। তীক্ষ্ণ নজর থাকে, কর্মিকরা যাতে ষোল-আনা মানুষ হয়ে জীবন কাটায় —শুধুমাত্র কাজের যন্ত্র না হয়ে ওঠে। এই কাউন্সিলের ব্যবস্থায় সাড়ে ন-হাজার সংস্কৃতি-ভবন (Palace of Culture) চলছে। তা ছাড়া ছোটখাট ক্লাব —গুণতিতে দাঁড়াবে সাতানব্বুই হাজার। কর্মিক ও তার পরিবারের হরেক রকম খেলাধূলা পড়াশুনা ও স্ফূর্তিফার্তির ব্যবস্থা। ক্লাবে এসে তারা ছবি আঁকে, ফোটো তোলে, দরজির কাজ শেখে, তাস-দাবা খেলে, থিয়েটার করে, সিনেমা দেখে। গুণীজ্ঞানীরা এসে শিল্প সাহিত্য ও বিজ্ঞানের বক্তৃতা দিয়ে

যান। প্রতি ক্লাবের সঙ্গেই শিশুকেন্দ্র—ছেলেপুলেদের শিক্ষা শরীর-চর্চা ও আমোদের ব্যবস্থা। তেরো হাজার লাইব্রেরি চালায় কাউন্সিল। তা ছাড়া সরকারি লাইব্রেরি ও ইস্কুল-কলেজের লাইব্রেরি আলাদা তো আছেই। লড়াইয়ের সময় হিটলারের দল বিস্তর জায়গা দখল করে নিয়েছিল, অনেক লাইব্রেরি পুড়িয়ে দিয়েছে তখন। সেই সব লাইব্রেরি আবার নতুন করে গড়তে হয়েছে।

লড়াইয়ে বাড়ি ভেঙে চুরমার করেছিল, এখন দেদার বাড়ি বানাচ্ছে কর্মিকদের বসবাসের জন্য। কর্মিকের প্রয়োজন মতো ঘরবাড়ির বন্দোবস্ত করে দেওয়ার কাজও ট্রেড-ইউনিয়নের। মাইনে-করা ইউনিয়নের ডাক্তার—কর্মিকদের বাড়ি বাড়ি ঘুরে মুফতে রোগি দেখে বেড়ান। ইউনিয়নের ইনস্পেক্টররা—পাকা লোক দেখে দেখে এই কাজে দেয়—তদারক করে বেড়ান, কর্মিকদের স্বাস্থ্যহানির কারণ ঘটছে কিনা কোথাও। প্রায় হাতে-মাথা-কাটার ক্ষমতা ওঁদের—দরকার হলে ফ্যাক্টরির কাজকর্ম থামিয়ে দিয়ে মামলা আনতে পারেন কর্ম-কর্তাদের বিরুদ্ধে। দোষত্রুটি সামলানোর জন্য, এমন কি, ফ্যাক্টরির চালনা সরাসরি নিজ হাতে নিয়ে নিতে পারেন সাময়িক ভাবে। কর্মিকরা গোলমাল না করে, সেটাও দেখেন ওঁরা ; গণ্ডগোল জমে ওঠবার আগেভাগে মিটমাটের ব্যবস্থা করেন সকলকে এক জায়গায় এনে বসিয়ে। ওভারটাইম কাজ করার নিয়ম নেই। কিন্তু জরুরি ব্যাপারে কখনো-সখনো বিশেষ হুকুম আসে। তখনও ইনস্পেক্টর নজর রাখবেন, কর্মিকদের শরীর খারাপ না হয়ে পড়ে। পেনশন পায় সকল কর্মিক—পুরুষের ষাট আর মেয়ের পঞ্চান্ন বয়স হলে। কয়লার খনিতে যারা কাজ করে তাদের পেনশন অনেক আগে। পেনশন পেলেই যে কাজ ছাড়বেন, তার কোন মানে নেই। স্বাস্থ্য ভাল থাকলে চাকরি চালিয়ে যথারীতি মাইনে নেবেন, পেনশনের টাকাও আসবে।

অক্ষমতার পেনশন আছে। শরীর হঠাৎ অপটু হয়ে পড়লে পথে বসতে হবে না। সংসার-পোষণের দায়ঝক্কি থাকলে পুরো মাইনে পাবেন কাজকর্ম না করেও। অন্যথা মাইনের চার ভাগের তিন ভাগ। ভারী কাজ করতে পারছেন না কিন্তু হালকা কাজের শক্তি আছে, এমন অবস্থায় মাইনের অর্ধেক দেবে; বাকিটা হালকা কাজ করে আপনি রোজগার করুন। চাকরির পঁচিশ বছর পুরলে মাস্টার-মশায়রা পেনশন পাবেন। শক্তি থাকলে তারপরে চাকরিও চালিয়ে যাবেন পেনশনের সঙ্গে। সন্তান-প্রসবের সময় মেয়ে-কর্মিকরা যাবতীয় খরচখরচা পায়। এবং সাতাত্তর দিনের ছুটি। কোন কর্মিকের ধরুন শরীর খারাপ হয়ে পড়েছে ; তার জন্য বলকারক দামি খাদ্য চাই। কিংবা একটা ছেলে ধরুন পড়াশুনোয়

কৃতিত্ব দেখিয়েছে, বৃত্তি দিয়ে তাকে উৎসাহিত করতে হবে। ইউনিয়ন আলাদা ফাণ্ড জমিয়ে রেখেছে এই সব বাড়তি ব্যবস্থার জন্য।

তেরো হাজার স্যানিটোরিয়াম ও বিশ্রামস্থান আছে ইউনিয়নগুলোর তাঁবে—পাহাড়ের উপরে সমুদ্রের কিনারে ভাল ভাল স্বাস্থ্যকর জায়গায়। কর্মিকরা সেখানে মুফতে থাকতে পায়। এক মাস থাকবে—তার মধ্যে কারখানায় ছুটি মেলে আঠারো দিনের; সোস্যাল ইনস্যুরেন্স-ফাণ্ড থেকে বাকি বার দিনের মাইনে দিয়ে দেয়। কর্মিকদের স্বাস্থ্য ও আনন্দের জন্য নানারকম চেষ্টা—তার ফলে উৎপাদন বেড়ে সমৃদ্ধি উথলে উঠছে। জিনিসপত্রের দাম কমছে দিনকে দিন; এবং কর্মিকের মাইনে বাড়ছে। কর্মিকের পরিবার খুব বড় হলে সে ক্ষেত্রে বিশেষ ভাতা। ছেলেপুলের মধ্যে ইস্কুল-কলেজ ও য়ুনিভার্সিটির ছাত্র থাকলেও বেশি টাকা। জাতীয় আয়ের সত্তর ভাগ জনসাধারণের কাছে ফিরে আসবে, এই হল আর্থিক ব্যবস্থা ওদের।

ধর্মঘটের কথা কখনো শুনিনে আপনাদের দেশে। কড়া আইন আছে বুঝি?

কার বিপক্ষে করবে বলুন ধর্মঘট? মালিক বলে আলাদা কোন দল নেই, নিজেরাই সব। ধর্মঘট তবে নিজেদের বিরুদ্ধে? সোবিয়েত দেশটাই হল এক সুবৃহৎ পরিবার। কত রকমের সমস্যা ওঠে; তেমনি সমাধানও করে নেয় নিজেরা বুঝসমঝ করে। চাকরি যাওয়া খুব কঠিন এদেশে; অতি-বড় অপরাধ করলে কালেভদ্রে চাকরি যায়। শোষণের মানুষ না থাকার তিক্ততার কারণ ঘটে না কোন সময়।

ছুটলাম ওখান থেকে শহরের ভিতর দিকে। আর এক বড় প্রতিষ্ঠান—গর্কি ইনস্টিট্যুট অব ওয়ার্লড-লিটারেচারস। ডিরেক্টর হলেন অ্যানিসিমভ, চীনে যাঁর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। সোবিয়েত-দলের নেতা হয়ে তিনি চীনে গিয়েছিলেন। সে কথা কি আর মনে আছে এত দিন পরে? দ্বিধা ভরে দোভাষিণীর মারফতে শুধালাম: মনে পড়ে আবছা রকমের কিছু? অ্যানিসিমভ গড়গড় করে একগাদা জবাব দিয়ে চললেন, দোভাষিণী ইংরেজি করে দিল: মনে পড়বে না কি বলছ? সাংহাইয়ে বক্তৃতার কমপিটিশন হল যে তোমার সঙ্গে। জিত তোমারই—হাততালির চোটে কানের পর্দা ছিঁড়ে যায়। তৎক্ষণাৎ আমি না না করে উঠি: আজ্ঞে না, ডাহা মিথ্যে বলা হচ্ছে। তোমার বক্তৃতায় এমন হাততালি, আকাশ ফেটে চৌচির হয়ে গিয়ে বৃষ্টির তোড়ে সৃষ্টিসংসার লণ্ডভণ্ড করে দিল। 'চীন দেখে এলাম' বইয়ে সংক্ষেপে ব্যাপারটা আছে। পাকে-চক্রে আমিও সেই সময় ভারতীয় দলের কর্তা হয়ে পড়েছি। কিন্তু

বক্তৃতার ঐ ব্যাপারগুলো আগেভাগে বানানো নিতান্তই কাগজে-লেখা বস্তু—বাহাদুরি কারো নেই। না আমার, না অ্যানিসিমভের।

অ্যানিসিমভ তারপরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে চললেন: মনে নেই যে বলছ, দেখে যাও এদিকে এসে।—এসো।

দেয়ালজোড়া বইয়ের তাক। একটার সামনে দাঁড় করালেন। ওঁর হাতে সেই সময় একগাদা বই দিয়েছিলাম। তার একটাও অন্য কোথাও দেন নি; নিজের ইনস্টিট্যুটে সাজিয়ে রেখেছেন। রেখেছেন কেমন জায়গায় ভাবতে পারেন? রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে। বাংলার লেখক আমরা তা হলে মোটমাট দু-জন—রবীন্দ্রনাথ এবং এই অধম। আপনারা দূর-ছাই করেন, আর এত দূরে কী পশার জমিয়ে আছি, ভাবুন একবার। এবং হিংসায় জ্বলে মরুন। ইতিমধ্যে অনেক দিন কেটেছে, আরও অনেকে নিশ্চয় জুটে পড়েছেন সেখানে। বেশ দিব্যি ছিলাম নিরালায় কবিগুরুর পদপ্রান্তে। এখন ভিড় জমে গেছে।

গর্কির নামে প্রতিষ্ঠান—গর্কি-সম্পর্কীয় যত-কিছু এই এক জায়গায় সংগ্রহ করে রাখছে। হরেক পাণ্ডুলিপি একটা ঘরে—জানলা নেই, ভারী দরজা, দেয়াল ডবল-পুরু। হাতের কাছে টুকবোটাকরা যে কাগজ পাওয়া গেছে, তার উপরেই গর্কি কলম চালিয়েছেন। আবার চওড়া মার্জিনে গোটা গোটা অক্ষরের পাণ্ডুলিপিও দেখছি। পরের পাণ্ডুলিপিও যত্ন করে দেখে কাটকুট করে দিতেন—নিদর্শন শত শত রয়েছে। চিঠিপত্রের সংগ্রহ—চেকভকে লেখা চিঠি, চেকভ তার যে উত্তর দিয়েছেন; বিপ্লবী শ্যামজী কৃষ্ণবর্মার চিঠি, ভারতের স্বাধীনতা সম্পর্কে ইউরোপের এখান-ওখান থেকে শ্যামজী চিঠি দিতেন গর্কিকে।

গর্কির জিনিসপত্রের ভাণ্ডারই শুধু নয়—তাবৎ সাহিত্যের গবেষণাগার। জাতবেজাত ভুলে দুনিয়ার সমস্ত সাহিত্য এই আখড়ায় জমায়েত হবে—গর্কির সেই মনোবাসনা। ইনস্টিট্যুট অব ওয়ার্লড লিটারেচারস নামকরণটা গর্কিরই। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীর আদর্শ ঠিক করেছিলেন 'যত্র ভবত্যেকনীড়ম্'—এখানেও সেই এক বস্তু।

তিরিশ ভল্যুমে গর্কির যাবতীয় বই বেরুচ্ছে এই বছরের মধ্যেই। অতিরিক্ত এক ভল্যুম হবে গর্কির চিঠিপত্র। তিন লাখ করে ছাপছে আপাতত।

ইংরেজি-সাহিত্যের ইতিহাস লেখা হয়েছে বৃহৎ পাঁচ ভল্যুমে। ফরাসি ও জর্মন সাহিত্যের ইতিহাসও তৈরি হচ্ছে। সোবিয়েতে মোটমাট যতগুলো ভাষা চলে, প্রতিটি ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে গবেষণা হচ্ছে, প্রতিটি সাহিত্যের ইতিহাস লিখছে। বেশি নজর অবশ্য রুশভাষা সম্পর্কে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। দেশের পুরানো রূপকথা নিয়েও জোর গবেষণা চলেছে।

ক্রেমলিনে চলেছি। কত শত বার গেছি সামনে দিয়ে, আজকে ভিতরে যাব। রেড-স্কোয়ারের সামনে সদর গেট — ইতর লোক আমাদের ঐ পথে ঢুকতে মানা। বিস্তর কড়াকড়ি। ভিতরে ঢুকে তার পরেও সর্বত্র চলাফেরা করতে দেবে না। লেনিন যেখানে থাকতেন, হাল আমলের কর্তারা থাকেন যেদিকটায় — দূর থেকে নজর করে যেটুকু যা দেখতে পান। কাছে যেতে দেবে না। অনেকটা পথ হাঁটতে হাঁটতে মস্কো-নদীর ধারে এসে পড়েছি। ক্রেমলিনের অন্যদিকে নদী। নদীর কিনারে ছোটখাট এক দুর্গ — তখন কেউ ভেবেছে, এত বিশাল হয়ে উঠবে কালক্রমে? এত খাতির, এমন নামডাক?

সাতপাহাড়ের উপরে মস্কো শহর। যে পাহাড় তার মধ্যে সকলের উঁচু, ক্রেমলিন সেখানে। শহর পত্তনের একেবারে গোড়ায় ক্রেমলিন; তাকে ঘিরে দোকানপাট ব্যাপারবাণিজ্য ও লোকবসতি ক্রমশ জমে উঠল। ছোট্ট এক দুর্গ — বারম্বার চেহারা পালটে আজকে অভিনব ও বিরাটকায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। সোবিয়েত-সরকারের মূল ঘাঁটি; যত-কিছু শলাপরামর্শ বিচার-বিবেচনা এখানে বসে হয়। ভারি ভারি রাজনীতিক সভা এখানে — আমাদের পণ্ডিতজীকে নিয়েও হয়েছিল। টানা উঁচু পাঁচিল — বিস্তর ঘরবাড়ি মাথা তুলে আছে ভিতরে; আকাশ-ছোঁওয়া বড় বড় গির্জা; পাঁচিলের উপরে মাঝে মাঝে চূড়া উঠে গেছে; চূড়ায় লাল-তারা। এই হল ক্রেমলিন। মস্কো শহর, তাবৎ সোবিয়েত দেশ এবং নিখিল ভুবন দৃষ্টি তুলে তাকিয়ে আছে রহস্যময় ক্রেমলিনের দিকে। বিরাট স্থাপত্য — শতাব্দীর পর পর শতাব্দী ধরে বিশাল হয়েছে।

ক্রেমলিনের ভিতরে দেশের প্রাচীনতম মিউজিয়াম। বড় বড় শিল্পীর মূল্যবান অজস্র ছবি — বহু বিচিত্র শিল্পভাণ্ডার। ঐতিহাসিক বস্তুর বিপুল সংগ্রহ। তাবৎ রুশশিল্প, তার বিকাশ ও ক্রমোন্নতি — এই একটা জায়গা থেকে মালুম হবে। ধাতব ও কুটিরশিল্প, হাতের কাজ, কাঠের কাজ — এবং সোনারুপোর কাজ বিশেষ করে।

ইতিহাসের বিভিন্ন অধ্যায়ের সঙ্গে শিল্পরীতির কত রদবদল হয়েছে, নিতান্ত উদাসীন লোকেরও নজরে না পড়ে উপায় নেই। এগারো শতক থেকে এই বিশ শতক—সাত-শ বছরের ধারাবহতা ছবির মতন দেখবেন। রাজা-রাজপুত্র রাজবধূ-রাজকন্যা সামন্ত-সেনানীদের যাবতীয় বিলাসভূষণ ও শিল্পসম্পত্তি সোবিয়েত আমলে এইখানে এনে জমা করেছে।

পিটার দ্য গ্রেটের তৈরি মিউজিয়াম। এক দিকে অস্ত্রাগার—জার এবং সেনানী-সামন্তদের। ষোল কিলোগ্রাম ওজনের ভারী অস্ত্রও আছে। রকমারি শিরস্ত্রাণ। বক্ষোভূষণ মণিমুক্তাখচিত। বিচিত্র কারুকর্মের বন্দুক—ষোল শতকের। তলোয়ার—পিটার দ্য গ্রেট ভারতীয় তলোয়ার ও ছোরা ব্যবহার করতেন, তা-ও রয়েছে। তলোয়ারের বিচিত্র খাপ। নানা রকম যুদ্ধের বাজনা সেকালকার। ঘোড়ার বর্ম, মানুষের বর্ম। পনের-ষোল শতকের বাসনকোশন। সোনার থালা। সোনা ও রুপার হরেক পাত্র—নাম বলতে পারব না। একটা পাত্রে সোনার ওজন পাঁচ সের হবে অন্তত। হাতির দাঁতের কৌটা। সোনা ও মণিমুক্তা-খচিত কৌটা। ঘড়িই বা কত রকমের। কাঠের ঘড়ি—স্প্রিংটুকু মাত্র ধাতুর। আর এক ঘড়ি—আকারে বিশাল; মণিমাণিক্যে রৌদ্রের আভা বেরোয়; ঘণ্টা বাজলে ঈগলপাখি মুক্তা ফেলে দেয় মুখ থেকে; দরজা খুলে যায়; যে ক'টা বাজল, সেই অক্ষর ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে। পিটার দ্য গ্রেটের মদ্যপাত্র, পোশাক। মণিমুক্তা-গাঁথা কত রকমের পোশাক—একটা পোশাকের ওজন প্রায় তিরিশ সের, এই গায়ে দিয়ে চলাফেরা করতেন। সোনায় তৈরি মস্তবড় বাইবেল-কেস। বাইবেলের খাপ একটা-দুটো নয়—অনেক। রাজ-মুকুট, অভিষেকের জিনিসপত্র। হাতির দাঁতের সিংহাসন; মণিমুক্তা-বিজড়িত সিংহাসন। পিটারের বাপ রোমানভের সিংহাসন—চারটে হাতি চতুর্দিকে, বিস্তর কারুকার্য। সিংহাসনটা তৈরি হয়েছিল ভারতে; পারশ্যের বণিকেরা কিনে নিয়ে উপহার দেন।

ঘোড়ার রাজকীয় সাজ, ঘোড়ার গায়ে দেবার জন্য পালকের কম্বল। সতের ও আঠার শতকের ঘোড়ায়-টানা গাড়ি; নানা জায়গা থেকে উপহার এসেছিল এসব। শীতে বরফের উপর দিয়ে নিয়ে যাবার শ্লেজগাড়ি। রানীর শীত-কালের গাড়ি—বাইশ ঘোড়ায় টানত, পিটার্সবার্গ থেকে মস্কো পৌঁছতে লাগত তিন দিন। দ্বিতীয়-ক্যাথেরিনের বিশেষ এক ধরনের গাড়ি, ফ্রান্সে তৈরি; দরাজ ভাবে স্প্রিং দেওয়ার দরুন গাড়ি দুলতে দুলতে চলে।

সারা বেলাও দেখে শেষ করতে পারিনে। কত আর টুকব? ক্লান্ত হয়ে এক সময়ে হাল ছেড়ে দিতে হয়।

বলেছি তো, এই ক্রেমলিনের ভিতরে খাসা খাসা গির্জা। জার থাকতেন না এখানে; করোনেশনের সময় এবং অবরেসবরে আসতেন। খুদ জার-জারিনা এবং তাঁদের ছেলেপুলে উজির-নাজির পুরুত-পাণ্ডার ধর্মকর্মের ক্যাথিড্রাল— অতএব অতিশয় শৌখিন। উসপেনস্কি ক্যাথিড্রালের ১৪৭৯ অব্দে পত্তন। বলগোভেশ্চেনেস্কি ১৪৪৯ অব্দে এবং আর্কএঞ্জেল ১৫০৯ অব্দে বানানো। এদের স্থাপত্য ও দেয়াল-ছবিগুলোয় একবার নজর বুলিয়ে তাজ্জব হয়ে আসুন। আশ্চর্য অনেক ছবি অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল, শিল্পীরা খেটেখুটে উদ্ধারকর্ম প্রায় শেষ করে এনেছেন।

তারপরে দেখুন ঢালাইয়ের কাজকর্ম। জারের কামান— কাঁসার কাছাকাছি একরকম মিশ্রধাতুতে তৈরি (১৫৩৬ অব্দ)। কারুকার্যে ভরা, বিরাট চেহারা, ওজনে চুয়াল্লিশ টন। বড় বড় শেল পাঁচশ মিটার অবধি যেতে পারে এই কামানে। তাতারের আক্রমণ ঠেকাবার জন্য বানানো। কিন্তু শেষ অবধি ব্যবহারের দরকার হয়নি।

পৃথিবীর সাত আশ্চর্যের একটা আমি আগে দেখে এসেছি—চীনের মহা-প্রাচীর। আর একটা এই এখানে— দৈত্যাকার ঘণ্টা। বেড় হল ছয় মিটার ষাট সেন্টিমিটার; ওজন দু-শ টন। দুনিয়ায় এর জুড়ি নেই। জারের ঘণ্টা— গ্রানাইট বেদির উপর রেখেছে, উপরে জারের ছবি। রুপা-তামা ইত্যাদি নানান ধাতু মিশিয়ে তৈরি। কারিগরের নাম আইভান মোটোরিন ও তার ছেলে মিখাইল। ১৭৩৩-৩৫ অব্দে এখানে এই ক্রেমলিনের ভিতরে তৈরি। ঢালাই হয়ে গেলে ঘষামাজার জন্য ফ্রেমের উপর তোলা হল। সেখানে কাজকর্ম চলতে লাগল। ১৭৩৭ অব্দে মস্কোয় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড। ঘণ্টা আগুনে বিষম তেতে গেল; কাঠের ফ্রেমও পুড়ে ছাই। ঘণ্টা পড়ল গিয়ে নালার মধ্যে—মস্কো-নদীর জলে ভরতি সেই নালা। গরমে-ঠাণ্ডায় ফেটে চৌচির। একটা টুকরো আলাদা হয়ে পড়ল, তার ওজন সাড়ে এগারো টন। পুরো একশ বছর ঐ নালায় পড়েছিল; ১৮৩৯ অব্দে তুলে নিয়ে পাথরের বেদি গেঁথে তার উপর রেখে দিয়েছে। টুকরোটা পাশে।

আজকে আমার বক্তৃতা। বিকালবেলা, ভোকস-অফিসে। সাংস্কৃতিক দলের হয়ে এসেছি— ঘোরাফেরা এবং খানাপিনা করে গেলেই হল না, ট্যাক্স দিয়ে যাও। সাংস্কৃতিক বচন শোনাও কিছু। তাতে ডরাই নাকি? গণ-তন্ত্রের যুগে সাহিত্যিক হয়ে আগডম-বাগডম লিখলেই শুধু চলে না, বলতে হয়

দেদার। ভেবেছিলাম, বলব, আধুনিক বাংলা উপন্যাস নিয়ে। গতিক বুঝে বিষয় পালটেছি— 'গণজীবনে বাংলা সাহিত্যের প্রভাব'।

কেন শুনুন। বাংলা সাহিত্য নিয়ে আপনারা জাঁক করেন। জাঁক করবার বস্তুই বটে। বহু সাধকের জীবন-সাধনায় মহাসাহিত্য গড়ে উঠেছে। কিন্তু খবর রাখেন, বাহিরের কেউ আপনাদের পোঁছে না? এই রাশিয়াতেই দেখলেন গল্প-সংকলনের ব্যাপারে। ভারত-পাকিস্তানের গল্প বাছাই হল, তার মধ্যে বাংলা ভাষায় লেখা একটি গল্প নেই। সাহিত্য-দিক্‌পালদেরই প্রশ্ন: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে বাংলা সাহিত্যও মরে গেছে নাকি? বুঝুন। মুশকিল হয়েছে, বাংলার কেউ ইংরেজিতে লেখেন না। লিখতেই বা যাবেন কেন? এমন স্বচ্ছ প্রাণবন্ত ভাষা আমাদের, মনের গূঢ় ভাবরঙ্গ ভাষায় এঁকে অতি সহজে প্রকাশ করতে পারি। আর ওদিকে দেখুন, শফরীকুল শুধুমাত্র ইংরেজি লেখার গুণে আন্তর্জাতিক বাজারে শাহান শা হয়ে বসেছেন। স্বচক্ষে দেখে এলাম। শুধু এই সোবিয়েত দেশের ব্যাপার নয়, তামাম ইউরোপে চক্কোর দিয়ে দেখেছি—শরৎচন্দ্রের নামটাও জানেন না বিস্তর সাহিত্য-ধুরন্ধর। দুনিয়া ছোট হয়ে একেবারে ঘরের উঠানে এসে বসল—সেদিকে চোখকান বুঁজে থাকবেন আপনারা কত দিন?

তা খোলাখুলিই বলি--বক্তৃতার এই যে নতুন বিষয়টা নিয়েছি, কিঞ্চিৎ যেন চোখ-রাঙানি এর ভিতর। বাপু হে, সাংস্কৃতিক যোগাযোগের কথা বলে থাক, দাওয়াত দিয়ে এনে যত্নআত্তি করছ সেই বাবদে—কিন্তু বাঙালি জাতের মন পাবে না বাংলা-সাহিত্যের অবহেলা কর যদি। বাঙালির বড় গর্ব তার সাহিত্য নিয়ে। ভাষার জন্য বাঙালি প্রাণ পর্যন্ত দিয়েছে, পৃথিবীর কোন তল্লাটে যা আর কখনো ঘটে নি।

গণজীবনে বাংলা সাহিত্যের প্রভাব—পূর্বাপর একটা ইতিহাস দাঁড় করানো কঠিন ব্যাপার, বিস্তর কাঠখড় পোড়াতে হয়। দূর বিদেশে ঘোরাঘুরির মধ্যে অবসর কোথায় তেমন? আর ফরমাস মতো বইপত্রই বা কে দেবে জুটিয়ে? বক্তৃতা শুনবেন এখানকার সেরা মানুষেরা। তবে সুবিধা আছে। জ্ঞানীগুণী তাঁরা যতই হোন, বাংলা সাহিত্যের কিচ্ছু জানেন না—নীরন্ধ্র অন্ধকার দৃষ্টির সামনে। অতএব শ্রীমুখে যা উচ্চারণ করব, তাই প্রায় বেদবাক্য ওঁদের কাছে। আপনাদের সামনে হলে—ওরে বাবা, কপালে ঘাম দেখা দিত, উঁ-আঁ করতাম বিশ বার—কাঠগড়ায় যেন খুনি আসামি। মস্কো শহরে কিসের পরোয়া? ভাগ্যক্রমে পাণ্ডিত্য দেখাবার এইটুকু মওকা এসে গেছে, আপনারা মুখ বাঁকাবেন না এই নিয়ে।

গোড়া ধরে শুরু করা গেল — চর্যাপদ থেকে, বাংলা-সাহিত্যের যা প্রথম নিদর্শন। সাধনার এক বিশেষ ধারা নিয়ে ঐসব কবিতা — এবং সে ধারা গণসমাজেই। গণমানুষের অগণ্য জীবনচিত্র — জাল ফেলে মাছ-ধরা, হরিণ-শিকার, ডোম-চণ্ডাল-শবরের ঘরবাড়ি, অনুরাগ-বিরাগ গীতিকাব্যের মধ্যে যেন বিজলী-চমক দিচ্ছে।

তুর্কিরা বাংলাদেশ জয় করল। রাজনীতিক ও সামাজিক বিপর্যয়। সমাজের মাথায় থেকে যাঁরা শাসন করতেন, ক্ষমতা হারিয়ে তাঁরা সাধারণের মধ্যে নেমে এলেন। সংস্কৃত সাহিত্য এতাবৎ উঁচু শ্রেণীর একচেটিয়া ছিল, সেই সাহিত্য অতঃপর লৌকিক রূপ পেতে লাগল। ফলে বাংলা সাহিত্য লাভবান হয়েছে। রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবত সর্ববোধ্য সহজ রূপ নিয়ে হাটে মাঠে বাটে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল; উন্নত সংস্কৃতির ফটক খুলে গেল গণ-মানুষের সামনে। তেমনি আবার বিস্তর লৌকিক ধর্ম ও লৌকিক আখ্যান মার্জিত সাহিত্যিক রূপ পেয়ে গেল বিভিন্ন মঙ্গল-কাব্যে। মানুষের কথায় ভরা এই কাব্যগুলি। দেবতারাও আছেন বটে, কিন্তু মানুষের সঙ্গে নিতান্ত ঘরোয়া সম্পর্ক তাঁদের। স্ত্রীর সঙ্গে কোন্দল, আধিপত্য-বিস্তারের জন্য ছলা-কলা, পেটের দায়ে অতি-সাধারণ বৃত্তি-গ্রহণ — মঙ্গল-কাব্যে মানুষ-দেবতায় ভেদ নেই।

দীন-চণ্ডীদাসের পদ আবৃত্তি করা গেল — 'শুনহ মানুষ ভাই, সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।' মানুষের উপর কেউ নেই, দেবতারাও নন — মানুষের মহিমা ঘোষণা করলেন বাংলার কবি। কৃত্তিবাসী রামায়ণ বাল্মীকির সংস্কৃত রামায়ণের অনুবাদ মাত্র নয়; বাংলার কবির মনের রঙে রাঙানো অনুপম সৃষ্টি। অনেক উপাখ্যান আছে, বাল্মীকির রামায়ণে যার নামগন্ধ নেই। অযোধ্যা আমাদের বাংলা দেশেরই কোন এক জনপদ — রাম-লক্ষ্মণ-সীতা যেন বাঙালি তরুণ ছেলেমেয়ে। জনজীবনে কৃত্তিবাসী রামায়ণের বিশেষ প্রভাব। বাংলার কুমারী মেয়ে কামনা করছে, সীতার মতন সতী হই, রামের মতন পতি পাই, দশরথের মতন শ্বশুর পাই, লক্ষ্মণের মতন দেবর পাই...

সুযোগ পেয়েছি, সহজে ছেড়ে দেব ওদের? বিস্তর বাগাড়ম্বর করে তো চৈতন্যযুগে পৌঁছানো গেল। নবীন গণতান্ত্রিকতার প্লাবন বাংলা সাহিত্যে। চিরকালের কবিরা অতীতকেই মনোরম করে আঁকেন, এঁরা কিন্তু পুরাণের বহুনিন্দিত পাপময় কলিযুগকে প্রণাম জানালেন — 'প্রণমহ কলিযুগ সর্বযুগ সার।'

মাইকেল মধুসূদনের প্রায় সমস্ত বই দেখে এসেছি লেনিন লাইব্রেরিতে।

রবীন্দ্রনাথ ছাড়া বাঙালি কবিদের মধ্যে মাইকেলকে জানে এরা। বোধ করি, শুধুমাত্র তাঁকেই। মাইকেল থেকে নবীন বাংলা সাহিত্যের কথা শুরু করা গেল। বাংলা সাহিত্য কালের সঙ্গে সমান তালে এগিয়ে চলেছে, সেই জন্যে এই সাহিত্য জনমনে এমন জীবন্ত। 'মেঘনাদ বধে' কবি রামায়ণের কাহিনী কালের ছাঁচে ঢালাই করে নিয়েছেন—পুরানো নৈতিক মান এই কাব্যে একেবারে পালটে গেল। অনাচারী ঐশ্বর্যশালী রাবণ কবির কল্পনাকে উদ্দীপিত করেছে। 'বীরাঙ্গনা কাব্যের' নায়িকারাও চিরকালের রীতিনীতি মেনে নিতে পারছে না—বিদ্রোহিণী তারা। কাব্যের বহিরঙ্গেও বিদ্রোহের ছাপ। পুরানো পদ্ধতির পয়ারগ্রন্থি ছেদন করে অমিত্রাক্ষর ছন্দে মাইকেল কাব্যলক্ষ্মীর শৃঙ্খল মোচন করলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র। য়ুরোপীয় সংস্কৃতি আমাদের চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছিল—বঙ্কিমের সাহিত্যে জাতীয় আত্মপ্রতিষ্ঠার সাধনা। ভারতের সাধনার পাদপীঠে য়ুরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা—বঙ্কিম-সাহিত্যের এই হল মর্মকথা। 'আনন্দমঠ' নামে উপন্যাসের একটা গান 'বন্দে মাতরম্'। বিপ্লবভূমি এই রাশিয়ায় হাজার হাজার তরুণ-তরুণী প্রাণ দিয়েছে মানুষের মুক্তি-সাধনায়। আমার ভারতবর্ষেও ঠিক তেমনি—ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অবসানের জন্য। বিশেষ করে বাংলা দেশে। ফুলের মতো বাংলার ছেলেমেয়েরা কারাগারে দ্বীপান্তরের নির্বাসনে ফাঁসির মঞ্চে গুলির মুখে দলে দলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। শেষ-নিশ্বাসের সঙ্গে 'বন্দে মাতরম্' উচ্চারণ করে মন্ত্রের মহিমা দান করে গেলেন তাঁরা। 'বন্দে মাতরম্' সর্বভারতের জাতীয় মহাসঙ্গীত হয়ে উঠল।

বাংলার প্রথম কৃষক-অভ্যুত্থান নীল-বিদ্রোহে। শ্বেত শোষকদলের বিরুদ্ধে নিরন্ন চাষীরা রুখে দাঁড়াল। দীনবন্ধু এই নিয়ে নাটক লিখলেন—'নীলদর্পণ'। আন্দোলন বিশেষ ভাবে প্রভাবিত হল এই নাটকে। নীলকরের অত্যাচার-কাহিনী দেশবিদেশে ছড়িয়ে পড়ল। শেষ অবধি ব্যবসা গুটিয়ে দেশে পালাতে হল নীলকরদের।

রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে দু-চার কথায় কি বলা যায়? তাঁর সৃষ্টি দেশের সঙ্কীর্ণ গণ্ডিতে আটক হয়ে থাকেনি, বিশ্বমানসের সঙ্গে তিনি জাতীয় মানসের আত্মীয়তা সাধন করলেন। বিজ্ঞানের দয়ায় দূর বলে কিছু নেই আজ দুনিয়ায়। সব মানুষের মধ্যে চেনা-পরিচয়, রাজনীতি অর্থনীতি ও সংস্কৃতির সম্পর্কে সকলের যোগাযোগ। এই বিশ্বজনীনতার এক বিচিত্র উপলব্ধি এনে দিলেন রবীন্দ্রনাথ। দেশে দেশে পরিভ্রমণ করে তিনি ভারতের চিরন্তন সৌভ্রাত্র ও শান্তির বাণী প্রচার করলেন।

শরৎচন্দ্র ও নজরুল ইসলামের কথা বলে ইতি করা গেল। বক্তৃতা বড় হয়ে যাচ্ছে, তা ছাড়া আর এগুলে বিপদ আছে। বইটই কিছু নেই হাতের কাছে—ভ্রম বশে হয়তো বা কারো নাম বাদ পড়ে গেল। টের পেলে খেয়ে ফেলবেন তাঁরা আমায়। উপসংহারে এসে পড়েছি: বাংলা দেশ আজ খণ্ডিত; নানা সমস্যায় জর্জর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য। তবু এখনো বঙ্গের উভয় খণ্ডেরই জনজীবনে বাংলা সাহিত্যের অতুল প্রভাব। অন্নের মতোই বাঙালির কাছে বাংলা সাহিত্যের আবশ্যক। বঙ্গভাষীর সংখ্যা ভারতের মধ্যে অনেক কম হয়ে গেছে, কিন্তু বাংলা বইয়ের বিক্রি ভারতীয় কোন ভাষার চেয়ে কম নয়। কলম মাত্র উপজীবিকা অনেক লেখকের; পাঠকেরাই তাঁদের পোষণ করেন।

নিজের বুক ঠুকে বলি, দেখছেন এই অধীনকে। পাঠকেরাই খাওয়ান-পরান। চেহারা দেখে কি মনে হয়—খুব খারাপ খাওয়ান না তাঁরা, কি বলেন?

হাসির তোড়ে ঘর ফেটে যায়। কিঞ্চিৎ গায়ে-গতরে আছি, সেটা দেখিয়ে আমার পাঠকদের মহিমা-কীর্তন হল। রোগা ডিপডিপে লেখকেরা আছেন—ঐ আসরে তাঁরা থাকলে মুশকিলে পড়তাম।

পাকিস্তানের কথা উঠল। পূর্ব-পাকিস্তানের পুণ্যদিন একুশে ফেব্রুয়ারি। বাংলা ভাষার জন্য তরুণেরা প্রাণ দিলেন, রক্তের অক্ষরে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি তাঁদের ভালবাসা লিখে গেলেন। দেশে দেশে স্বাধীনতা ও ধর্মের জন্য বহু জনে প্রাণ দান করেছেন। কিন্তু মাতৃভাষার জন্য প্রাণ দেওয়া প্রথম এই পূববাংলায় দেখা গেল।

মোটামুটি এই হল বক্তব্য। সেই যে আমার ভাই—গ্নাতুক ডানিয়েলচুক—রুশে তর্জমা করে বুঝিয়ে দিল। আপনারা কেউ ছিলেন না তো! ওরা কি বুঝবে—ফাঁকি দিয়ে কিছু তারিপ কুড়িয়ে নেওয়া গেল। আমার পরে হীরেন মুখুজ্জে মশায়—তিনিও বাংলা সাহিত্য নিয়ে বলবেন। তিনি ছিলেন না, অন্য কোন কাজে বেরিয়েছিলেন, বক্তৃতা শেষ হবার মুখে এসে পড়লেন। ছিলেন না ভাগ্যিস—পণ্ডিত মানুষ, অতুলন বক্তা, তাঁর সামনে কথাই সরত না মুখ দিয়ে। কামারের কাছে সূঁচ চুরি চলে না। কোন সভায় একদিন বলেছিলাম বাংলা সাহিত্য দুনিয়ার এক সেরা সাহিত্য। হীরেন্দ্রনাথ চুপি-চুপি সমঝে দিলেন, দুনিয়া অবধি টানেন কেন, বড্ড বাড়াবাড়ি, ভারত ধরেই না হয় বলুন। আমি বলি, গতিক দেখছেন তো। সাহিত্যকে আকাশে তুলে দিয়ে চলে যাই—ওরা খানিকটা বাদসাদ দিয়ে নিচ্ছে, তারপরে যত

দিন যাবে নামতে নামতে আকাশ থেকে ক্রমশ ধরালোকে এসে পৌঁছবে। এখনকার মতো পাতালের তলে আশা করি মুখ থুবড়ে পড়বে না আবার। হীরেন্দ্রনাথ আন্দাজে ধরেছেন, কাঁপিয়েছি আজকেও। শুরু করলেন তাই নিয়ে: আমার বন্ধু বোস মশায় ভালবাসার উচ্ছ্বাসে বাড়িয়ে বলেছেন হয়তো— তা হলেও বঙ্গসাহিত্য…ইত্যাদি, ইত্যাদি।

ইংরেজিতে বললেন। সে বক্তৃতা টুকে আনি নি, টোকা অসম্ভব। খরস্রোতে ছুটে চলেছে। অপরূপ বাচনভঙ্গি, লেখায় তার কিছুই বোঝা যায় না — কানে শুনতে হয়, চোখের উপর দেখতে হয়। সেই অপরাহ্নে দূর বিদেশের অজ্ঞাত পরিবেশে দুই বাঙালি আমরা প্রাণ ভরে বাংলা-সাহিত্যের গুণগান করলাম।

বলসইতে এত পালা দেখলাম, মস্কো-আর্ট-থিয়েটারে একদিন তো যাওয়া উচিত। কিন্তু দেশে ফেরার জন্য পা বাড়িয়ে আছেন, প্রস্তাব কেউ কানে নেন না। শেষ পর্যন্ত মোটমাট পাঁচ জন হলাম আমরা। আর দোভাষিণী ইরা — ইংরেজি করে বুঝিয়ে দেবার জন্য। পালা হল উষ্ণহৃদি (Warm Heart) কিছু দিন আগে কালিদাসের নাটক হয়ে গেছে। সময় নেই যে রয়ে-বসে কোন ভাল পালা দেখব এখানে।

হলে ঢুকে রাগ হচ্ছে। আন্তন চেকভের মতো গুণী নিজে গড়ে তুললেন —জগৎজোড়া নাম —সে বস্তু হল এই? হালফিল আমাদের কলকাতার থিয়েটার যা দাঁড়াচ্ছে, ভাল বই খারাপ নয় এর চেয়ে। সিনসিনারি আহা-মরি কিছু নয়। বলসই থিয়েটার চোখ ধাঁধিয়ে মাথা খারাপ করে দিয়েছে— এখানে, ভেবেছিলাম, না জানি আরও কি দেখতে পাব। শুরুতেই মুষড়ে পড়েছি তাই।

প্রেমের গল্প। হাসি-রহস্যও খুব। উনিশ শতকের পরিবেশ। একটা দৃশ্যে কিছু বাহাদুরি দেখতে পেলাম। জমিদার বাবু বাড়ি থেকে বেরিয়ে নৌকো চড়ে কাছারিবাড়ি যাচ্ছেন। বাড়ির নিচে নদী। উঠলেন বাবু সতর্ক হয়ে, জুতোয় জলকাদা না লাগে। ছেড়ে দিল নৌকো — গান-বাজনা ও স্ফূর্তিফার্তি চলেছে খুব — ঘরবাড়ি, গির্জা, মাঠ, গাছপালা পার হয়ে নৌকো যাচ্ছে। অবশেষে কাছারিবাড়ির ঘাটে এসে লাগল। জমিদার সদলবলে নেমে পড়লেন। হলসুদ্ধ আমরাও নৌকোর সঙ্গে সঙ্গে চলেছিলাম যেন। এখন কাছারিবাড়ি পেঁাছে গিয়ে সেখানকার কাজকর্ম দেখছি।

ব্যাপারটা বুঝলেন? নৌকো একই জায়গায় স্থির হয়ে আছে। স্টেজের

উপর দর্শকের দৃষ্টির উপর থেকে যাবেই বা কোথা? পিছনের পর্দা ঘুরে যাচ্ছিল এ তাবৎ—পর্দায় আঁকা গির্জা ঘরবাড়ি গাছপালা প্রভৃতি। আর আলোর কারসাজি। নৌকোর ভিতর গানবাজনার সমারোহ এবং নিখুঁত জীবন্ত অভিনয়—সমস্ত মিলিয়ে দৃষ্টিবিভ্রম ঘটায় দর্শকের। রেলগাড়িতে চড়ে হঠাৎ যেমন দেখেন—গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, গ্রামগুলো সামনের দিক থেকে পিছনমুখো চলছে। এখানেও সেই রকম করে দেখাচ্ছে, অতএব উল্টো রকম প্রত্যয় কেন হবে না?

অভিনয় যত এগোয়, মালুম হচ্ছে বলসইর সঙ্গে তফাতটা কোথায় এই থিয়েটারের। বলসইতে সিনসিনারি আলো সাজপোশাকের বাহার—একই টিকিটে যুগপৎ অভিনয় ও ম্যাজিক দেখতে পান; এবং পালা বিশেষে সার্কাসও। মস্কো-আর্ট-থিয়েটারে শুধুমাত্র একটি বস্তু—অভিনয়। আমাদের থিয়েটারে প্রমট করার রেওয়াজ—গানের একটা কলি যেমন দু-বার করে গায়, থিয়েটারেও তাই। একবার উইংসের অন্তরাল থেকে প্রমটার মশায়ের অ্যাকটিং শুনি, দ্বিতীয় বার উইংসের বহির্দেশে অভিনেতার। ইউরোপে কত দেশের থিয়েটার দেখেছি—প্রায়ই তো পয়লা সারির সিটে বসে। প্রমট শুনে শুনে বলার রেওয়াজ ওদের নেই। ঠোঁটের মুখস্থ মাত্র নয়, নাট্যকারের লিখিত বস্তু অন্তরের ভিতর থেকে পুরোপুরি নিজ বস্তু হয়ে বেরিয়ে আসে। আজকের এই হালকা নাটক, ডাকহাঁক করে ব্যাখ্যানের কিছু নয়—কিন্তু প্রাণঢালা কী অভিনয়ই করছে প্রতিজন!

ইরা ঠিক পাশের সিটে। পাত্র-পাত্রী কে কি বলছে, অন্ধকারে কানের কাছে মৃদুগুঞ্জনে ইংরেজি করে যাচ্ছে। বিরক্তি লাগে। আঃ, থাম দিকি তুমি। নয় তো উঠে ওধারে গিয়ে বোসো, ওঁদের কারো যদি দরকার থাকে!

কথা বুঝছেন?

না। কিন্তু সমস্ত বুঝতে পারছি।

সত্যি, অভিনয়ের মধ্যে কথা যে অতি-সামান্য ব্যাপার, আজকের আসরে নিঃসংশয়ে টের পাওয়া গেল। নায়িকা সেজেছে ঐ যে তরুণী মেয়েটা, মাথার চুল থেকে পায়ের নখ অবধি সর্বাঙ্গ দিয়ে ওর অভিনয়। চোখ বুঁজে আজও সেই অভিনয়ের ছবিটা যেন পাই। মনের গূঢ়লোকে যত রকম ভাবের আনাগোনা, মূঢ়তম দর্শকের কাছেও অবলীলাক্রমে সমস্ত মেলে ধরছে। মস্কো-আর্ট-থিয়েটারের নাম এমনি হয় নি।

মস্কোর দোকানে জিনিস কিনতে যাওয়া ঝকমারি। যেখানে যাবেন, কিউ। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা ব্যথা হয়ে যায়। অথচ দেশে আপনারা এতগুলি রয়েছেন, দুটো-একটা না নিয়ে এলে কেমন হয়? পুরো বেলা দাঁড়িয়ে থেকে জিনিস কিনবেন সত্যি সত্যিই একটা কিম্বা দুটো — এক কিউ শেষ করে অন্য কিউয়ে গিয়ে দাঁড়াবেন, অধিক কি করে হবে বলুন। আমাদের বটুক-দা'র বুদ্ধি ধরলে কেমন হয়, ভাবছি। বিলে মাছ ধরতে গেলাম বটুক-দা'র সঙ্গে। হোগলাবন ও জলকাদার ভিতর দাঁড়িয়ে ছিপ ফেলা। এক জায়গায় যা হবার হল, যাও তার পরে অন্যখানে। বটুক-দা খানিকটা চেষ্টাচরিত্র করে শেষে দেখি ডাঙায় উঠে খেজুরগুঁড়ি ঠেশান দিয়ে নিশ্চিন্তে বিড়ি ধরিয়েছেন। ও বটুক-দা, খালি-হাতে গেলে বাড়ির লোকে বলবে কি? বটুক-দা জবাব দিলেন, খালি কেন হবে? হাট ঘুরে যাব; হাট থেকে মাছ কিনে নিয়ে গিয়ে বলব, ধরে এনেছি। বিরক্ত হয়ে আমরাও এক একবার ভাবছি তাই। দুত্তোর, কাবুলে গিয়ে কিম্বা একেবারে দিল্লি পৌঁছে যা-হোক কিছু নিয়ে নেব। এত ঝামেলা কেন করি? বটুক-দার গল্পের উপসংহারও তবে শুনুন। হাটে পৌঁছুতে দেরি হয়ে গেল, সব মাছ উঠে গেছে, এক ডালিতে শুধু ইলিশ আছে গোটা কয়েক। তাই সই। নির্ভীক বটুক-দা বাড়ি গিয়ে হয়তো বলেছিলেন, ইলিশমাছ ধরেছেন ছিপে। বটুক-দার বাড়ির ওঁরা অত্যন্ত ভালমানুষ, এক কথায় মেনে নিয়ে বঁটি পেতে মাছ কুটতে বসে গেলেন। আপনারা যে তা নন। এমনই বোধ হয় চোখ টেপাটেপি করেন: সোবিয়েতে ঘোরা চাট্টি কথা কিনা। লিলুয়া কি বিরাটির কারো বাড়ি লুকিয়ে থেকে চুপি-চুপি সোবিয়েতের বই ফেঁদে নিয়েছিল সেখানে। মস্কোর জিনিস ক্যাশমেমো সহ নয়ন সুমুখে ধরে দিলেও কতবার আপনারা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখবেন।

আমাদের এক টাকায় ওদের চুরাশি কোপেক। রুবলের (অর্থাৎ এক শো

কোপেক) দাম দাঁড়াল তবে একটাকা তিন আনার মতো। এই রুবল যেন খোলামকুচি ওদের কাছে। মস্কোর ঐ তল্লাটে ফুল ফোটে কম। সুখের ব্যাপারে শোকের ব্যাপারে কাগজের ফুলের ছয়লাপ। গাছের গোলাপ প্রতিটির দাম হল তিন রুবল অর্থাৎ সাড়ে তিন টাকার উপর। কিনবেন? সাধারণ জুতো এক জোড়া দেড়-শো দু-শো রুবলের কম নয়। ওভারকোট হাজার দেড়-হাজার। খাবার জিনিস অবশ্য সস্তা সেই তুলনায়। আলুর সের বারো আনার মতো। রুটির পাউণ্ডও বারো আনা।

দর শুনে আমরা থ হয়ে যাই—আর ওরা কী কাণ্ড করে কেনাকাটার জন্য! ক্যামেরা গ্রামোফোন-রেকর্ড ঘড়ির দোকানে অবধি কিউ। এক মস্কো শহরেই দশ লক্ষ ঘড়ি কাবার হয়ে গেল এক সপ্তাহে। আরও যে যোগান দিয়ে উঠতে পারে না! গুম অর্থাৎ সর্ববস্তু-বিপণিতে ঢুকেছি—রথের মেলার মতো মানুষ ঠেলে পারা যায় না। ছোট ছোট দোকানে ঢুকে দেখেছি—এমন কি বইয়ের দোকানেও, যেখানে পাঠ্যপুস্তকের মরশুমটা বাদ দিয়ে কর্মচারীদের আরামে নাক ডেকে ঘুমোনোর কথা। ভিড় সর্বত্র—অবস্থার ইতরবিশেষ নেই কোনখানে। রুবল যেন পকেটে থেকে কামড়ায়, খরচ করে ফেলে নিশ্চিন্ত।

কেন হবে না বলুন—ভবিষ্যতের কোন ভাবনা যখন নেই। ছেলেপুলে, চাকরি-বাকরি, অসুখ-বিসুখ, বুড়ো বয়সের ব্যবস্থা—সকল দায় সরকারের। সাধারণ মানুষ কাজ করবে, খাবে, বেড়াবে, আমোদ-স্ফূর্তি করবে—ব্যস। ফালতু টাকা কিসের জন্য জমাতে যাবে? জিনিসপত্রের দর বেশি, রোজগারও অনেক বেশি তেমনি। ইস্কুল-মাস্টার মশায়ের কথাই ধরুন। চাকরিতে ঢুকলেন আট-শ রুবলে; বাইশ-শ রুবল অবধি মাইনে উঠবে। ইস্কুলে চার ঘণ্টার খাটনি—অন্যত্র ঠিকে পড়িয়ে (প্রাইভেট ট্যুইশানি নয়) উপরি-রোজগার হয়। আরও আছে। আমাদের দেশে একা মাস্টার মশায়েরই শুধু আয়; স্ত্রী রাঁধাবাড়া করেন, ঘর-সংসার দেখেন। ওখানে স্ত্রীরও পৃথক আয় আছে—মেয়েপুরুষ সকলেরই কাজ। পারিবারিক আয় তবে কত বেড়ে গেল বিবেচনা করুন। একটি পয়সা কেউ সঞ্চয় করতে চায় না, দোকানে দোকানে তাই অত মচ্ছব।

খানাপিনা অন্তে আজ আবার ইউনিয়ন অব রাইটার্সে যাবার ব্যবস্থা হয়েছে। সারা দেশের কলমবাজদের একটিমাত্র ইউনিয়ন—সভ্য তাবৎ লেখকেরা। রাশিয়া বলে নয়—সোবিয়েতে যতগুলো গণতন্ত্র, সব জায়গার সকল লেখক। বিপুল প্রভাব অতএব। সাহিত্যকর্ম করতে যা

কিছু বোঝেন, সমস্ত ইউনিয়নের তাঁবে। শাখা আছে শহরে শহরে। গণ-তন্ত্রগুলো দরকার মাফিক নিজ দেশে আলাদা কনফারেন্স করে, তাদের কর্মকর্তাও আলাদা — কিন্তু সকলের মাথার উপরে এই ইউনিয়ন।

কাজকর্মের অবধি নেই। বিভিন্ন দপ্তরে সমস্ত ভাগ করা। যতগুলো ভাষা সোবিয়েত দেশে, প্রতিটির জন্য আলাদা এক এক দপ্তর। পৃথিবীর যাবতীয় সেরা ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য পৃথক দপ্তর আছে। গ্লাতুক ডানিয়েলচুকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে, সে হল বৈদেশিক দপ্তরের লোক। খাটছে অগুন্তি লোক — একদল ভারতীয় সাহিত্য নিয়ে আছে, চীনা সাহিত্য নিয়ে আছে একদল, ইংলণ্ড-ফ্রান্স-আমেরিকার ইতিহাস ও সাহিত্যের চর্চা করে আর একদল। আলোচনার বৈঠক বসে প্রায়ই। বিদেশ থেকে বিস্তর বই আসে; কর্মীরা পড়ে শুনে যে বইয়ের তারিফ করে, অনুবাদ ও প্রকাশনার ব্যবস্থা হয়। কোন কোন বই ছেপে বেরুবে, কোনটা বাতিল হবে—ইউনিয়ন তার বিচারের মালিক।

বিদেশি লেখকদের অনেক সময় দাওয়াত দিয়ে আনি আমরা ইউনিয়নের তরফ থেকে। আমাদের লেখকরাও বাইরে যান। অতিথি পেলে বড্ড খুশি হই। শুধু যে বন্ধুরাই আসেন, এমন নয়। বিরূপ মনোভাব নিয়ে এসে অনেকে তর্কাতর্কি গালিগালাজ করেন। শেষটা বুঝসমঝ হয়। পরস্পরের সাহিত্য আরও ভাল বোঝা যায় লেখকদের যাতায়াতে আলাপ-পরিচয়ে।

ইউনিয়নের বড়কর্তা কেউ হবেন, মুখপাত্র হয়ে তিনিই সব বলছেন।

দেয়ালে পোস্টার দেখছ ঐ? কংগ্রেস হচ্ছে — লেখকদের কংগ্রেস। অনেক বছর পরে হচ্ছে এবার। ব্যবস্থা ইউনিয়নের। বিপুল তোড়-জোড় চলছে। আমাদের যত গণতন্ত্র, সব জায়গায় লেখকরা কনফারেন্স করছেন আসন্ন কংগ্রেস সম্পর্কে। এই কংগ্রেসে সোবিয়েতের সকল অঞ্চল থেকে লেখকরা আসবেন। বাইরের বড় বড় অনেক লেখককেও নিমন্ত্রণ করা হয়েছে।

ভারতের কাউকে বললেন?

কিষাণচন্দর তো আছেনই। আব্বাস এবং —

বাংলা সাহিত্যের কেউ নেই—জিজ্ঞাসার আগে থেকেই নিশ্চিন্ত আছি। বলি, নিমন্ত্রণের লিস্টি কি ভাবে আপনারা ঠিক করেন বলুন তো?

সদুত্তর মেলে না, আমতা-আমতা করছেন: যাঁদের নাম জানা আছে, সোবিয়েতের মানুষ যাঁদের বইটই পড়ে, তাঁদের মধ্য থেকে বলা হয়।

সেটা জানি। গোণাগুণতি কয়েকটা নামই ওঁদের জানা—অন্নপ্রাশন

থেকে আদ্যশ্রাদ্ধ যাবতীয় ব্যাপারে ঘুরে-ফিরে তাঁদেরই ডাক আসে। বাংলা সাহিত্য বলে একদা এক বস্তু ছিল—সত্যিই কি বিশ্বাস করেন, তা একেবারে ফৌত?

কিছুই তো খবর পাইনে—

দোষ আমাদের, অন্যের উপর রাগ করে কি হবে? রবীন্দ্রনাথের পর আর তো কেউ নজর করে বাইরের পানে তাকালেন না—পূবের শেষ প্রান্তে নানা সঙ্কট নিয়ে আছি পড়ে খণ্ডিত অবহেলিত একটি অঞ্চল। বিদেশের খাতির-আহ্বান এবং টাকাটা-সিকেটার যে সুযোগ আসে, ভারতের দ্বারপথ বম্বে এবং ভারতের রাজধানী দিল্লি অচিরে সমস্ত ভাগাভাগি করে নেন।

এই লেখক-কংগ্রেসেরই ব্যাপার। এঁরা একটা নাটক চেয়েছিলেন, যাতে ভারতীয় জীবন-চিত্র আছে। নাটকটা রুশে তর্জমা করে নিয়ে কংগ্রেসের গুণীজ্ঞানীদের মধ্যে অভিনয় করবেন। এমন একটা ব্যাপার—খবরটা দিল্লি পেঁৗছানোর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে নাটক চলে গেল। বাইরের কাকপক্ষী কেউ জানল না। ওঁরা দোমনা ভাবে মাথা চুলকান: আমরা চেয়েছিলাম ভারতীয় জীবনের সত্যিকার ছবি থাকবে নাটকে। এ নাটকের ঘটনাস্থল মস্কো লণ্ডন কিম্বা প্যারি হলেও বেমানান হয় না। অথচ এসেছে ভারত থেকে, বাতিল করাও চলবে না। পোড়া বাংলা সাহিত্যে এই হাল আমলেও খাটি দেশি নাটক লেখা হয়েছে। কিন্তু হলে হবে কি--জোরদার মাতুল কোথায়, যথাসময়ে যথাস্থানে বস্তুটা যিনি গুঁজে দেবেন?

রুশ-সাহিত্য সম্বন্ধে আজ অনেকের মনে যে প্রশ্ন, ঘুরে ফিরে তাই উঠে পড়ে: ইউনিয়নের এমন সব ব্যবস্থা, লেখকদের এমন সচ্ছলতা—কিন্তু ভাল সাহিত্য হচ্ছে কই তেমন?

হচ্ছে বই কি। খবর রাখেন না আপনারা তেমন--

সে তো বটেই। ভিন্ন দেশের পুরোপুরি খবর রাখা সোজা নয়। আগেও এই ছিল। তবু সাহিত্য নিজের জোরে বিদেশের ঘরে ঘরে বিদেশির মনে মনে আসন করে নিত। তেমন সব দিক্‌পাল সাহিত্যকার কোথায় আজকের দিনে?

ভদ্রলোক বললেন, দেশের উপর দিয়ে কী ঝড় বয়ে যাচ্ছে, সেটা বিবেচনা করুন। বিপ্লবের পর থেকে চলছেই। ঘরের শত্রু, বাইরের শত্রু। তার পরে ঐ মহাযুদ্ধ—যার ধকল ষোল-আনা এখনো কাটানো যায় নি। সাহিত্য হল শান্তির ফসল—ক'টা দিন আমরা শান্তিতে থাকতে পেলাম বলুন।

আর এক কারণ হল, লেখকের স্বাধীনতা নেই। ছাঁচে ফেলে প্রয়োজন মাফিক সাহিত্য বানাবার প্রয়াস এখানে।

চমকে ওঠেন তিনি : কে বলল ?

আপনিই তো ! কোন বই ছাপা হবে না হবে, এখান থেকে ঠিক করে দেন। কেউ অতএব এমন লিখবে না, কর্তাদের যা পছন্দসই নয়। যে কথাগুলো কর্তৃপক্ষ সকলকে শোনাতে চান, তারই সাহিত্য বানানো হচ্ছে। স্বাধীন সহজ সাহিত্য গড়ে ওঠে না তাই।

ভদ্রলোক হেসে বলেন, এই দেখুন — মিছে বদনাম দিলেন। কর্তা কেন হতে যাব—আমরাও তো লেখক। ইউনিয়ন লেখকদেরই — সমস্ত লেখক মিলে-মিশে গড়েছে। আর এই যদি নিয়ন্ত্রণ বলেন, এ জিনিস সকল দেশেই আছে।

আমাদের নেই। আমরা সব-কিছু লিখতে পারি। ছেপে ইচ্ছামতো বই বের করি -- কারো পছন্দ-অপছন্দের ধার ধারিনে।

কিন্তু অপছন্দ হলে ছাপা বই বাজেয়াপ্ত হয়; পরিশ্রম অর্থব্যয় বাজে হয়ে যায় তখন। একই পদ্ধতির রকমফের। পাঠকের কাছে পৌঁছানো অনুচিত মনে হলে আমাদের ইউনিয়ন আগেভাগে বন্ধ করে, আপনাদের সরকার বন্ধ করে ছাপা হয়ে যাবার পর। কোনটা ভাল, বিবেচনা করে বলুন এইবার। ছাপানোর পরে না ছাপানোর আগে ?

ক'টা বই বা বাজেয়াপ্ত হয় ভারতে ! কালে-ভদ্রে কদাচিৎ।

এখানেও ঠিক তাই। বাতিল পাণ্ডুলিপি নিতান্ত গোণাগুণতি। শুধু দুটো ব্যাপার নিয়ে আমরা লিখতে দিই নে -- লড়াই বাধানো, আর ধনতন্ত্রে ফিরে যাওয়া। বাকি সব-কিছু লেখা চলে। সমাজতন্ত্রের নিন্দা চলবে না ; কিন্তু রাষ্ট্রের মাতব্বরদের বিরুদ্ধে স্বচ্ছন্দে লিখতে পারা যায়।

বলতে লাগলেন, শত্রুরা রটায় আমরা নাকি সমালোচনা চাইনে। তাহা মিথ্যা। সমালোচনা ছাড়া এগুনো যায় না, দোষত্রুটির শোধন হয় না — এ কথা শিশুও জানে। এমন কি পাঠকদেরও আমরা ডেকে আনি আচ্ছা রকম সমালোচনা যাতে হয় — পাঠকে-লেখকে মিলে-মিশে দোষ-গুণের বিচার করেন। লেখক ক্রমশ ত্রুটিশূন্য হয়ে ওঠেন পাঠকদের তাড়নায়। শুধুমাত্র পাঠকেরাই কনফারেন্স করে বইয়ের সম্পর্কে মতামত দেন। প্রত্যেকটি লাইব্রেরি ক্লাব কর্মিকদের সংস্কৃতি-ভবন এমন কি ইস্কুল-কলেজের ভিতরে পাঠক-কনফারেন্সের ব্যবস্থা আছে। এই যে কংগ্রেস হবে, ছাত্র শিক্ষক অভিভাবক সবাই তাতে যোগ দেবেন। সারা অঞ্চলের লেখকরা দেখতে

পাবেন, কাদের জন্য লিখে থাকেন তাঁরা। নিরক্ষরতা নেই বলে বইয়ের বিষম চাহিদা। সাধারণ বই পনের-বিশ হাজার এবং গল্প-উপন্যাস হলে এক লাখ দেড় লাখ ছাপা হয়। লেখকের কি বিরাট দায়িত্ব বিবেচনা করুন। সামাল অতএব হতেই হবে। আর পাণ্ডুলিপির যে বিচার হয়, তা আমরা—লেখকরাই করে থাকি; ধুরন্ধর রাজনীতিক তার ভিতরে নেই। আমাদের ভুল হলে, উপরে বোর্ড আছে—সেখানে পুনর্বিচার হতে পারে।

১৯৪৫ থেকে ১৯৫১ সাত বছরে নতুন বই সাড়ে ন'হাজার বেরিয়েছে। কংগ্রেসের সঙ্গে বইয়ের প্রদর্শনী হবে—গত বিশ বছরের বই দেখানো হবে সেখানে। সোবিয়েতের বই বাইরের দেশে যত বেরিয়েছে, তা-ও থাকবে। গর্কির 'মা' উনত্রিশটা ভাষায় তর্জমা হয়েছে একশ-তিন দফায়। ভুবনপ্রিয় বই আরও অনেক আছে।

কাজ নেই। যথা ইচ্ছা ঘুরে বেড়ানো, দোকানে ঢুঁ মেরে সম্ভব হলে কিছু কেনাকাটা করা। ভোকস আজ রাত্রে বিদায়-ভোজ দিচ্ছেন। বহু বিচক্ষণ ব্যক্তি এসেছেন। আমাদের রাষ্ট্রদূত কে. পি. এস. মেননকেও ডেকেছে। ভুল হয়ে যায়, বিদেশ-বিভুঁয়ে রয়েছি আমরা। ভোজের মধ্যেই জায়গা বদলাবদলি হচ্ছে—এর পাশে গিয়ে বসলাম খানিক, ও চলে এলো আমার পাশে। আছি মাত্র কালকের দিনটা। তার পর কে কোথায়? কথাবার্তা বেদনায় জড়িয়ে যাচ্ছে—আর দেখা হবে না এ জীবনে। মানুষ বড় ভাল, মানুষে মানুষে তফাত নেই—দূরের মানুষরা কত সামান্য সময়ে একেবারে আপন হয়ে যায়।

মেনন বক্তৃতায় বড় জমিয়ে তুললেন: ভারতীয়দের নেমন্তন্নের কথা শুনে লণ্ডনের কোন কাগজে লিখল, রাশিয়া ভারতের সঙ্গে প্রেম জমাচ্ছে (Russia is wooing India)। আরে বাপু, প্রেম জমানো কি—মিলন তো হয়েই আছে শান্তির মধ্যে (They have already been wedded in peace)। কথা কেমন রসিয়ে বলেন মেনন, যেখানে যান দিব্যি হাসিখুশির আবহাওয়া এনে ফেলেন।

বাঙালি ক-জনের কাল রাত্রে বিনয় রায়ের বাড়ি খাওয়া। আমাদের বরাদ্দ ভোজ—গুজরাটি ভায়াদের আগে হয়ে গেছে। গাঙ-খাল থেকে সদ্য ধরে-আনা জীবিত মৎস্যের ঝোল খাওয়াবেন, বিনয় কথা দিয়েছেন। মস্কো শহরে শেষ খাওয়া—খানাপিনা শেষ করে ঐ রাতেই প্লেন ধরব। ছিমছাম ছোট ফ্লাটে স্বামী-স্ত্রী বাচ্চা ছেলেটি নিয়ে দিব্যি আছেন। অজু বলে, ডাকে

ছেলেটিকে — এমন মিষ্টি ছেলে। লহমার মধ্যে ভাব জমে গেল। বিস্তর সম্পদ অজুর। মস্কো শহরে খেলনার একজিবিশন আছে কিনা জানতে চাচ্ছেন? একজিবিশনে কি দেখবেন, অজুর যা আছে নিয়ে আসতে বলুন। বলতেও হবে না — বয়ে বয়ে নিজেই জেঠুদের সামনে জড় করছে। মস্কোয় যত রকম খেলনা পাওয়া যায় সমস্ত — এর বাইরে কিছু নেই। বিনয় আর জয়া দেবী দু'জনের চাকরি, অহরহ কাজে ব্যস্ত। ছেলে কিণ্ডারগার্টেন-ইস্কুলে পড়ে — সেখানে থাকতে হয়। শনিবার বিকালে মা-বাপের কাছে আসে, সোমবার ভোরবেলা চলে যায়। বাংলা শেখে বাড়িতে, ইস্কুলে রাশিয়ান। আমাদের সামনে কিছুতে রাশিয়ান বলবে না অজু। এত দিনে আমরা পাঁচটা-দশটা রুশ কথা শিখেছি। সকলে মিলে একটা পুরো প্রশ্ন দাঁড় করানো গেল। দুষ্টু অজু তারও জবাব দিয়ে দিল বিশুদ্ধ বাংলায়।

এ ছেলের হাত ছাড়িয়ে বেরিয়ে পড়া চাট্টি কথা নয়। মোটরে উঠে হুঁশ হল দেরি হয়ে গেছে। জোরে চালাও —। বাঁধা-ছাঁদা এখনো কিছু বাকি। সেই কাজ সারা করে হোটেল থেকে এক্ষুণি এরোড্রোম ছুটতে হবে। মস্কো এরোড্রোম, বুঝতে পারছেন, বিশ মাইলের ধাক্কা। প্লেন ছাড়বে ঠিক সাড়ে-বারোটায়। জোরে চালাও গাড়ি, আরও জোরে —

রবি ভাদুড়ি তিন ঘন্টার উপর হোটেলে বসে আছেন, চলে যাবার আগে একটুকু যদি দেখা হয়। দেশের মানুষ পেলে কী যে করেন এঁরা সব। কথা-বার্তার ফুরসত হল না — তিনিই লেগে-পড়ে স্যুটকেসে মালপত্র ঠেসে টানাটানি করে সেগুলো বাইরে এনে দিলেন। আরও কত জনের সঙ্গে ভাব জমিয়ে আছি — যাবার বেলা মন খারাপ হচ্ছে। এরোড্রোম অবধি চললেন তাঁদের কতক, প্লেনে চাপিয়ে দিয়ে ফিরে আসবেন।

কী কাণ্ড! বারোটা বেজে গেছে, সাড়ে-বারো হয়ে এলো — বসেই আছি, প্লেনের কর্তারা চুপচাপ। পল খোঁজখবর নিয়ে এসে বলে, ছাড়তে দেরি হবে। একটা বেজে গেল। কি হল, ওরা বোধ হয় লেপ মুড়ি দিয়ে পড়েছে। দেখে এসো তো পল-ভাই আর একবার।

পল আবার উঠল। অনেকক্ষণ দেরি করে এসে বলে, ওঠো—

দুর্গা — দুর্গা।

পল বলে, মাঠের দিকে নয় — হোটেলে ফিরতে হবে। আবহাওয়া খারাপ, রাতে প্লেন ছাড়বে না।

রাত ঝিমঝিম করছে। দুর্ভোগটা ভাবুন — হাড়-কাঁপানো শীতে আবার এখন বিশ মাইল। রাস্তায় কদাচিৎ একটা-দুটো গাড়ি, দু-জন একজন মানুষ।

হোটেলের জোরালো আলোগুলো প্রায় সব নেবানো। করিডরে এখানে একটা ওখানে একটা — কায়ক্লেশে পথ খুঁজে চলা যায়। একেবারে নিশুতি হয়ে গেছে। দোতলার আফিস-ঘরে মেট্রন মেয়েটা দেখছি ফাইল ও খাতা-পত্রের মধ্যে মগ্ন হয়ে বসে কাজ করছে।

এতগুলো জুতোর আওয়াজে চমকে মুখ তোলে। দেখে হেসে ফেলল: এ কি?

সকালবেলা যাব। আবহাওয়া ভাল হলে খবর পাঠাবে।

মুশকিলে ফেললে। 'কি করি এখন বল দিকি —

মুশকিল আসানের জন্য ছুটোছুটি করছে। আমাদের বিছানাপত্র তুলে দিয়েছে এর মধ্যে; সকালবেলা ঘরগুলো ভাল করে ধুয়ে বীজাণুমুক্ত করে নতুন বিছানা পাতবে নব আগন্তুকদের জন্য। রাত্রির তৃতীয় প্রহরে কোথায় মানুষ-জন, কোথায় কি! ডেকে তোল সকলকে — যেমন যেমন ছিল, তেমনি করে দিক।

ভোরবেলা উঠতে হবে — রাতের আর কতটুকু বা আছে! — উদ্বেগে ঘুম হয় না। সাড়ে-ছ'টায় পোশাক পরে তৈরি। সাতটায় ঘর থেকে বেরিয়ে পাক দিয়ে এলাম এদিক-সেদিক। মানুষজন দেখিনে, অন্ধকার থমথম করছে। আটটার সময় হৈ-হৈ পড়ল — খবর এসে গেছে, ব্রেকফাস্ট খেয়ে এখুনি বেরুনো। প্লেন ছাড়ল বেলা দশটায়। আকাশ অন্ধকার, কুয়াশায় ঢাকা। এই দস্তুর এখানকার। কাল দুপুরবেলাটা উজ্জ্বল রোদ দেখেছিলাম এক ঝলক। আরও একটা দিন, মনে পড়ছে। এত দিন মস্কোয় কাটিয়েছি, তার মধ্যে মোটমাট দুটো রোদের দিন।

যে পথে এসেছিলাম, সেই পুরানো পথ ধরে বাড়ি যাচ্ছি। দুপুরের খানা আখচুবিনস্কে। রাত্রি তাসখন্দে কাটবে। কাল দিনমানে সীমান্তের তের-মেস হয়ে কাবুল। ফিরছিও দুটো দল হয়ে। আমাদের নামিয়ে দিয়ে প্লেন পরের ক্ষেপে এসে পিছনের দল নেবে।

আখচুবিনস্কে নামতে গিয়ে সিঁড়ির মুখে থমকে দাঁড়াই। বৃষ্টিবাদলা হয়ে গেছে, কাঁচা গ্যাংওয়ে জলকাদায় ভরতি। ওর মধ্যে নামি কোথা ? ওরাও বলছে, রসুন—রসুন—। বাস এসে দাঁড়াল প্লেনের দরজার গায়ে। সিঁড়ি থেকে বাসের গহ্বরে। অফিসবাড়ি আধ মাইলের উপর—কাদা-জল ছিটাতে ছিটাতে বাস সেখানে পৌঁছে দিল। এবং খানাপিনা অন্তে ফিরিয়ে আনল প্লেনে।

মজা আছে আরও। যথারীতি দরজা এঁটে প্লেন তো ছেড়ে দিল। দৌড়চ্ছে তীরবেগে—এমনি দৌড়তে দৌড়তে হুশ করে উঠে পড়বে আকাশে। খানিকটা গিয়ে আর এগোয় না। এমন তো হবার কথা নয়। জানলা দিয়ে বাইরে দেখবার চেষ্টা করি। দেখবার কি আছে—চতুর্দিকে কাদাজল। আমাদের গাঁয়ের বিলের ধানক্ষেতে আষাঢ় মাসে চাষ দিয়ে যে রকমটা করে রাখে। ইঞ্জিন তারপরে হঠাৎ বন্ধ করে দিল। নিঃশব্দ। গতিক কিছু বুঝতে পারিনে—এ-ওর মুখে তাকাচ্ছি। পাইলট খোপ থেকে বেরিয়ে এলো।

হল কি মশাই ?

কাদায় চাকা বসে গেছে।

পাড়াগাঁয়ে গরুর গাড়ির চাকা এমনি বসে যায় কাদার মধ্যে। গাড়োয়ান এবং চড়ন্দারেরা, কখনো বা পাশের ভুঁইক্ষেতের চাষীদের ডেকে, সকলে মিলে ঠেলাঠেলি করে চাকা তুলে দেয়। চাকা-মারা বলে এই প্রণালীকে। কাজাকি-স্তানে প্রান্তরের কাদায় নেমে, কি জানি, আমাদেরই বা চাকা মারতে বলে।

দরজা খুলে পাইলট ও অন্য অফিসারেরা টপাটপ লাফিয়ে পড়ে অফিস-ঘরের দিকে চলে গেল। তারপরে দেখি, বিস্তর লোক মিলে বড় বড় দুই লোহার পাত বয়ে আনছে। চাকার ঠিক সামনে কাদার উপরে পাত দুটো পেতে দিল। পাইলটেরা উঠে এসে আবার স্টার্ট দিয়েছে। প্রপেলার ঘুরছে দুরন্ত বেগে, ঘোরতর আওয়াজ করছে। নড়ল প্লেন; কাদা থেকে চাকা বেরিয়ে লোহার উপরে উঠল। আর কি—বেশি কাদার জায়গাটা পার হয়ে এসে, ছুটতে ছুটতে উপরে উঠে যায়। তবে তো বোঝা যাচ্ছে, হামেশাই এই কাণ্ড ঘটে তোমাদের এখানে। নয় তো প্রকাণ্ড লোহার পাত এরোড্রোমে এনে মজুত রেখেছ কি জন্য ?

মস্কো থেকে তাসখন্দ বারো ঘণ্টার পথ। দুই জায়গায় সময়ের ফারাক তিন ঘন্টা। একটা রাতে ঠিক হিসাব মতোই তাসখন্দে নেমেছি। জ্যোৎস্নায় ফিনিক ফুটছে, যেন দিনমান। দিগ্‌ব্যাপ্ত মাঠের উপর এমন অপরূপ জ্যোৎস্না কত দিন দেখিনি! অনেকবারের আসা-যাওয়ার এ জায়গা চেনা হয়ে গেছে, মাতব্বর যাঁরা অভ্যর্থনায় আসেন, অনেকের নামও বলতে পারি। আজকে এসেছেন জন চারেক ছাত্র। বলছেন, এরোড্রোমের রেস্তোঁরায় ব্যবস্থা হয়েছে—ঝামেলা আগেভাগে চুকিয়ে নিন।

সে ভাল। শহরে পৌঁছে ডিনারে বসতে বসতে রাত পোহায়ে যেত। কিন্তু বাইরে আজকে গাড়ি একটাও নেই। যাব কিসে? মতলব কি তোমাদের? জামাইয়ের সেই গল্প। বিস্তর দিন শ্বশুরবাড়ি পড়ে থাকায় ধনঞ্জয়কে শেষটা পিটুনি খেয়ে সরতে হল। ভরা পেটে এখন আমাদের হাঁটাবে নাকি অত দূরের শহর অবধি ?

না, জায়গাও করেছে এবার এইখানে—এরোড্রোমের একেবারে কাছে, রাস্তাটা পার হয়ে গিয়েই। অসমাপ্ত বাড়ি, রাস্তার পগার লাফিয়ে উঠানে পৌঁছুতে হয়। দালানে ঢালা-বিছানা, পাড়াগাঁয়ে বিয়েবাড়ি বরযাত্রীদের জন্য যেমন করে। যাকগে, একটা রাত্রি মোটে—ক-ঘন্টাই বা আছে রাত্রির !

কিছু রুবল আছে এখনও ট্যাঁকে। সীমানা পার হয়ে গেলেই রুবলের নোটগুলো পাকিয়ে কান চুলকানো ছাড়া কাজে আসবে না। অতএব প্রথম প্রাতঃকৃত্য, যে-বস্তু চোখের সামনে পড়বে কিনে ফেলে ট্যাঁক খালি করা। দোকানের খোঁজে হাঁটতে হাঁটতে প্রায় শহর অবধি চলে গিয়েছি। গাড়ি ছুটিয়ে সেই অবধি এসে ওরা ধরল। প্লেনে ঢুকতে হবে এখনই ; শীতকাল এসে পড়েছে, হিন্দুকুশ বেলাবেলি পাড়ি দিতে হবে। তেরমেস রীতরক্ষার মতো একটুখানি ছুঁয়ে আমুদরিয়ার উপর এসেছি। বিদায় সোবিয়েত-ভূমি! অন্ধকার

পাতালপুরী নয়, দিব্যধাম স্বর্গও নয়—আমার-আপনার মতোই হাসি-অশ্রুময় লক্ষ-কোটির সংসার সেখানে। মানুষগুলিকে বড় আপন করে পেয়েছিলাম। বিদায়, বিদায়।

কাবুল। কাবুল-হোটেলের নতুন ব্লক খুলে দিয়েছে, এবারে জায়গার অকুলান নেই। গুপ্ত-মুখুজ্জেরাও আছেন—অতএব আড্ডা দিই, নিমন্ত্রণ খাই এবং অ্যাম্বাসির জীপে ঘোরাঘুরি করি। পরের দিনটা দিল্লির প্লেন ছাড়বার দিন নয়। উত্তম, বাবর-বাগ দেখে আসা যাক—বাদশা বাবরের কবর যেখানে। প্রশস্ত দুই চেনার-গাছ সিংহদ্বারের মতন। উপরে উঠে যেতে হয়। ন্যাড়া পাহাড়ের নিচে টালি-ছাওয়া ছাত, সদ্য চুনকাম-করা দেয়াল। বাবর ওখানে ঘুমুচ্ছেন। অদূরে পুরানো কেল্লার চিহ্ন। শ্বেত পাথরের নতুন মসজিদ বানানো হচ্ছে পাশে।

তারপরের দিনও প্লেন যাচ্ছে না—আবহাওয়া অতিশয় খারাপ। উত্তম। নেতাজি এই শহরের কোনখানে এসে লুকিয়েছিলেন, জায়গাটা তবে দেখে আসি। বাজার—ভারতীয়দের বিস্তর দোকানপাট। বাজার ছাড়িয়ে ঘিঞ্জি পাড়ায় ঢুকেছি। গলির মাথায় সঙ্কীর্ণ এক বাড়ি দেখিয়ে দিল। রণচক্রের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে ভারতবর্ষের নাগপাশ ছিঁড়ে ফেলবেন, ঐখানে থেকে নেতাজি তার আয়োজন করছিলেন।

তারপরের দিন লটবহর নিয়ে এরোড্রোমে হাজির। সেদিনও বলে, ফিরে যান, সুলেমান-রেঞ্জে ঝড় বইছে। অতি উত্তম। ক্যামেরা ও ঘড়ি এখানে ভারি সস্তা ভারতের মতো কড়া ডিউটি নেই বলে। বাজার চুঁড়ে ক্যামেরা পছন্দ করা যাক তবে। কিন্তু ঘরমুখো মন এখন—সহযাত্রী অনেকে হুঙ্কার ছাড়লেন: যতক্ষণ না সুলেমানের ভাল খবর আসে—রইলাম এইখানে চেপে বসে। তা যত দিন হোক, যত মাস হোক। চাই কি বছরই হোক পুরো। হোটেলে আর ফিরছিনে।

ঘন্টা দুয়েক ধরে খবরাখবরের পর হুকুম এলো: ঢুকে পড় প্লেনে। দেখা যাক সেই অবধি গিয়ে।

উত্তম কথা। না হয় ফিরেই আসব। হোটেল আর যাচ্ছে কোথা?

ছোট্ট এক কৌটা আমাদের প্লেন। আকাশ-ব্যাপ্ত সুলেমান অদৃশ্য মুঠোর ভিতর কৌটাটা নিয়ে উপরে-নিচে ডাইনে-বামে ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে দেখছে, কোন সব চিজ রয়েছে এর ভিতরে। ঝাঁকুনি দিয়ে দিয়ে তারপর—? কৌতূহলের অবসানে মুচড়ে দুমড়ে ছুঁড়ে দেবে কোন অজানা তুষার-শৃঙ্গে? আমাদের

চিহ্নমাত্র রইল না, এবং তৎসহ খাতা-ভরতি এই যত আয়ুধ নিয়ে যাচ্ছি ভালমানুষ পাঠককুল বিমর্দনের জন্য।

কিন্তু কিছুই হয় নি, সে তো টের পাচ্ছেন। কিস্তি কিস্তি শর-নিক্ষেপ করে নাজেহাল করেছি এতদিন আপনাদের। আজকে ইতি। সফদরজং-এরোড্রোমে উপর থেকে সভয়ে দেখছি—তুমুল হৈ-হল্লা, দাঙ্গা বেধেছে সম্ভবত কোন-কিছু ব্যাপার নিয়ে। দরজা খুলে মালুম হল, প্রায় সেই ব্যাপার—ছোরা-লাঠি নয়, ফুল নিয়ে সব এসেছেন। স্বদেশের ভাইব্রাদাররা দল জুটিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন; নানান সমিতির তরফ থেকেও এসেছেন। ভাইব্রাদার আমার কেউ নেই বটে, কিন্তু সমিতিরা তো ছাড়বেন না—তাঁরা পাইকারি হারে মালা দেন। বেঁটেমানুষ দলপতি ভিন্নরূপ ধারণ করেছেন ইতিমধ্যেই—স্তূপীকৃত মালার নিচে থেকে জুতোসুদ্ধ এক জোড়া পা, বোঝার ক্লান্তিতে পা দুটো গুটিগুটি এগুচ্ছে। সেনাপতি যেন দিগ্বিজয়ে বেরিয়েছিলেন—কাবুল থেকে মেরু-সাগর অবধি বিজয় করে ফিরলেন। অথচ জানেন আপনারা, জুতোর তলায় ধুলোমাটিও লাগতে দেয়নি সোবিয়েতের মানুষ। কোন বাহাদুরির ফলে মাল্যলাভ, বুঝতে পারি না। এক মহিলা নামলেন, তিনি আবার খাস দিল্লির অধিবাসিনী—রক্ষে নেই, তোড়া ও মালা উঁচিয়ে চতুর্দিক থেকে রে-রে করে ছুটেছে। আমি সেই ফাঁকে টুক করে লাইন ছেড়ে জনতার ভিতরে চলে গেলাম—প্লেনে আসিনি, সম্বর্ধনাকারীদেরই একজন যেন আমি। তারপরে ফাঁক বুঝে আরও কিছু পিছিয়ে সটান কাস্টমসের আড়গড়ায় ঢুকেছি।